সূচীপত্র

দার্জিলিঙে যতীন্দ্রনাথ (১৯০৩)

দিদি বিনোদবালা

জন্ম : ১৮৭৪ মৃত্যু : ১৯৪৩

যতীন্দ্রনাথের সহধর্মিনী ইন্দুবালাদেবী

সহধর্মিণী ইন্দুবালাকে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ (দাঁড়িয়ে); দিদি বিনোদবালা (বসে) ; তাঁর বাঁদিকে যতীন্দ্র-কন্যা আশালতা, ডানদিকে তেজেন্দ্রনাথ।

আলোকচিত্রাবলী শ্রী বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

প্রথম দিনের সূর্য

॥ এক ॥

প্রমত্তা পদ্মার চঞ্চলা মেয়ে গড়ুই নদীতে আজ আর তেমন ঢল নামবে না। এখনো সবে হেমন্ত ঋতু। পদ্মার প্রচণ্ড স্নেহের পাশ তুচ্ছ করে ভীষণ গড়ুই ছুটে চলেছে পূবমুখো।

নদীয়া জেলা।

গড়ুইয়ের ডানদিকে, দক্ষিণে পাড়ে, বিখ্যাত কুষ্টিয়া শহর। একটু এগিয়ে, বাঁদিকে, উত্তর পাড়ে—ছোট্ট সুন্দর গ্রাম কয়া। তারপরেই ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের ব্রিজ। দক্ষিণ পাড় থেকে ট্রেন আসছে উত্তরে; গোটা ব্রিজ কাঁপছে সেই গতি-বেগে।

কয়ার চাটুজ্যেদের এই চণ্ডীমণ্ডপের দালান। ভাঙা দালান, সাবেকী আমলের।

বিরাট আঙিনার বুকে এই যে বাগান, এই যে বাড়ি-ঘর, শোনাই এর ইতিবৃত্ত।

গড়ুই নদীর মনোরম এই কূল আমাদের দেশের ইতিহাসের এক মহান নায়কের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে তীর্থস্থানের মহিমা নিয়ে।

অত বড় তীর্থস্থানই যদি হবে, গাইড কই? কই এখানে মর্মর-ফলক?

না, আমরা ভারতবাসী। প্রথমত আমাদের ঐতিহ্য হচ্ছে: ইতিহাস চাই না। চাই পুরাণ। চাই কাহিনী।

দ্বিতীয়ত, চেয়ে দেখি না কেন আমাদের দেশের অদূর অতীতটার দিকে। একের :পর এক ঐশ্বর্য-লোলুপ নরপশুর আক্রমণের শোচনীয় চিহ্ন যে এর প্রতিটি পরতে আঁকা।

তৃতীয়ত, আমরা আজ আত্মবিস্মৃত।

গত আড়াইশ' বছরের কথাই ধরি। না-হয় উল্টে দেখি সেদিনের পাতাটা—যেদিন, উত্তর-কৈশোরে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদে অধিষ্ঠিত সরল সিরাজ বিশ্বাসঘাতকের ছলনায় পড়ে রক্ষা করতে পারল না বিদেশীর গ্রাস থেকে এই সোনার দেশকে।...

খৃস্টীয় আঠারো শতকের বাংলায়, সারা ভারতেই নেমে এল ব্যাপক

অধঃপতনের যে অন্ধকার, তার ইতিহাস যদি থাকেও, সে ইতিহাসের নাম একঘেয়েমি! অথচ দেশবাসীর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সম্পদ—এদেশের স্বকীয়তম সম্পদ, যা বিশ্ববাসীর ঈর্ষার বস্তু—আর অধ্যাত্মজীবনের আস্পৃহা যে বিনষ্ট হয়ে যায়নি, তারই বরাভয় নিয়ে ধ্বনিত হল সাধক কবি রামপ্রসাদের কণ্ঠ; বাংলার বাউল বৈষ্ণব চারণেরা গ্রামে জনপদে শহরে শহরে গেয়ে চললেন চেতনা-উদ্বুদ্ধ করা প্রেরণাদীপ্ত সঙ্গীত; নেপথ্যে ধূনী জ্বালিয়ে সুদিনের প্রতীক্ষায় বসে রইলেন সিদ্ধ মহাপুরুষেরা। তাঁদেরই প্রভাবে, তাঁদের নির্দেশেই, সিরাজের পতনের পনেরো বছর পরে সঙ্ঘটিত হল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—যার পটভূমিকায় পরের শতকে লিখিত হল জাতীয়তাবাদের প্রথম সঙ্কল্পপূত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'। এই সন্ন্যাসীদের আদর্শ বুকে নিয়েই, অনুমান করা যায়, পলাশী যুদ্ধের একশ' বছর পরে এল সিপাহী অভ্যুত্থান—বিদ্রোহের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ স্বাক্ষর।

ওদিকে ভারতীয় নবজাগরণের ভগীরথ রাজা রামমোহন ইংরেজি শিক্ষার প্লাবনের সঙ্গে প্রবাহিত করলেন শাশ্বত ভারতের জ্ঞান-প্রস্রবণকে, প্রলয়-পয়োধি থেকে উঠে এল অজস্র হলাহল আর অপরিমেয় অমৃত। যুক্তির জাগরণের প্রথম পর্বে এল সংশয়বাদ, অবিশ্বাস, আর তত্ত্ব-বিচার; সেইসঙ্গে সৃজনশীল প্রতিভারও স্ফূরণ সম্ভব হল, জীবনাভিমুখী সমাজের মর্যাদা নিয়ে; আর, সর্বোপরি, সুপ্তোত্থিত ভারতীয় চেতনাকে অভিনব সব পরিস্থিতি আর আদর্শের সম্মুখীন হতে হল। সবকিছু হৃদয়ঙ্গম করবার, স্বকীয় করবার, অধিগত করবার সুতীব্র তৃষ্ণা নিয়ে জাতীয় চেতনার আলোকে সদ্য-জাগ্রত মন ফিরে তাকাল তার সমৃদ্ধ অতীতের ঐতিহ্যের দিকে। সেইসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভূমিতে দাঁড়ানোর অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তাও সে অস্বীকার করল না।

রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আবির্ভূত হলেন এ-দেশের 'আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্ত গঠনের সর্বপ্রধান যুগপুরুষ' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—'উগ্র উৎকট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষ'! এলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন। এলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ! এলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর স্বামী বিবেকানন্দ।

এই যে ক্ষণজন্মা পুরুষেরা একের পর এক এসে আমাদের দিয়ে গেলেন

আলোর বার্তা, এঁদের জন্মস্থানের কোথায় কটাই বা মর্মর-ফলক পাব আমরা, কোথায় পাব গাইড? জাতির চেতনায় নিভৃততম মহলে চির অক্ষয় এঁদের আসন।

এই সাবেকী আমলের বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সেদিন ছিল অগ্রহায়ণ মাসের একুশে; বাংলার বারো-শ' ছিয়াশি সাল। ইংরেজি মতে আঠারো-শ' উনআশি সালের ৮ই ডিসেম্বর।

নতুন আমন ধান সবে ক্ষেত থেকে উঠছিল। এই গোলাবাড়ির সামনে, উঠোনে, বলদের পা ধুইয়ে তাদের শিঙে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে—সবে খোলা হয়েছে পিঠের বস্তা দুটির বাঁধন, সশব্দে ধান-বোঝাই বস্তা উঠোনের ওপর আছড়ে পড়েছে।

এমনি লগ্নে বেজে উঠল মঙ্গল-শঙ্খ। শোনা গেল হুলুধ্বনি। আনন্দে উদ্ভাসিত হল চাটুজ্যে-বাড়ির বড়ছেলে বসন্তকুমারের মুখ। তাঁর বোন, বাড়ির বড় মেয়ে শরৎশশী দেবী ছিলেন সন্তান-সম্ভবা; দ্রুতপদে বসন্তকুমার ভিতর-মহলে গেলেন খবর নিতে—

"বড়মামা, দিদিমা বলছেন আমার ভাইটি হয়েছে!"—হাসিমুখে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল শরৎশশীর পাঁচ বছরের শ্যামবরণা ঝলমলে মেয়ে বিনোদবালা।

সাদরে বিনোদকে কোলে তুলে নিলেন বড়মামা বসন্তকুমার।

চাটুজ্যে-বাড়ির পাঁচ ভাই আর দুই বোনের মধ্যে এ-ই প্রথম ছেলে হল, দ্বিতীয় সন্তান। উৎসবের বাঁশি বেজে উঠল সবার প্রাণে।...

বিরাট একান্নবর্তী পরিবার চাটুজ্যেদের। জ্ঞাতিগোষ্ঠী, আত্মীয়-স্বজনে বেশ কয় বিঘা জমি আর এই ভিটে-বাড়ি।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় চুয়াডাঙা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রতি রাতে আইন পড়ে তিনি হুগলী থেকে সকালের ট্রেনযোগে ফেরেন, এসে স্কুল করেন।

যশোর জেলা। ঝিনাইদা মহকুমার সাধুহাটি রিসখালি গ্রাম। কাছেই নদী—নবগঙ্গা। নদীর ধারে সিঁদরে গ্রামে দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীলকর সাহেবদের কুঠি। সমাজের ছোট-বড় সকলেই জুজু হয়ে থাকেন সাহেবদের নামে। ঘোড়ায় চড়ে সাহেবরা পথে বার হলে বিনয়ে আনুগত্যে বেঁকে দাঁড়ান

প্রতিবেশী সকলেই। সাহেব যে রাজার জাত!

কিন্তু একটি লোক, যুবক ব্রাহ্মণ—কোনদিন ফিরেও তাকান না সাহেব-দের দিকে, ভেদ মানেন না কালো-সাদার, মাথা তাঁর সর্বদা উঁচু। সর্বদাই তিনি আত্মস্থ। স্মিত বয়ান, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।—সাহেবরাও চেনেন তাঁকে। আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত এই তেজস্বী ব্রাহ্মণকে সবাই চেনে।

বিঘা কয়েক জমির অধিকারী এই শিক্ষিত ব্রাহ্মণের নাম শ্রীউমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণীর পিতৃগৃহ থেকে ফিরছেন উমেশচন্দ্র—সঙ্গে ব্রাহ্মণী শরৎশশী দেবী, নাবালিকা কন্যা বিনোদবালা, আর ক্রোড়ে শিশুপুত্র।

পুত্রের নামকরণ হল—জ্যোতি।

এই ছোট্ট জ্যোতি উত্তর-কালে অমর হয়ে রইল ভারতীয় বিপ্লব-সংক্রান্ত কাগজপত্রে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রূপে। তিনি স্বয়ং কিন্তু পিতৃদত্ত নামটিই চিরকাল ব্যবহার করে এসেছেন।

যতীন্দ্রনাথ বড় হয়।

মা-বাবার ভালবাসায় শিক্ষায় শাসনে সে বড় হয়ে ওঠে দিদির পিঠপিঠ। দিদি বিনোদবালা তো জ্যোতি বলতে অজ্ঞান।

একদিন জননী শরৎশশী কাজ করছেন রান্নাঘরে।

হঠাৎ তিনি চমকে ওঠেন ছেলের আকুল ডাক শুনে। ফিরে দেখেন: হাঁপাতে হাঁপাতে জ্যোতি কোথা থেকে ছুটে আসছে। কতই-বা তার বয়স? সবে বোধহয় চার বছরে পা দিয়েছে।

মা জিগ্যেস করেন, "হ্যাঁ রে জ্যোতি, অমন করে ছুটে এলি কেন? কী হয়েছে?"

জ্যোতি ভয়ে ভয়ে শুকনো মুখে বলে, "কুকুর!"

"কুকুর? কই কুকুর? দেখা তো?" বলে মা তুলে নিলেন শক্ত এক চেলাকাঠ।

মায়ের আঁচল ধরে উঠোন অবধি যায় জ্যোতি। আড়ষ্ট আঙুল তুলে ধরা-গলায় দেখিয়ে দেয়—"ওই যে!"

জ্যোতির হাতে চেলাকাঠ দিয়ে মা শাসনের সুরেই বলে ওঠেন, "যা! এখুনি কুকুর মেরে আয়। লজ্জা করে না ভয় পেতে?"

জ্যোতি ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। অবাক হয়ে যায় মায়ের মুখের পানে চেয়ে। স্নেহময়ী মার চোখে আগুন!···ছেলের মনে কী ভাব জাগে। একছুটে সে বেরিয়ে যায় কুকুর মারতে।

কাঠ হাতে জ্যোতিকে আসতে দেখে কুকুর ততক্ষণে ভোঁ দৌড় মেরে হাজির হয়েছে বাড়ির পেছনের ধূ ধূ মাঠের মাঝখানে।

ফিরে এল জ্যোতি। মা তাকে আদর করে টেনে নিলেন কোলে। মিষ্টি গলায় বললেন, "ভীতু ছেলের মা আমি নই!"

ভয় পাওয়া বোধহয় জ্যোতির জীবনে এই প্রথম এবং শেষবারের মতো। আর কোনদিন সে ভয় পেয়েছে বলে কেউ শোনেনি কখনো।

আরেক দিনের কথা।

দুপুর বেলা। সবাব খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। মা সবে খেতে বসবেন। জ্যোতি এসে খবর দিল: "মা, বাইরে ভিখারী এসেছে!"

মা উঠে দাঁড়ান। হাত ধুয়ে হাঁড়ির সব ভাত, ডাল, তরকারি পরিপাটি করে সাজিয়ে দেন থালায়। থালা জ্যোতির হাতে দিয়ে বলেন, "যা, অতিথিকে ঠাঁই করে দে!"

ছলছল চোখে অবুঝ ছেলে জানতে চায়, "মা, তুমি খাবে না?"

মা হাসেন। বুঝিয়ে বলেন, "ভিখারী যে ভগবান, বাবা; তার খাওয়া হলেই তো আমার তৃপ্তি"—তারপর হেঁসেল তুলে মা চলে যান কাজে।

জ্যোতি অবাক হয়ে বুঝতে চেষ্টা করে তার মাকে।

বহুকাল আগে এমনি শিক্ষাই কি আরেক মা তাঁর দামাল ছেলেকে দেন নি? শিবাজীর মা জীজাবাঈয়ের কথা কি মনে পড়ে না?

কাহিনীর এই পর্বটা এবার সংক্ষিপ্ত। মাত্র পাঁচ বছরের জ্যোতি আর দশ বছরের বিনোদবালাকে ব্রাহ্মণীর ভরসায় রেখে, চোখ বুঁজলেন তাদের বাবা, মহাতেজা পণ্ডিত উমেশচন্দ্র।

বসন্তকুমার এলেন। পরম স্নেহভরে বিশেষ আগ্রহ করে নিয়ে যেতে চাইলেন ভগিনী শরৎশশীকে কয়ার বাড়িতে। শিক্ষার্থে পুত্রকে শরৎশশী পাঠিয়ে দিলেন বসন্তকুমারের সঙ্গে। নিজে কন্যাকে নিয়ে আঁকড়ে রইলেন স্বামীর ভিটে।

অবশ্য অল্পকাল পরে তাঁর এ-সঙ্কল্প আর টিঁকল না; দাদার সনির্বন্ধ স্নেহের চাপে তিনিও বিনোদকে নিয়ে চলে এলেন কয়ার বাড়িতে। বিরাট একান্নবর্তী সংসারের সমস্ত ভার তিনি তুলে নিলেন নিজের হাতে। কাজের মধ্যে আর সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষার ব্রতে বোনকে নিরত দেখে ভায়েদেরও মনে এল সান্ত্বনা।

বাংলা লেখা-পড়া খুবই ভাল জানতেন শরৎশশী। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির গ্রন্থাবলীই শুধু পড়তেন তিনি,—নিজেও ছিলেন ক্ষমতাশালী কবি।

গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে কতবার দেখা গিয়েছে, তিনি উঠে গিয়ে বসেছেন কবিতা লিখতে। 'স্বামীর স্বর্গারোহণ', 'শ্মশান', 'সংসার' প্রভৃতি তাঁর রচিত কাব্যগুচ্ছ সেকালে যথেষ্ট আদৃত হয়। তার অধিকাংশ আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্তপ্রায়। তাঁর ছোট ভাই ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় 'পারিবারিক কথা' পুস্তকে উদারচেতা অসাধারণ রমণী শরৎশশীর কিছু কিছু কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 'পিতার স্বর্গারোহণ' নামে সুদীর্ঘ কবিতাটির কতকাংশ এখানে তুলে দিই ঃ

এ ভব ভাবনা ব্যাধির যাতনা
আজ বুঝি সব ফুরাইল
পবিত্র শ্মশানে করিয়া শয়ন
হৃদয় বাসনা পুরাইল।
ভীষণ শ্মশানে দেখিয়ে ভীষণ
মনে যে বিকার হয়েছিল
ভয়ানক অতি ভীষণ মূরতি
সে সময় কত দেখাইল,
দেখাইল কত প্রচণ্ড আকার
ভৈরব নিনাদে গরজিল
গরজিল কত মায়া সিংহ আসি'
ভয়াল আকারে আক্রমিল।
দেহ পরিহরি পথিক তখন
স্বর্গ সেতু পথ আরোহিল

প্রবঞ্চনাময় সিংহ সকল
শিবা-বৎ দূরে পলাইল।
ভুলাতে তখন প্রলোভনে পাপ
বাহু প্রসারিয়া দাঁড়াইল,
আয় আয় বলে লইবারে কোলে
বিমান বাহু সে প্রসারিল।
বলিয়া কি ভয় দানিল অভয়
আশ্বাস বচন শুনাইল
ধর্মজ্ঞানে ধীর হইয়া পথিক
প্রলোভনে ধিক প্রদানিল।
ধর্মের আলোকে পথিক অন্তর
আদিত্যের জ্যোতি ধরেছিল
বাদিত্র নর্ত্তকী সুসঙ্গীত সহ
আশু সুখ কত দেখাইল।
দেখিল পথিক প্রবঞ্চনাময়
পাপ মূর্তিখানি বাহিরিল
চিনিয়া তখন নরকের নদী
ধর্ম তরীখানি আরোহিল।
রাজহংসবৎ খেলিতে খেলিতে
পাপের সলিলে পাড়ি দিল
দেখিল সম্মুখে অমর ভবন
ঝলকে নয়ন ঝলসিল।
মরি সে ভবনে সহাস্য বদনে
শ্রীমধুসূদন উত্তরিল
চিনিলে কি ভাই কে ইনি পথিক
কার পুণ্যে পাপ পরাজিল।
জনক আমাদের দেহ পরিহরি
যবে স্বর্গধামে উতরিল
পরীক্ষা করিতে সূর্যের তনয়
প্রলোভন কত দেখাইল।

ধরমের জোরে মহাযোগী পিতা
পরম যোগেশে পেয়েছিল
তখনি দেখিয়া চিনিল তাহায়
ব্রহ্মতেজ তায় পরাজিল।…

শরৎশশী দেবী প্রসঙ্গে ললিতবাবু আরো লিখেছেন যে নিজের অভাবের দিকে দৃকপাত না করে পরণের ভাল কাপড়টি অবধি তিনি গরীব ভিখারীকে দান করে দিয়েছেন কতবার।

সকলের অসুখ-বিসুখে সেবা-যত্ন দেখাশুনো করতে অদ্বিতীয়া তিনি। আবার সংসারে সমস্ত অনুষ্ঠানে, পূজোয়, উৎসবে—প্রাণপণে পরিশ্রম করে সবকিছু স্বার্থকরূপে সম্পন্ন করানোরও তিনি কর্ত্রী।—দেখা গিয়েছে, পাড়ার কোন মেয়ের সন্তান-কষ্ট হচ্ছে, ছুটে গিয়েছেন শরৎশশী, হাতের সব কাজ ফেলে রেখে আঁতুড়-ঘরে শুশ্রূষায় যেতে গিয়েছেন।

গৃহকর্মে, শিল্পে, কাব্যে তাঁর যেমন অনুরাগ, তেমনি দক্ষতা। নানারকম সুন্দর কাঁথা সেলাই করতে, উলের কাজে, পিঁড়ি আলপনায় সিদ্ধহস্ত শরৎশশী দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাভরে বহু পুরস্কার অর্পণ করেছেন আঞ্চলিক হিতকারী সভা।

স্বামীর আদর্শ, আপন আকাঙ্ক্ষা, অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণগুলি সবই কন্যা বিনোদবালা ও পুত্র যতীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চার করতে সর্বদা সচেষ্ট সযত্ন ছিলেন তিনি।

এইভাবে মামাবাড়িতে বড় হয়ে ওঠে দিদি বিনোদ আর তার আদরের ভাই জ্যোতি। মা তাদের উৎসর্গ করেছিলেন পাঁচু ঠাকুরের দোরে। তাই মেয়েকে ডাকেন পাঁচী, আর ছেলেকে পেঁচো নামে॥

॥ দুই ॥

শারদ-যৌবনা নদী গড়ুই।

বাঁকে বাঁকে তার উদ্দাম জোয়ারের আমন্ত্রণ; বিশাল বুকে তার তরঙ্গিত স্রোতের অতল আকর্ষণ। গড়ুই নদীই ছুটতে ছুটতে বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্তে নাম নেয় মধুমতী।

ভীষণ মদির যেমন মধুমতী, ভীষণ মদির তেমনি এই গড়ুই।

দিনের শেষ প্রহর। চাটুজ্যে বাড়ির চত্বর পেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন শরৎশশী নদীর তীর অভিমুখে। সঙ্গে চলেছে হাস্য-চঞ্চল, জ্যোতি—যেন পাথরে কোঁদা বালগোপাল।

পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে ছেলের। নিষ্পাপ কচি অবয়বে রূপ যেন আর ধরে না; সরল অতল দুটি চোখ সবিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে অরুপণ গোধূলি আকাশের তলায় বয়ে-যাওয়া ভীষণ মদির এই গড়ুই নদীর দিকে।

নদীর ওপারে—পশ্চিম দিকে কুষ্টিয়া শহর: ছোট ছোট পুতুলের মতো লোক আসছে যাচ্ছে অনবরত। ছোট বড় কত না নৌকো পাড়ি জমাচ্ছে নদীর বুকে: বড় বড় মহাজনী নৌকো, অগুণতি পালোয়ারি নৌকো—সাদা পাল উড়িয়ে দিয়ে স্রোতের বিপরীত মুখে সবেগে এগিয়ে চলেছে কলকল শব্দে। জেলেডিঙিগুলো স্রোতের বুকে পিছলে চলেছে গা ভাসিয়ে দিয়ে—ইলিশ ধরতে।

সূর্যাস্তের লাল একখণ্ড মেঘ কে যেন গুলে দিয়েছে গড়ুইয়ের জলে: রঙে রঙে ছায়ায় ছবিতে স্বপ্নপুরী গড়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। অনন্ত স্বপ্ন···অজস্র গান···অসংখ্য হাতছানির সেই জগতে মা নেই, দিদি নেই, বড়মামা নেই—সব বাস্তবতার খেই হারিয়ে তন্ময় হয়ে যায় জ্যোতি।

নদীর সঙ্গে, নদীর দুই তীরের ঘন বৃক্ষরাজির আঁকাবাঁকা কালো-সবুজ রেখার সঙ্গে, আর মন উদাস করানো আকাশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় জ্যোতি। বিলীন হয়ে যায় তার সমস্ত চেতনা বিশ্বপ্রকৃতির এই ধ্যান-লগ্নে।

মায়ের ডাকে সংবিত ফেরে।

"দেখ্ রে পাঁচু, এখুনি রেলগাড়ি আসবে", মা ডাকেন।

ঝিক্‌ঝিক্ করে রেলগাড়ি চলে যায় গড়ুইয়ের ব্রিজ কাঁপিয়ে। জ্যোতি চেয়ে চেয়ে দেখে: কোথায় যায় ওই রেলগাড়িটা?···ব্রিজের কাঁপন যায় থেমে।

ব্রিজের তলায়, তীর-বরাবর বড় বড় পাথরের চাঁই ফেলা আছে—জলের তোড় ঠেকানোর জন্যে। অন্য পাশে একটা স্টীমার ডুবনো, মোটা মোটা লোহার শেকল মাটির বুক কামড়ে পড়ে আছে। দিকভোলা গড়ুইয়ের জল প্রতিহত হয়ে প্রবল ঘূর্ণী আর ভলকা সৃষ্টি করছে।

"এই সাঁকো কে বানাল মা ?" জ্যোতি প্রশ্ন করে।

মা তাকে শোনান গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত সেই কাহিনী।...সাহেবেরা এল সাঁকো গড়তে ; জ্যোতির জন্মের অনেক বছর আগের কথা। শত শত লোক কাজে লাগল। কিন্তু পদ্মার দস্যি মেয়ের সঙ্গে আঁটা কি চাট্টিখানি কথা ? থাম একটু একটু গাঁথা হয়, হু হু জলের তোড় কোথা থেকে ছুটে এসে সব ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যায়। আর জলের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে মজুরেরা পালায় কাজ ফেলে।

বারবার এই খেলা চলে।

সাহেবেরা দারুণ রেগে যায়। হুকুম দেয় : জল আসুক না-আসুক— থাম গাঁথা চাই-ই চাই। গাঁথনি ফেলে পালিয়েছ কি গুলী করে মারব !

আবার এল তোড়।

সাহেবের হুকুমের চেয়ে প্রাণের দাম বড়। মজুরেরা হৈ হৈ করে যেই পালাতে গেল, গুলি চালাল সাহেবেরা : মরে গেল দশ-বারোজন মজুর। নির্দোষীর রক্তে লাল হয়ে উঠল কয়ার নরম মাটি, গড়ুইয়ের কাক-চোখো জল।

আহা রে !...ছাঁৎ করে ওঠে জ্যোতির বুক ; পায়ের তলায় যেন সে অনুভব করে নিরপরাধীদের রক্তভেজা মাটি ; গায়ে তার কাঁটা দিয়ে জাগে কি এক শিহরণ। হাসি-হাসি ভাবে-বিভোর মুখে ঘনিয়ে আসে মেঘ।

ম্লান মুখে হঠাৎ চমকায় বিদ্যুৎ। চকচক করে ওঠে জ্যোতির চোখ। "মা, সাহেবেরা কোথায় গেল ?" সে জানতে চায়।

"আছে বাবা, গোটা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে, গোটা দেশেই এমনি করে ওরা শাস্তি দিচ্ছে রোজ কত না অসহায় লোককে"—মার কণ্ঠ করুণ হয়ে আসে, মুখে অথচ কঠোরতার ছাপ পড়ে।

মায়ের মুখের দিকে তাকায় জ্যোতি। বলে ওঠে, "বড় হয়ে আমি কিন্তু সাহেবদের এই নিষ্ঠুরতা সইব না, মা। আমি ওদের শাস্তি দেব !"

তারপর মনে মনেই যেন বলে, "সাঁকোও বানাব আমি। মানুষের মনে দুঃখ না দিয়ে, কাউকে কষ্ট না দিয়েই সাঁকো বানাব আমি !"

মা ছেলের কাঁধে স্নেহভরে হাত রাখেন।

এইভাবে জ্যোতি চিনতে শেখে তার দেশকে, চিনতে শেখে দেশের মাটিকে, মানুষকে, মানুষগুলোর ইতিহাসকে। দেহ-মনের সমস্ত শক্তি

তার একীভূত হয়ে ওঠে আন্তরিক সঙ্কল্পে, দিনের পর দিন। বড় হয়ে প্রতিকার করবে সমস্ত অন্যায়ের, সব অত্যাচারের—এই অঙ্গীকারের বীজ গাঁথা হয়ে যায় জ্যোতির শিশু-মনের অবচেতন গহনে।

"পাঁচু, চল রে, সন্ধ্যে হয়ে গেল" মা ডাকেন। স্নান সেরে এবার মাকে ঘরে ফিরতে হবে। শাঁখ বাজিয়ে যাবেন তাঁর ঠাকুমার কাছে, প্রদীপ আনতে। মণ্ডপের বোধন গাছে, তুলসীতলায়, গোলাবাড়িতে প্রদীপ দেবার সময় হল। তারপরে, সংসারের সব কাজ সেরে, দু-মুঠো খেয়ে নিয়ে তিনি শোবেন গিয়ে বিনোদ আর জ্যোতির মাঝখানে। অত রাত অবধি তারা জেগে থাকবে মার মুখে গল্প শোনার জন্যে: রামায়ণ, মহাভারতের গল্প, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, সীতারাম রায়ের গল্প, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীরের গল্প!···

মায়ের ডাক শুনে জ্যোতি এগিয়ে যায় জলের ধারে। একটা শাড়ির এক মুড়ো নিজের কোমরে বেঁধে অন্য মুড়োটা বাঁধেন জ্যোতির কোমরে, তারপর মা জ্যোতিকে নিয়ে যান একগলা জলে। বেড়ে চলে স্রোতের টান। দু-হাতে শূন্যে তুলে ধরেন মা জ্যোতিকে—সবলে তাকে ছুঁড়ে দেন গড়ুই নদীর উন্মাদ ঢেউয়ের বুকে।

ঝপাং করে ছলকে ওঠে ভর-সন্ধ্যার কালো মাতাল জল!

নীরব গ্রামের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনি তোলে সেই শব্দ। চমকে উঠে কোলের ছেলেকে নিবিড় করে বুকে টেনে নেয় গেরস্তর বউ। অবাক হয় সবাই চাটুজ্যেদের বিধবা মেয়ের বুকের পাটা দেখে। শিবরাত্রির সলতে ওই সবেধন নীলমণি জ্যোতি: এমন অলক্ষুণে কাণ্ড তাকে নিয়ে—কি দরকার বাপু অত সাহসে?

সেদিন বাংলা দেশের সাধারণ মায়েরা বোঝেন নি বীর-প্রসবিনী শরৎশশী দেবীর তপস্যাবল কতখানি স্পর্ধা রাখে। মৃত্যুর কোলে সন্তানকে নিত্য তিনি ঠেলে দিয়ে করে তুলছেন তাকে মৃত্যুঞ্জয়; জীবনের সব সুখ সব দুঃখই যে তিনি সঁপে দিয়েছিলেন সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের শ্রীচরণে!···

জ্যোতি হাঁকপাঁক করতে থাকে, ঢেউয়ের সঙ্গে আপ্রাণ যুঝতে থাকে, যুঝতে যুঝতে দম চলে যায়, তলিয়ে যেতে থাকে। মা এই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করেন: সাঁ করে তীরবেগে উপস্থিত হন তিনি ছেলের পাশে, টেনে তোলেন তাকে। আবার দম নিয়ে আবার জ্যোতি যুঝতে থাকে

ঢেউয়ের সঙ্গে।

জীবন-যুদ্ধের প্রথম হাতে-খড়িই বুঝি দিতে থাকেন শরৎশশী। জ্যোতি হয়ে ওঠে সুদক্ষ সাঁতারু।…

॥ তিন ॥

শ্রীপঞ্চমী এসে পড়ল।

চাটুজ্যে-বাড়ির উঠোনে একটা আলপনা দেওয়া জলচৌকির ওপর গুটিকয় বই, দোয়াত, কলম সাজানো। ধোয়া দোয়াতগুলোয় দুধেজলে ভরে সরস্বতী পুজোর আয়োজন হচ্ছে। পাশেই সিঁদুর-চন্দনে মাখা খাগের কলম।

আজ জ্যোতির হাতে খড়ি

ভোরবেলা উঠে নদীতে স্নান করে এসে খালি গায়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ির ছেলেরা এল অঞ্জলি দিতে: হাত তাদের ভরে উঠল গাঁদা ফুল আর আমের মুকুলে।

অঞ্জলি-শেষে প্রাতঃরাশের পালা। তারপর জ্যোতি যাবে আর-সবার সঙ্গে—পাঠশালায়।

খেতে বসল ছেলেরা।

ক্ষেতের সরষে ভাঙিয়ে টাটকা তেল এসেছে; তাতে গরম গরম মুড়ি মেখে পাতে পাতে দিচ্ছেন জ্যোতির মা, আর মাসীমা জয়কালী দিচ্ছেন খই-মুড়কি, বড়মামীমা দেবরাণী নিয়ে এলেন চিঁড়ের মোয়া আর ভাঁড়ারের মটকি থেকে 'কুশর' গুড়; আখের গুড়ের মটকির মুখে সোনা-রঙ যে পুরু সর দানা বেঁধে ওঠে, সেটা ছেলেরা কত ভালবাসে মামীমাও জানে। এরপর এল নারকেল নাড়ু।

পাশেই উঁচু বাঁশের বেড়ার ওপর ঢোলকলমীর লতা; বড় বড় সাদা ফুল থেকে শিশির ঝরে পড়ছে। অদূরে বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর দিয়ে উয়াক উয়াক করে উড়ে চলেছে সাদা বকের পাঁতি। ওদিকে মাচার ডগায় সতেজ লাউগাছের ঢোলাঢোলা পাতার ফাঁকে উকি মারছে অনেক ফুল আর একটা দুটো কচি লাউ।

গ্রামের অন্যান্য ছেলেরাও এসে পড়ল, মুড়ি-মুড়কি, নাড়ু আর আখের

গুড় খেল সবার সঙ্গে। তারপর দল বেঁধে বেরিয়ে গেল তারা। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে নদীর কিনারায় পাঠশালা বসে গোপাল পণ্ডিতের। খেয়াঘাট থেকে অবিরাম লোক আসে যায়।···

পথে, নদীর ধার দিয়ে চলে ছেলেরা। জ্যোতি বলে, হ্যাঁরে আজ যে শ্রীপঞ্চমীর দিনে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে হয়।···সবাই আগ্রহভরে তাকাতে থাকে, কার চোখে প্রথম নীলকণ্ঠ পাখি পড়ে।

পাঠশালার পাশেই রাজকিশোর পালের গুড়ের আড়ৎ। মাটিতে দরমা পেতে সাদা দোলোগুড় শুকুতে দেওয়া হয়েছে।

"কই, জ্যোতে-দাদা, পাঠশালায় যাবার আগে মিষ্টিমুখ করবে না?"—হৈ-হুল্লোড়ে ভরে যায় আড়ৎ: ছেলেরা গুড় চেখে পাঠশালায় যায়।

গোপাল পণ্ডিতের পাঠশালা ভাঙে বেলা একটা নাগাদ। ভাত খেতে যাবার ছুটি।

বাড়ির আর সবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে, ছেলেরা-পাঠশালা থেকে ফিরলে তাদের খাইয়ে গিন্নীরা খাবেন। ততক্ষণে চাটুজ্যে-বাড়ির উঠোনে খেতে বসেছে—মুসলমান চাকর নরমদি, ঘরামি নাসের আর গরু চরানোর রাখাল। বসন্তবাবুর খুড়িমা ব্রহ্মময়ী চাকর-বাকরদের পাতে আমিষ ব্যঞ্জন সমেত ভাত-ডাল পরিবেষণ করছেন।

আর, রোজকার মতোই, পথ চলতি অপরিচিত অতিথির ঠাঁই পড়েছে বাইরের ঘরে। জ্যোতি আর—তার চেয়ে মাত্র বছরকয়েকের বড়—তার ছোটমামা ললিতকুমার পরিবেষণ করছে অতিথিদের।

খাবার পর আবার পাঠশালা।

ছেলেদের দলে জ্যোতি যেমন পাণ্ডা হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই, তেমনি পড়াশুনোতেও পণ্ডিতমশায়ের প্রিয়পাত্র হতে তার দেরি হয় নি। মধুর স্বভাব, সত্যবাদিতা, সুন্দর সুঠাম চেহারা, সরল হৃদয় আর শুভবুদ্ধির জন্যে গাঁয়ের ঘরে ঘরে তার আদর। তার সাহসের জন্যে ছেলেরা রীতিমতো সমীহ করে চলে।

জেলা-বোর্ডের রাস্তা বেয়ে ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যায়।···

কে ওই লোকটা—মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ভীমকান্ত দশাসই চেহারায় ওই যে ছুটে আসছে? কাঁধে ওর মাঝারি-গোছের একটা থলে, ডান হাতে ঘুঙুর-বাঁধা সড়কি!

চাটুজ্যেদের দক্ষিণ-ভিটেয়, বৈঠকখানার সামনে বেলগাছ তলায় এসে লোকটা থলে নামিয়ে রাখল।

"পরাণ এসেছিস ?" বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন গ্রামের পোস্টমাস্টার হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—জ্যোতির মেসোমশাই। চাটুজ্যে-বাড়িতেই গ্রামের ডাকঘর।

হরলালবাবুর পেছন-পেছন হুঁকো টানতে টানতে বেরিয়ে এলেন গ্রামের আর-দশজন মাতব্বর। "খুলুন, হরদাদা, দেখি আজকের ডাকে কি এল !" বলতে বলতে অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন থলেটার ওপর।

ওদিকে ঝাঁকড়া চুল ডাকহরকরাকে এককোণে ডেকে নিয়ে গল্প জমায় জ্যোতি।

"ভুঁইমালীদা, তুমি যে এতটা পথ একা একা আস, যদি কুশর-খেত থেকে বুনো শুয়োর ছুটে এসে তোমায় তাড়া করে ? ভয় করে না ?"

পরাণ ভুঁইমালী জ্যোতিদেরই ভিটের শেষ মুড়োয় থাকে। ঝাঁকড়া চুল নেড়ে সে হেসে বলে, "কেনে দাদাবাবু, আমি তার প্যাটের মুধ্যি আমার এই সড়াকিডা ঢুকোয়ে তাইরে মাইরে ফেলাবো।"

পরাণের বলিষ্ঠ চেহারাটা ভাল করে ঠাহর করে দেখে জ্যোতির বিশ্বাস হয়, হ্যাঁ! পরাণের মতো তাগড়াই স্বাস্থ্য আর মনের জোর আছে যার, জগতে তার ভয়ের কি আছে ?

ভারি শ্রদ্ধা জাগে জ্যোতির মনে। পরাণের কাছে আরো ঘন হয়ে সে দাঁড়ায়। শোনে পরাণের মুখে নানা বীরত্বের কাহিনী। শুনতে শুনতে ছোট্ট জ্যোতির নিশ্বাস দ্রুত হয়ে আসে, আয়ত চোখদুটো জ্বলজ্বল করে, বুক ফুলে ফুলে ওঠে উত্তেজনায়।

আবার তাকে প্রশ্ন করে জ্যোতি, "আচ্ছা, পরাণদা, সন্ধ্যেবেলায় তুমি যে একলাটি কুষ্টেয় যাও, তোমার গা ছমছম করে না বিন্দীপাড়ার ঘাটে ? ওই শ্মশান থেকে নাকি ভূত-প্রেত বার হয় ; তারা যদি তোমার ঘাড় মটকে দেয় ?"

এবারও পরাণ বিচলিত হয় না। সরল মনে জ্যোতিকে সে বলে, "দাদাবাবু, ভূত-পেত্নী ওসব লোকের বানানো কথা। ওসব কিচ্ছু নেই, তুমি জেনে রেখো।"

জ্যোতির ভারি ভাল লাগে পরাণের কথাগুলো। সে ভাবে, "বড় হয়ে আমিও যাব পরাণদার মতো, একা-একা ঘুরব বনে বনে, বুনো শুয়োর, সজারু, বাঘ-ভাল্লুক মেরে আনব।"

একদিন মাঝরাতে সত্যিই জ্যোতি চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ে।* পূর্ণিমার রাত। আকাশে-বাতাসে জেগেছে আমন্ত্রণ: উন্মাদনায় বেরিয়ে পড়ে জ্যোতি, হাতে একটামাত্র সড়কি।

মাঠে মাঠে ঘুরছে বুনো সজারুর দল। সড়কি-ধারী বালক-শিকারীর সন্ধান পেয়ে তারা দে ছুট্—চোখের পলকে উধাও হয়ে যায় ঝোপের আড়ালে।

জ্যোতিও সমানে তাদের তাড়া করে চলে। ঝুমুর-ঝুম্ ঝুমুর-ঝুম্… সারারাত প্রায় চলে সজারুর শব্দ, আর তার পিছু-পিছু ক্ষত্রিয়ের দুর্বার তেজে ধাওয়া করে চলে জ্যোতি ॥

॥ চার ॥

স্বামীর মৃত্যুর পর দু'বছর কেটেছে, কি কাটে নি। আবার ব্যথার বেহালায় মূর্ছনা উঠল শরৎশশীর জীবনে।

দাদা বসন্তকুমারের চেষ্টায় ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি কন্যা বিনোদবালার। কিন্তু মেয়ের কপাল খারাপ। বছর না-পুরতেই তাকে শাঁখা-সিঁদুর ফেলে বরণ করতে হল বৈধব্যের সাজ। সবে তখন বিনোদ-বালার বারো বছর বয়েস।

আর-দশজন মায়ের মতো বিলাপ করেন নি তিনি। নতুন সঙ্কল্পে বুক বেঁধে দাদাকে বললেন: বিনোদ ইংরেজি লেখাপড়া শিখবে।

ঘরে বসে ইতিমধ্যে বিনোদ বেশ বাংলা শিখেছে মায়ের কাছে, শিখেছে ঘরের কাজ। আর মায়েরই মতো, সে-ও পেয়েছে স্বভাব কবিত্ব। সেইসঙ্গে পেয়েছে চরিত্রের দৃঢ়তা।

বসন্তকুমার ব্যবস্থা করলেন বিনোদবালার উপযুক্ত শিক্ষার।

এমনি একদিন। বিনোদ আর জ্যোতি এক-সঙ্গে বসে পড়াশুনো করছে। আর পড়শীদের এক মেয়ে নির্নিমেষ চেয়ে আছে তাদের দিকে।

---

* শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঘা যতীন' জীবনী দ্রষ্টব্য॥

শরৎশশী দেবী সংসারের কাজের অবসরে সেদিকে গিয়েছেন। মেয়েটিকে বাইরে চৌকাঠের কাছে বসে থাকতে দেখে বলেন, "হ্যাঁরে ভেতরে গিয়ে বস না!"

"না, মাসী, ওরা যে লেখাপড়া করছে!"

"তাতে কি—"

"না, মাসী, বিনোদের পাপ হচ্ছে না লেখাপড়া করে?"

"পাপ কেন হবে রে?"

"আমিও মাসী মনে মনে প্রার্থনা করি, পরের জন্মে আমি যেন পাঁচী আর পেঁচোর মতোই লেখাপড়া করতে পারি!"

জ্যোতির ন'মামা অনাথবন্ধু—ভারি সৌখিন লোক। খেলাধুলোয়, জিমনাস্টিকে, ঘোড়ায় চড়তে, বন্দুক চালাতে, মাছ ধরতে সিদ্ধহস্ত। নদীয়ার রাজবাড়িতে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তিনি।

বাড়িতে ন'মামা বিলেতি কুকুর, হরিণ, ময়ূর, ভাল ভাল পায়রা পুষেছেন। গোয়ালভরা দুধেল গরু—নিজে হাতে তাদের সেবা করেন।

ন'মামার দামী ঘোড়া, সুন্দরী নাম। সাদা ধব্‌ধবে তার রং। তেমনি চমৎকার চলন।

জ্যোতির সাধ যায়, ঘোড়ায় চড়া শিখবে। বয়েস সবে আট কি নয়। মামার কাছে মনের কথা খুলে বলতে তিনি তো আনন্দে আটখানা।

"তুই ঘোড়ায় চড়বি, জ্যোতে? এখুনি চল্।"

বাড়ির পাশ দিয়ে জেলা-বোর্ডের পাকা সড়ক গিয়েছে কুষ্টিয়ার উত্তর-পার থেকে সোজা কুমারখালি অবধি। সেই রাস্তার ওপারে ন'মামা জ্যোতিকে তালিম দেন সুন্দরীর পিঠে।

দেখতে দেখতে জ্যোতি গুরুমাবা বিদ্যে আয়ত্ত করে ফেলল। সুন্দরীর পিঠে জিন্ নেই, মুখে লাগাম নেই, জ্যোতি তার ওপর সওয়ার হয়েছে, যেন আরব বেদুইন। একহাতে ঘোড়ার কেশর ধরে অন্য হাতের ইশারায় ঘোড়াকে সে অবলীলাক্রমে চালিয়ে দেয় তীরবেগে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে অদৃশ্য হয়ে যায় সে দু-চারখানা গ্রাম ওপারে।

মুগ্ধ বাষ্পাকুল নয়নে ন'মামা চেয়ে থাকেন শিষ্যের দিকে, বিধবা বড়দির একমাত্র পুত্রের প্রগতির পথ অভিমুখে! সাব্যস্ত করেন, জ্যোতিকে বন্দুক

চালাতেও শিখিয়ে দেবেন।

শুধু বন্দুক চালানোই নয়ঃ ন'মামার অনেক গুণ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলে জ্যোতি।

প্রায়-সমবয়সী ছোটমামা ললিতকুমার আর খেলার সঙ্গী অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে জ্যোতি গিয়েছে কাছাকাছি এক গ্রামে; সেখানকার মেলায় নাকি খুব ভাল একটা তেজী ঘোড়া বিক্রী হচ্ছে। ও-ঘোড়াটা কিনবে জ্যোতি।

ঘোড়ার চনমনে চেহারা দেখে জ্যোতির ভারি পছন্দ হয়ে গেল। এখন, একবার চড়ে দেখা দরকার। ঘোড়ার মালিককে জিন লাগিয়ে দিতে বলায় তিনি জানালেন যে জিন তো নেই, তবে লাগাম দিতে পারেন।

তাই সই।···

লাগাম-গাছটা ঘোড়ার মুখে লাগিয়ে, এক লাফে তার পিঠে চেপে জ্যোতি চাবুক হাঁকড়াল। এ-টুকুর অপেক্ষাই বুঝি করছিল ঘোড়াটা।

হাওয়ার বেগে সে ছুট দিল গেঁয়োপথ ভেঙে।

বর্ষাকাল। জলে-কাদায় দুরূহ পিচ্ছিল সেই পথ। স্বচ্ছন্দে ঘোড়া চলছে প্লুতছন্দের জোয়ার ঢেলে। এমন সময় গব্‌গব্‌ ক'রে বৃষ্টি নামল আকাশ ভেঙে।

সঙ্গীরা ওদিকে বাড়ি পৌঁছে দুর্গানাম জপ করছে। খালি হাতে এই দুর্যোগের মধ্যে কি করবে জ্যোতি, কোথায় যাবে, কে জানে? ঘোড়াটা তার ওপর একদম নতুন।

প্রকাণ্ড এক চক্কোর মেরে, সব সন্দেহ নিরসন ক'রে দিয়ে জ্যোতি কিন্তু খানিকবাদেই ফিরে এল তার সন্থ কেনা বাহন নিয়ে।

জ্যোতিকে এখন পায় কে?

সাঁতার কেটে যে সময়ের মধ্যে সে আট-দশ মাইল চ'লে যেত, গড়ুইয়ের স্রোত ঠেলে, সেই সময়ের মধ্যেই সে বহুগুণ দূরে চলে যায় তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

বড়মামা একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এলেন আফ্রিদি এক ওস্তাদকে।

লম্বায় যেমন, তেমনি চওড়ায়, দশাসই: গোটা শরীর যেন তামা পিটিয়ে কোনও অলৌকিক শিল্পী সযত্নে গ'ড়ে দিয়েছেন। জ্যোতি সমীহে, গর্বে

তাকিয়ে থাকে তার পানে।

ওস্তাদের নাম ফেরাজ খান্। বাংলা দেশের আওতায় এসে তার নাম মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল ফেরাজমিঞা রূপে। —মাইনে দিয়ে তাকে কয়ার বাড়িতে রেখে দিলেন বসন্তবাবু: বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে জ্যোতিকেও সে শেখাবে কুস্তি, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, তলোয়ার চালানো।

কুস্তির নানা প্যাঁচ ইতিমধ্যে জ্যোতি রপ্ত করেছিল কয়াগ্রামের কাছেই গট্টিয়ার ওস্তাদ যাদুমাল কুস্তিগীরের আখড়ায়। কয়ার চাটুজ্যে-বাড়িতে যাদুমালের বহুকালের যাতায়াত। জ্যোতিকে সে সযত্নে তালিম দিয়েছিল শরীর-চর্চার।

ফেরাজের সংস্পর্শে এসে জ্যোতির স্বাধীনতা-প্রিয় মন পেল নতুন ভাবনার খোরাক, যখন শুনল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে—ফেরাজের মুলুকে—স্বাধীনতার মূল্য প্রাণের চেয়েও বেশি বলে জানে সেখানকার লোক।

জ্যোতি এক মুহূর্তের জন্যেও ভোলে না তার মায়ের শিক্ষা: বিদেশী রাজার অত্যাচারে জর্জর মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতেই হবে। ফেরাজের স্বাধীনচেতা মন বুঝল হয়তো জ্যোতির মনের সঙ্কল্পের মূল্য।

দেখতে দেখতে বাংলা-মুলুকের ছোট্ট জ্যোতিকে ভালবেসে, কয়াগ্রামের চাটুজ্যে-বাড়ির বনেদি মেজাজে আকৃষ্ট হয়ে ফেরাজ ভালবেসে ফেলল পল্লী-অঞ্চলের বাংলাকে. চাটুজ্যে-বাড়ির ভিটেতে ডেরা বাঁধল সে; এই বাড়িতেই বহু বছর অতিক্রান্ত হল তার, এই বাড়িতেই বার্ধক্য-পীড়িত ফেরাজ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। রুক্ষ দুর্ধর্ষ আফ্রিদি আশ্রয় পায় বাংলার শীতল মাটির বুকে।

জ্যোতিকে ফেরাজ বলত: তাদের মুলুকেও ইংরেজ রাজা হতে চেয়েছিল। কিন্তু লাঠির জোরে তারা সেই দুশমনদের ঠেকিয়ে রেখেছে। দারুণ দুর্দশা তাদের দেশের; বড গরীব তারা। তবু তারা নিজেদের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয় নি।

॥ পাঁচ ॥

বড়মামা বসন্তকুমার রাত জেগে আইন অধ্যয়ন করে করে কৃতিত্বের

সঙ্গে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ণনগরে গিয়ে নদীয়ার সদর জেলা-বোর্ডে ওকালতি করছেন ; কয়েক বছরেই জমিয়ে ফেলেছেন তাঁর পশার, উত্তরোত্তর তাঁর খ্যাতির সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে।

অনতিকাল পরে তিনি শুধুমাত্র নদীয়ার গভর্নমেণ্ট প্লীডার-ই হলেন না, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ, জেলাবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ, কৃষ্ণনগর কলেজের আইন অধ্যাপকের পদ প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ কর্মেই বৃত হন কালক্রমে।

তাঁর স্বনামধন্য মক্কেলদের অন্যতম ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, নদীয়ার মহারাজা, মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর রামগোপাল চেৎলাঙ্গিয়া প্রভৃতি ; কয়া গ্রামের অতি নিকটে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারী—সেইসূত্রেই কয়ার চাটুজ্যে-বাড়ির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। ঠাকুরবাড়ির সুরেন্দ্রনাথ আবার নিবিড়ভাবে পরিচিত হন আমাদের কাহিনীর নায়ক জ্যোতি বা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ; উভয়েই উভয়ের কাছে যাতায়াত করতেন, উভয়ে ছিলেন একই পথের পথিক।

কিন্তু সে কাহিনী বলবার সময় এখনো আসে নি।

বড়মামা বসন্তকুমারের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আইনের গণ্ডী ছাড়িয়ে রাজনীতি, সমাজ এবং সাহিত্যের দরবারেও তাঁর অবদান কম নয় ; তার প্রমাণ : নদীয়ার প্রতিনিধি হয়ে মাদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ প্রভৃতি কংগ্রেসে তাঁকে যেমন যোগ দিতে হত, তেমনি যোগ দিতে হত বিভিন্ন সাহিত্য আর সমাজসেবামূলক সম্মেলনেও।

প্রতি সপ্তাহে বড়মামা কয়ায় এসে ক'দিন কাটিয়ে যান, জমি-জমার তদারকি, সংসারের দেখাশুনো, প্রজাদের সুখ-দুঃখ অবধারণের উদ্দেশ্যে।

জ্যোতি বারো বছরে পা দিয়েছে। গ্রামের পড়া তার সাঙ্গ হয়েছে। বড়মামা গ্রামে এসে জ্যোতির শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চমৎকৃত হলেন, সকলেই একবাক্যে এই হীরের টুকরো ছেলেটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করেন দেখে গর্বে স্নেহে বড়মামার বুক ভরে ওঠে।

শরৎশশী দেবীকে ফিরে এসে বলেন তিনি, "জ্যোতিকে তুই আমার সঙ্গে কৃষ্ণনগরে পাঠিয়ে দে। ওখানকার A. V. School-এ ওকে ভর্তি করে দিচ্ছি, এনট্রান্স ওখান থেকেই পাশ করুক।"

দাদার কথায় শরৎশশী সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। জ্যোতিও প্রস্তুত।

কৃষ্ণনগরে শুরু হল জ্যোতির নতুন জীবন। প্রতি সপ্তাহে সে গ্রামে ফিরে যায় মাকে দেখতে, দিদির সঙ্গে দুষ্টুমি করতে, মামা, মাসী, মামীদের দেখতে, মামাতো মাসতুতো ভাই-বোনদের আর গ্রামসুদ্ধ ছেলে-মেয়েদের ঐকান্তিক সান্নিধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত করতে। আর তার নিজস্ব বালক-সঙ্ঘের খবরদারি করাও কমখানি কাজ নয়।

একদিন সে কৃষ্ণনগরের পথ দিয়ে চলেছে স্কুলে—খবর পেল গ্রামে কলেরা লেগেছে।

অবিলম্বে জ্যোতি পাড়ি জমাল কয়া অভিমুখে: তার গ্রামের লোক কলেরায় আক্রান্ত আর সে কিনা কৃষ্ণনগরে বসে থাকবে নিশ্চেষ্ট হয়ে? সে না গ্রামে বালকদের দলপতি? বিপদে দূরে থাকা যে তার পক্ষে অসম্ভব।

কলেরার দুঃসংবাদ ঠিকই, কিন্তু গ্রামে এসে জ্যোতি দেখল অমন দুঃসময়েও যথারীতি স্কুল চলছে। শিক্ষকেরা স্কুলের ছুটি দিতে নারাজ: হুকুম নেই! অথচ ছুটি না পেলে ছেলেদের নিয়ে পীড়িতের কাজে নামাতে পারবে না জ্যোতি।

পরদিন। চার-পাঁচজন অনুগত সহচরকে নিয়ে জ্যোতি গিয়ে দাঁড়াল স্কুলের কাছাকাছি একটা পোড়ো বাড়ির সামনে। এখানেই হল তাদের হেড-কোয়ার্টার: বই-দপ্তর বগলে যেই ছাত্রেরা স্কুলের দিকে পা বাড়ায়, জ্যোতির সঙ্কল্প জানানো হয় তাদের—"বাড়ি যা, সময় মতো কাজে নামবার ডাক আসবে, তখন আসিস। স্কুলে যাবি না!"

যারা নিষেধ না শুনে জোর করে স্কুলে ঢুকবে বলে এগিয়ে গেল, তাদের চ্যাংদোলা করে আটক রাখা হল পোড়োবাড়িটার মধ্যে।

ঘণ্টা পড়ল। কেউ ক্লাসে এল না। বসে বসে বিরক্ত হয়ে শিক্ষকেরা ফিরে গেলেন যে যার ডেরায়।

"ঘটনাটি ছোট্ট। কিন্তু এর মূল কথাটা তখন দেশের হাওয়ায় ভাসছে। ...দুই মন্ত্র—Service to humanity এবং resistance to authority—তখন এক ছন্দে মিলে গেছে। কারো শিক্ষার অপেক্ষা না রেখে তাঁর স্বভাব কেমন সহজে সেই ছন্দ গ্রহণ করেছিল ঐ ছোট ঘটনাটি তারই সাক্ষী।..." লিখেছেন হেমন্তকুমার তরফদার।*

---

* আনন্দবাজার পত্রিকা, বিশেষ যতীন্দ্রনাথ সংখ্যা (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭)॥

স্কুলের ছেলেদের নিয়ে পরম উৎসাহে জ্যোতির দল ঘরে ঘরে রোগীর সেবায় লেগে গেল। বিস্মিত গ্রামবাসীরা দেখল, যে-রোগ হলে মায়ের পেটের ভাই অবধি ভাইকে ফেলে পালাতে কসুর করে না, সেই রোগের বিরুদ্ধে একি সংগ্রাম ঘোষণা করেছে এই দুগ্ধপোষ্য ছেলের দল।

কলেরা, বসন্ত—যে কোনও রোগেই জাতি ধর্মের প্রভেদ তুচ্ছ করে জীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করবার প্রেরণা জ্যোতি পেয়েছিল তার গর্ভধারিণী শরৎশশী দেবীর কাছে। শরৎশশী দেবীই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। জ্যোতির সহজাত শুভ-বুদ্ধিই অবশ্য তাকে শিখিয়ে দিয়েছে সবচেয়ে বেশি—মানুষের মাঝে মানুষ রূপে কী তার কর্তব্য! আর, বেপরোয়া, কর্তব্যনিষ্ঠ অথচ করুণাময়ী শরৎশশী দেবী ইন্ধন জুগিয়েছেন জ্যোতির সেই বিবেকের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

আম পেকেছে, কাঁঠাল পেকেছে। এ-ভি স্কুলের বাগান ম'-ম' করছে পাকা কাঁঠালের গন্ধে।

জ্যোতির কিন্তু হুঁশ নেই সেদিকে। তাদের দেশের বাড়িতে বহু রকম আম আর সেরা গোলাপী কাঁঠাল পাড়া হয়েছিল বাগান থেকে; এই তো দু-দিন হল সে খেয়ে এসেছে। সেই গোলাপী কাঁঠালের মধুর সোয়াদ, প্রচুর রস আর মন-মাতানো সুগন্ধ আর-দশটা কাঁঠালের থেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র।

স্কুলের পরে চুপি-চুপি একদল ছেলে এসে জ্যোতির কাছে আর্জি পেশ করল, "ভাই জ্যোতিদা, জান, কি খাসা কাঁঠাল ইস্কুলের এই গাছে পেকেছে। কিন্তু ওর একটা কোয়াও খায় কার সাধ্য?"

"কেন?" জ্যোতি জানতে চায়।

"ও বাবা! সব চলে যায় হেডমাস্টার মশায়ের বাড়িতে। দরোয়ানেরা পেড়ে নিয়ে যাবে, দেখ!"

"তা তোরা কোনদিন চেয়ে দেখেছিস, মাস্টারমশাই দেন কি না?"

"মোটেই দেবেন না, জানি আমরা।"

"বেশ, কাল তা হলে সন্ধ্যের পর ইস্কুলে আসিস—সকলে। তোদের

কাঁঠাল খাবার নেমন্তন্ন রইল", দরাজ গলায় জ্যোতি বলল।

যথা নির্দেশ! এ-ভি স্কুলে জ্যোতির যত সহপাঠী ছিল, কেউ বাদ গেল না এই কাঁঠালের ভোজ থেকে। পরম তৃপ্তিভরেই কাঁঠাল খেতে খেতে তারা জিগ্যেস করল, "জ্যোতিদা, অত কড়া পাহারা এড়িয়ে কাঁঠাল পাড়লে কি করে?"

জ্যোতি মুখ টিপে হাসল:

পরদিন যথাসময়ে হেডমাস্টার খবর পেলেন যে বাগান থেকে কাঁঠাল চুরি করে খেয়েছে স্কুলেরই ছাত্রেরা।

শুকনো মুখে ছেলেরা ঘোরাঘুরি শুরু করল জ্যোতির আশে-পাশে: "কি হবে জ্যোতিদা? দারুণ শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে; মাস্টারমশাই যে আস্ত রাখবেন না! আবার বাড়িতে খবর গেলে সেখানেও উত্তম-মধ্যমের ব্যাপার—"

"তোরা এতই ভীতু, জানতাম না?" নির্বিকারচিত্তে জ্যোতি বলল, "ফুর্তি করে কাঁঠাল খেতে পারলি, আবার সে-জন্যে কতটা দুর্ভোগ কপালে আছে সেই ভেবে আধমরা যদি থাকবি, দুর্ভোগ পোয়াবি কি করে? অত ভয় থাকলে কাঁঠাল খেলি কেন?"

সকালবেলা ক্লাস বসেছে।

হেডমাস্টার হঠাৎ ক্লাসে এসে ঢুকলেন। সন্ত্রস্ত ছাত্রেরা হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল। একপ্রস্থ সদুপদেশ বর্ষণ করলেন মাস্টারমশাই। তারপর আগের দিনের ঘটনার জের টেনে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—কী মারাত্মক অপরাধ করেছে ছেলেরা।

তারপর বললেন, "আমি জানি, স্কুলের সকলে এমন হীন কাজ করতে পারে না। যারা অপরাধ করেছ তাদের নাম চাই আমি।..."

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে অধোবদন।

হেডমাস্টার মশাই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে লক্লকে বেত শাসিয়ে প্রশ্ন করলেন, "জবাব দিচ্ছ না কেন?"

নিরুত্তর ক্লাসের নীরবতা ভেঙে গম্ভীরভাবে হাত তুলল—ক্লাসের সেরা ছেলে, জ্যোতি।

আশার আলো খেলল হেডমাস্টার মশায়ের মুখে। "তুমি জান, জ্যোতি, কে কে এই জঘন্য অপরাধে লিপ্ত?"

"আমি একা, স্যার !"

হতচকিত হেডমাস্টার মশাই রাগে-বিস্ময়ে থ' বনে গেলেন। ভীষণ ক্ষোভে বললেন, "তুমি ? তুমি একা ? তুমি না এই স্কুলের গৌরব ?"

"হ্যাঁ স্যার, একা আমি গতকালের ঘটনার জন্যে দায়ী। কারণ—"

"কারণ ?"

"কারণ আমার মনে হল যে এই ঘটনাটায় কোনমতেই অপরাধ হতে পারে না।"

"অপরাধ হতে পারে না ?" বিদ্রূপের ঝাঁজ !

"স্যার কিছু যদি মনে না করেন তো বলি : এই কাজ করবার আগে আমি বহুবার ভেবে দেখেছি যে এ-কাজে অপরাধ হয় না আমাদের। এবং অপরাধ যদি হত, আমি এ-কাজ করতাম না।"

বারো বছরের ছেলের এই আত্ম-বিশ্বাস ও বিবেক-বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হন হেডমাস্টার মশাই। মুগ্ধ হন তার সাহসে।

"এ কাজে অপরাধ নেই কেন, বুঝিয়ে দাও।" তিনি সাগ্রহে জিগ্যেস করেন।

একটু ইতস্তত করে সবিনয়ে জ্যোতি জবাব দেয়, "স্যার, ইস্কুল আমাদের। আমরা কি ঘণ্টা বেঁধে শুধুমাত্র পড়তে আসি এখানে, একে ভালও বাসি না আমরা ? এই ইস্কুলের গাছে গাছে আমাদের চোখের সামনে মুকুল আসে, গুটি ধরে, ফল হয়, ফল পাকে। সে-ফলের স্বাদ কেমন আমাদের তো জানতে ইচ্ছে হয় ? ছেলেদের কাছে শুনলাম, ফল পেকে উঠলেই সেগুলো উধাও হয়ে যায়। অথচ সকলেরই প্রবল ইচ্ছে দেখলাম, কাঁঠালগুলো কেমন, চেখে দেখে। কিন্তু আপনাকে বলবার সাহস ওদের নেই দেখে আমি ভার নিয়েছিলাম, কাঁঠাল পেড়ে ওদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার। সবাই যে কী তৃপ্তি পেয়েছে স্যার, এই ফল খেয়ে, আপনি নিজে না দেখলে বুঝবেন না।"

অকপট ভাব-গম্ভীর কথাগুলো শুনে হেডমাস্টার মশাই বিচলিত হলেও গম্ভীর মুখে সবাইকে বললেন, "ঠিক আছে, বস সকলে !"—বলে বেরিয়ে গেলেন ক্লাস থেকে।

সেদিন থেকে ঢালাও হুকুম দিলেন তিনি—"এবার থেকে কাঁঠাল পাকলেই ইস্কুলের মালীরা তা' পেড়ে ছেলেদের খাওয়াবে।"

কৃষ্ণনগর। ১৮৯৩ সাল।

এ-ভি স্কুলের ছাত্র জ্যোতি, কাগজ পেন্সিল কিনতে গিয়েছে বাজারে, রাস্তার ওপরেই, নদীয়া ট্রেডিং কোম্পানীর এক দোকানে।

দাম মিটিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় তার কানে এল হঠাৎ দারুণ হল্লা, আর্তকণ্ঠের মিনতি, ত্রাহি-ত্রাহি রব।

দোকানের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে জ্যোতি দেখে, প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে পথচারী যত, প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে জনবহুল রাস্তা, চারিধারে অস্বাভাবিক শশব্যস্ত ভাব।

ভাল করে ঠাহর করবার জন্যে জ্যোতি ফুটপাতে নেমে পড়তেই শুনল শত কণ্ঠের সতর্ক চিৎকার: পালাও, পালাও! মারা পড়বে!···

জ্যোতি চেয়ে দেখে, রাস্তার দু' পাশের রোয়াকে, জানলায় ভিড় করে সবাই হুমড়ি খেয়ে ওকে সাবধান করতে ব্যস্ত। পথের দিকে লক্ষ্য করে তার চোখে পড়ল—অদূরে, ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ছুটে আসছে এক পাগলা ঘোড়া, আলটু-বালটু লাফাতে লাফাতে।

মন ঠিক করে ফেলল জ্যোতি। পালানোর বদলে ততক্ষণে সে দেখে নিয়েছে তার পিছন দিকে মাঝ-পথে ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে এক শিশু; সামনে থেকে ঘোড়া ছুটে আসছে। সটান জ্যোতি দাঁড়াল গিয়ে মাঝরাস্তায়। হায় হায় রব উঠল।

অন্য কোনদিকে ভ্রূক্ষেপের অবকাশ নেই জ্যোতির। খটাখট খটাখট করতে করতে ঘোড়া ওর নাগালে চলে আসা মাত্র জ্যোতি ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘোড়ার ওপর।

এমন অতর্কিত আক্রমণে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা মুহূর্তের জন্যে। সেই সুযোগে জ্যোতি ক্ষিপ্রহস্তে চেপে ধরল তার কপালের কেশর। প্রবল আপত্তিসূচক হ্রেষাধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে ঘোড়াটা শিষ-পা হয়ে উঠে দাঁড়াল মানুষের মতোই প্রায়।

জ্যোতি তখন ঝুলছে ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে।

নৃশংস দুইপাটি দাঁত খিঁচিয়ে ঘোড়াটা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল জ্যোতিকে ছিটকে ফেলে দেবার। কিন্তু বজ্রমুষ্টিতে ঝুঁটি ধরে আছে জ্যোতি। কতক্ষণ ধস্তাধস্তি চলল টের পাবার আগেই ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে জ্যোতি উঠে বসল তার পিঠে। আর শান্ত মুখে ধীরে ধীরে চাপড় মারতে লাগল

ঘোড়ার দাবনায়, হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার গলায়, মাথায়।

মন্ত্রাবিষ্ট নাগিনীর মতো ঝিমিয়ে পড়ল ঘোড়াটা। অঘটন!···তার সারা গায়ে শিহরণ জাগল। একমুখ ফেনা নিয়ে দাঁড়িয়ে সে উপভোগ করতে লাগল জ্যোতির যাদুস্পর্শ।

অবিলম্বে বেরিয়ে এল ঘোড়ার সহিস। হাতে তার লাগাম। পিছন থেকে লাগামটা জ্যোতির হাতে দিতে জ্যোতি ঘোড়ার মুখে সেটা পরিয়ে নেমে এল; সহিস ঘোড়া নিয়ে চলে গেল তার মনিব স্থানীয় উকিল বারাণসী রায়ের আস্তাবলে।

রাস্তাসুদ্ধ লোকের ধড়ে এতক্ষণে বুঝি প্রাণ ফিরে এল। নাগরিকদের ফিরে এল চৈতন্য। একটা কিশোর কিনা অমন বজ্জাত ঘোড়াটাকে দমন করে অতগুলো পথচারীর জীবন রক্ষা করল, বিশেষত ওই শিশুটির?

জ্যোতির জীবনীকার শচীনন্দনবাবু এই ঘটনাটি বিবৃত করে এর তুলনা দেখিয়েছেন কালীয়-দমনের আখ্যানের সঙ্গে: নবঘনশ্যাম কিশোর বীরকেও তো অভিনন্দিত করেছিল সেদিন সারা বৃন্দাবন। আজকের নদীয়াও কি কসুর করবে বীরের যোগ্য স্বীকৃতি দিতে?

মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে জ্যোতি আপন আয়ত্তে আনল উদ্দাম প্রাণশক্তির প্রতীক এই ঘোড়াটিকে। যে-পরাচেতনার প্রেরণায় তার এই বিজয় সম্ভব হল, সেই চেতনাশক্তিই জ্যোতিকে এগিয়ে নিয়ে চলল নিত্য-নূতন বিজয়ের পথে।

দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল জ্যোতির উপস্থিত বুদ্ধি, সৎসাহস, আর পরোপকার ব্রতের কাহিনী। জননী শরৎশশীর, কানেও পৌঁছল এই খবর। সগৌরব কৃতজ্ঞতায় তিনি প্রণতি জানালেন ইষ্টদেবতাকে, আর স্মরণ করলেন তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণকে—যাঁর অভিজাত শোণিত বইছে বিনোদবালা আর জ্যোতির ধমনীতে, মজ্জায়।

যৌবনের পরশমণি

॥ এক ॥

রবিবার।

চাটুজ্যে-বাড়িতে ফকির বোষ্টমদের ভিক্ষা পাবার দিন। রোজকার মতো এ-দিনও পাঁচুফকির এসে গান শোনাচ্ছে চাটুজ্যে-বাড়ির বাইরের উঠোনে। সাধক লালন ফকিরের শিষ্য এই পাঁচুফকির কয়া গ্রামেই থাকে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে সে শৈশবে।

পাঁচুফকির গান ধরে। তদ্‌গতচিত্তে জ্যোতি শোনে তার গান :

(আমি) একদিন না দেখিলাম তারে
(আমার) বাড়ির কাছে আরশিনগর,
(তাতে) পড়শী বসত করে—
(ওবে) সে আর লালন একখানে রয়
(তবু) লক্ষ যোজন ফাঁক্ রে—
(আমি) একদিন না দেখিলাম তারে॥

জ্যোতির মনে গভীর রেখাপাত করে পাঁচুফকিরের গান, গভীর রেখাপাত করে সে-গানের জীবন-দর্শন, গভীর রেখাপাত করে বাউলদের জীবনযাত্রার ছাঁদ। এমনিভাবেই লালন ফকিরের সম্প্রদায় প্রভাবান্বিত করেছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে, যে-প্রভাবের স্বীকৃতি তিনি দিয়ে গিয়েছেন স্বয়ং :

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে* যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেচে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।...

"...এমন বাউলের গান শুনেচি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়,

* জ্যোতির জন্মভূমি কয়াগ্রামের কাছেই শিলাইদহ॥

সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য-রচনা, তেমনি ভক্তিরস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করিনে।"

এমনি সহজ হয়েই জ্যোতির মনের মধ্যে মিশে গিয়েছিল বাউলের সুর আর বাউলদের জীবনদর্শন। "বাউলরা হল বাংলার মুক্তিপাগল সংগীত-সাধক", লিখেছেন শান্তিদেব ঘোষ। "এদের জীবনে সুরই হল প্রাণ, সুরই হল আনন্দ, সুরেই কথা; এরা সুরের ভেতর দিয়ে জীবনের মূল সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করে।···এরা রসোপলব্ধির সাধনা করে, এরা আনন্দ-রসের অনুরাগী। এরা প্রেমের সাধনা করে, যে প্রেমের উদ্দেশ্য কেবল ভালবেসে যাওয়া। এদের ভালবাসা অধরার প্রতি। কিন্তু এই অধরাকে তারা ধরতে চায় রূপের জগতের সাহায্যে।···এরা বলছে···আমার মধ্যেই সেই অধরা, সেই মনের মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইভাবে তাকে অনুভূতির সাহায্যে জানাই হল এদের মূল কথা।···বাউলরা সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসবাস করেন, সংসারও করেন, অথচ এঁরা যেন হাঁসের মতো। জলের মধ্যে ডুব দিলেও জল এঁদের গা ভেজাতে পারে না। এঁরা ঘর যেমন বাঁধেন আবার যে কোনো মুহূর্তে ঘর ভাঙতেও সেইরকম দক্ষ। এরকম আত্মভোলা এঁরা।"*

জ্যোতির জীবনের বনিয়াদ অনেকটা যেন প্রভাবান্বিত হয় বাউলদের জীবনদর্শনে। এরই সুর কতক যেন ধ্বনিত হতে শুনেছি জ্যোতির দিদি বিনোদবালারও কবিতায়, যেমন শুনেছি সেখানে গীতার শিক্ষা-প্রভাবান্বিত বাণী:

"কেবা পতি পত্নী? পিতা, মাতা ভগ্নী?
ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা চির আপন?
এ ভব-নিলয়ে যেন পান্থালয়ে
পথিকে পথিকে ক্ষণ-মিলন!"

পুত্রের কৈশোরে শরৎশশী দেবী তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন গীতা। গীতাই গড়ে দিল জ্যোতির জীবন-দর্শনের, জ্যোতির জীবন-ধারার মূল ভিত্তি।

* 'রবীন্দ্রসংগীত'—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ॥

গীতা জ্যোতিকে শেখাল : কে তোমার আত্মীয় ? কে তোমার বন্ধু এই সংসারে ? হাহাকার তুমি করছ কার মৃত্যুতে অধীর হয়ে ? কে তোমার পুত্র ? কে পত্নী ? কোথায়ই বা তোমার সংসার ? তুমি যে সবার, সকলেই যে তোমার ভাই।

দুঃখের শেষ কোথায় ? অশান্তির মূলোচ্ছেদ কিভাবে সম্ভব ?—গীতাই জবাব দিয়েছে : মুক্ত কর নিজেকে কামনা-বাসনাদি রিপুর প্রভাব থেকে। ...তোমার শরীর তো তুমি নয়, তোমার প্রাণও তুমি নয়, তোমার মনও তুমি নয়। তবে কে তুমি ?—গীতাই জবাব দিয়েছে জ্যোতিকে : তুমি হচ্ছ অজর, তুমি হচ্ছ অমর, তুমি হচ্ছ চির অক্ষয় উপাদানে গড়া আত্মা। এই আত্মাই সংসারের সুখ-দুঃখ শুভ-অশুভ জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পথ কেটে চলেছে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে। এই আত্মা হচ্ছে অমৃত-পথের যাত্রী, জন্ম তার আনন্দের মধ্যে, চলেছেও সে আনন্দ আর অমৃতেরই অভিমুখে।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগে জ্যোতির মনে। প্রশ্নের পর প্রশ্নের সমাধান পায় সে গীতার শ্লোকে। গীতা তার কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিল এই বিশ্বের স্বরূপ, বিশ্বের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে বিশ্বের মিলন-সূত্র, আর মানুষের মধ্যেই ভগবানের অভিব্যক্তির প্রত্যয়।

সমস্ত কর্ম তদ্‌গতচিত্তে নিষ্পন্ন করে ভগবানেরই চরণে তা অর্পণ করতে শেখে জ্যোতি। সহজাত তার বিবেক-বুদ্ধিই তাকে পরিচালিত করে এই পথে—স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়। অভ্রান্ত ব'লেই সে জেনেছে মানুষের জন্ম-রহস্য : ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করতে মানুষ আসে এই পৃথিবীতে। ভগবানেরই উদ্দেশ্য সাধন করতে সে জন্মগ্রহণ করেছে।

স্বাভাবিক বৈরাগ্য তার অন্তর জুড়ে বিস্তারলাভ করছে। অথচ জ্যোতি বোঝে সন্ন্যাসের মধ্যে নেই তার চরম সার্থকতা। কী তবে সেই সার্থকতা ? প্রশ্নটি উৎশিখ হয়ে ওঠে তার হৃদয়ে। কে দেবে উত্তর ?

কৃতিত্বের সঙ্গে জ্যোতি এনট্রেন্স পরীক্ষায় পাশ করেছে কৃষ্ণনগর থেকে। এবারে বড়মামার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে যেতে হবে কলকাতায়—এফ-এ পড়তে।

দিদি বিনোদবালা আর জ্যোতি কলকাতায় এসে উঠল শোভাবাজারে,

তাদের মেজমামা ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

মেজমামা খুব বড় ডাক্তার। স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী প্রভৃতি তাঁরই সমসাময়িক, সতীর্থ। ২৭৫ নং আপার চিৎপুর রোডে বিরাট দোতলা বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন ধর্মশালা। কয়ার, কুষ্টিয়ার, কৃষ্ণনগরের পরিচিত অর্ধ-পরিচিত কত লোক যে এখানে আশ্রয় নিয়েছে তার ঠিক নেই। তাদের অধিকাংশই বিদ্যা-শিক্ষার্থী।

মেজমামা ছেলেবেলা থেকে সাহসী ও শক্তিশালী বলে পরিচিত ছিলেন। তেমনি উদার তাঁর হৃদয়। প্রচুর রোজগার করেন তিনি, অনেকখানিই তার ব্যয় করে ফেলেন আশ্রিতদের খাওয়া-পরায় আর স্কুল-কলেজের মাইনেতে। অনবরত লোকে এসে ধারও নিচ্ছে—কাকে কত ধার দিচ্ছেন, হিসেব রাখবার মতো মানুষ তিনি নন। আপন-পর সবাই তাঁর চোখে সমান। নিজের দুই পুত্র অমূল্য আর অজিত খায়-পরে আর-দশজনেরই মতো।

দিদি বিনোদবালা ভর্তি হলেন কলকাতার ভিক্টোরিয়া স্কুলে। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে প্রথম ইংরেজি-শিক্ষার আলোক যাঁরা লাভ করেন, শোনা যায় বিনোদবালা দেবী তাঁদের প্রিয় পাত্রী ছিলেন।

পাঠ্যাবস্থাতে বিনোদবালার পরিচয় হল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের দুই কন্যা সুনীতি আর সুরুচি দেবীর সঙ্গে; পরিচয় হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেও।

বাংলা এবং ইংরেজি চমৎকার শেখেন বিনোদবালা দেবী। পরবর্তী জীবনে জ্যোতির অনুপস্থিতিতে জ্যোতির স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করেছেন বিনোদবালা দেবী—প্রথমে কৃষ্ণনগরে কারমাইকেল গার্লস্ স্কুলে শিক্ষকতা করে, পরে কলকাতায়ও, সমস্ত রাজরোষ তুচ্ছ করে।

আর, ইংরেজি-শিক্ষার গুণেই বিনোদবালা বোধ করি সচেতন ছিলেন তাঁর অনুজের জীবনের তথ্য সম্বন্ধে—যার কিছু কিছু তিনি স্বহস্তে একান্তে লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিলেন ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকের জন্যে, কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখে গিয়েছিলেন জ্যোতির জ্যেষ্ঠ-পুত্রবধূ উষারাণী দেবীকে দিয়ে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এমন দিন ভারতবর্ষে আসবে যেদিন স্বাধীন ভারতের নাগরিকেরা পূজো করবে তার অনুজের অলোকসামান্য স্মৃতি, যেদিন দেশের যথার্থ ইতিহাস লিখিত হবে। সেই সুদিনের পথ চেয়ে

সুদীর্ঘ জীবন অতিক্রান্ত করে অবশেষে বিনোদবালা দেবী দেহরক্ষা করলেন দেশ স্বাধীন হবার মাত্র অল্পকাল পূর্বে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীর অবদান যেদিন সত্যই লিখিত হবে—সেদিন বিনোদবালা দেবীর ত্যাগ, সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির কাহিনীও যেমন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হবে, তেমনি লিপিবদ্ধ হবে তাঁর সহোদর বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনে স্বল্প-বিশ্রুত এই অসামান্য নারীর দান ও প্রভাবের কথাও।

ফিরে আসি জ্যোতির প্রসঙ্গে।

কলকাতায় এসে জ্যোতি ভর্তি হল সেণ্ট্রাল কলেজে। সেই সঙ্গে, স্বাবলম্বী হবার জন্যে Atkinson সাহেবের ক্লাসে শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিংও শিখতে লাগল। অল্পকালের মধ্যে স্টেনোগ্রাফিতে দেখাল সে বিশেষ দক্ষতা।

সর্বোপরি তার সমস্ত সত্তা জুড়ে অনির্বাণ শিখার মতো প্রশ্ন জ্বলছে : কী সার্থকতার জন্যে ভগবান পাঠিয়েছেন তাকে এই পৃথিবীতে? সেকি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে আজীবন ঈশ্বরের সাযুজ্য সাধন করবে?

ইতিমধ্যে কলকাতার বহুবিদিত কুস্তিগীর অম্বু গুহের পুত্র ক্ষেত্রনাথ গুহের কাছে জ্যোতি কুস্তির অভ্যাস করতে থাকে। এই আখড়াতে তার পরিচয় হল সমসাময়িক বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গে, এই আখড়াতেই সে এল বহু বিচিত্র ব্যক্তিত্বের ও ভাবধারার সংস্পর্শে, এই আখড়াতেই সে পেল এমন একজনের সান্নিধ্য, যিনি তার প্রশ্নের অনেকটাই অনুমান করে তাকে দেখালেন জীবনের পথ।

যাঁর কথা আমি বলছি, তাঁর নাম শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক লেখক ও চিন্তানায়ক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের পুত্র। জ্যোতির দিদি বিনোদবালা লিখেছেন, যে শচীন্দ্রনাথের সংশ্রবে এসে জ্যোতির "সাহস এবং বল বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল।"

জ্যোতির মানসিক অবস্থা এবং আত্মিক উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে শচীনবাবু তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর যুগপ্রবর্তক পিতার কাছে। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ তখন থাকেন শ্যামপুকুরে। তাঁর বাড়িও নদীয়ায়, সুবর্ণপুর গ্রামে। ইনি শিবনাথ শাস্ত্রীর সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু। আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খুবই স্নেহাস্পদ ; বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় যোগেনবাবু বিয়ে করেছিলেন

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো যোগেনবাবুও ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কিন্তু চাকরির মোহ ত্যাগ করে তিনি সুপ্ত জাতিকে জাগানোর সঙ্কল্প নিয়ে তুলে ধরেছিলেন অগ্নিবর্ষী লেখনী।

লেখক এবং সম্পাদক যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের ভাষা উনিশ শতকের বাঙালীর মনে এনে দেয় দুর্নিবার উন্মাদনা। এঁর জীবনের একটি ব্রত ছিল, "যে যে প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত মহাত্মাগণের নিরন্তর যত্নে ও অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মোহিনীশক্তিতে দাসত্বপীড়িত জাতি সকল আত্ম ভুলিয়া জন্মভূমির চরণে আত্মবিসর্জন করিতে শিখিয়াছে, তাঁহাদিগের জীবিতমালা জাতীয় ভাষায় গ্রন্থিত করা।"

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যখন চুঁচুড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সেইসময়েই ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মিলিত হতেন বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায়; সেখানে আর ভূদেববাবুর বাড়িতে বসে তাঁরা দেশপ্রেমমূলক সাহিত্য রচনার ব্রত গ্রহণ করেন ১৮৮০ সাল থেকেই।

জ্যোতির সঙ্গে তার ছোটমামা ললিতকুমারও যোগেনবাবুর সান্নিধ্যে এলেন। এই একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিকের লেখা মাৎসিনি, গারিবলদি প্রভৃতির জীবনী, মহারাজা নন্দকুমারের কীর্তির নূতন এবং যথার্থ স্বরূপ, রাজপুত বীরদের কাহিনী বাংলার তরুণদের মনে সেদিন এনে দিয়েছে আলোড়ন। সম্ভবত প্রথম যোগেনবাবুই জ্যোতির অন্তরের প্রশ্নের জবাবে জ্যোতিকে আমন্ত্রণ জানালেন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার যজ্ঞে অবতীর্ণ হতে।

১৯০০ সালের মে মাসে ছোটমামা ললিতকুমার পাণিগ্রহণ করেন যোগেনবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা সুধাময়ী দেবীর। ঘনিষ্ঠতর হল যোগেনবাবুর সঙ্গে তাঁদের অন্তরের যোগ।

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী!...

"কলিকাতাবাসী যুবকগণ, ওঠো, জাগো, কারণ শুভ-মুহূর্ত আসিয়াছে... সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না। ওঠো, জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলী প্রার্থনা করিতেছেন।...ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধি-বল আছে, ধনবল আছে; কিন্তু আমর মাতৃভূমিতেই কেবল উৎসাহাগ্নি

বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি জ্বালিতে হইবে।...”

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব তাঁর শোভাবাজারের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দকে অভিনন্দন জানালে স্বামীজীর দেবাবিষ্ট কণ্ঠে ধ্বনিত হল মাতৃভূমি স্বাধীন করবার এই আমন্ত্রণ।

জ্যোতির বুকে জাগল ভাবের জোয়ার। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে আকুল হয়ে উঠল তার মন। শয়নে স্বপনে তার মনে পড়ে অতলস্পর্শী গভীর আয়ত অগ্নিগর্ভ দুটি চোখ আর আত্মজ্ঞানের লাবণ্যে আপ্লুত একটি মুখমণ্ডল!...

অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে ইতিপূর্বে তার পরিচয় হয়েছিল। তিনি জ্যোতিকে নিয়ে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। বারকয়েক স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হল জ্যোতির। সেইসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্যান্য প্রত্যক্ষ শিষ্যদের আশিসলাভেও সে নিজেকে ধন্য মনে করল।

স্বামীজীর সঙ্গে জ্যোতির এই পরিচয় প্রগাঢ়তর হবার সুযোগ এল।

কলকাতায় দেখা দিল মহামারী। প্লেগ রিলিফের কাজে নামলেন বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। আর নিবেদিতার কাজে সহ-যোগিতার জন্যে দেশের যেসব কিশোর, তরুণ ও যুবক এগিয়ে গেলেন, জ্যোতি তাঁদের অন্যতম।

জ্যোতির ব্যক্তিত্বে প্রখর বৈদ্যুতিক শক্তির পরিচয় পেয়েই নিবেদিতা বুঝি তার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, “A young man came to me whose one idea is to make Swamiji's name the rallyingpoint for young India. He is wild about him, and he is such a strong man himself. He is independent, and a Brahmin!”—এবং নিবেদিতাও আগ্রহ করে জ্যোতির কথা স্বামীজীকে বলেন, জ্যোতিকে নিয়ে যান স্বামীজীর কাছে।

স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে জ্যোতি স্পষ্ট উপলব্ধি করে, কী তার জীবনের উদ্দেশ্য।—ভারতের মর্মবাণী জগৎকে শোনাতে গেলে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন, সেই স্বাধীনতা অর্জনের সাধনাই এখন গোটা দেশের সাধনা হওয়া চাই, বৈরাগ্য সাধনা নয়!

কি কাজে জ্যোতি গিয়েছে ফোর্ট উইলিয়মের দিকে। কাছেই গোরা-বাজার।

বাজারের এক জায়গায় অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জ্যোতি।—একটা গোরা সৈন্য তার হাতের ছড়িটা হাসি-হাসি মুখে ঘুরিয়ে চলেছে আর পথের দুধারের দোকানীদের মাথায় চটাস চটাস করে পড়ছে সেই ছড়ির বাড়ি। হাসতে হাসতে সাহেবটা গুণে চলেছে—নাইনটিন, অ্যাণ্ড টোয়েন্টি, নাউ টোয়েন্টি-ওয়ান!

বয়সের বাছ-বিচার নেই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই, কালো চামড়ার ওপর নিষ্ঠুর এই অত্যাচার করে যারা আমোদ পাচ্ছে, তারা কি মানুষ?—জ্যোতি ভাবে।

আরো সে বিস্মিত হয়—দোকানীরা সকলেই এ-দেশী, পথচারীরা বেশির ভাগই এ-দেশী। কিন্তু দেশেরই লোকের ওপর একটা বিদেশী সৈন্য এইভাবে অত্যাচার করে চলেছে, দেখে কেউ টুঁ শব্দটি করছে না!

অসহ্য বোধ হল জ্যোতির।

সাহেব তখনো ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোকানদারগুলোকে মেরে চলেছে। তখনো সাহেবের মুখে দানবীয় হাসি। সশব্দে আর্তনাদ করে উঠল বৃদ্ধ এক দোকানদার আহত মাথায় হাত রেখে।

"Take that, forty-nine!" বলেই সাহেবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্যোতি। গোটা-দুই মুষ্ট্যাঘাতেই সাহেবকে ধরাশায়ী করে ফেলল।

হাঁ হাঁ করে ছুটে এল দর্শকেরা। গালি ছুটল মোসাহেবদের মুখে। পরিতৃপ্ত দোকানদারেরা "ঠিক করেছেন বাবু, বেশ হয়েছে!" বলতে বলতে জ্যোতিকে ঘিরে ধরল।

নিন্দা-স্তুতির কুয়াসা ভেদ করে নির্লিপ্তচিত্তে জ্যোতি এগিয়ে চলল তার নিজের পথে॥

॥ দুই ॥

শরৎকাল।

দুর্গাপূজো এসে পড়ল।

সবার মনই চঞ্চল হয়ে উঠেছে দেশে ফিরে যাবার জন্যে। মেজমামা

অন্ত-কোথায় গিয়েছেন জরুরী কাজে। সেখান থেকেই কয়া যাবেন তিনি।

দিদি, জ্যোতি, অমূল্য, অজিত—চার ভাইবোনে বাঁধা-ছাঁদা করে দিন গুণতে লাগল। যে যেখানেই থাক, এ-সময়টি বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের সকলকেই ফিরতে হবে কয়ার বাড়িতে।

এই সময়টার পথ চেয়ে সারাটা বছর মন যেন মুখিয়ে থাকে।

চাটুজ্যে-বাড়ি। কয়া।

বাইরের আঙিনায়, উত্তর ভিটেতে প্রকাণ্ড মণ্ডপ। এখানেই প্রতি বছর পূজো হয় মহা ধূমধামে।

ষষ্ঠীর দিন।

বাড়ি ঢুকতেই জ্যোতিদের চোখে পড়ে, বরাবরের মত এ-বারেও বড়-বড় কলাগাছ দিয়ে বাঁধা হয়েছে তোরণ। কাঠ চেলা হচ্ছে আমতলায়।

ফুল-বাগানে, বেড়ার গায়ে কালো-রঙের কয়েকটা কচি-কচি পাঁঠাকে বাড়ির ছেলেমেয়েরা সাদরে ফুল-পাতা খাওয়াচ্ছে। শিশু-কণ্ঠের কোলা-হলে আর পাঁঠার কোমল ডাকে আবহসঙ্গীতে ধ্বনিত হতে থাকে আসন্ন মহোৎসবের।

বর্ষায়, যে-সব জঙ্গল হয়েছিল, সব পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে।

প্রশস্ত সাদা উঠোন-জুড়ে একরাশ শিউলিফুল। বাগানের স্থলপদ্মগুলো রোদে লাল হয়ে উঠেছে।

মণ্ডপের বাঁদিকে, বেলতলায় বসেছে বোধন। সুপুরি, বাতাবি-লেবু, কলা আর নারকোল ঝুলছে সারি-সারি।

আর ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন।

মণ্ডপে ঝলমল করছে আনন্দময়ীর ঢলঢলে প্রতিমা।

ঢাকের সুপরিচিত বোল শুনে বুক কেঁপে উঠল জ্যোতির। আশৈশব তন্ময় হয়ে সে শুনেছে এই ঢাকের বাজনা। ঢাকিদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। দরদ দিয়ে তারা জ্যোতিকে শিখিয়ে দিয়েছে কী করে তুলতে হয় বুক-কাঁপানো মিঠে বোল। পূজোর কয়দিন যেন স্বপ্নের মাঝে কাটায় জ্যোতি আশৈশব।...

ন-মামার সঙ্গে বাড়ির অন্যান্য কর্মকর্তারা ফাই-ফরমাস খাটাচ্ছেন ভরাট গলায়। নিজেরাও খাটছেন।

ভেতর-বাড়ি।

মণ্ডপের পেছনেই, রোয়াকের ওপর পুজোর আর রান্নার বাসন-কোসন মেজে আলাদা উপুড় করে রাখা। মিষ্টি রোদ পড়ে সব ঝকঝক করছে।

একদিকে একরাশ বঁটি। বারকোষ, নৈবেদ্যের থালা, ধামা অনেকগুলো ধোয়া হয় নি এখনো।

এককোণে, একটা চাকর বসে বসে নারকোল ছাড়িয়ে ডাঁই করছে।

পূবদিকের বারান্দায় বড়-বড় জলের জালা। মাটির গেলাস।

নিরামিষ রান্নাঘরের রোয়াক। জ্যোতির মা, মাসী, দিদিমা—সবাই ভোগের চাল-ডাল বেছে পরিষ্কার করছেন। গল্পে, আনন্দে মুখর পরিবেশ!

অনেক দিন পর এসে পায়ের ধুলো নিতে যেতেই—"ওরে, রেলের কাপড়, জুতো-পায়ে ছুঁস নে, ছুঁস নে"…বলে তাঁরা উঠোনে নেমে এসে আশীর্বাদ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন সব কুশল।

এর মধ্যেই, তাঁদের গলা শুনে, হাজির হয়েছেন এসে বাড়ির আর-সবাই। পাড়া-পড়শী। বন্ধু-বান্ধব। গল্প করতে-করতে প্রণাম করতে করতে, প্রণাম নিতে-নিতে কেটে যায় বেলা!

হাত-মুখ ধুয়ে, খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করতে বসে জ্যোতি শোনে প্রতিমাকে আসনে বসানোর বাজনা।

ছুটে যায় সে। হাত লাগায় গিয়ে।

মহাশক্তি জগজ্জননীর চরণতলে সমবেত তরুণ-প্রাণের উদ্দাম চঞ্চলতায় গম্‌গম্‌ করে ওঠে মণ্ডপ। আনন্দে, গর্বে টন্‌টন্‌ করে ওঠে অভিভাবকদের মন।

তখন সবাইকে নিয়ে জ্যোতি সারি দিয়ে দাঁড়ায় প্রতিমার সামনে। শুরু হয় যুক্তকণ্ঠে বন্দনাগীত।

তারপর সবাই মিলে জড়ো হয় গিয়ে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণের শামিয়ানায়। আকাশে ওঠে স্তিমিত চাঁদ।

চলে গল্প-গুজব, আর সপ্তমীর রাতে যে-নাটক অভিনীত হবে—শুরু হয় তার মহড়া। এবার ঠিক হয়েছে 'সীতার বনবাস'। জ্যোতিকে করতে হবে হনুমানের পার্ট!

যে যার পোশাক জোগাড় করে আনে। শুরু হয়ে যায় মহড়া। জ্যোতি এদিকে মহা ভাবনায় পড়েছে: হনুমানের লেজ কোথায় মেলে? সবাই ভেবে সারা।

"আসছি আমি এখুনি!"

বলেই সে ছুটে বেরিয়ে যায়। মুখে তার হাসি ধরে না।...আর তখুনি ফিরে আসে জ্যোতি পেল্লায় লেজ-সমেত। দেখা গেল, বড়মামার আদালতের পোশাক থেকে গোপনে সে পাগড়িটুকু জোগাড় করে এনেছে।

খুব জমে উঠেছে মহড়া।

ওদিকে বড়মামার ডাক এসেছে। কী এক জরুরী কাজে তখুনি তাঁকে যেতে হবে কুষ্টিয়া। তিনি তো পাগড়ি খুঁজে-খুঁজে হয়রান।

কে-একজন চুপি-চুপি তাঁকে খবরটা দেয়। বিরক্ত গম্ভীর মুখে তিনি গিয়ে দাঁড়ান শামিয়ানার তলায় এক-ধারে।

কিন্তু জ্যোতির হনুমানেব পার্ট দেখে মামা হেসে উঠলেন হো-হো করে।

ভারি এলেমদার অভিনেতা জ্যোতি। এর আগে দশ-বিশটা গ্রামের লোক ধন্য ধন্য করে গিয়েছে কি বছর তার নাটক দেখে। দক্ষযজ্ঞ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, প্রফুল্ল, প্রতাপাদিত্য—সব নাটকেই জ্যোতি কুড়িয়েছে দর্শকদের অভিনন্দন!

যাঁরা তার কাছে সামান্য কয়েক-মিনিটের জন্যেও কখনো গিয়েছেন, পেয়েছেন তাঁরা জ্যোতির স্বভাবে এমন একটা জিনিস, যা' কোনদিন কাউকে তার সামনে মুখভার করে থাকতে দেয় নি। তার উপস্থিতিতেই তাঁরা অনুভব করেছেন আনন্দের, আশার, সর্বজয়ের একটা নিশ্চয়তা।

মুর্শিদাবাদের লালবাগ থেকে এসেছে হয়তো বিখ্যাত ছানাবড়া। জ্যোতির প্রিয় মিষ্টি। শালপাতা ঢাকা হাঁড়ি-হাঁড়ি ছানাবড়া।

দেখামাত্র জ্যোতির মন ভরে উঠেছে রসে। নেচে-নেচে সে হাঁড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছে ভাঁড়ার ঘরে। কিংবা চুপি-চুপি এক-আধ হাঁড়ি ছানাবড়া নিয়ে গিয়ে বিলিয়ে দিয়েছে বাড়ির এবং পাড়ার ছোট-ছোট ভাইবোনদের মধ্যে। আর সঙ্গে-সঙ্গে তানকর্তব দিয়ে গান বেঁধে লেগে গিয়েছে দরাজ গলায় গাইতে:

এলেন মা ছানাবড়া
শালপাতা বাহনে!
কি-বা মায়ের লাল মূর্তি
দেখে হয় চক্ষুস্ফূর্তি!
ইচ্ছা হয় টপাটপ
দিই ফেলে বদনে!...

ছেলে-বুড়ো যে-ই দেখেছেন জ্যোতির সেই সোল্লাস নাচ আর গান, হেসে কুটিপাটি গিয়েছেন।...

কিংবা—জ্যোতি ফিরেছে পুরী থেকে। জগন্নাথ দেবের দর্শন সেরে। সোৎসাহে মামাতো ভাই-বোনেরা জানতে চেয়েছে, "বড়দা, জগন্নাথ কেমন দেখে এলে ?"

রহস্য করে জবাব দিয়েছে জ্যোতি: "ঠুঁটো রে, একদম ঠুঁটো জগন্নাথ !"...কিন্তু ব্যঙ্গ-অভিনয়ে অদ্বিতীয় সে। তাই, ছোটরা ধরে বসেছে, জগন্নাথ কেমন—দেখাতে হবে !

তখন অঙ্গভঙ্গী-সহকারে জ্যোতি তাদের দেখিয়েছে ঠুঁটো জগন্নাথের রূপ। হাসির খই ফুটেছে বাড়ির মহলে-মহলে। ক্যামেরা নিয়ে ছুটে এসেছেন রসিক কোনও আত্মীয় ; তুলে নিয়েছেন তার জগন্নাথ-মূর্তি।...

আবার—

জ্যোতির চাকরি-জীবনে, সে হয়তো ফিরেছে অফিস থেকে। রেকাব-ভর্তি জলখাবার আর পাথরের গেলাসে করে সরবৎ সাজিয়ে এনে, দিদি বিনোদবালা অবাক ! কোথায় জ্যোতি ?

খোঁজ ! খোঁজ !

মাঝে মাঝে জ্যোতি বার হয় সৌখীন একটা ছড়ি হাতে। ছড়িটা—দিদি দেখে, শোয়ানো রয়েছে জ্যোতির বিছানায়।

জ্যোতি নেই অথচ !

খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ঘর-বার করছে দিদি। হঠাৎ পাশ থেকে, দরজার আড়ালে কিসের আওয়াজ হল : 'হুম্ !'

সন্ধ্যার আধো-আঁধার ! দিদি ঠাহর করে দেখে, ছড়ি যেখানটা হেলান দিয়ে রাখা হয়, সেখানটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—জ্যোতি !

দিদি ডাকে, "পাগল কোথাকার। বেরিয়ে আয় !"...হাসতে-হাসতে ছোট্ট ছেলেটির মতই বেরিয়ে এসে, দিদির হাত থেকে খাবার কেড়ে খায় সে !

অষ্টমীর দিন।

মিষ্টি সুরে বেজে ওঠে সানাই। মঙ্গলারতির বাজনা। ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙে যায় চাটুজ্যে-বাড়ির সকলের। চট্‌পট্ তৈরি হয়ে নেয় সকলে।

আজ যে অনেক কাজ !

দূর-দূর থেকে লোকজন আসবে ঠাকুর দেখতে। এখানেই প্রসাদ পাবে জগজ্জননীর। তা-ছাড়া নিমন্ত্রিত অতিথিও আসবেন প্রচুর ।

রান্না-বাড়িতে আগের দিনের ব্যবহৃত রাশীকৃত বাসন-কোসন। দাঁড়িয়ে মাজিয়ে নিচ্ছেন জননী শরৎশশী। পরিষ্কার করাচ্ছেন বাড়ি-ঘর-দোর।

শুরু হয় মহাস্নানের বাজনা :

পূজো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। দেখতে দেখতে রঙীন কাপড়-চোপড় পরা ছেলেমেয়ের ভিড়ে হেসে ওঠে মণ্ডপ-আঙিনা।

ন'মামা। হিসেব করে দেখছেন, আন্দাজ কত লোকের মত রান্না করা হবে। সেই অনুযায়ী পার্বতী-মামা ভাঁড়ার থেকে বের করে দিচ্ছেন চাল, ডাল, ঘি, ময়দা, মসলাপাতি, কাঁদি-কাঁদি কাঁচকলা, থোড়, মোচা, কুমড়ো, পটল, আলু।

ষষ্ঠী সপ্তমী—দু'দিনই রোজ প্রায় এক হাজার লোকের মত রান্না চড়েছে। আজ, কিছু বেশিই হবে। একসঙ্গে প্রায় দশ-বারো মণ চালের ভাত রাঁধা সহজ কথা নয়।

পূজোর ক'দিন ভাত রাঁধবার ভার নেয় জ্যোতি। হালুইকর দিয়ে রাঁধানোর রেওয়াজ সে-যুগের পল্লী-অঞ্চলে তখনো হয় নি। বাড়ির লোকেরাই বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে আন্তরিক শুচিতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন সব কাজ !

পূজো-বাড়ির ভাত যাঁরা খাবেন না—মুসলমান ফকির প্রভৃতি—তাদের জন্যে ব্যবস্থা রয়েছে আলাদা ভাঁড়ারে : ডোল-ডোল চিঁড়ে-মুড়কি, থরে-থরে দই-মিষ্টি !···

তার পাশেই, পূজোর ভাঁড়ারে পূজোর উপকরণ সযত্নে আলাদা করে সাজানো। সূর্যোদয়ের আগেই, স্নান সেরে পুরুতঠাকুর ফুলের তদারক করতে বসেছেন : চেঙারী-বোঝাই স্থলপদ্ম, সাজি-ভরা শিউলি, রাশি-রাশি রাঙাজবা, দোপাটি প্রভৃতি ফুল এনে পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখেছে পুলিন নাপিত।

ওদিকে—জ্যোতির দল লেগে গিয়েছে রান্না-বাড়ির উঠোনে : আট-দশটা হাঁড়ি একসঙ্গে যাতে বসতে পারে, সেই অনুপাতে খুঁড়িয়ে নিয়েছে লম্বা একটা উনুন।

চাকরের দল কাঠ কেটে এনে ভরে ফেলেছে উনুন : টগ্‌বগ্‌ করে এখন ভাত ফুটছে। বড়-বড় নতুন ঝুড়িতে সরু বাঁশ বেঁধে তাতে ভাত ঢালা হয়েছে। ফেন ঝরানো হচ্ছে।

আর রান্নাঘরের বারান্দায়, পরিষ্কার চাটাইয়ের ওপর ভাতের বিরাট একটা স্তূপ আস্তে আস্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে!

জননী শরৎশশীর কড়া দৃষ্টি চারিদিকে। কর্মরত ছেলেদের মুখে-মুখে তিনি জোগান দেওয়াচ্ছেন গেলাস গেলাস ঘোলের সরবৎ।

ইতিমধ্যে এসে পড়েছে জেলেরা।

মাছ আনবার দেরির জন্যে ধমক খেয়ে বেচারারা নিজে থেকেই পুকুর-পাড়ে গিয়ে বসে, মাছ কুটে কর্তাদের তুষ্ট রাখতে।

মাছ কোটা হয়ে গেল। প্রত্যেক জেলে-প্রজাকে একটা করে নতুন কাপড় দিয়ে বিদায় দেয় জ্যোতি আর তার ছোটমামা; জানিয়ে রাখে, দুপুরে প্রসাদ পেয়ে যাবার নেমতন্ন।

যে-কেউ চাটুজ্যে-বাড়ির পূজো দেখতে আসুক না কেন, নতুন কাপড় না-নিয়ে, মিষ্টিমুখ না-করে যাবার উপায় নেই।

সারা সকাল পূজোর মন্ত্রের মধুর সুর ধ্বনিত হয় আকাশে-বাতাসে। মণ্ডপ থেকে সেই সুর-লহরী এসে প্রেরণা দেয়, উৎসাহ জোগায় কর্মরত তরুণদের প্রাণে।

তন্ময় হয়ে দর্শনার্থীরা মণ্ডপে এসে ভিড় করে। একাগ্রচিত্তে শোনে চণ্ডীপাঠের মন্ত্রোচ্চারণ।

ব্রাহ্মণদের ডাক পড়ে।

বেলা দু'টো বেজে যায় তাঁদের খাওয়া শেষ হতে। অন্যান্য সবাইয়ের পাতা সাততাড়াতাড়ি পাতা হয়। এক আঙিনায় সবার ঠাঁই হওয়া অসম্ভব।

বিশেষ মমতা নিয়ে পরিবেষণ করছে জ্যোতির দল। সারা বছর এদের অনেকেরই হয়তো জোটে না ভাল-মন্দ তরি-তরকারিটা!

নিঃসঙ্কোচে তারা চেয়ে নেয় জ্যোতির কাছে এটা-সেটা। পরম-আদরে সে জুগিয়ে চলে তাদের পছন্দমত পদ।

সাধারণত নিচু-শ্রেণীর অতিথিদের দেবার ব্যবস্থা—ঘরের লাল-চালের ভাত। কিন্তু জ্যোতির মুখের দিকে চেয়ে ইতস্তত করে তাদের একজন বলল,

"বড়-দাদাবাবু, চাড্ডি সাদা ভাত দেবা ?"

সেই থেকে ইতর-বিশেষ সবার জন্যেই ব্যবস্থা হয়ে গেল সাদা-ভাতের।

লোক খাওয়াতে খাওয়াতে সূর্য যায় ডুবে। শুরু হয় সন্ধিপূজো। সারি-সারি প্রদীপ জ্বলে ওঠে মণ্ডপ ঘিরে।...

ভারে-ভারে ফল-মিষ্টি উপচার আসে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে!...

ইঙ্গিতমাত্র বেজে ওঠে জলদ-গম্ভীর স্বরে ঢাক, শঙ্খ, কাঁসর।...

গড়ুইয়ের অন্ধকার বুক বয়ে ভেসে চলে সেই সঙ্গীত-ধ্বনি দূরের পানে। ধূপ-ধুনোর গন্ধে মন ওঠে ভরে: নিবিষ্ট-মনে একান্তে স্মরণ করে সবাই— মায়ের নাম!

এক-কোণে—শান্ত-শিষ্ট জ্যোতি একরাশ জমাট স্তব্ধতা নিয়ে বসে বসে দেখে প্রতিমার মূর্তি। সন্ধিপূজোর ইঙ্গিতময় মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রতিমার চোখ-মুখ!

তার দু-চোখে বয়ে চলে অবিরল জলের ধারা!

জ্বলে ওঠে এককাঁড়ি পাটকাঠি! ঢাকের বাজনা দ্রুত হয়। বিহ্বল ছাগশিশুর কণ্ঠে শোনা যায় আর্তনাদ: সম্পন্ন হয় সন্ধি-পূজোর বলি!

ভাবাবিষ্ট জ্যোতি উঠে যায়। এক মুচির কাঁধ থেকে ঢাকটা কেড়ে নিয়ে নিজের কাঁধে ফেলে; শুরু হয় বাজনা।

দুলে-দুলে, নেচে-নেচে, লাফিয়ে-লাফিয়ে ঢাক বাজায় জ্যোতি। তার বাহ্যজ্ঞান বুঝি লোপ পেয়ে যায়! মেতে ওঠে সবার মন মিষ্টি হাতের মুখর বোলের ছন্দে। জ্যোতির দেখাদেখি উঠে যান ভাবোন্মাদ পঞ্চু মজুমদার। কেড়ে নেন আরেকটা ঢাক। জমে যায় ঢাক বাজানোর পাল্লা।

পরদিন।

'নবমী' করতে এসেছে চাটুজ্যে-বাড়ির জেলে-প্রজারা। তাদের বিশেষ উৎসব এ-দিনে। মণ্ডপের আঙিনায় নেচে গেয়ে তারা মেতে উঠেছে।

ফি-বছরের মত—জ্যোতিও কোন্ ফাঁকে গিয়ে ভিড়েছে তাদের দলে। হাজার-জনের ভিড়েও প্রথমে চোখে-পড়বার মত চেহারা তার!

একটা নারকোল বুকে নিয়ে শুয়ে পড়েছে জ্যোতি। দশজন জোয়ান জেলে ঘেমে নেয়ে উঠেছে—প্রাণপণ চেষ্টা করছে তার কাছ থেকে নারকোলটা

কেড়ে নিতে। পারছে না!...*

আমরা জ্যোতির যৌবনের বর্ণনা পাই জ্যোতির গ্রামের লোক শচীনন্দন চাটুজ্যের কাছে। গ্রামের সম্পর্কে তিনি ওর মাসতুত ভাই হন। তিনি বলছেন:

যে-দুর্বার যৌবন নিয়ে বালক বাবর সন্তরণে অতিক্রম করতেন সিন্ধুনদ, আলেকজাণ্ডার করতেন দিগ্বিজয়, যে-যৌবনের প্রেরণায় অশীতিপর বৃদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর পদব্রজে হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে যাত্রা করেছিলেন, সেই অপরূপ যৌবন নিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ।...

যে-যৌবন নিয়ে ছত্রপতি শিবাজী ঘোড়ায় চেপে উল্কাগতিতে মহারাষ্ট্রের পার্বত্য-অঞ্চলে গঠন করে বেড়াতেন মাওয়ালি সৈন্যদল, যে-যৌবনের অপরাজেয় মনোবল নিয়ে রাণা প্রতাপ পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে আত্মগোপন করে যুদ্ধ করতেন মোগলদের বিরুদ্ধে, সেই অপরাজেয় যৌবন নিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ।...

যে-যৌবনের উদারতায় নিমাই পণ্ডিত সতীর্থ রঘু পণ্ডিতের মলিন মুখ দেখে স্বরচিত গ্রন্থখানি হাসিমুখে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন, কিশোর শাক্য-সিংহ বাণবিদ্ধ হংসীর যন্ত্রণা অনুভব করতে পেরেছিলেন নিজের দেহের প্রতিটি কোষে, অণুতে-অণুতে, সেই উদার যৌবন নিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ।...

কী-এক চাপা শিহরণ তাঁর দেহে আর মনে নিরবচ্ছিন্ন ফুটে উঠতে লাগল। কস্তুরী মৃগ যেমন আপন সৌরভে উন্মনা হয়ে, উদ্‌ভ্রান্তের মত খুঁজে ফেরে সেই সৌরভের উৎস, যতীন্দ্রনাথের সমস্ত সত্তা তেমনি একটা-কিছুর জন্যে নিরন্তর এক অস্থির চাঞ্চল্যে উন্মনা হয়ে দুলে উঠল।...

নবমীর রাত।

সন্ধ্যারতির শেষে করুণ হয়ে ওঠে প্রতিমার স্নেহ-ঢালা ডাগর দুটি চোখ। সারাদিন মায়ের সামনে লোকজনের আসা-যাওয়া, হাসি, গান, বাজনা, দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় ক্লান্তিহীন আত্মনিয়োগ—

এ-বছরের মত সবই কাল শেষ হয়ে যাবে: সবারই বুকে কেমন যেন

---

* যতীন্দ্রনাথের ছোটমামা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক কথা' এবং 'দুর্গোৎসব' পুস্তিকা অবলম্বনে॥

ভুরু-ভুরু ভাব!

ওদিকে ঠায় বসে জননী শরৎশশী। ভাই, ভাইপো, ছেলে—কারো এখনো খাওয়া হয় নি; বড়মামার ডাকে হুঁশ ফেরে সবার। যে-যার মত খেতে বসে। আবার ডাকে আনন্দের বন্যা!

খাওয়া-শেষে বসে গান-বাজনার আসর। হয়তো কলকাতার ভাল কোন কীর্তনীয়া-দলের গান। ভানী, পান্নার ভাব-ললিত কণ্ঠে শ্রোতাদের মন দুলে ওঠে।

বাড়ির মেয়েরা মণ্ডপে, চিকের আড়াল থেকে কীর্তন শুনতে শুনতে আঁচলের খুঁটে চোখ মোছেন!...

গচ্ছ দেবি নিজালয়ং!...

করুণ গম্ভীর মিনতি: পুরোহিতের গলা দিয়ে মন্ত্র যেন বার হতে চাইছে না আজ। তন্ময়, বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে তবু তিনি উচ্চারণ করেন বিজয়া দশমীর মন্ত্র।

ভোগ পড়েছে: নাল-ফুলের অম্বল আর পান্তা ভাত।

বিকেলে—বরণের বাজনা বাজতেই ছুটে আসে যে-যেখানে ছিল। আগে থেকে রাস্তার দু-ধারের জঙ্গল সাফ করে রেখেছে মুচি-প্রজারা। প্রতিমা বার করবার জন্যে অপেক্ষা করছে জেলে-প্রজারা।

আর, তাদের পুরোভাগে—জ্যোতি।

নদীতে—বড়-বড় দুটো নৌকো একজোড়ে বাঁধা। প্রতিমা উঠলেন তার ওপর। অন্যান্য নৌকোয় উঠল বাজনদারেরা: ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁসর, শঙ্খ নিয়ে। শুরু হল বাজনা।

গ্রামের সব-বাড়ির ছেলেমেয়ে নতুন নতুন কাপড়-জামা পরে, জ্যোতিকে এসে ঘিরে ধরে।

নতুন করে বাঁধা নৌকোর ছই—সাদা কাপড়ে মোড়া; আর পৎপৎ করে তার ওপরে উড়ছে লাল পতাকা। সস্নেহে জ্যোতি ছেলের দলকে তুলে দেয় নৌকোয়-নৌকোয়।

বেলা সাড়ে চারটে।

নৌকোয়-নৌকোয় ছেয়ে গিয়েছে বিশাল গড়ুইয়ের বুক। আর লোকে-লোকে ছেয়ে গিয়েছে দু-ধারের ঘাট।

শুরু হয় 'বাচ্'-খেলা। কার নৌকো কত তাড়াতাড়ি যেতে পারে—তারই প্রতিযোগিতা!

প্রকাণ্ড এক নৌকোয় এক-পাল ছেলেমেয়ে নিয়ে জ্যোতি গিয়ে বসল হাল ধরে। নদী তোলপাড় করে বয়ে চলল নৌকো। আনন্দে আত্মহারা হয়ে কলরব করে উঠল ছেলেমেয়েরা! জ্যোতিও মাঝে মাঝে যোগ দিতে লাগল তাদের নাচে, গানে, তালপাতার ভেঁপু বাজানোয়!

ষষ্ঠীর দিন থেকেই ছেলেদের বায়না শুরু হয়: "বড়দা! এবার কিন্তু আপনার নৌকোয় আমায় নিতেই হবে!"

পালা করে সবাইকে জ্যোতি একবার করে তুলে নেয় তার নৌকোয়। সবাইকেই দেয় সে অভিনব আনন্দের অনাবিল স্বাদ!

ঘাটে-ঘাটে নৌকো লেগেছে।

পূজোর নতুন কাপড়-গয়নায় সেজে গ্রামের মেয়ে-বউরা এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। শেষবারের মতো তারা দর্শন পেতে চায়।

শেষবারের মতো, নদীর বুকেই শুরু হয় আবর্তি!

ও দিকে—ঘাটের দোকান-পাট থেকে জ্যোতি কিনে এনেছে সন্দেশ, খাজা, কদমা, গজা। সূর্যাস্তের কোমল আলোয় রাঙা হয়ে ওঠে ছোটদের কচি-কচি চোখ-মুখ। মিষ্টিতে তারা কামড় মারে আলতো আবেগে!

ওঠে হুলুধ্বনি!

সূর্য পশ্চিম-দিগন্ত স্পর্শ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিসর্জন দেওয়া হয় প্রতিমা। ঢাকের বাজনায় বুক মুচড়ে মুচড়ে ওঠে।

ঘাটে-ঘাটে নৌকো থামে। আত্মীয়-স্বজনদের হাতে ছেলেমেয়েদের তুলে দিয়ে জ্যোতি ফিরে আসে বাড়িতে। মন তার উদাস, নিস্তরঙ্গ।

খাঁ-খাঁ করছে মণ্ডপ! দেখতে দেখতে মা, মাসী, দিদিমা, দিদি—এগিয়ে আসেন: হাতে তাঁদের ধান-দুর্বা, আর সিদ্ধির মিষ্টি। তাঁদের প্রণাম করে, সিদ্ধির মিষ্টি মুখে দিয়ে, দলবল নিয়ে জ্যোতি বার হয়ে বাড়ি-বাড়ি কোলাকুলি করতে!

দেখতে দেখতে আসে কোজাগরী পূর্ণিমা।

লক্ষ্মীপূজোর রাত। ধানের আড়িতে শোলার লক্ষ্মীর মুখ: পরণে তাঁর লাল চেলি। নিরামিষ বহু রকমের ভোগ, পায়েস, মিষ্টি—অর্ধবৃত্তাকারে

সাজানো। ঘরে-ঘরে সূক্ষ্ম সুচারু আলপনার ছড়াছড়ি।

মাঝ-রাতে শেষ হয় পূজো।

নারকোল-চিঁড়ে প্রসাদ পেয়ে, ফুটফুটে চাঁদের আলোয়, গ্রামের ছেলেদের নিয়ে বার হয় জ্যোতি—পরিক্রমায়। অন্যান্য বাড়িতে যে নেমন্তন্ন রাখতে হবে!

কৈলাস মজুমদারের বাড়িতে হয়তো একটা লুচি আর একটা নাড়ু; মুখুজ্যেদের বাড়িতে একটু চিঁড়ে-দই; ভৌমিক-পাড়ায় কোন-বাড়িতে হয়তো একটু ক্ষীর আর খাগড়াই-মুড়কি; চক্রবর্তী-পাড়ার কারো-বাড়িতে একটা সন্দেশ—এইভাবে জ্যোতির দল নেমন্তন্ন রাখে গ্রামে-গ্রামে।

জ্যোতির উদার-মনে নেই জাত-বিচারের বালাই। বিজয়ার দিন থেকেই জেলে-জোলা, কামার-কুমোর, মুচি-মেথর, বাগ্দী, নমঃশূদ্র—সবাইকেই সে ভাই বলে টেনে নিচ্ছে বুকে। সবার ঘরেই গিয়ে করছে মিষ্টিমুখ। সবার ঘরেই পৌঁছে দিয়ে আসছে চাটুজ্যে-বাড়ির পূজোর ভোগ! সর্বত্রই তার অবাধ বিচরণ!

লক্ষ্মীপূজোর রাত যখন শেষ হয়ে আসে, জ্যোতির দল গিয়ে ওঠে শশী মজুমদারের বাড়ি। সেখানে গরম-গরম খিচুড়ি খেয়ে ফিরে আসে তারা বসন্ত চাটুজ্যের মণ্ডপে। জননী শরৎশশী পরম স্নেহে তাদের বিতরণ করেন মহালক্ষ্মীর প্রসাদ।

অক্ষয় মিলনের স্বপ্নে ভরে ওঠে জ্যোতির মন। গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে, দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে কি গড়ে তোলা যায় না এই মহামিলনের মাধুর্য ?...

॥ তিন ॥

কলকাতা।

সেণ্ট্রাল কলেজ। সামনেই জ্যোতির পরীক্ষা। সেকেণ্ড ইয়ার শেষ হয়ে এল। এবার সে ফাইন্ আর্টস্ পাশ করবে।

কলেজে হঠাৎ রটে গেল: জ্যোতি পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়েছে।

অধ্যাপক, সহপাঠী—সকলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভালবেসে ফেলেছেন অদ্ভুত উপাদানে গড়া অসাধারণ এই ছাত্রটিকে।

দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি গায়ের জোর, মনোবল, স্বভাব-চরিত্র, আর তেমনি পড়াশুনোয়। সকলেই তাই তৎপর হলেন, খোঁজ নিয়ে দেখতে।

জানা গেল—

চাকরি ক'রে স্বাবলম্বী হবে বলেই জ্যোতি হঠাৎ আঠারো বছর বয়েসে কলেজ ছেড়ে দিল। ভাল চাকরিও সে পেয়েছে। 'আমহুটি অ্যাণ্ড কোম্পানী'—নামে কোন-এক ইংরেজ মার্চেণ্ট অফিসের কাজ।

একদিন বিকেলে।

জ্যোতি অফিস থেকে ফিরছে। অদূরেই অ্যাটকিন্‌সন সাহেবের শর্টহ্যাণ্ড শেখানোর বিদ্যালয়। এখানে জ্যোতি শর্টহ্যাণ্ড এবং টাইপিং শিখেছে।

চকিতে জ্যোতির চোখে পড়ল—

এক ষণ্ডামার্কা চানাচুরওয়ালা অকথ্য-ভাষায় গালাগাল করছে এক নিরীহ বাঙালী যুবককে। যুবকের হাত ধ'রে চানাচুরওয়ালার টানাটানি করবার ধরণ দেখে বিশ্রী লাগল জ্যোতির।

সে এগিয়ে গেল, কি ব্যাপার জানতে।...রাস্তার দু-দিকেই দারুণ ভিড়: অধিকাংশ হল অফিস-ফেরতা বাঙালী-বাবু। মজা লুটছেন।

অনুসন্ধান ক'রে জানল সে—

যুবকটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে সামান্য একটু চানাচুর পড়ে গিয়েছে ওই চানাচুরওয়ালার ট্রে থেকে। দাম তার বড় জোর দু-পয়সা।

কিন্তু সদর্পে ঘোষণা করছে চানাচুরওয়ালা: দো-রুপয়ার এক-প্যাসা কমে তোম্‌হাকে হামি ছাড়বে না, বংগালী শ্যাতান্!

দু-টাকা কেন, দু-আনা পয়সাও যুবকের পকেটে নেই, টের পেল জ্যোতি।

নিজের পকেট থেকে একটা সিকি বার করল সে। চানাচুরওয়ালার হাতে দিয়ে মিষ্টিগলায় বলল: মিটিয়ে নে ভাই! কেন অনর্থক ঝামেলা করছিস? ওইটুকু তো চানাচুর পড়েছে।

এই প্রস্তাবে, জ্যোতির প্রতিও চানাচুরওয়ালা তার গালাগাল বর্ষণ শুরু করল।

আরো বার-কয়েক ভাল-মুখে জ্যোতি মিটিয়ে নিতে বলা-মাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল চানাচুরওয়ালা। ভাবল: হাজার হ'লেও কত আর

মেকদার হবে !

তাই সে হাত তুলল জ্যোতির গায়ে।

আর যাবে কোথায় ?—জ্যোতি স্বমূর্তি ধারণ করতে বাধ্য হল। এক-ধাক্কায় সে চানাচুরওয়ালাকে ঠেলে ফুটপাথের ওপর ফেলে দিয়ে, যুবকটিকে জানাল : বাড়ি ফিরে যান মশাই !

বেশ খেলাটা জ'মে উঠেছিল। এমন চকিতে সব মিটে যাবে আশা করে নি জনতা। ভারি নিরাশ হয়ে একে-একে যে-যার ঘরের দিকে পা-বাড়িয়েছে, এমন-সময় জুটল নতুন মজার খোরাক।

আবার তাই গুটি-গুটি ফিরে এল দর্শকের দল। আবার শুরু করল তারা জল্পনা-কল্পনা !

ব্যাপারটা এই।

অ্যাটকিন্‌সন সাহেবের স্কুল থেকে এক গোরা জোয়ান সব দেখছিল। সবে সে বিলেত থেকে এসেছে। কালা-জাতটাকে উঠতে-বসতে একটু শিক্ষার আলোক দেবার মহৎ উদ্দেশ্যে হাতটা তার সর্বদাই নিসপিস করে।

ঘটনাস্থলে এসেই সে তাই রুখে দাঁড়াল জ্যোতির সামনে। চানাচুর-ওয়ালার পক্ষ নিয়ে, ভাঙা হিন্দীতে সে শুরু করল তুমুল হট্টগোল।

চমৎকার ইংরেজীতে জ্যোতি তাকে বুঝিয়ে দিতে চাইল ঘটনাটা।

কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের একজন নেটিভ প্রজা যে সাহেবের মুখের ওপর মুখ-নাড়া দেবে—সাহেবের স্বপ্নেরও অতীত সে-ব্যাপার।

তাই সে ঝট্‌ ক'রে লাথি চালিয়ে দিল জ্যোতির তলপেট লক্ষ্য করে। অবলীলাক্রমে, ক্ষিপ্র-পায়ে জ্যোতি এক-পাশে স'রে গিয়েই দিল তার জব্বর জবাব। বসিয়ে দিল পেল্লায় এক ঘুসি, সাহেবের চোয়ালে।

টাল সামলাতে না-পেরে, সাহেব প'ড়ে যাচ্ছে দেখে—তার জামার কলার ধ'রে আরো কিছু বেশ উত্তম-মধ্যম লাগিয়ে দিল জ্যোতি।

অত্যন্ত কাহিল অবস্থায় লুটিয়ে পড়ল সাহেব জ্যোতির পদতলে, পথের ধূসর ধূলোয়।

তাকে রেহাই দিয়ে বজ্র-নির্ঘোষে জ্যোতি বলে উঠল "Now for your life, apologise !"

গদগদ-কণ্ঠে, বারবার মাপ চাইল সাহেব। তখন জ্যোতি পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে গেল তাকে ফুটপাথের ওপর। নিজ-হাতে দিল তার

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা।

ধাতস্থ হ'ল সাহেব।

জ্যোতি জানে—শক্তের ভক্ত, নরমের যম এই ইংরেজ জাতটা। যেখানে তারা চোট পাবে, সেখানে বন্ধু-সম্ভাষণে হাত বাড়াতে তারা কখনো ইতস্তত করবে না।

জ্যোতির সঙ্গে সখ্য পাতাতে চাইল সাহেব।

সাহেবকে তুলে ধরে জ্যোতি বুঝিয়ে দিলে, যে অন্যায়ের পক্ষ নিয়ে তার ওপর সাহেব এসেছিল জোর খাটাতে। সে যদি দুর্বল হ'ত, সাহেবের পীড়নে জর্জরিত হ'য়ে এতক্ষণে গোঙাতে হ'ত তাকে এই ফুটপাথের ওপর। কিন্তু উল্টে সাহেব আজ শিক্ষা পেল যে না-জেনে না-বুঝে গায়ের জোর ফলাতে যাওয়াই চরম বাহাদুরি নয়। আসল বাহাদুরি সেখানেই, যখন সত্যের পথে যুঝতে পারা যাবে সত্যের পক্ষ নিয়ে!

মাথা নুয়ে পড়ল সাহেবের।

জ্যোতি ব'লে চলল, "In future, think twice before you act as a dispenser of justice!"

তারপর, সাহেবের দুরবস্থায় বিচলিত হল জ্যোতির স্নেহ-কাতর মন। নিজে সাহেবকে গাড়িতে ক'রে পৌঁছে দিয়ে এল তার বাড়িতে।

সজল চোখে জ্যোতির দু-হাত ধ'রে সাহেব বলল, "Good night, friend!"

মজঃফরপুর।

মোটা মাইনে দিয়ে ব্যারিস্টার কেনেডি-সাহেব জ্যোতিকে নিয়ে এসেছেন তাঁর স্টেনোগ্রাফার ক'রে।

স্বাধীনতা-প্রিয়, আদর্শবাদী এই আর্যসন্তানকে মাস-দুয়েকের মধ্যেই ভালবেসে ফেলেছেন কেনেডি। এমন স্বাস্থ্য, এমন পাণ্ডিত্য, এমনই তার নিষ্ঠা—দেখে দেখে কেনেডি সাহেবের আর মন ভরে না।

জ্যোতি তাঁর বাড়িতেই থাকে।

আপন-ভোলা সাহেব পরম নির্ভরতার সঙ্গে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বিশ-বছরের এই প্রিয়-দর্শন সৌম্য বাঙালী যুবকের হাতে।

জ্যোতিকে শেখান কেনেডি রাজনীতির, অর্থনীতির, শাসনতন্ত্রের গূঢ়

তথ্য। কেনেডির মন যেন বলে, এ-শিক্ষা একদিন কোথাও না কোথাও ফলপ্রসূ হবে!...

জ্যোতির সহজাত স্বাধীনতা-প্রীতির অগ্নি ইন্ধন পায় তার গর্ভধারিণীর কাছে। দ্বিতীয় ইন্ধন জোগায় স্বাধীন সীমান্ত-প্রদেশের আফ্রিদি ওস্তাদ ফেরাজ। তৃতীয় ইন্ধন দেন স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, দেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। চতুর্থ ইন্ধন—সম্ভবত ব্যারিস্টার কেনেডি।

দেখতে দেখতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে জ্যোতি মজঃফরপুরের তরুণ, কিশোর, যুবক-মহলে। নানারকম ব্যায়াম খেলাধূলো প্রভৃতি প্রবর্তন করবার উদ্দেশ্যে—জ্যোতি খুলল এক তরুণ সঙ্ঘ; নিজে-হাতে শেখাতে লাগল লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা, কুস্তি, দৌড়-ঝাঁপ।

স্পোর্টসের প্রতি যুবকদের আন্তরিক টান দেখে জ্যোতি ব্যবস্থা করল বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিযোগিতার।

প্রতিযোগীদের মনে উৎসাহ দেবার জন্যে জ্যোতি নিজেও অংশ নিতে লাগল সবকিছুতে। হাই-জাম্প, লং-জাম্প, দৌড়নোয় বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়ে মুগ্ধ করল মজঃফরপুর-বাসীদের মন। টনক নড়ল সাহেব-সুবোদের।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বহু নাগরিক, বহু প্রতিষ্ঠান জ্যোতিকে প্রদান করেন অগণিত পুরস্কার।

শুধু শারীরিক শিক্ষাই নয়। জ্যোতির বিশাল মনের সংস্পর্শে এসে, জ্যোতির আদর্শের স্বাদ পেয়ে উদার, বিশাল, মহৎ হবার স্বপ্ন দেখতে লাগল মজঃফরপুরের যুবমন।

হঠাৎ খবর আসে –

জননী শরৎশশীর দারুণ অসুখ!...ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে জ্যোতির বুক।

কেনেডি-সাহেবকে খবর দিয়েই তক্ষুণি সে কয়া যাবার জন্যে প্রস্তুত হল।

ইংরেজীর ১৮৯৯ সাল।

কুষ্টিয়ায় গাড়ি থেকে নামল জ্যোতি। দেখল, ঘাটে একটাও নৌকো নেই। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। অভ্যাসমতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সে গড়ুই -নদীর প্রখর পীন-বক্ষে! অতি দ্রুত সাঁতার কেটে, তিন মাইল পথ পেরিয়ে

পৌঁছল গিয়ে কন্যায়।

গ্রামে গিয়েই খবর পেল, মায়ের কলেরা হয়েছে!

অল্প-কয়েকদিন আগে, বড়মামার ছেলে নির্মলের কলেরা হয়। বরাবরের মতো এ-যাত্রাও মা দিনরাত রোগীর ঘরে থেকে তার অক্লান্ত সেবা করেছেন।

তারপরই শরীরটা তাঁর বিশেষ খারাপ হ'য়ে পড়ে। যমের কবল থেকে নির্মলকে বাঁচিয়ে নিজেকেই বুঝি ঠেলে দিলেন তিনি মৃত্যুর গহ্বরে।

সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে বিনোদ আর জ্যোতি লেগে যায় গর্ভধারিণীর সেবা করতে।

অষ্টপ্রহর দিদি আর ভাই জেগে থাকে জননী শরৎশশীর শিয়রে।

কিন্তু জননী বোঝেন, তাঁর ডাক এসেছে পরলোকের থেকে। বোঝেন, ফুরিয়েছে তাঁর এ-জগতের কাজ। তাঁর মনে পড়ে—পরমগুরুর তেজস্বী সেই মুখ।...

আজ কোন ক্ষোভ নেই জননীর মনে।

মহীয়সী কন্যার, কৃতী পুত্রের জননী শরৎশশী দেবী ঈশ্বরের নাম জপ করতে করতে জ্যোতির কোলে মাথা রেখে, বিনোদের সেবায় পরিতৃপ্তা—ত্যাগ করেন শেষ নিঃশ্বাস।

অতি অল্প-বয়সেই মা চলে গেলেন তাঁর ভবলীলা সম্বরণ ক'রে। যেন নিজের মহাপ্রয়াণের কথাই মা লিখে গিয়েছিলেন তাঁর একটি কবিতায়:

"সুন্দর পূর্ণিমা-শশী
আঁধারিয়া দশ-দিশি
ভূমে খসি' পড়িল,
হেন প্রতিকূল বায়ু
আহা কেন বহিল!
রে সময় কী করিলি?
কারে আজ কেড়ে নিলি
কাঁদাইলি কাহারে?
করিলি দস্যুতা
একী নিদারুণ প্রহারে?"

দিদি বিনোদবালার অবস্থাটাই বারবার বড় ক'রে বাজে জ্যোতির বুকে।

শৈশবে বাবাকে হারিয়ে তারা-দু'জনে মায়ের কোলে মানুষ হয়েছে যেন একই পাখির দুটি ডানা।

দিদির বিয়ে দিয়ে মা চেয়েছিলেন সুখী হ'তে। দিদিকে সুখী করতে। কিন্তু সেখানেও ভাগ্যদেবতা বাদ সাধলেন। দিদির অবচেতনে, অপরিণত মনে দ্বিতীয়-বার প্রচণ্ড শোকের শেল এসে বিঁধল।

পরম নির্ভরতায় ফিরে এল দিদি। বিধবা মায়ের বিধবা মেয়ে। পরম নিস্তরতায় আঁকড়ে ধরল দিদি মায়ের স্নেহচ্ছায়া। তিনিই তাদের দুটি ভাইবোনের জীবনের ধ্রুব-তারা।

তিনি আজ অস্ত গেলেন।

জ্যোতি বোঝে, দিদির একমাত্র সম্বল, একান্ত সান্ত্বনা—সে নিজে। একমাত্র সে-ই দিদিকে দিতে পারে যথার্থ আরাম। একমাত্র সে-ই দিতে পারে দিদির অন্তরের ক্ষতে ভালবাসার প্রলেপ।

তাই সে নিজের শোক ভুলতে চেষ্টা করে দিদির মুখ চেয়ে। চেষ্টা করে : দিদিকে সুখী করা যায় কী ক'রে !

জ্যোতি তুলে নেয় গীতা। শোনায় দিদিকে চির-অশোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বরাভয় :

এই যে আত্মা—এর জন্মই-বা কোথায়, কোথায় এর মৃত্যু ? কোথায় এর উৎপত্তি, কোথায় বিনাশ ? অজাত, নিত্য, শাশ্বত এই আত্মা। শরীর যদি জীর্ণ হ'য়ে আসে, জীর্ণ বসনেরই মতো সে-শরীর ত্যাগ ক'রে নতুন শরীর পরিগ্রহ করে আত্মা। এতে শোকের অবকাশ কোথায় ? ভয়ে কুণ্ঠিত হব কেন ? কেন আমরা শিউরে উঠব অব্যক্ত বেদনায় ?...

ওদিকে দিদির মনের অবস্থাও তাই।

পাগলা ছেলে জ্যোতি ! এই তো সবে কুড়ি বছরে পা দিয়েছে। মাত্র পাঁচ-বছর বয়েসে হারিয়েছে অসাধারণ চরিত্রের বাবাকে। মানুষ হ'য়েছে মামা-বাড়িতে থেকে।

মায়ের আদর্শ শিক্ষায় আর নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই সে তার জীবনে কুড়িয়েছে অজস্র আশীর্বাদ।

তবু—মা ছাড়া তো সে আর-কিছুই জানে না !

পরম-স্নেহে দিদি তাই ঘিরে ধরে জ্যোতির গোটা জীবনটা—নিজের

অন্তর-অতলে সুপ্ত মাতৃত্বের অমৃত-স্বাদে।

মাকে হারিয়ে পরস্পরকে আরো নিবিড়ভাবে পায়—দিদি বিনোদবালা আর ভাই জ্যোতি।

আর—

জ্যোতির খোঁজ নেন কেনেডি-সাহেব। খবর পেয়ে তিনি ভারি ব্যথিত হন। আরো ব্যথিত হন, যখন খবর আসে: সে আর মজঃফরপুরে ফিরে যেতে চায় না। শুনে।

জ্যোতি না আসতে চায়, আসবে না। কিন্তু তিনি চান, জ্যোতি সুখী হোক, সুপ্রতিষ্ঠিত হোক জীবনের বুকে।

তাই—তিনি নিজে থেকেই চেষ্টা করেন জ্যোতিকে অন্যত্র কোন ভাল কাজে নিয়োগ করতে।

জ্যোতি খবর পায়: বাংলার সেক্রেটারিয়েটে সে কাজ পেয়েছে। কেনেডি-সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন বাংলা-গভর্নরের খাস-সেক্রেটারি মিঃ হুইলার। সেই হুইলার-সাহেবের স্টেনোগ্রাফার-পদে বহাল হয়েছে জ্যোতি।

দিদি বুক বেঁধে জোর ক'রে তাকে পাঠিয়ে দেয় কলকাতায়—কর্মক্ষেত্রে।

ভারি দায়িত্বপূর্ণ কাজ।…প্রীত হন হুইলার—জ্যোতির দক্ষতায়, তৎপরতায় আর চলনে, বলনে, কাজে শৃঙ্খলার পরিচয় পেয়ে।

এইতো সুযোগ!…

ধীরে ধীরে জ্যোতি পরিচিত হ'তে থাকে—ইংরেজদের শাসন-ব্যবস্থার জটিলতম কল-কৌশলের সঙ্গে।

জ্যোতির মন বলে: এ-পথই তার শ্রেষ্ঠ পথ! জীবনে তার যে-উদ্দেশ্য সফল করতে হবে, তার সিদ্ধির জন্যে নিতান্তই প্রয়োজন এ-পথের প্রত্যক্ষতম অভিজ্ঞতা!

ছোট, বড়—সবার সঙ্গেই তার জন্মাল হৃদ্যতার ভাব; সর্ব-শ্রেণীর কর্মচারীরাই দায়ে, অদায়ে, সুখে, দুঃখে তার পরামর্শ, তার সাহায্য অপরিহার্য মনে করে।

ছোটলাটের গতিবিধির সঙ্গে বাঁধা জ্যোতির গতিবিধি।

একদিন—সদলবলে ছোটলাট যাচ্ছেন রাঁচি থেকে হাজারিবাগে। সত্তর মাইলের পথ। পুশ্-পুশ্-গাড়িতে লাটসাহেব আর তাঁর অন্যান্য উচ্চপদস্থ

পর্ষদদের যাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

কিন্তু জ্যোতি বেঁকে বসল : আর-একটা মানুষ, আমারই ভাই—সে কিনা এতটা পথ গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে, আর আমি যাব সেই গাড়িতে চেপে ?

গোটা পথটাই স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে এল জ্যোতি। ঘন-ঘন লাটসাহেব তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। মুগ্ধ হলেন তিনি—জ্যোতির অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়ে।

ছুটি পেলে চ'লে আসে জ্যোতি কয়ার বাড়িতে। এ-তল্লাটের যত লোক—এর মধ্যেই তারা বুঝে নিয়েছে : তাদের বড়দার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী ভূ-ভারতে নেই।

হয়তো একদিন কুষ্টিয়া থেকে জ্যোতি নৌকোয় উঠছে, গ্রামে ফেরবার পথে। সোজা অফিস থেকে চলে এসেছে। পরণে তার দামী কোট-প্যাণ্ট।

ঘাটে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে মুখ-চেনা এক ভিখারী। এর কাছে এক-পয়সা, ওর কাছে এক-আধলা হয়তো সে ভিক্ষে পাচ্ছে।

এমন সময় জ্যোতিকে দেখেই তার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে সে চুপি-চুপি বলল, "বড়দা, একটা কথা বলি ?"

"কি বলবি, বল্ না !" অভয় দেয় জ্যোতি।

"বড়দা, তোমার পুরনো কাপড় আমায় দেবে একটা ?"

ভিখারীর পরণের ছেঁড়া ধুদ্ধুরে কাপড়টায় বিস্তর তালিমারা। তা-ও খসে খসে পড়ছে। জ্যোতির দু-চোখ জলে ভ'রে উঠল সেই দুরবস্থা দেখে। ব্যাকুল হ'য়ে উঠল জ্যোতি।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে পেল একটা দশ টাকার নোট। আর কিছু রেজগি।

ভিখারীকে বুকে টেনে নিয়ে সব টাকা তার হাতে তুলে দিল জ্যোতি; বলল, "পুরনো কাপড় নয় রে, গোবিন্দ, পুরনো কাপড় নয়! এই পয়সায় তুই ভাল নতুন কাপড় কিনে নিস !"

গোবিন্দ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় বড়দাদাবাবুর দিকে। অমন বীরের মতো বড়দার চেহারাটা। কিন্তু একটুতেই তাঁর চোখে জল ?

মনটা ভিজে উঠল গোবিন্দর। অন্তরে অন্তরে সে জ্যোতির কাছে চির-ঋণী হয়ে রইল।

রোগীর সেবা করতে জ্যোতির উৎসাহের অন্ত নেই। ঠিক তার মায়ের মতই।

বসন্ত, কলেরা, নিউমোনিয়ার রোগীকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সেবা ক'রে, না-খেয়ে, না-ঘুমিয়ে, সমস্ত কাজ-কর্ম, সমাজ-সংসার ভুলে রোগীর শিয়রে ব'সে থেকে কী যে আনন্দ পায়, সে-ই জানে!

গলিত কুষ্ঠে আক্রান্ত সমাজ-পরিত্যক্ত রোগীকে সে নিজে-হাতে চিকিৎসা করে, হাসিমুখে তার ঘা ধুইয়ে পরিষ্কার ক'রে দেয়, ভাল মলম লাগিয়ে বেঁধে দেয় ব্যাণ্ডেজ।

রোগীর বুক চিরে বার হয় আরামের নিঃশ্বাস।

এ-রকম বহু ঘটনা তোমাকে শোনাবার মতো লোক আজো বেঁচে আছেন, পথিক, যাঁরা নিজে-চোখে দেখেছেন জ্যোতির সেই মানব-প্রেমের ব্রত, যাঁরা নিজেরাও এমনি বহুবিধ ঋণে জ্যোতির কাছে বাঁধা।

এমন ক'রে জীবনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় জ্যোতি ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল তার দুর্নিবার প্রাণশক্তি—তাই না আজো অক্ষয় হয়ে আছে তার স্মৃতি: হৃদয়ে-হৃদয়ে, ঘরে-ঘরে, গ্রামে-গ্রামে, দেশে-দেশে।

কন্নার পথ।

জ্যোতি বেড়াতে বেরিয়েছে। সবে ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করছে পূব-আকাশের ঘোমটার আড়াল থেকে। পাখির গানে-গানে ভরে উঠেছে সারা গ্রাম। নদীব বুক থেকে ছড়িয়ে পড়ছে মিষ্টি হাওয়া।

হঠাৎ জ্যোতির কানে ভেসে আসে দূরাগত এক কান্নার আওয়াজ। কান পেতে শোনে সে। কান্নাটা আসছে যেন জেলে-পাড়া থেকে।

সে দ্রুত-পায়ে এগিয়ে যায়।

এ-যে দ্বারিক-মাঝির বউ! বউ কাঁদছে।

মাঝির ঘরে ঢুকে জ্যোতি দেখে—মেঝেয় শুয়ে গোঙাচ্ছে দ্বারিক। আর পাশেই তারস্বরে কাঁদছে তার বউ।

বউ বলল: কাল রাত থেকে মাঝির এখন-তখন অবস্থা। বেশ-কিছুদিন ধ'রে কঠিন অসুখে ভুগছে সে।

বুড়ো-বুড়ি নিজেদের মতো গ্রামের এককোণে এই কুঁড়ে-ঘরে থাকে। আত্মীয়-স্বজন কেউই ওদের নেই। আর, মাঝির শেষ-সময়ে গ্রামের কেউও আসে নি। বোধ হয় সৎকারের ব্যবস্থাটাও হবে না।

বুড়ি ব'সে ব'সে কাঁদছে।

মাঝির শেষ-সময় তাকে যে কেউ একটু ঘরের বাইরে নিয়ে যাবে, এমন লোকও নেই!

তাড়াতাড়ি জ্যোতি পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নেয় দ্বারিককে। নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয় তাকে উঠোনে, মাতুরের ওপর। বিশ্রী দুর্গন্ধে ভ'রে উঠেছে উঠোন। ভন্‌ভন্‌ ক'রে উড়ছে মাছি।...

জ্যোতি নির্বিকার।...

এতক্ষণ যেন মাঝির প্রাণটুকু ধুকধুক করছিল জ্যোতির স্পর্শেরই পথ চেয়ে। জ্যোতির বাহু-পাশে পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজল দ্বারিক মাঝি। থেমে গেল তার ক্ষীণ হৃৎ-স্পন্দন।...

"দেবৃতা, আমার এখন কী উপায়?" হাউ হাউ ক'রে কেঁদে জ্যোতির পায়ে মাথা কুটতে থাকে দ্বারিকের বউ।...

ছলছল চোখে উঠে দাঁড়ায় জ্যোতি। গ্রামে তরুণ বন্ধুদের সন্ধানে বেরিয়ে যায়।

বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে যথারীতি দ্বারিক মাঝির সৎকার ক'রে ফিরে এল জ্যোতি। ব্যবস্থা ক'রে এল, এই বিপদের মধ্যে দ্বারিকের বউ যেন যথাসাধ্য সাহায্য পায়।

আর ব্যবস্থা ক'রে এল তার মাসোহারার।

গ্রামে হরিসভা প্রতিষ্ঠা করেছে জ্যোতি।

জ্যৈষ্ঠ মাস। ভর দুপুর। সকাল থেকে কীর্তন চলছে। জমে উঠেছে কীর্তন। হরিসভায় তিল-ধারণের জায়গা নেই। কথকঠাকুর রাধারমণ গোঁসাই তদ্‌গত-চিত্তে গান গাইছেন:

(হরি এবার) তোমায় আসতে হবে হে!
নইলে তোমার ভক্ত মরে—
(এবার) তোমায় আসতে হবে হে!

গ্রামসুদ্ধ লোক বিভোর হ'য়ে শুনছে সেই কীর্তন। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। দারুণ গরম হাওয়ায় সাদা ধুলো উড়ছে। তবু কারো হুঁস নেই!

গ্রামের ডাক্তার যুধিষ্ঠির বিশ্বাস। জাতে জেলে। কিন্তু ভক্তিতে তাঁর

জুড়ি মেলা ভার।

কীর্তন শুনতে শুনতে ভাবের ঘোরে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। দু-হাত তুলে নাচতে-নাচতে গিয়ে নামলেন উঠোনে। বালি তেতে গন্‌গন্ করছে। হুঁস নেই ভক্তের!

তিনি ধ্যানলোকে এক হ'য়ে গিয়েছেন বুঝি গোপীদের রাসে। পরম আনন্দে দু-চোখ বেয়ে ঝরছে প্রেমাশ্রু। 'প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ! প্রাণ-গৌর নিত্যানন্দ!' গাইতে গাইতে তিনি নেচে চলেছেন হেলে-দুলে।

তাই দেখে দুলে উঠল জ্যোতির মন।

এক-বালতি জল আর একটা হাত-পাখা এনে যুধিষ্ঠির বিশ্বাসের পেছন-পেছন ঘুরতে লাগল সে। যেখানে যেখানে যুধিষ্ঠির দাঁড়ান, সেখানেই—বালির ওপর জল ঢেলে হাওয়া করতে থাকে জ্যোতি পরম নিষ্ঠা নিয়ে।

"দু'জনেরই ভাবোন্মাদ অবস্থা। একজন 'প্রাণ-গৌর'কে ডাকতে মত্ত, অন্যজন গৌর-ভক্তের সেবায় মত্ত"—লিখেছেন জ্যোতির জীবনী-লেখক শচীনন্দনবাবু।

কয়ার থিয়েটার ক্লাব। মোটা টাকা দিয়ে জ্যোতি দাঁড় করিয়েছে এই ক্লাবটি। পাকাপাকিভাবে গ্রামের ছেলেরা যাতে এখানে এসে অভিনয় করতে পারে ভাল ভাল নাটক। যে-সব নাটকে উদ্দীপ্ত হবে দেশপ্রেম, উদ্দীপ্ত হবে তরুণদের মনের অতলে সুপ্ত বহ্নিশিখা, যে-সব নাটক গ'ড়ে তুলবে তাদের চরিত্র।

আর ক'রে দিয়েছে সে ফুটবল ক্লাব। দূর-দূর থেকেও তরুণেরা এসে সমবেত হয় এই ক্লাবে। জ্যোতি নিজে তুলে নেয় তাদের শিক্ষার ভার। আর, খেলাধূলোর ফাঁকে-ফাঁকে দেয় তাদের মহৎ আদর্শের সন্ধান। দেয় তাদের দেশকে স্বাধীন করবার মন্ত্র।

আর সে মাঝে মাঝে তাদের শোনায় গীতার ধর্ম। শোনায় যোগেন বিদ্যাভূষণের জাতীয়তাবাদী লেখাগুলো। শোনায় 'আনন্দমঠ'-এর কাহিনী। পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা। পড়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লব-ইতিহাস॥

॥ চার ॥

পুজোর অল্পকাল বাদে।

দিদি একদিন ডেকে বললেন ভাইকে, "জ্যোতি, তোকে সংসারী দেখে যাবার ভারি ইচ্ছে ছিল মায়ের। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ। তা' হ'য়ে উঠল না!"

জ্যোতিকে নিরুত্তর দেখে ব'লে চললেন বিনোদবালা, "মা চলে যাবার পর থেকেই মনটা আমার বারবার বলছিল, তোর বিয়ে না-হওয়া অবধি মা সুখী হতে পারছেন না।"···

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, বলেন বিনোদবালা "মা-ই পাত্রীর খোঁজ করছিলেন। ভাগ্যক্রমে পাত্রী নিজে এসেই দেখা দিয়েছিল।"

"পুজোর সময় আমাদের ঠাকুর দেখতে তো কত লোকই আসে। একদিন একটি মেয়েকে দেখে মায়ের ভারি ভাল লাগে। পছন্দ হয়ে যায় মেয়েটিকে। সুন্দর শান্তশিষ্ট চেহারা। সরল দুই চোখ ভ'রে সে প্রতিমা দেখছিল; মনে হল—ওর সারা অন্তর যেন প্রতিমার মধ্যেই ডুবে গেছে!"

তারপর ভাইয়ের মুখোমুখি চেয়ে বিনোদ বলে, "খোঁজ নিয়ে মা জেনেছিলেন, মেয়ের বাপ নেই। আসল বাড়ি বলাগড়। কুমারখালিতে, মামাবাড়িতেই থাকে। ঠিক আমাদের মতো।"

ম্লান হাসে জ্যোতি।

১৯০০ সালের এপ্রিল মাস।

জিরেট বলাগড়ের ˚উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ইন্দুবালার সঙ্গে সম্পন্ন হল যতীন্দ্রনাথের শুভ-পরিণয়।

তার বিয়েতে কয়ার বাড়ি এবং গ্রাম থেকে একশ' জনেরও বেশি বর-যাত্রী পায়ে হেঁটেই পাঁচ-মাইল পথ কুমারখালিতে গিয়ে উঠলেন।—কন্যার মাতুলালয়ে বিবাহ সম্পন্ন হল।

বিয়ের পর।

দিদি ও স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে জ্যোতি তার দার্জিলিং-এর বাসায়।

ছোটলাটের সঙ্গে সঙ্গে গরম-কালটা পুরোই জ্যোতিকে কাটাতে হয় দার্জিলিং। প্রতিদিন আফিসের কাজ সেরে সে যখন বাড়ি আসে সন্ধ্যায়, তার সঙ্গে-সঙ্গে এসে হাজির হয় স্থানীয় তরুণেরা।

জ্যোতি তাদের গীতা পড়ায়।

জ্যোতির কাছেই শোনে তারা : দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবার চরম মুহূর্ত আসন্ন! প্রতিটি দেশবাসীকে হ'তে হবে প্রস্তুত। দেশের জন্যে ত্যাগ করা চাই সমস্ত স্বার্থ, সব সঙ্কীর্ণতা। মহৎ হ'তে হবে হৃদয়েবুদ্ধিতে; চাই তার জন্যে অনেক উঁচু আদর্শ।

জ্যোতির কাছেই শেখে তরুণেরা : ভয়ের অতীত হ'তে হবে। হ'তে হবে বলে, বীর্যে, সহিষ্ণুতায়, স্বাস্থ্যে—নিখুঁত নিটোস। চাই তার জন্যে নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যায়াম, চাই শরীরচর্চা।

জ্যোতির ব্যক্তিত্বের মধুর অথচ প্রখর আকর্ষণে দলে দলে তরুণ, যুবক সঙ্ঘবদ্ধ হয় তার চারিধারে। যেখানে যখন সে যায়, তাকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে তরুণদের সম্মিলনী।

সকলেরই সে দাদা। বিনোদবালা সকলেরই দিদি। আর ইন্দুবালা—বৌদি!

জ্যোতির বাড়িতে ভাল-মন্দ রান্না হয়েছে। আফিস থেকে ফিরেই সে খবর পেয়েছে। আর, অমনি ঢালা নিমন্ত্রণ গিয়েছে তার 'ভাইদের' কাছে : আজ এখানেই খেয়ে যাবি।

ছেলেবেলা থেকেই, একা কোনদিন খেতে বসা তার ধাতে নেই। দল-বেঁধে, মজলিস জমিয়ে, অফুরন্ত প্রাণের উচ্ছল-হাস্যে দশদিক মুখর ক'রে মরাগাঙে জ্যোতি নিয়ে আসতে জানে সঞ্জীবনীর জোয়ার।

আর দিদি বিনোদবালার সাহচর্যে সহধর্মিণী ইন্দুবালা হাসিমুখে জোগান দেন জ্যোতির এই স্নেহব্রতের উপচার।

অলঙ্ঘনীয় গুরুবাক্যের সম্মান দিয়ে প্রতিটি তরুণ অনুশীলন করতে থাকে জ্যোতির শিক্ষা, স্মরণে রাখে তার বাক্য। দেশ-সেবাকে তারা তাদের অবশ্য-কর্তব্য ব'লে মনে করে।

শেখে তারা কষ্ট-সহিষ্ণু হ'তে, কঠোরতার মধ্যে মুক্তির সুখ-স্বাদ পেতে। ভীরুর জীবন, দুর্বলের জীবন যে কতদূর হাস্যাস্পদ তার উপলব্ধি তারা পায়—জ্যোতির আদর্শের মাঝে।

তার কাছে ওরা শোনে : ভারতের স্থান আজ জগতের অন্যান্য জাতির চোখে কত নেমে গিয়েছে! অন্যান্য দেশ হাসে, দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের পরমুখাপেক্ষী নীতি দেখে।

শাশ্বত ভারত, বেদ-বেদান্তের ভারত, জগতের অধ্যাত্ম-গুরু ভারত আজ বিশ্বের চোখে মৃতের সামিল।

চিকাগো-র মহাসম্মেলনে, সর্বজাতির সামনে দাঁড়িয়ে, এ-যুগে সর্বপ্রথম যখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রমাণ করলেন, শাশ্বত ভারত মরে নি, মরতে পারে না—তখন নতুন ক'রে বিশ্ববাসীর কৌতূহল জাগে ভারতের প্রতি।

কিন্তু—জ্যোতির ধারণা—ভারতের পূর্ণমর্যাদা ততদিন ভারত পাবে না, যতদিন সে লাভ না-করছে তার পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

আর—এ-স্বাধীনতা কেউ মুখের কাছে এনে তুলে ধরবে না। এ-স্বাধীনতা আদায় ক'রে নিতে হবে বিপ্লবের মাঝে, গায়ের জোরে—যেভাবে করেছে বিশ্বের আর-সব দেশ, বুকের রক্তে ধরণীর ধূলি ভাসিয়ে দিয়ে, দেহের শেষবিন্দু সামর্থ্য অর্ঘ্যের মতো তুলে ধ'রে!

জ্যোতি তার অনুরক্ত তরুণদের শোনায় ইতালীর রণ-নায়ক গ্যারিবল্ডির রক্ত-নাচানো আমন্ত্রণ, মহাবীরের অমর আহ্বান:

"ভাগ্যদেবী আজ যদি আমাদের ওপর বিরূপ হয়ে থাকেন, কাল তিনি প্রসন্ন হবেনই।...যারা বিদেশীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চাও এস আমার সঙ্গে।

"আমি তোমাদের অর্থ দিতে অক্ষম, গৃহ দিতে অক্ষম, অক্ষম তোমাদের যোগ্য খাদ্য-সরবরাহ করতে।

"আমি দিতে পারি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অক্লান্ত পথ-পরিক্রমা, যুদ্ধ আর মৃত্যু।

"অন্তর দিয়ে সত্যিই কেউ ভালবাস যদি স্বদেশকে, যদি শুধু তা' মুখের ভালবাসা না-হয়, এস তবে আমার সঙ্গে!"

জ্যোতির সান্নিধ্যে তরুণেরা লাভ করে সর্বত্যাগের মন্ত্র। মন তাদের বাঁধা হয়ে যায় চড়া সুরে। অন্তরে তারা শোনে যেন আসন্ন বিপ্লবের প্রস্তুতি।

আসন্ন বিপ্লবের পথ চেয়ে জ্যোতির পাশে এই সময় থেকেই যে তরুণেরা কাজে নামেন জ্যোতির একান্ত সহচররূপে, তাঁদের অন্যতম তিনজন আজ বিপ্লবের ইতিহাসে অপরিচিত নন: ভবভূষণ মিত্র (উত্তরকালে স্বামী সত্যানন্দ পুরী), কুঞ্জলাল সাহা (মাণিকতলা বোমার বাগানে গ্রেপ্তার হন), আর যতীশ মজুমদার।।

রুদ্রের আহ্বান

॥ এক ॥

ভারতবর্ষের সনাতন যে সাধনা, তার পূর্ণরূপ সিদ্ধি কখনোই আসতে পারবে না, যতদিন না ভারত তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাচ্ছে, পাচ্ছে পূর্ণ স্বরাজ :

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ করে যতীন্দ্রনাথের এই যে উপলব্ধি হয়, তা-ই সঙ্কল্পের মত শোনাল শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠে—স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে শ্রীঅরবিন্দ অবতীর্ণ হলেন নব-জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত জাতীয় চেতনার সম্মুখে।

১৯০৩ সালের কথা। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মশাইয়ের শ্যামপুকুরের বাড়ি। বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ এসেছেন। উঠেছেন যোগেনবাবুর এই বাড়িতে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আছেন বরোদা সৈন্য-বিভাগের যতীন্দর উপাধ্যায়—অর্থাৎ বিখ্যাত যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে যিনি নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন।*

শ্রীঅরবিন্দ যখন যোগেনবাবুর আতিথ্য গ্রহণ ক'রে শ্যামপুকুরের বাড়িতে এসে উঠলেন, যোগেনবাবু স্মরণ করলেন তাঁর পুত্রতুল্য যতীন্দ্রনাথকে এবং জামাতা ললিতকুমারকেও। ললিতবাবু তখন বি-এল পাশ ক'রে সবে প্র্যাকটিসে বসছেন এবং যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী কর্মসূচীর সহযোগিতাও করছেন। এ-শতাব্দীর সূচনাতেই বা তারও আগে সম্ভবত যতীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন বাংলার যুবশক্তিকে ক্ষাত্রধর্মে দীক্ষা দিতে। যথেষ্ট বিস্তীর্ণ তাঁর কর্মক্ষেত্র।

যতীন্দ্রনাথ ও ললিতকুমারের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ এবং জে এন ব্যানার্জির পরিচয় করিয়ে দিলেন যোগেনবাবু।

সরকারী কাগজ-পত্রে পাওয়া যায় যে, ১৯০১ সাল নাগাদ কলকাতাতে

* 1902 সালে শ্রীঅরবিন্দ এঁকে বাংলাদেশে পাঠান বিপ্লবী-সংগঠনের পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে। কাহিনীর সুবিধার্থে এঁকে অভিহিত করছি জে এন ব্যানার্জি ব'লে। আর জ্যোতিকে বলছি যতীন্দ্রনাথ॥

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

গুপ্ত-সমিতি গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা হয় রাজনৈতিক ও রাজনীতি গন্ধী উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রসিদ্ধ জাপানী চিন্তাবিদ ওকাকুরা, সরলা ঘোষাল, প্রমথ মিত্র প্রভৃতি এবং ইতিপূর্বেই গুপ্ত-সমিতি গঠনের কাজ কুষ্টিয়ায় দানা বেঁধেছিল যতীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় : "...flourished particularly in Kushtia where Jatindra Nath Mukherjee was the leader."

১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে যাবার পথে স্বামী বিবেকানন্দ জাপানে যান : তখনই তাঁর দেখা হয় ওকাকুরার সঙ্গে। ওকাকুরার "Asia is one" আন্দোলন স্বামীজীর মনঃপূত হয়। উদ্ধত পশ্চিমী দেশ-গুলোর শ্রদ্ধা পেতে হলে সমস্ত এশিয়াকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে—ওকাকুরার এই আদর্শে মুগ্ধ হয়ে স্বামীজী তাঁকে ভারতে আসতে আমন্ত্রণ জানান। তার আটবছর পরে ওকাকুরা এ-দেশে আসেন, এবং নিবেদিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেশ ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর আন্তরিক বন্ধুত্ব হয়।

১৯০১ সালে ওকাকুরা সুরেন ঠাকুরকে বলেন, এ-দেশের কয়েকজন নেতা এবং শিল্পী ও সাহিত্যিকের সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। তখন সুরেন ঠাকুর, সরলা দেবী, শশীভূষণ রায়চৌধুরী প্রভৃতির চেষ্টায় কলকাতায় গুপ্ত সমিতি গঠনের সূচনা হয়। পরে এর সম্মিলিত রূপ পরিগ্রহ করে ৪৯ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের 'অনুশীলন'। যতীন্দ্রনাথও ছিলেন এই 'অনুশীলন'এর সঙ্গে জড়িত।

যতীন্দ্রনাথের প্রথম বিপ্লবী-শিষ্যদের অন্যতম ভবভূষণ মিত্র (স্বামী সত্যানন্দ) বলেন : "সুরেন ঠাকুরের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের বিশেষ যোগ ছিল। কুষ্টিয়ায় স্টেশন রোডের কাছে ঠাকুরদের একটি দোতলা ছবির মত বাড়ি ছিল। কুষ্টিয়ায় এসে সেই বাড়িতে উঠতেন সুরেন। কখনো সোজা নৌকা ক'রে শিলাইদহ যেতেন। যতীনের চরিত্রগুণেই সুরেন তাঁকে খুব বিশ্বাস করতেন ও ভালবাসতেন। সুরেন ছিলেন বিদ্বান : ঠাকুরবাড়ির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন। তাঁর কাছে যাঁরা যাতায়াত করতেন সকলেই ছিলেন উন্নতমনা, শারীরিক চর্চা আর নৈতিক উন্নয়নের আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। সুরেন তখন যুবক : যতীন্দ্রনাথের বাড়িতে 'সুন্দরী' নামে যে সাদা ঘোড়াটা ছিল, ...একাধিক দিন সুরেন সেই ঘোড়াটা নিয়ে শিলাইদহে যাতায়াত করতেন। আমরাও

পরে আমরা জানলাম যতীন্দ্রনাথের মত, সুরেনও দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। দেশ বলতে আমরা তখন বুঝতাম সারা ভারত, rather এশিয়া। লাঠিখেলা (লকড়ি), ঘোড়ায় চড়া, নৌকা চালানো—এ-সবে আমাদের সঙ্গী ছিলেন সুরেন। তিনি তখন আমাদের ইতিহাসও পড়াতেন। পরে সার্কুলার রোডেও তিনি যতীন বন্দ্যোর আড্ডায় ইতিহাস পড়িয়েছেন।…"

ওকাকুরার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয়ের প্রথম যোগসূত্র ছিলেন এ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওকাকুরার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় যোগসূত্র ছিলেন নিবেদিতা। ভবভূষণবাবুর ভাষায়, "দমদমের বাড়িতেও* রাজনৈতিক কাজে যতীন্দ্রনাথকে নিবেদিতার কাছে যাতায়াত করতে দেখেছি—বাঘ মারবার আগে এবং পরে।…"

সরলা দেবীর† সঙ্গেও যতীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয়ের কথা জানা যায়। ভবভূষণবাবু বলছেন, 'সরলা দেবীর সঙ্গে চণ্ডীর (মজুমদার) ও আমার খুব মেলামেশা ছিল। যতীন্দ্রনাথকে বাঘে কামড়ানোর খবরে সরলা দেবী কেঁদে ফেলেন : টেলিগ্রাম ক'রে যতীন্দ্রনাথের খবর নিতে থাকেন।'

'প্রমথ মিত্রের সঙ্গেও যোগ ছিল যতীন্দ্রনাথের', ভবভূষণবাবু বলেছেন, 'বেশি আলোচনা হত শরীর-চর্চা প্রসঙ্গেই। Violent method-এ এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করা বিষয়ে এঁরা দু'জনেই ছিলেন সমমতাদর্শী। ধর্ম-আলোচনা এবং চরিত্র-গঠনের লক্ষ্যও এঁদের উভয়ের যোগসূত্র।'

এ-ছাড়া যতীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় আচার্য বিজয়কৃষ্ণের স্বনামধন্য এই পাঁচজন অনুরাগীর সঙ্গে—বলেছেন ভবভূষণবাবু : (১) বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, (২) কৃষ্ণকুমার মিত্র ('সঞ্জীবনী' সম্পাদক), (৩) প্রথম বোমা-প্রস্তুতকারীদের অন্যতম, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, (৪) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, (৫) প্রসিদ্ধ উকীল তারাকিশোর চৌধুরী (পরবর্তী জীবনে সন্তদাস বাবাজী) : এঁরা সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, ফিরিঙ্গীর দাসত্ব করবেন না, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখবেন না ইত্যাদি। তা ছাড়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও

* স্বনামধন্য আনন্দমোহন বসুর বাগানবাড়িতে॥

† কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলতেন ধীরাষ্টমি সংগঠনের কাজেই সরলা দেবীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়॥

যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল।** রামানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ একই সভায় বহুবার উপস্থিত ছিলেন—প্রথম দু'জন বিশেষ মনোযোগ দিয়ে যতীন্দ্রনাথের কথা শুনতেন এবং যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যেমন ছিলেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত।

১৯০৩ সালে যোগেন বিদ্যাভূষণের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের প্রথম এই সাক্ষাৎকারের পটভূমিকায় আর-একবার দেখে নিতে হবে বাংলাদেশের তদানীন্তন পরিস্থিতি।—

১৮৮০ সালে দেশপ্রেমের যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সাহিত্যে নূতন এক হাওয়া তুলেছিলেন, সেই একই সঙ্কল্পের আগুনে জ্বলে উঠতে দেখি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে: অসাধারণ প্রতিভার সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বক্তৃতায় ছড়িয়ে দিতে লাগলেন ম্যাৎজিনি, গারিবাল্‌দির শৌর্যের কাহিনী ১৮৮৪ সালের আগেই।

ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্রের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের প্রথম আলাপ হয় বিলেতে। সেই সুবাদে সুরেন্দ্রনাথই মিত্রসাহেবকে আইন পড়ানোর আহ্বান জানান রিপন কলেজে। এবং মিত্র সাহেবের তীব্র দেশপ্রেম সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে আরো প্রবল হয়ে উঠল।

ওদিকে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দেশপ্রেমিক শশিভূষণ রায়চৌধুরী আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতার জন্যে। শশিবাবুর বাড়ি ২৪-পরগনার তেঘরা গ্রামে। কিছুকালের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের সাহায্যে তিনি নিজ গ্রামে গ'ড়ে তুললেন পলিটেকনিক্ স্কুল। বলা বাহুল্য, দারুণ ইংরেজ-বিদ্বেষ সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষাটা শশিবাবু সুন্দর শিখেছিলেন। স্কুলে লেখাপড়া শেখানো ছাড়াও তালা তৈরি, তুঁতের চাষ প্রভৃতির ব্যবস্থা তিনি করেন। স্কুলের পেছনে শশিবাবুর ছিল আদর্শ শিক্ষক তৈরি করবার উদ্দেশ্য, যাতে করে দেশ ছেয়ে যায় দেশপ্রেমিক শিক্ষকে; জাতির কালনিদ্রা ধীরে ধীরে তাতেই ভাঙবে—তাঁর বিশ্বাস। দেশের অনেক জায়গায় তিনি ঘুরেছেন আদর্শবাদী বলিষ্ঠদেহী তরুণদের সন্ধানে। পরে তিনি মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়ে হাইস্কুল স্থাপন করেন; তাঁর শিষ্যরূপে সেখানে পান নিমধারী সিং

** রামানন্দবাবুর পুত্র শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ও এই কথা বলেন॥

প্রমুখ কয়েকজনকে। তেমনি কটকে গিয়ে শশিবাবু আলাপ করেন বিখ্যাত নেতা ও ন্যাশনাল ট্যানারি-র প্রবর্তক মধুসূদন দাসের সঙ্গে, আধুনিক উড়িষ্যার জনক গোপবন্ধু দাসের সঙ্গে; সেখানেও প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরা 'সত্যবাদী ওপন্ এয়ার স্কুল'। প্রথম জীবনে গোদাবরীশ মিশ্র, নীলকণ্ঠ দাস আরও অনেকে ছিলেন তাঁর প্রিয় সহকর্মী।

শশিবাবুর সঙ্গে সুরেন ব্যানার্জী আলাপ করিয়ে দিলেন প্রমথ মিত্রের। মিত্র-সাহেব শশিবাবুকে একদিন বললেন, "গায়ে জোরওলা কিছু ছেলের সঙ্গে পরিচয় করাতে পারিস?"—শশিবাবু, সুরেন্দ্রনাথ ও মিত্র-সাহেব ঘুরে ঘুরে ছেলে সংগ্রহে মাতলেন।

বাংলাদেশে ইতিমধ্যে তরুণদের মধ্যে জেগেছে শরীর-চর্চার ঝোঁক। শতাব্দীর একেবারে সূচনাতেই এবং তারও আগে দেখি সর্বত্র ছোট-বড় কুস্তির আখড়া।* কলকাতায় বিশেষ করে হেদুয়ার আশেপাশে গ'ড়ে উঠেছিল বহু আখড়া: জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ (পরে স্কটিশ চার্চ)-এ পুলিন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির আখড়া, গৌরবাবুর আখড়া, নারায়ণ বসাকের আখড়া, ক্ষেত্র গুহের আখড়া। ২৪-পরগনায় হরিনাভিতে ও চিংড়িপোতায় এই সময় হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy) প্রমুখ যে ক্লাব গ'ড়ে তোলেন, কয়েক বছর পরে এটি হয়ে ওঠে যতীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরক্ত শিষ্য ও সহকর্মীদের একটি মূল কেন্দ্র। নারকেলডাঙা ও অন্যান্য অনেক জায়গায়ই এ-রকম ক্লাব দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

মফস্বলে ১৯০০ সাল নাগাদ ঠাকুরবাড়ির সরলা দেবী সমিতি গঠনের সূচনা করেন; ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি' তার মধ্যে সর্বপ্রধান। বৌবাজারে 'আত্মোন্নতি সমিতি' প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল তাঁর প্রেরণা।

১৯০২ সাল নাগাদ মদন মিত্র লেনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন'-এর আদর্শে প্রিয়ব্রত সরকার, সতীশ বসু, পুলিন মুখোপাধ্যায়, নরেন ভট্টাচার্য (নিউ ইণ্ডিয়া ইনস্টিট্যুটের প্রধান শিক্ষক) প্রমুখ ছোট্ট একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নরেনবাবু এর নাম রাখেন 'অনুশীলন' সমিতি। কালক্রমে,

* তারই অন্যতম প্রধান একটি কেন্দ্র ছিল অম্বু গুহ ও ক্ষেত্র গুহের আখড়া, যেখানে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ যেতেন কুস্তি করতে এবং সম্ভবত তাঁর নির্দেশেই ওখানে গিয়ে যতীন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থাতেই যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেন॥

এঁদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল ৪৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়ি—যেখানে সে-সময় থাকতেন হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (M. N. Roy) প্রভৃতি; এঁরা অনতিবিলম্বেই এই সম্মিলিত 'অনুশীলন' সমিতিতে যোগদান করেন।

১৯০২ সালেই ওদিকে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ নিয়ে জে এন ব্যানার্জি বরোদা থেকে, শ্রীঅরবিন্দের পত্র সমেত এসে সাক্ষাৎ করেন সরলা দেবীর সঙ্গে। এবং সুকিয়া স্ট্রীটের কাছে সার্কুলার রোডে তিনি যে আখড়া স্থাপন করলেন, সেখানে বক্সিং, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার, লাঠিখেলা, সাইকেল চড়া প্রভৃতি বহু বিচিত্র শরীর-চর্চার উপাদানের সমাবেশ ঘটল। এখানে পাঠ-চক্রের ব্যবস্থাও হল—বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় তরুণদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্য।

'অনুশীলন' তখনো শুধুমাত্র শরীর-চর্চার দিকেই মনোনিবেশ করে আছে। হরি চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy) প্রমুখ তরুণদের মনে তখন জেগেছে জিজ্ঞাসা "লাঠি খেলে কী হবে? দেশ স্বাধীন হবে কি?"...

জবাবে মিত্র-সাহেব, সতীশ বসু প্রভৃতি বলতেন, "দেশ যদি স্বাধীন করতে চাও, ওই আখড়ায় যাও—বরোদা থেকে লোক এসেছে।"

জে এন ব্যানার্জির প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্যে বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ পাঠালেন অনুজ বারীন ঘোষকে। বারীন উঠলেন সার্কুলার রোডে, তাঁর কর্মস্থল, জে এন ব্যানার্জির আখড়ায়। শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যানার্জি ও বারীন মিলে মন দিলেন সংগঠনে, এবং সরলা ঘোষাল, সুরেন ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির অপরাপর কয়েকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন, মিত্র-সাহেব, চিত্তরঞ্জন, বিজয় চাটুজ্যে প্রমুখ কয়েকজন ব্যারিস্টারের সঙ্গেও।

মিত্র-সাহেব প্রথমে এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন; কিন্তু ব্যানার্জির—অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দেরই—উগ্র বামপন্থী মতবাদ বেশি-বেশিদিন সহ্য করতে অক্ষম হলেন। ফলে ৪৯ নম্বরের আখড়ার সঙ্গে সার্কুলার রোডের আখড়ার সম্পূর্ণ ঐক্য সাধিত হওয়া তো দূরে থাক, খানিক ব্যবধানই দেখা দিল।

অথচ, সমিতি গঠনের সূচনা থেকেই দুটি মাত্র নেতার কথা পাই, যাঁরা দল-নিরপেক্ষ হয়ে উদার অবাধ মন নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন এক আখড়া থেকে অপর আখড়ায়, এক সংগঠন থেকে অন্য সংগঠনে—অকপট স্নেহ নিয়ে তরুণদের সঙ্গে মিশেছেন, মনমত আদর্শবাদী বলিষ্ঠকায় ছেলে চোখে পড়লে

তাকে আপন করে নিয়েছেন, অথচ নিজের দলে টানতে চেষ্টা করেন নি।

এঁদের একজন হলেন শশিভূষণ। অন্যজন—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বীডন স্ট্রীট অঞ্চলে শশিভূষণ ও যতীন্দ্রনাথ উপযুক্ত কর্মীর সন্ধানে আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পরস্পরকে আবিষ্কার করলেন ১৯০৩ সালের গোড়াতে। এই এঁদের সখ্যের শুরু।

এই পশ্চাৎপটে শ্রীঅরবিন্দ বাংলা দেশে এলেন ১৯০৩ সালে। উঠলেন যোগেন বিদ্যাভূষণের বাড়িতে।

পরপর কয়েকটি বৈঠক এই সময় শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করে বসে বিদ্যাভূষণ মশাইয়ের বাড়িতে, জে এন ব্যানার্জির আখড়ায়, খেলাৎচন্দ্র ইনস্টিট্যুট প্রভৃতি কেন্দ্রে। শ্রীঅরবিন্দ, জে এন ব্যানার্জি, যতীন্দ্রনাথ, সুরেন ঠাকুর, আশু চৌধুরী, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি অনেকেই মিলিত হন।

এই আলোচনাসূত্রে যতীন্দ্রনাথ বিশেষ ঝোঁক দিলেন অস্ত্র, অর্থ, লোক-সংগ্রহ প্রভৃতির ওপর এবং গীতা, ম্যাৎজিনি, গারিবাল্‌দি প্রভৃতি পড়ানোর ওপরেও।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে যতীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ সহকারে শুনলেন তাঁর ত্রিধারা বিপ্লব পরিকল্পনা।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, প্রস্তুতির প্রথম পর্যায় হবে: ভারতের যুবকগণকে ক্ষাত্রশক্তিতে দীক্ষিত করা। গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করে বিদ্রোহমূলক আদর্শ প্রচার করা। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে সম্যক প্রস্তুত হয়ে ওঠা।

বাংলাদেশের নেতারা এ পথে আংশিক অগ্রসর হয়েছিলেন ইতিপূর্বেই। কিন্তু অন্তরায় হলেন মিত্র-সাহেব: জে এন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের কাছে নালিশ জানালেন যে, ব্যানার্জি উগ্র হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রচার শুরু করেছেন।

এইখানেই মিত্র-সাহেবের সঙ্গে মতান্তরের সূত্রপাত হলেও, তিনি তখনো দলে রইলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থনে অগ্রসর হলেন জে এন ব্যানার্জি, বারীন ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ। যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাও তো ছিল জাতিকে বীর্যবান করে তোলা, বিদ্রোহের পথে বিপ্লব আনা, গেরিলা যুদ্ধের সাহায্যে দেশবাসীকে মরতে শেখানো—জাতি জেগে উঠতে পারে যাতে করে।

শ্রীঅরবিন্দের দ্বিতীয় পন্থা হল: ভারতবাসীকে সম্যক বুঝিয়ে দিতে হবে স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজনীয়তা! স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে প্রতিটি

দেশবাসীকে করে তুলতে হবে সচেতন। তার জন্যে চাই প্রকাশ্য প্রচার খবরের কাগজে লিখে, বক্তৃতা দিয়ে।

কারণ জনসাধারণের সহায়তা ও সহানুভূতি ব্যতীত কোনমতেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান সফল হয়ে উঠতে পারবে না।

১৮৯৩ সালেই শ্রীঅরবিন্দ তো এ-কাজ শুরু করেন স্বয়ং। বিলেত থেকে ফিরেই বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে তিনি জানাতে চাইলেন কংগ্রেসের তখনকার নীতি কত দূর অসার অক্ষম। উচ্চ-মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে শ্রীঅরবিন্দ পরিণত করতে চাইলেন সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানে, জাতীয় প্রতিষ্ঠানে। 'প্রলেটারিয়াট' শব্দটা প্রথম এদেশে তিনিই ব্যবহার করেন ঐ যুগে।

বিপ্লবের পথে যে স্বাধীনতা আসবে এ-বিশ্বাস তাঁর বদ্ধমূল ছিল। বরোদায় থাকাকালীন তিনি পরিচিত হন পুণার ঠাকুর-সাহেবের গুপ্ত-সমিতির সঙ্গে। লোকচক্ষুর অন্তরালে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যপন্থী নীতির অচলায়তন টলিয়ে দিয়ে বামপন্থী আদর্শের পথে তাঁদের পরিচালিত করতে লাগলেন; তিলক, লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির কণ্ঠে ক্রমান্বয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল শ্রীঅরবিন্দের নীতিরই প্রতিধ্বনি।

কলকাতায় এসে শ্রীঅরবিন্দের পথ উত্তরোত্তর সুগম হয়ে উঠল। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সন্ধ্যা, যুগান্তর, নবশক্তি, বন্দেমাতরম, ধর্ম, কর্মযোগীন—কত কাগজই তো মুখর হয়ে উঠল তাঁর প্রত্যক্ষ প্রেরণা বহন করে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র, ভূপেন দত্ত, হেমেন্দ্র-প্রসাদ, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি কত শক্তিধর লেখকের সহযোগিতায় মূর্ত হয়ে উঠল শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দর্শন!

এ-যুগেও মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বারীন্দ্র-কুমার ঘোষ রইলেন শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম প্রধান সহযোগীদের মধ্যে।

শ্রীঅরবিন্দের তৃতীয় পরিকল্পনা হল: প্রকাশ্যে জন-সঙ্ঘ গড়ে তুলতে হবে। এইসব সঙ্ঘ নির্ভয়েই সরকারের বিরোধিতা করে চলবে অসহ-যোগের সাহায্যে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দিয়ে, বয়কট-প্রথায়। এভাবেই ধীরে ধীরে শিথিল হবে বৃটিশের শাসনভিত্তি।

সর্বোপরি শ্রীঅরবিন্দ জানালেন—ইংরেজের শাসনতন্ত্রের চৌহদ্দির ভেতরেই state within state হিসেবে গড়ে তুলতে হবে ভারতের জাতীয়

রাষ্ট্র। সেই জাতীয়-রাষ্ট্রই জনসাধারণের সহানুভূতি উত্তরোত্তর জাগিয়ে তুলে প্রবলতর করে তুলবে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে অসহযোগ।

আর, তখনই অন্যান্য দেশ, অপরাপর জাতি এগিয়ে আসবে—ভারতের এই মুক্তি-প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে। সমগ্র দেশে, আসমুদ্র হিমাচলে, জাগবে বিদ্রোহ। প্রথমত বর্জন করতে হবে বৃটিশ পণ্য, দেশের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে।

দ্বিতীয়ত, বিদেশীদের কেরানী-গড়া বিদ্যালয় ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে।

তৃতীয়ত, জাতীয় আদালত স্থাপন করে আইনকানুন, বিচার-ব্যবস্থা তুলে নিতে হবে নিজেদের হাতে।

চতুর্থত, স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তুলে কালক্রমে তাকে পরিণত করতে হবে জাতীয় সৈন্যবাহিনীতে। এরাই হবে জাতীয় অভ্যুত্থানের সহায়।

দীর্ঘ চোদ্দ বছরের ইংল্যাণ্ড-প্রবাস কালে শ্রীঅরবিন্দ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছেন বৃটিশ চরিত্রের সঙ্গে। জগতের বিভিন্ন বিপ্লবের নজির দেখিয়ে তিনি বললেন—ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করবার প্রশস্ত মুহূর্ত সমাসন্ন।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে এই উদ্দেশ্যেই যতীন্দ্রনাথ প্রেরণা জুগিয়ে দলে টেনেছিলেন। তাতেও শ্রীঅরবিন্দের ছিল পূর্ণ উৎসাহ ও সমর্থন।

১৯০৩ সাল থেকে যতীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন শ্রীঅরবিন্দের অপরিহার্য বন্ধু, শ্রদ্ধেয় সহকর্মী, একমাত্র নেতা—যাঁর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলতে পেরেছেন: 'He was my right-hand man!'

বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ যে-বিপ্লবের কর্মসূচী খাড়া করলেন শতাব্দীর সূচনায়, তারই প্রথম সার্থক বাস্তব প্রকাশ সম্ভব করলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১৯১৫ সালে!

বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতির কেন্দ্রীয়বিভাগের যেসব শীর্ষ বৈঠক বসেছে বাংলা দেশে, শ্রীঅরবিন্দ এবং যতীন্দ্রনাথ দুজনেই তাতে উপস্থিত থেকেছেন।

॥ দুই ॥

১৯০৩ সাল। দার্জিলিং। গরমকাল।...

রোববারের হাটের থেকে ভিক্টোরিয়া হসপিটালে যাবার রাস্তা উঠে গিয়েছে এক ধারে ; বাঁ দিকে নেমে গিয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবার পথ ; আর-একটা পথ সোজা চলে গিয়েছে কাছারি অভিমুখে।...

প্রথম রাস্তাটার ডানদিকে একটা গাছ—যতীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে বলেন উইপিং উইলো—তার পাশেই খুব লম্বা একটা দোতলা বাড়ি। নাম বোধহয় 'কাছারি হাউস'।...

দোতলায় একটা করিডোর। তার দু' ধারে কয়েকটা ঘর। পশ্চিম দিকে, হাসপাতালে যাবার রাস্তার ওপরেই যে-ঘর তার দরজায় টোকা পড়ে।

দরজা খুলে যতীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসে দেখেন—কুমার দাঁড়িয়ে। কুমার-নাথ বাগচি। ভবিষ্যতের কৃতী চিকিৎসক ও রায়বাহাদুর।

কুমারদের বাড়ি চুয়াডাঙার কাছে সুমিদ্ধিয়া গ্রামে। যতীন্দ্রনাথের বড়মামা বসন্তকুমার চুয়াডাঙায় যখন হেডমাস্টার ছিলেন, তখন কুমারের বাবা কালিপদবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় বসন্তবাবুর।

ফলে পূজোর সময় প্রতি বছরেই ছুটিতে কয়া যাবার সময় বসন্তবাবু কালিপদবাবুকে সপরিবারে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে তাঁদের বাড়ির দুর্গোৎসব দেখতে।

এইভাবে কুমারদের অনেক বয়স পর্যন্ত ধারণা ছিল শরৎশশী দেবী তাঁদের আপন পিসীমা, যতীন্দ্রনাথ আপন বড়দা, বসন্তবাবু আপন কাকা, বিনোদ-বালা আপন বড়দিদি।

কুমারের দিদি কমলকুমারী ছিলেন ভাল ফটোগ্রাফার ; বিনোদবালার বন্ধু। যতীন্দ্রনাথের অনেক ছবি তিনি তুলেছিলেন সে যুগে।

ম্যালেরিয়া আক্রান্ত কুমারকে গরমের ছুটিতে দার্জিলিঙে তাঁর কাছেই চলে আসতে বলেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। গভর্নমেন্ট হোস্টেলের বড় একটা ঘরে তাঁরা তিনজন থাকতেন : জনৈক মহেন্দ্রবাবু, শরৎবাবু, আর যতীন্দ্রনাথ।

কুমারকে স্বাগত জানিয়ে, প্রাণখোলা হাসির সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন যতীন্দ্রনাথ।...

ঘরের অন্য দুজনকে তখুনি যতীন্দ্রনাথ বলে দিলেন, কুমার মাসখানেক তাঁর কাছে থাকবে।

নিজের খাটের পাশে একটা চৌকি পেতে দিলেন কুমারের জন্যে। আর ঠাকুরকে ডেকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন: "ছাখ্, এই বাবুকে ভাল করে খাওয়াবি। বুঝলি?"

চুঁচুড়ার ধনী এক সোনার বেনের ছেলেও—ভাল ফটোগ্রাফার—প্রায়ই সে-সময় যতীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন।···

রাতে সকলকে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ খেতে বসেন: রোজ রাতেই লুচির ব্যবস্থা। কুমার প্রথম প্রথম পাঁচ-ছ' খানার বেশি লুচি খেতে পারেন না। যতীন্দ্রনাথ খান চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশখানা। আর ঠাকুরকে ইশারায় বলেন, গল্পে-গল্পে কুমারের পাতে লুচি দিয়ে যেতে।

ফলে, কিছুদিন বাদে কুমারের স্বাস্থ্য এত সুন্দর হয়ে উঠল যে, কুড়ি-বাইশখানা লুচি তিনি নিজের অগোচরে খেয়ে ফেলেন। দার্জিলিং ছেড়ে আসার দিন ঠাকুরকে যতীন্দ্রনাথ জিগ্যেস করেন, "কি ঠাকুর, কুমার ক'খানা খাচ্ছে এখন?"

জবাব শুনে তো কুমার অবাক: "তাই তো!"

একদিন কুমার যতীন্দ্রনাথকে বললেন: "বড়দা, টাইগার হিল্-এ সূর্যোদয় দেখতে যেতে চাই।"

"কষ্ট করতে পারবি?" যতীন্দ্রনাথ হেসে বলেন, "ভোরবেলা উঠে তিনটে নাগাদ হাঁটতে হাঁটতে চলে যা সোজা!"

কুমার আপত্তি জানান, "না, সে-ভাবে নয়। যাব, গিয়ে বাংলোয় উঠব। সারাদিন থেকে ভাল করে সব দেখে আসতে চাই।"

"সে তো অনেক খরচ রে!"

বলে, একদিন কিন্তু যতীন্দ্রনাথ কুমারকে সূর্যোদয় দেখানোর বন্দোবস্ত করে ফেললেন।

"শোন্, কুমার, তোর জন্যে একটা গাধা ঠিক করে এলাম", ডেকে যতীন্দ্রনাথ বললেন, "ঘোড়ায় তো তুই চড়তে পারবিনে, তাই এমন একটা ঘোড়া দেখে রেখেছি যা' গাধারই সামিল।"

ঘোড়ায় চেপে কুমারকে নিয়ে গেলেন যতীন্দ্রনাথ শিন্‌চল্-এ।

"ভোরবেলা। আকাশ সবে লাল হব হব। এমন সময় একটা মেঘ এসে সব ঢেকে দিল;" কুমারবাবু বলেছেন, "আধ ঘণ্টা বাদে মেঘ যখন সরে

গেল, তখন রোদ উঠে গিয়েছে। বড়দা বললেন: তোর কপালে নেই, আমি কি করব, বল্ ?

"সেদিন আর দেখা হল না সূর্যোদয়।—"

তারপরেও, যতীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে উপ্‌রো-উপ্‌রি কয়েক বছর গরমের ছুটিতে দার্জিলিঙে কাটিয়েছেন কুমার।

কুমারবাবুর কাছে জানা যায় যে কয়ায় এলেই যতীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলায় বার হতেন; বাড়ির পিছন দিক দিয়ে ফেরিফেন্টের রাস্তা দিয়ে চলে যেতেন গোষ্টের চরে—অন্ধকারে রিভলভার চালানো অভ্যাস করতেন। বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে কুমারও যেতেন দেখতে। সাধারণত আর কারো হাতে রিভলভার দিতেন না যতীন্দ্রনাথ। আব্দার ধরলে মাঝে মাঝে এক-আধজনকে দিতেন।

একদিন কুমারের বিশেষ পীড়াপীড়িতে তার হাতেও রিভলবার দিলেন। কিন্তু, গুলী ছোঁড়বার সময় ভয়ে কুমার চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

"যাঃ, মিছিমিছি আমার একটা কার্তুজ নষ্ট করলি তো?" হেসে যতীন্দ্রনাথ বললেন।

কুমার আভাসে জানতেন যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী কর্মধারার কথা। একদিন যতীন্দ্রনাথ 'কাজে' যাচ্ছেন; কুমার ধরে বসলেন, "বড়দা, আমিও যাব।"

"না, না, কুমার!" সস্নেহে আপত্তি জানালেন যতীন্দ্রনাথ, "তুই মামার একমাত্র ছেলে। তোকে আমি আসতে দেব না। যে-কাজে আমরা যাচ্ছি, সে-কাজে অনেক বিপদ-আপদ।"

"ঠিক এইজন্যেই তিনি তাঁর বড়মামার ছেলে ফণীকেও দলে নিতেন না— বাপ-মায়ের মানসিক অবস্থা বুঝতেন বলে।" কুমারবাবু বলছেন, "যদিও ফণী খুব কুস্তি-টুস্তি করে দশাসই হয়ে উঠেছিল।"

কুমার তখন ফোর্থ ক্লাসে পড়েন।

১৮৯৯ সাল বোধহয়।

বিজয়ার পরদিন। একাদশীর সকালবেলা। কয়ার বাড়িতে—বিসর্জনের শূন্যতা আর অবসাদ তখনো কাটে নি। বাড়ির তরুণ, কিশোর, যুবক— সকলে বসে নানা রকম আলাপ-আলোচনা হচ্ছে।

যতীন্দ্রনাথ হঠাৎ প্রস্তাব করলেন: একটা ভালরকম সাহিত্য-পত্রিকা

প্রকাশ করতে হবে।

"ওই করতে হবে করতে হবে অবধি হবে শেষ পর্যন্ত", যতীন্দ্রনাথের দু-একজন মামা প্রতিবাদ করলেন, "কে করছেটা শুনি? লেখকই বা তেমন কই?"

আরো এমনি-ধারা দু-চারটে প্রতিবাদ উঠল।

নীরবে যতীন্দ্রনাথ তা' শুনলেন। মুখে চাপা একটা হাসি। যাঁরা যতীন্দ্রনাথকে জানেন, তাঁদের বুঝতে দেরি হল না—যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং চ্যালেঞ্জটা নিয়েছেন। ফল কি দাঁড়ায়, দেখতে সকলেই উৎসুক।

"সেদিনই সকালে ঘণ্টা-দুই বসে বসে বড়দা কী যেন লিখলেন;" কুমারবাবু বলেছেন, "দ্বাদশীর সকালে আবার যখন সকলে মিলিত হয়েছেন, নয়-দশ পৃষ্ঠা ফুলস্ক্যাপের একটি পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প বড়দা পড়ে শোনালেন।

"সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে উপভোগ করলেন গল্পের Plot, বাঁধুনি, আবেদন।

"গল্পের নায়িকার নাম মনে নেই। বড়দা তাঁর নায়কের নাম রেখে-ছিলেন সুবোধগোপাল। তাঁর মামারা তাই নিয়ে অনেক দিন ঠাট্টা করতেন তাঁকে—হ্যাঁরে, আর নাম পেলিনে খুঁজে, সুবোধগোপাল দিলি?...

"কাগজ বের করা সাব্যস্ত হয়ে গেল। কাগজের নাম হল 'গ্রহতারা'। প্রতি সপ্তাহে বুধবার করে বার হত। বেশ কয়েকটি সংখ্যা বেরিয়েছিল।

"প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় ছোটমামা ললিতকুমার কাগজের উদ্দেশ্য প্রভৃতি ব্যক্ত করলেন; তিনি নিজে ভাল সাহিত্যিক ছিলেন। আর প্রথম সংখ্যার সর্বপ্রথম রচনাই ছিল যতীন্দ্রনাথের ছোটগল্পটি।

"অন্যান্য সংখ্যাতেও বড়দা নিয়মিত লেখা দিতেন: কবিতা পর্যন্ত লিখতেন। বড়দি (বিনোদবালা দেবী) হৃষীকেশদা, ছোটকাকা (ললিত-কুমার) প্রভৃতি আরো অনেকেই এই কাগজে লিখতেন নিয়মিত।

"কাগজের অনেকগুলো সংখ্যা আমার দিদি (কমলকুমারী) সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন—বড়দার লেখা বহু চিঠি, ফটো, রচনা প্রভৃতিও ছিল। সেগুলো সবই পুড়িয়ে ফেলতে হয় বালেশ্বর ঘটনার পরে। কারণ আমার সম্বন্ধী পুলিশে চাকরি করতেন; লম্বা সুপুরুষ ছিলেন তিনি; বড়দা তাঁকেও খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু তাঁর চাপে পড়েই সবকিছু পুড়িয়ে ফেলি।"...

কয়েক বছর পরের কথাও এইসূত্রে গেঁথে ফেলি।...

কুমারবাবুর বিয়ে হয় ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে (২২শে অগ্রহায়ণ)। যতীন্দ্রনাথের জন্মদিনের পরদিন।

বাংলার রাজনৈতিক আকাশে তখন প্রবল কালবৈশাখী রুখে উঠেছে। কর্ণধার যতীন্দ্রনাথের নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। স্বদেশী 'ডাকাতি' করে টাকা তুলতে হচ্ছে দলের জন্যে। অত্যাচারী শাসককুলের সর্বাধিক দুর্বিষহ মাথাগুলোকে অপসারিত করতে হচ্ছে বিপ্লবের স্বার্থে। ধৃত বিপ্লবীদের ছাড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে; আইনের মার-প্যাঁচ নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যারিস্টার জে এন রায়ের সঙ্গে।...

আর কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠছে ইংরেজের কুটিল শাসন-যন্ত্র।...

অথচ, স্নেহভাজন কুমারনাথের বিয়ে।

মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ অসি নামিয়ে মসী তুলে নিলেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

লিখে ফেললেন কুমারনাথের বিয়ের কবিতা। বিয়ের দিন কবিতাটা ছেপে নিজে হাতে দিয়ে গেলেন কুমারনাথকে।

"বড়দি (বিনোদবালা দেবী) নিজেও সুকবি ছিলেন। কিন্তু বড়দার লেখা কবিতাটা দেখে তিনি বলেন : জ্যোতির কবিতা এত চমৎকার হয়েছে যে আমারটার আর প্রয়োজনই নেই।—এবং তিনি সেটা ছিঁড়েই ফেলেন।"* —কুমারবাবু বলছেন।

যতীন্দ্রনাথের কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করি :

ওঁ

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

শ্রীমান কুমারনাথের বিবাহ উপলক্ষে

'বড়দা'র আশীষ।

কুমার !—

পিছে রাখি বহু দূর শৈশবের স্মৃতি
জীবনে অতীত নিশা আজি অবসান।

সব উষালোকে* আজি নব আশা লয়ে
সবীনার কর ধরি বিস্ময়ে পুলকে
নবীন উৎসাহে তুমি হলে উপনীত
জীবনের কর্মকেন্দ্র সংসার মাঝারে!
মরমের ভাষা আজি মুখে না জুয়ায়,—
কেমনে জানাব বল, হৃদয়ের গীতি?—
লহ মোর প্রাণভরা স্নেহ আশীর্বাদ,—
আর লহ পাতি শির তাঁর স্নেহাশীষ
নীরব ভাষায় যাহা—পীযূষ পুরিত—
ঝরিছে অম্বর হতে সদা শিবময়—
জাহ্নবীর পূতধারা সম নিরমল—
দম্পতি জীবন হক চির সুখময়।
কঠিন কর্তব্য ভরা কর্মক্ষেত্র মাঝে
নির্ভয়ে বিভুরে স্মরি' হও অগ্রসর!
কুশাঙ্কুর (ও) কভু তব বিঁধিবে না পায়!—
(আর) স্মরি জনম-দুঃখিনী দেবী জন্মভূমি তব,
দেশহিতে মন প্রাণ কর সমর্পণ,
যশের মন্দার মালা তুলে লও গলে,
সার্থক জীবন হ'ক, ধন্য হ'ক দেশ!—

যতীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় জীবনের যে-ক'টি বছর কুমার অতিবাহিত করেছেন, তাঁর আদর, তাঁর নীরব শাসন, তাঁর অতল ভালবাসার কত-না কাহিনী আজো কুমার সযত্নে লালন করছেন। সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করে, যতীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের আলোকে প্রোজ্জ্বল সেই জীবন-প্রভাতকে কুমারনাথ বলেন, "The happiest time in my life."

কুমারনাথের মতো আরো অনেকেই ছিলেন আমাদের দেশে, কেউ কেউ আজও রয়েছেন আমাদের মধ্যে—যতীন্দ্রনাথকে যাঁরা পেয়েছিলেন এমনি নিবিড় করে।

এঁদের অনেকেরই নৈতিক ও মানসিক গঠন, শারীরিক উন্নতি, এবং

* কুমারবাবুর স্ত্রীর নাম উষা দেবী॥

রাজনৈতিক ও দার্শনিক মননের পশ্চাতে ছিল যতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য-প্রসূত মহান এক প্রেরণা।

কুমারনাথের কাছে শুনেছি, যতীন্দ্রনাথ একদিন বাজার থেকে একটা ফরাসী শিক্ষার প্রথম ভাগ কিনে এনে উপহার দিলেন তাঁকে। বললেন, "বসে বসে অবসর সময়ে পড়িস এটা। কাজে দেবে।"

দেশের তরুণ ও যুবকদের উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ পাঠিয়ে সেই সঙ্গে সামরিক শিক্ষাতেও তাদের শিক্ষিত করে তোলা এবং বিদেশী বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে দেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে পুষ্ট করে তোলা ইতিমধ্যেই যতীন্দ্রনাথের কর্মসূচীর অন্তর্গত হয়েছে—তার প্রমাণ পাব আমরা যথাস্থানে। হয়তো কুমারনাথকে ফরাসী শিক্ষা দেবার কল্পনার পশ্চাতেও ছিল এমনি কোন সঙ্কল্প ?

॥ তিন ॥

১৯০৪ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস।...

কলকাতায় কর্মব্যস্ত যতীন্দ্রনাথ। দেশ থেকে চিঠি পেলেন, তাঁর প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদ।

দিদি লিখেছেন, "অবিলম্বে তুই একবার কুমোরখালি গিয়ে ইন্দুকে ও খোকনকে দেখে আয়।"...

দলের অনেক কাজ কুষ্টিয়ায়। ময়মনসিংহে বিপ্লবী নেতা হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য-চৌধুরী যতীন্দ্রনাথের বন্ধু। কুষ্টিয়ায় হেমেনবাবুর কুটুমবাড়ি। সেখানেই তাঁর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়। কুষ্টিয়ার চক্রবর্তী-বাড়িতে। এঁরা মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা,—শোনা যায় যতীন্দ্রনাথের প্রেরণা কম ছিল না এর পশ্চাতে।

হেমেনবাবুর সঙ্গে কুষ্টিয়ায় সাক্ষাৎও হবে, তারপর কুমোরখালি গিয়ে নবজাত পুত্রের মুখ দেখেও আসা যাবে। দিদিকে সেই কথা লিখে দিলেন যতীন্দ্রনাথ।

যতীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠালেন দিদি।

নির্দিষ্ট দিন।

জামাই আনতে কুমোরখালি স্টেশনে লোক গিয়েছে। সঙ্গে গিয়েছে গাড়ি। স্টেশন থেকে দেড় মাইল পথ। জামাইকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া

তো যায় না!

ট্রেন এল। যাত্রীরা নামল এক এক করে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। জামাইকে বহু খোঁজাখুঁজি ক'রেও পাওয়া গেল না। শ্বশুরবাড়ির লোক হতাশ হ'য়ে ফিরে এল।

বাড়ি ঢুকে সবে সে বলছে, "জামাইবাবু এ-ট্রেনে আসেন নি—" এমন সময় ভিতর থেকে ভেসে এল জামাইয়ের প্রাণখোলা অট্টহাসি।

কী ব্যাপার? হতভম্ভ হ'য়ে গেল লোকটি। জামাই দিব্যি হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেতে খেতে বাড়ির সবার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন!···

জামাইবাবু কি মন্ত্র জানেন? তন্ন তন্ন ক'রে সে সারা ট্রেন, গোটা প্ল্যাটফর্মখানা খুঁজে এল। আর জামাই কিনা আসর জমিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছেন?

তার অবস্থা দেখে বাড়ির অন্যেরাও হেসে বাঁচে না। যতীন্দ্রনাথও শিশুর মত সরল হাসিতে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

তারপর হেঁয়ালি পরিষ্কার হ'ল।

শোনা গেল, ট্রেনে আসতে আসতে জামাই দেখলেন—শ্বশুরবাড়ির কাছ দিয়েই তো গাড়ি চলছে! অতএব গুটি গুটি গাড়ির দরজা খুলে সেই চলতি ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন তিনি লাফ দিয়ে। তা নইলে আবার স্টেশন থেকে দেড় মাইল পথ আসতে হবে অনর্থক!

এ-ভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে বহুবারই যতীন্দ্রনাথ নেমে পড়তেন।

দিদি বিনোদবালা লিখেছেন, "জ্যোতির জীবনের প্রত্যেক কার্যই অসীম শক্তি ও বিপুল সাহসের পরিচায়ক। তিনি যখন কলিকাতায় থাকিতেন সে সময় তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি বাড়ীতে কয়াগ্রামে থাকিত। তিনি অনেক সময় অফিস করিয়া দার্জিলিং মেলেই বাড়ী চলিয়া আসিতেন, তখন কোন corresponding train না থাকায় পোড়াদহ হইতে গার্ডকে বলিয়া মাল-গাড়ীতে উঠিয়া পড়িতেন; মালগাড়ী কুষ্টিয়াতে থামে নাই, সুতরাং গোরাই ব্রিজের নিকট ঐ চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

"আবার কতদিন ঝড়-তুফানের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে নদীতে কোনও মাঝি নৌকা লইয়া যাইতে স্বীকার হয় নাই; তিনি একটি জেলের ডিঙি নৌকা লইয়া গোরাই নদী পার হইয়া কুষ্টিয়া গিয়া ট্রেন ধরিয়াছেন। কখনও

কোনও ভয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। জীবনটি তাঁহার নিকট যেন তুচ্ছ খেলার সামগ্রী ছিল।…"

যতীন্দ্রনাথের অপর জীবন-চরিতকার শচীনন্দনবাবুর ভাষায়, "কলকাতার অভ্যস্ত মানুষেরা যেমন চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়ে, যতীন্দ্রনাথ ঠিক তেমনি এই ৪৫ মাইল বেগে ধাবিত চাটগাঁ মেল থেকে নেমে পড়লেন।"

অনেকদিন এমনও হয়েছে যে, চলন্ত মালগাড়ী থেকে এইভাবে নেমে সোজা গোরাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নিশুত রাতে একাকী মাইল-তিনেক পথ সাঁতরে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। কখনো-বা সঙ্গে রয়েছেন দু-একজন বিপ্লবী শিষ্য।*

সবাই তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন হয়তো। একমাত্র টের পেতেন দিদি।

আর টের পেতেন মাসীমা—জয়কালী দেবী। সন্ধ্যাবেলায় ঘরকন্নার কাজ সেরে রোজই তিনি বসেন পূজো করতে। পূজো সেরে উঠে খাবেন।

রাত কত হয়, হুঁশ থাকে না।

জ্যোতির পায়ের শব্দ তাঁর কানে পৌঁছয়। মা-মরা ছেলে। সাত-তাড়াতাড়ি পূজো ফেলে উঠে আসেন তিনি। জ্যোতিকে খাইয়ে-দাইয়ে শুতে পাঠিয়ে দেন। আবার গিয়ে ঢোকেন ঠাকুর-ঘরে।

তন্ময় হ'য়ে যান। ভুলে যান খিদে-তেষ্টা।

ধ্যান যখন ভাঙে—চেয়ে দেখেন, আকাশ ফরসা হ'য়ে এসেছে। আকাশ-বাতাস পাখির ঐকতানের মাধুর্যে ভ'রে উঠেছে।

শুরু হয় মাসীমার দিন।…

যোগেন বিদ্যাভূষণের আত্মীয় পাবনার অন্নদা কবিরাজমশাই ছিলেন উত্তরবঙ্গের প্রভাবশালী নেতা। বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে অন্নদাবাবুর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের আলাপ হয়। অন্নদাবাবুর মারফৎ যতীন্দ্রনাথ পরিচিত হন স্বনামধন্য বিপ্লবী নেতা, পাবনার মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর সঙ্গে। মুন্সেফ অবিনাশবাবু এবং অন্নদাবাবু প্রথম সাক্ষাতের পরই যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হ'য়ে পড়েন।

যতীন্দ্রনাথের বড়মামা বসন্তকুমারের শ্বশুরবাড়ি ছিল পাবনার পোতা-

* তাঁদের মধ্যে ভবভূষণ মিত্র জীবিত ছিলেন এই গ্রন্থ রচনাকালে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন করেছেন উক্ত ঘটনাবলীর সত্যতা॥

জিয়ায়। বসন্তবাবুদের মামাবাড়িও পাবনায়, চাটমোহরে। সেইসূত্রে পাবনার বহু কেন্দ্রের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। পাবনা ছাড়াও রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের বড় বড় নেতা, উকিল, জমিদার প্রভৃতির সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের আলাপ হ'ল অবিনাশ-বাবু এবং অন্নদাবাবুর উৎসাহে।

১৯০৫ সালে পুজোর ছুটির সময়ে কয়ার বাড়ি থেকে যতীন্দ্রনাথ সদলবলে নৌকো ক'রে যে পাবনা যান এবং পথে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ বিলিতি নুন, কাপড় ও অন্যান্য মাল বর্জনের বাণী হাটে, বাজারে, গ্রামে গ্রামে প্রচার করেন, তার উল্লেখ পাই যতীন্দ্রনাথের ছোটমামা ললিত-কুমারের রচনাবলীতে:

"১৩১২ সালের পূজার ছুটিতে আমরা আর একবার নৌকা করিয়া মামা-বাড়ী গিয়াছিলাম। এবারে এক সেজদা ছাড়া আমরা আর সব ভাই, মা, বৌরা, মেয়েরা, ভাগিনেয় জ্যোতি প্রভৃতি বাড়ীর ছেলেরা সকলে মিলিয়া এক বোটে প্রায় ৩০ জন একসঙ্গে সমারোহে চলিয়াছিলাম। বড়দাদা কবি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের 'পদ্মা' নামে বৃহৎ বোটখানি চাহিয়া লইয়া-ছিলেন।...মাঝিরা ছাড়া আমাদিগের লাঠিয়ালের সর্দার ফেরাজকে আমরা সঙ্গে লইয়াছিলাম। নদাদার দোনলা টোটা বন্দুকও সঙ্গে ছিল এবং সড়কি-লাঠিও কিছু সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল।...

"...সেবার স্বদেশী আন্দোলনের বৎসর। আমরা পাবনার বাজারে গিয়া সেখানে বিলাতি নুন, বিলাতি কাপড় বিক্রয় হইতেছে কিনা সন্ধান লওয়ার একটা-হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।...

"...অনেকদিন পর মামাবাড়ীতে গিয়া আমাদের খুব আনন্দে কাটিতে লাগিল। সেখানে তিনদিন মাত্র ছিলাম, তাহার মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের সভা, বক্তৃতাও করিতে ত্রুটি করি নাই।..."*

ফিরে যাই মুন্সেফ অবিনাশবাবু ও অন্নদাবাবুর প্রসঙ্গে। এঁদের মারফৎ যতীন্দ্রনাথ পরিচিত হন রংপুরের জনপ্রিয় নেতা ঈশান চক্রবর্তীর সঙ্গে। এই ঈশানবাবুর পুত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ—মশিডিতে বারীন ঘোষদের বোমা বিস্ফোরণের ফলে ইনি মারা যান। ঈশানবাবুর অপর পুত্র সুরেশ চক্রবর্তী পণ্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে

* পারিবারিক কথা: ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৯১০ সাল থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত অতিবাহিত করেন ; ইনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচকরূপে বাংলাদেশে বিখ্যাত হন। ঈশানবাবুরই হাতে-গড়া ছেলে প্রফুল্ল চাকী* শহীদ হ'ন ক্ষুদিরামের সঙ্গে মজঃফরপুরে। ঈশানবাবুর আড্ডায় এইসব তরুণ যতীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে দেদীপ্যমান হ'য়ে ওঠেন।

১৯০৪ সাল পর্যন্ত জে এন ব্যানার্জির সার্কুলার রোডের আখড়ায় বারীন ঘোষ, প্রমথ মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর, দেবব্রত বসু, অধ্যাপক নলিনী মিত্র, সতীশ বসু, যতীন্দ্রনাথ আত্মোন্নতির সভ্যেরা (ইন্দ্রনাথ নন্দী, রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর সেন, হরিশচন্দ্র শিকদার, প্রভাস দে প্রভৃতি), যতীন্দ্রনাথের তরুণ অনুগামী শ্রীশ সেন ও তাঁর বন্ধু সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেখা যেত।

যোগেন বিদ্যাভূষণের জ্যেষ্ঠপুত্র অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দলের সহকারী সভাপতি। তিনি ও তাঁর ভাই ছিলেন জে এন ব্যানার্জির অনুরাগী। কিন্তু জে এন ব্যানার্জির একাধিপত্য কারো কারো বিরক্তির কারণ হয়, বিশেষত বারীন ঘোষ, দেবব্রত বসু, প্রমথ মিত্রের। শ্রীঅরবিন্দ মাসে ১০০ টাকা ক'রে দলকে সাহায্য করতেন। দলাদলির ফলে জে এন ব্যানার্জি ও মিত্রসাহেবে প্রথম বিচ্ছেদ ঘটে ; জে এন ব্যানার্জি উঠে যান অন্য বাড়িতে।

দলকে টাকা দেওয়া শ্রীঅরবিন্দ তখন সাময়িকভাবে বন্ধ করলেও জে এন্ ব্যানার্জির ভরণপোষণের ভার তখনো নির্বাহ ক'রে চললেন।

এই সময়ে চীন বৈপ্লবিক দলের জনৈক বিশিষ্ট প্রতিনিধি এলেন কলকাতায়। ফলে, মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী** শ্রীঅরবিন্দকে বাংলাদেশে

* যতীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু ও অনুরাগী, বগুড়ার নেতা যতীন রায় বলেন—তিনিই প্রফুল্ল চাকীকে কলকাতা আনান॥

** ১৮৭৩ সালে পাবনায় এঁর জন্ম। সাবজজ মাধবচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র। বিপ্লবের কাজে ইনি বহু সহস্র টাকা দান করেন শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথের কর্মসূচীর জন্যে। "চক্রবর্তী মহাশয়কে বাদ দিয়া বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না," লিখেছেন স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ডাঃ ভুপেন দত্ত। "যখন দেশের লোক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিতে ভয় পাইত, তখন এই ধনাঢ্য ও উচ্চবংশের এবং উচ্চ রাজকর্ম পদে প্রতিষ্ঠিত যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেন।...শেষে নিঃস্ব ও কপর্দকশূন্য শোচনীয় জীবন যাপন করিয়া এই জগৎ হইতে অন্তর্ধান করেন।..."শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বলেন, তোমরা অবিনাশ চক্রবর্তীর সব টাকা লইয়া

আসতে অনুরোধ জানান। এই চৈনিকের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের এক কোটি ও চীনের এক কোটি টাকা নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করানো, সদ্ভাবের যোগাযোগ স্থাপন করা। ব্যাঙ্কের অজুহাতে বিপ্লবের সহায়তাই হ'বে প্রধান লক্ষ্য। তা কাজে অবশ্য বেশি দূর অগ্রসর হয় নি।

শ্রীঅরবিন্দ যখন বাংলায় এলেন, মিত্রসাহেবের প্রধান অভিযোগ হ'ল জে এন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে: উগ্র হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রচার করছেন তিনি।

ইতিমধ্যে বারীন ঘোষও পৃথক হয়েছেন জে এন ব্যানার্জির সঙ্গে। ফলে, নিরালম্বস্বামী নামে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে তেরাই-এর জঙ্গল দিয়ে ব্যানার্জি চ'লে যান তিব্বতে; সেখান থেকে গাড়োয়াল প্রভৃতি স্থান দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ১৯০৬ সালে আলমোড়া, মায়াবতী ইত্যাদি স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখান থেকে পাঞ্জাবে গেলেন ১৯০৭ খৃস্টাব্দে: শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী ভাবধারার বীজ সেখানে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন তিনি দেশপ্রেমিক পাঞ্জাবীদের মনে; সর্দার অজিত সিং, কিষেণ সিং (ভগৎ সিং-এর পিতা), লালা লাজপৎ রায়, হরদয়াল, শিয়ালকোটের উকিল লালা অমরদাস, বিশিষ্ট ধনী সম্বলদাস, ওবেদুল্লা সিন্ধি, আম্বালার ডাক্তার হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, পেশোয়ারের ডাক্তার চারু ঘোষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ হ'ন নিরালম্ব স্বামীর বৈপ্লবিক আদর্শে। পেশোয়ার থেকে তিনি সীমান্ত প্রদেশের গহনে যান, কিন্তু তিনদিন বাদে সেখান থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন। পাঞ্জাসাহেব, অ্যাবোটাবাদ প্রভৃতি ভ্রমণ শেষে উপস্থিত হন তারপরে কাশ্মীর।

১৯০৭ সালের আশ্বিন মাসে 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের দেহান্তর ঘটলে নিরালম্ব স্বামী কলকাতায় এসে 'সন্ধ্যা'র সম্পাদনা গ্রহণ

তাহাকে নিঃস্ব করিয়াছে।..."

ডাঃ দত্তের মতে, অবিনাশ চক্রবর্তী মশাই-ই প্রথম তাঁদের ম্যাস মুভমেন্ট-এর কথা বলেন। বলেন: মিত্রসাহেব চাইছেন দুর্বল বাঙালীকে ব্যায়ামাদি করিয়ে সবল ক'রে তুলতে। এত ক'রে কত আর লোক পাবেন তিনি? দেশের তৈরি মালকে কাজে লাগানো হ'ক না? দেশের কৃষকেরা সবল, তাদের মধ্যে কাজ করা দরকার। পাবনার কৃষকেরা একবার ১৮৮০ সালে জমিদারদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দেয়; পাঁচ বছরের মধ্যে তার ফলে সরকার বাধ্য হন প্রথম বেঙ্গল টেনান্সি বিল পাস করতে। "তাহাদের শরীর সবল; আমিই ৫০,০০০ লোক দিব পাবনা হইতে,"—অবিনাশচন্দ্র বলেন যতীন্দ্রনাথকে।

যতীন্দ্রনাথের ইনি বিশেষ হিতৈষী ও অনুরক্ত বন্ধু ছিলেন॥

করলেন এবং 'মরি নাই—আমি আসিয়াছি' নামে অত্যন্ত জোরালো এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আবার স্বামীজীর সঙ্গে কারো কারো মতান্তর হ'ল। স্বামীজী আস্তানা গাড়লেন 'অনুশীলন' অফিসের সামনেই, ২০২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, কবিরাজ অন্নদা রায়ের বাড়িতে ; অন্নদাবাবু তখন 'যুগান্তর' পত্রিকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং পরামর্শদাতা।

॥ চার ॥

বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কাল।

ইংরেজের বাঁধন উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে নিপীড়িত করছে দুর্বল জাতিকে। কথায় কথায় পান থেকে চুন খসতেই রাঙা হয়ে উঠছে স্বেচ্ছাচারীর চোখ। রাস্তায়-ঘাটে অষ্টপ্রহর ঘৃণায় লাঞ্ছনায় আঘাতে অত্যাচারে ভারতবাসীদের পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেবার চেষ্টা করছে শাসকেরা।

ইংরেজ এ-যুগের অর্ধশিক্ষিত জনগণের দৃষ্টিতে হয়ে উঠেছে রাক্ষস অসুর পিশাচের সামিল—অসুরের প্রতিনিধি। মূর্ত অবিচার। তাদের ক্লিন্ন স্পর্শে কলঙ্কিত করে তুলতে চাইছে তারা ভারতের দেব-দেবী, ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের নর-নারী, ভারতের অফুরন্ত ঐশ্বর্য !

বাংলার প্রাণে প্রথম জাতীয় চেতনা জাগাতে চেয়েছিলেন মহারাজা নন্দকুমার—ভারতবাসীর সমস্ত ক্ষমতা কীভাবে ইংরেজ অপহরণ করে নিচ্ছে সে-দিকে জাতির দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। চন্দননগরে গোপন বৈঠকে তিনি পুণার পেশোয়ার সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন, কীভাবে ভারতের সমস্ত শক্তিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায় !

হেস্টিংসের বাঙালী সেক্রেটারি নবকৃষ্ণ সে-কথা ফাঁস করে দেন।…ফলে, জালিয়াতির মিথ্যা অপবাদে ফাঁসী দেওয়া হল স্বদেশপ্রেমী মহারাজা নন্দকুমারকে।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা করলেন ভারতীয় নবজাগরণের জনক রাজা রামমোহন রায়। দিল্লীর বাদশাকে সামনে রেখে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন, শোনা যায়। কিন্তু ঐ যুগে জাতির বিশালতর জাগরণ-সাধনাই বোধহয় সে-প্রচেষ্টাকে বেশি দূর নিয়ে যেতে দেয় নি।

এ-শতকের প্রথম প্রচেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের। তিনি বলেছিলেন: "বিপ্লবোদ্দেশ্যে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তুত করিব। Hiram Maxim-এর সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি। কিন্তু ভারত গলিত হইয়াছে— India is in Purtrefacton: এই জন্যই আমি একদল কর্মী চাই, যাহারা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোকের শিক্ষাদান করিয়া এই দেশকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিতে পারিবে।"*

স্বামীজীর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তাঁর জীবদ্দশাতেই বিপ্লব তিনি দেখে যেতে পারবেন। দেশের চেতনা সেই পথেই চলছিল। এমন সময় অকালে তিনি দেহরক্ষা করলেন।

স্বামীজীর চিতাবহ্নিই বাঙালীর বিপ্লবী অন্তরকে সেদিন অলক্ষ্যে এমন নাড়া দিল যে তার বছর-তিনেকের মধ্যে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ভারতের বুকে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তো স্বামীজীর চিতাবহ্নির প্রেরণা নিয়েই ছুটেছিলেন নূতন সঙ্কল্পের পথে।

শ্রীঅরবিন্দ এলেন সেই আলোকেরই সুযোগ নিয়ে—তাঁর লোকোত্তর আলোক-দিশা নিয়ে।

এলেন জে এন ব্যানার্জি, যতীন্দ্রনাথ, বারীন ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। শোনালেন তাঁরা দেশবাসীকে নতুন ভরসার কথা, ফিরে দাঁড়াবার মন্ত্র—

(ওদের) আঁখি যতই রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে
(ওদের) বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে ॥

দেশবাসীকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শেখালেন যতীন্দ্রনাথ, বললেন: এ-ই এ-যুগের ধর্ম, এ-ধর্ম হচ্ছে, দুর্গতিনাশিনী জননী দুর্গারই প্রেরিত বিভূতিদের ধর্ম, মাতৃপ্রেমিক সন্তানদের মাতৃপূজার ধর্ম— অসুরবিনাশী অবতারের ধর্ম।

তাই—যেখানে যখন অন্যায় দেখেছেন, অত্যাচার দেখেছেন, নিঃসংকোচে যতীন্দ্রনাথ ছুটে গিয়েছেন মহাকালের সংহার-মূর্তি নিয়ে। সাদা-কালোর বাছ-বিচার করেন নি। কঠিন সঙ্কল্পে সংগ্রাম চালিয়েছেন ন্যায়ের

* ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' ॥

সত্যের শাশ্বতের পক্ষে দাঁড়িয়ে। অন্যায় মিথ্যা আসুরিকতার বিরুদ্ধে।

আর—সেইজন্যেই দেখি যতীন্দ্রনাথের জীবনে, অন্যায়কারী অত্যাচারী-দের এত ঘন-ঘন নাজেহাল হবার দৃশ্য। দেশবাসীর মোহপাশ ছিন্ন করে দিলে যতীন্দ্রনাথ, দিলেন তাকে বীরাচারী মার্গের সন্ধান, আর দিলেন আত্মপ্রত্যয়, মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার।

১৯০৫ সাল।…

ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের সঙ্কল্প ঘোষিত হল: বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হবে! প্রকাশিত হল ইংরেজের অনুশাসন: বাংলার একাংশ —ঢাকা, চট্টগ্রাম আর রাজসাহী, আসামের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে গঠিত হবে 'পূর্ববঙ্গ-আসাম' প্রদেশ। আর, খণ্ডিত বাংলার অপরাংশ—মুখ্যত প্রেসি-ডেন্সী আর বর্ধমান, পরিচিত হবে বাংলা দেশ বলে, যদিও বিহার আর উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

কেন এই দেশ-বিভাগ?

জবাব পাই—এরই কয়েক বছর পরে জার্মানীর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা লেখক, সেনানায়ক ব্যার্নহার্ডির একটি ঘোষণাতে:

"আসন্ন আর-একটি সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে ইংল্যাণ্ডকে, যে সঙ্কটে ইংল্যাণ্ডের প্রাণশক্তিসমূহ জখম হবার সম্ভাবনা আছে। সে-সঙ্কট হল: মিশর ও ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন;…বড় বড় উপনিবেশ-গুলিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা।…যত দূর সম্ভব ভারতবর্ষের সাত কোটি মুসলমান যোগ দেবে বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনে। জগৎ-সভার ইংল্যাণ্ড আজ যে-উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত—এদের এই মিলনে ইংল্যাণ্ড সে-আসনচ্যুত হবে বলেই অনুমান করি।"*

প্রাক্-বঙ্গভঙ্গ যুগেই ব্যার্নহার্ডির এই উক্তির সমর্থন পাই না কি? যার ফলে ইংরেজকে দেখা যায় ব্যাপক মুসলমান-তোষণের পসরা সাজিয়ে, তাদের ধর্মবিশ্বাসের অন্ধ মোহকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো ব্যবহার করছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্ররোচনায়, চেষ্টা করছে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়ে দিতে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ক্লিষ্ট, ব্যর্থ, উপহসিত করতে!

১৯০৫ সাল। ৭ই আগষ্ট!

* The Great War, edited by H. W. Wilson and I. A. Hammerton.

সরকারের এই ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ জানাল সারা বাংলা দেশ। অবিভক্ত বাংলা।

শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। বিদেশী রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রথম সঙ্কল্প জানিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ।

নেতারা সক্রিয় হলেন জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহানুভূতি জাগিয়ে তুলে, অসহযোগ বাড়িয়ে তুলে বিপ্লব আন্দোলনের সম্যক সূচনা করতে।

বর্জন করা হল বিদেশী পণ্য। বর্জন শুরু হল ইংরেজের চাকরি, ইংরেজের আদালত, ইংরেজের শিক্ষাপদ্ধতি, ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য। দেশী জিনিস-পত্রের প্রতি জনসাধারণের মমত্ববোধ জাগাতে চাইলেন নেতারা। চাইলেন দেশবাসীর দেহে-মনে রন্ধ্রে রন্ধ্রে শক্তির প্রতিষ্ঠা!

বিদেশী পণ্য বর্জন করলেই তো হল না। চাই তার গঠনমূলক পরিপূরক। শ্রীঅরবিন্দের অনুমোদনক্রমে, ১৯০৩ সালে, যতীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী বন্ধু ঢাকার নিখিলেশ্বর রায়মৌলিক, কার্তিক দত্ত, ইন্দ্রনাথ নন্দী, পবিত্র দত্ত—যতীন্দ্রনাথেরই দল-নিরপেক্ষ নীতি অনুযায়ী কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন 'ছাত্র-ভাণ্ডার' নামে একটি স্বদেশী পণ্যের দোকান।

সরকারি ফাইলে 'ছাত্র-ভাণ্ডার' প্রসঙ্গে লিখছে:

"Tne nature and activity of 'Chhatrabhandar' is peculiar and interesting. It came to existence as far back as 1903, as a students' co-operative store association, and it is conceded that in its origin it was a legitimate trading concern..."

১৯০৬ সাল নাগাদ দশজন ডিরেক্টারের অধীনে 'ছাত্র-ভাণ্ডার' লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হয়। যতীন্দ্রনাথ সরকারি চাকরিতে অধিষ্ঠিত—দলেরই স্বার্থে।* অতএব প্রকাশ্য রাজনীতি বা অন্য-কোনও আন্দোলনেই তাঁর থাকা সমীচীন ছিল না, এবং নিজেকে সামনে তুলে ধরা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধও ছিল। তাই মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী, অন্নদা কবিরাজ, প্রভাস দে প্রভৃতি দশজন ডিরেক্টারকে সামনে রেখে 'ছাত্র-ভাণ্ডার'কে করে তুললেন

* যতীন্দ্রনাথের উপার্জনের সব টাকাই প্রায় সংগঠনের পেছনে যেত। তা' ছাড়া সরকারী দপ্তরের গোপন সংবাদ-সমূহ তাঁর নখদর্পণে ছিল এবং তার সাহায্যে বিপ্লবীদের পূর্ব থেকে সাবধান করতে পারতেন তিনি॥

বিপ্লবের অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্র।

সরকারী কাগজে পত্রে বলছে, "Its prosperity and flourishing condition soon attracted large number of revolutionaries and became a useful instrument for forwarding their aims."

ব্যবসার দিক দিয়েও 'ছাত্র-ভাণ্ডার' জমজমাট হয়ে উঠল এবং গুপ্ত-সমিতির অর্থ সরবরাহ করা ছাড়াও সমিতির সভ্যদের গা-ঢাকা দেবার প্রশস্ত-তম একটি নিরাপদ আস্তানায় পরিণত হল। যার ফলে, ১৯০৫ সাল নাগাদ, 'ছাত্র-ভাণ্ডার'কে মুখ্যত দুটি পৃথক ধারায় পরিচালিত করতে হয়: এক, ব্যবসার দিকের পরিচালনা; দুই, বিপ্লবীদের মেসের দিক দিয়ে পরিচালনা।

ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানেও 'ছাত্র-ভাণ্ডার'-এর অনুরূপ অসংখ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

'যুগান্তর' পত্রিকাও এক সময় নিখিলেশ্বর মৌলিকের সুমতি প্রেস থেকে ছাপা হয় এবং নিখিলেশ্বর 'ছাত্র-ভাণ্ডার' থেকে যথেষ্ট অর্থ সরবরাহ করেন 'যুগান্তর' পরিচালনা-কালে।

'বর্তমান রণনীতি', 'মুক্তি কোন পথে' এবং 'জাতীয় সমস্যা' নামে নিষিদ্ধ তিনটি পুস্তকের বহু কপি 'ছাত্র-ভাণ্ডার' থেকে বিক্রী করা হয়।

কলেজ স্কোয়ারে, কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ির নিচে ('সঞ্জীবনী'—ভবনে) 'ছাত্র-ভাণ্ডার' মেস বিপ্লবী কর্মীদের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। এই শাখার পরি-চালক ছিলেন নিখিলেশ্বরের একান্ত অনুরাগী ইন্দ্রনাথ নন্দী। কলকাতার 'অনুশীলন' দলও এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতেন।

'ছাত্র-ভাণ্ডার'-এর মত আরো অনেক প্রতিষ্ঠানই যেমন, বিখ্যাত Bengal Store, ভারত ভাণ্ডার—যতীন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রেরণায় গ'ড়ে ওঠে এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এই কেন্দ্রগুলোই জাতির ধমনীতে নতুন শক্তি সঞ্জীবিত করতে সহায় হয়।

জাতীয় কলেজ স্থাপিত হল। তার অধ্যক্ষ, আচার্য হয়ে শ্রীঅরবিন্দ চলে এলেন বরোদা থেকে। বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার মেলে ধরলেন শ্রীঅরবিন্দ—আদর্শবাদী বাংলার যুবশক্তি দলে দলে এসে মিলিত হলেন সেই অতি-মানবের সান্নিধ্যে।

স্থাপিত হল কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস। আগেই বলেছি, স্বত্বাধিকারী মোহিনী চক্রবর্তীর আত্মীয় হচ্ছেন যতীন্দ্রনাথের বন্ধু, ময়মনসিংহের বিখ্যাত

নেতা হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরী। শোনা যায় যতীন্দ্রনাথই এঁদের অনুপ্রাণিত করেন স্বদেশী বস্ত্র বয়নের ব্রতে। এমনি আরো কিছু শিল্পকেন্দ্র ও কারখানার প্রতিষ্ঠা তিনি করান।

কিছুকালের মধ্যে, বহুদিনের ঘনিষ্ঠ ও স্নেহভাজন সহকর্মী পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে যতীন্দ্রনাথ বসান শেয়ালদা স্টেশনের সামনেই, 'আর্য-নিবাস' নামে একটি হোটেল খুলে। মফস্বলের বিপ্লবীরা, বিশেষত যশোর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এসে এখানেই উঠতেন। যতীন্দ্রনাথের most frequented কেন্দ্রগুলির অন্যতম তখন এই 'আর্যনিবাস'।

১৯০৮-৯ সালে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের ১০ম জাঠ রেজিমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন শিবপুরের নরেন চ্যাটার্জি। ছাত্র-ভাণ্ডারের ভোলাদা বলেও এঁকে অনেকে জানতেন। এই সৈন্যদের ইনি নিয়ে যেতেন শিবপুর গ্রুপের নেতা ননীগোপাল সেনগুপ্ত, ভুবন মুখার্জি প্রভৃতির কাছে। কিন্তু নদী পার হয়ে এভাবে আসা-যাওয়া করতে সৈন্যরা অসুবিধা বোধ করতেন।

নিখিলেশ্বর রায়মৌলিক থাকতেন ছাত্র-ভাণ্ডারে। যতীন্দ্রনাথকে আড়ালে রেখে তিনিই প্রায় সব কাজের নির্দেশ দিতেন। তাঁরই উপদেশে নরেন চ্যাটার্জি এর পর এই সৈন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন খিদিরপুর গ্রুপের সঙ্গে। ডাঃ শরৎ মিত্র তখন এই গ্রুপের নেতা। তাঁর দুই ভাই সতীশ ও সুরেশও বিশেষ উৎসাহী কর্মী।

এই জাঠ সৈন্যদলের একজন Drummer এক সময়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের কথা ফাঁস করে দেয়। ফলে, কয়েকজন সৈনিকের সামরিক আইনে সাজা হয়ে যায়। সৈনিকদলটিকে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই যোগাযোগ হাওড়া মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ হয়ে দাঁড়ায়।

নরেন চ্যাটার্জি পলাতক হন। পলাতকই থেকে যান। কিন্তু এই বিশেষ কাজে তাঁর উৎসাহ কমে নি। বেনারস, মুশৌরী, লাহোর, পেশোয়ার প্রভৃতি সেনানিবাসের দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হন। এবং তাঁদের কাছ থেকে পরিচয় সংগ্রহ করে ফোর্ট উইলিয়ামের দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে আবার যোগস্থাপন করেন।

যতীন্দ্রনাথের পরামর্শে, পরবর্তীকালে এই যোগসূত্রের অনেকগুলি রাস-

বিহারী বসুর হাতে তুলে দেন যতীন্দ্রনাথের পরবর্তী নেতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ।

হাওড়া মামলা থেকে মুক্তিলাভের পর অভিযুক্তদের অনেকে বিপ্লব-প্রচেষ্টার ক্ষেত্র ত্যাগ করেন। নরেন চ্যাটার্জিও সেইরকম সঙ্কল্প জানান। তখন যতীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে পাঁচুগোপাল ব্যানার্জির উপর সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগের ভার অর্পণ করেন নিখিলেশ্বর।

ডাঃ শরৎ মিত্ররাও তাঁদের কেন্দ্রের ভার ত্যাগ করাতে ঐ ভার পড়ে খিদিরপুরের আশুতোষ ঘোষ, দুর্গাচরণ বসু প্রভৃতির উপর। পাঁচুগোপাল-বাবুর যোগাযোগ তখন থেকে এঁদের সঙ্গে।

১৯১৫ সালে বিপ্লব আয়োজনের বিরুদ্ধে যখন বৃটিশ সরকারের ব্যাপক অভিযান চলে তখন ফোর্ট উইলিয়ামের কয়েকজন দেশীয় সৈনিকের সঙ্গে আশুবাবুদের আখড়ার অনেকে ধরা পড়েন। সৈনিকদের সামরিক আইনে সাজা হয়। আশুবাবু, দুর্গাচরণবাবু এবং আরও কেউ কেউ ১৮১৮ সালের ৩ আইনে বন্দী হন।

পাঁচুগোপালবাবুকে পুলিশ ধরতে পারে নি। ১৯২১-২২ সালে তিনি অমরেন্দ্রনাথ, যাদুগোপাল, অতুল ঘোষ, মন্মথ বিশ্বাস (বসন্ত বিশ্বাসের ভাই), সতীশ চক্রবর্তী, নলিনী কর প্রভৃতি অন্য বিপ্লব-নেতাদের সঙ্গে পলাতকজীবন থেকে বেরিয়ে আসেন।

কলকাতা। টাউন হল।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জনসভা বসেছে। মিছিলের পর মিছিল জুটল গিয়ে টাউন-হলে, জননায়ক সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিস্রাবী ভাষণ শোনবার জন্যে। হল উপচে ভিড় ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায়, ফুটপাথে, ময়দানে।...

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বাংলার তথা সারা ভারতের গণমন। দাসত্বের পথে আর নয়। বাঁচতে হবে মানুষের মত। মরতে যদি হয় মানুষেরই মত হ'ক সে মরণ।

আসমুদ্র হিমাচলে বয়ে গেল ভাবের সেই উন্মাদনা। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনিত হল মহামন্ত্র: 'বন্দেমাতরম্'! সর্বশক্তির উৎস-মুখ খুলে গেল: দুর্বলতা, আলস্য, শৈথিল্যের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ গরিমায় ভাস্বর হয়ে উঠল স্বদেশপ্রেমিক জনগণ।

রাখীবন্ধনের প্রবর্তন হল। শুরু হল শহরে গ্রামে ছোটবড় নানারকম উৎসব, নানা ধাঁচের স্বদেশী মেলা।

কলকাতার রাজপথে বার হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ: মিছিলের পুরোভাগে তিনি চলেছেন, কণ্ঠে তাঁর নতুন দেশাত্মবোধের গান, বয়ানে মাতৃপ্রেমের স্নিগ্ধ দীপ্তি!...

বৃটিশ সরকারের টনক নড়ল।

জাগরণের এই ব্যাপক তরঙ্গের বিক্ষুব্ধতায় লর্ড কার্জন বিচলিত হলেন। মহারাণীর রাজত্বে সূর্য ডোবে না। সেই বিরাট সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি ভারতবর্ষ। সেই ভারতের ভারপ্রাপ্ত শাসক লর্ড কার্জন আর স্থির থাকতে পারলেন না।

ইতিপূর্বে—১৯০৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে লর্ড কার্জন প্রাচ্যদেশীয়দের মিথ্যাবাদী অপবাদে দুষ্ট প্রতিপন্ন করেন।

ভগিনী নিবেদিতা বইপত্র ঘেঁটে কার্জন-প্রণীত "Problems of the East" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি সমেত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লিখলেন: মহামতি কার্জন কোরিয়া গিয়ে কেমন স্বাদু 'সত্যকথা' বলবার কাহিনী একবার স্বকলমে কবুল করেছেন!

দেশের বড় বড় নেতারা যখন সেই নিয়ে কার্জনের মুণ্ডপাতার্থে সভা-সমিতিতে নরম-গরম ভাষণ দিতে ব্যস্ত, কর্মবীর যতীন্দ্রনাথ নীরবে দু' দু'বার পাঠালেন তাঁর দুই বিশ্বস্ত শিষ্য চণ্ডী মজুমদার আর শ্রীশ দাসকে—লর্ড কার্জনের জীবননাশ করতে: একবার চট্টগ্রামে, আরেকবার সিমলাতে! দুইবারই ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়।

দেশবাসী যখন মৃদু অসন্তোষে মাথা চাড়া দিল, সে-অপমান নীরবে মুখ বুজে সইতে নারাজ হল ইংরেজ সরকার। এর প্রতিশোধ নেওয়া চাই। বাঙালীর সদ্যো-সচেতন স্বদেশপ্রেমকে আহত করবার মোক্ষম অস্ত্র প্রস্তুত হয়ে রইল।

১৬ই অক্টোবর। ১৯০৫ সাল।

বেদনাহত বাঙালী শুনল বহু বছর যাবৎ পরিকল্পিত বাংলাদেশের বিভাগের শোচনীয় ঘোষণা।...

বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রতিপালিত হল অরন্ধন। বাঙালীর ঘরে ঘরে মা-মেয়ে ভেঙে ফেললেন তাঁদের অত্যন্ত আদরের সামগ্রী: চীনের বাসন,

কাঁচের চুড়ি, বিলিতি কাপড়চোপড়। বিষবৎ পরিহার করলেন তাঁরা বিদেশী সবকিছু।

মারাঠী দেশপ্রেমিক, সখারাম গণেশ দেউস্কর বাংলা ভাষায় বিখ্যাত লেখক। তিলকের আদর্শে বাংলাদেশে দেউস্কর প্রবর্তন করলেন 'শিবাজী উৎসব'। দেশকে তিনি স্মরণ করাতে চাইলেন ভারতের গৌরবময় অতীত।

শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই, 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর পত্রিকায় প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করলেন :

"আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য, মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত-দ্রব্য পাইতে কোন বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য করিতে যদি আর্থিক বা অন্য-কোনও প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত থাকিব না, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকে এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ কার্যের সহায় হউন।"

'সঞ্জীবনী' অফিসে কৃষ্ণকুমারবাবুর কাছেও যতীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে যেতেন। যতীন্দ্রনাথের বন্ধু, শিষ্য, সহকর্মী ও অনুচরেরা এই প্রতিজ্ঞার সমর্থনে সদলবলে শোভাযাত্রা নিয়ে বার হলেন প্রকাশ্য রাজপথে।

উদাত্ত কণ্ঠে তাঁরা আহ্বান জানালেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীন-দুখিনী মা যে মোদের,
তার বেশি আর সাধ্য নাই!"

বিদেশী কাপড়, বিদেশী পণ্যের যজ্ঞ চলল। পাড়ায় পাড়ায়, জেলায় জেলায় জ্বলে উঠল এই হোমবহ্নি।

দোকানে দোকানে আনা হল দেশী মিলের মোটা কাপড়, মাদ্রাজী গেঞ্জী, হাতে-পাকানো বিড়ি, সৈন্ধব আর কর্কচ নুন। কাঁসা-পেতলের বাসন-কোসন তার সাবেকি গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হল চীনেমাটি আর কাঁচের সেটকে হটিয়ে দিয়ে!...

আর, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে, প্রতিটি পথচারীকে রাখী না-পরিয়ে, আলিঙ্গন না-করে, 'বন্দে-মাতরম্' সম্ভাষণ না-জানিয়ে এঁরা কাউকে রেহাই

দেবেন না।

বেনারস কংগ্রেস।

সভাপতি গোখলের নেতৃত্বে তুমুল প্রতিবাদ জানানো হল সরকারের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ জানানো হল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। সারা ভারত সমস্বরে দাবি করল :

বঙ্গভঙ্গ রদ করতেই হবে!

কয়াগ্রাম।...

আবার পুজো এসে গেল। ১৯০৫ সালের পুজো!...

যতীন্দ্রনাথ আর তাঁর সেজমামা দুর্গাপ্রসন্ন গিয়ে ধরলেন বড়মামা বসন্তকুমারকে, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ আরেক প্রস্থ জানাতে হবে। অভিনব পন্থায়!

ইতিপূর্বে গ্রামের মহিলারা চাটুজ্যেদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হয়েছিলেন, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সভা আহ্বান করেছিলেন।

ললিতকুমারের ভাষায়, "বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে আমাদের বাড়িখানিও কম আন্দোলিত হয় নাই। পূজার ছুটির মধ্যে আমরা বাহির বাটীর প্রাঙ্গণে বড় বড় স্বদেশী সভা করিয়াছি। রাখীবন্ধনের দিনে আমাদিগের চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের ও বাড়ির মেয়েরা মিলিত হইয়া যে মনের তেজ ও দেশপ্রীতি দেখাইয়াছে তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি। খুড়ো মহাশয়ের দৌহিত্রী আমাদের ভাগিনেয়ী কিরণ যে সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিল তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। কৃষ্ণনগর কি কলিকাতার কোন সভাতেও অমন প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা তখনও শুনি নাই।..."

অন্যত্র ললিতবাবু লিখেছেন, তাঁদের কয়াগ্রামের বাড়ি প্রসঙ্গে : "তাঁহাদের বাটীর প্রাঙ্গণে গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের তরুণদিগের বৃহৎ সম্মেলনে যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার তরুণ বন্ধুদিগের সাহায্যে যে কাজকর্ম হইয়াছে তাহা বলিবার বিষয়।...যতীন্দ্রনাথের বাসস্থান বলিয়া কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব ও অন্যান্য ইংরেজ পুলিশ কর্মচারিগণ একাধিক বার বাংলার বিপ্লব সংশ্রবে কয়া পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।"

যতীন্দ্রনাথের অভিনব প্রস্তাবে বড়মামা সম্মতি দিলেন।

মহাষ্টমীর দিন।

ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কায়স্থ, মুসলমান, হাড়ি, মুচি, ডোম—সকলের পাতা পড়ল একত্রে। বাংলাদেশে বোধ হয় এই সর্বপ্রথম!

সকলকেই একাসনে ব'সে জগন্মাতার প্রসাদ পেতে হবে এই পঙক্তি-ভোজের মহামিলন-ক্ষেত্রে!

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সমাজপতিরা। ক্ষিপ্ত হলেন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় দুষ্ট প্রাচীনপন্থীরা। অসহায় আপত্তিতে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল অবহেলিত অপমানিত 'ইতর' জাতির প্রজারা।

অথচ, সঙ্কল্পে অটল যতীন্দ্রনাথ। বড়দাদাবাবু যে তাবৃতার সামিল। তাঁর কথা ফেলে কার সাধ্য? পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অবশেষে আসন গ্রহণ করা স্থির হল। নীরবে বসলেন সবাই।

অনুন্নত শ্রেণীর ব'লে যাদের যুগে যুগে অপমান করা হয়েছে দুর্ভাগা এই দেশে, কৃতজ্ঞতায় তাদের বুক ভরে গেল, চোখ বাষ্পাকুল হল।

পরম আনন্দে যতীন্দ্রনাথ তাদের বুকে টেনে নিলেন—তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করে, দিলেন তাদের বঞ্চিত সেই অধিকার, মনুষ্যত্বের অধিকার।

যতীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে তাই তো শুনি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলি: "এই শক্তিশালী জীবন-প্রবাহ তাহার সমস্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ লইয়া কখনো লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই।—সমুদ্রের গভীরতল-সঞ্চারী বিরাটকায় তিমির মত, এই জীবন, জাতির গভীর গোপন অন্তরতল আলোড়িত বিক্ষোভিত করিয়াছে, কদাচিৎ দুই একটি আবর্ত একান্ত অসতর্কভাবে বাহিরের ত্রস্ত শান্তিকে ক্ষণকালের জন্য ক্ষুব্ধ করিয়াছে মাত্র। এরূপ গোপনচারী জীবনের কার্যাবলীর পারম্পর্য দেখাইয়া পুষ্টি, বিকাশ ও পরিণতির সম্যক পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব।"*

উক্ত গ্রন্থেই বলা হয়েছে, "পেশল বলিষ্ঠ দেহ যতীন্দ্রনাথের দুর্দমনীয় দুঃসাহসের ও বজ্রকঠোর চরিত্রের মধ্যে কোমলতাও ছিল অতুলনীয়। জীবনপ্রভাতেই† তিনি দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন,—ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনার মধ্য দিয়া দেশের প্রাণবস্তুটি তাঁহার নিকট অতি আশ্চর্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তিনি সংস্কারক ছিলেন না, কাজেই দেশকে তিনি খণ্ডিত

* 'বিপ্লবের বলি: যতীন্দ্রনাথ' (চন্দননগর থেকে ইংরেজ আমলে প্রকাশিত ও নিষিদ্ধ গ্রন্থ-রূপে চিহ্নিত)

† "যতীন্দ্রনাথ ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দ হইতেই বিপ্লববাদের আদর্শ পান।..." (বিপ্লবের বলি।)

বিভক্ত করিয়া দেখেন নাই। সমগ্রের প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়া সেবাধর্মের এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ তাঁহার শক্তিশালী জীবনকে এক অপূর্ব করুণায় মণ্ডিত করিয়াছিল। যুগপৎ দয়া ও পৌরুষের মিলিত বিগ্রহ যতীন্দ্রনাথের কঠোরতা ও প্রচণ্ডতা যেমন ভীষণ ইহার অফুরন্ত দয়ার স্রোতও তেমনি গঙ্গাজলের মত স্নিগ্ধ ও সুশীতল। শৌর্যে বীর্যে হিমালয়ের মত অটলোন্নত যতীন্দ্রনাথের চরিত্রের সহিত এই কোমলতা ও সহজ বিগলিত দয়া দেখিয়া মনে হইত, সত্যই রুদ্রের জটা হইতেই দয়া ও সেবার গঙ্গা ঝরিয়া পড়িয়াছিল।...”

॥ পাঁচ ॥

১৯০৫ সালের শেষ দিক।

প্রত্যক্ষ আন্দোলনের জোয়ারে টলমল করছে বৃটিশ শাসনতন্ত্র।

সেক্রেটারিয়েটের উর্ধ্বতন মহলে বেশকিছুদিন থেকে যতীন্দ্রনাথ শুনছিলেন চাপা গুঞ্জন: এই দুর্যোগে কাজে লাগাতে হবে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জনপ্রিয়তা, তাঁর প্রতি দেশবাসীর সরল আনুগত্য।

সেই অভিপ্রায়ে আনানো হচ্ছে মহারাণীর নাতি প্রিন্স অব ওয়েলসকে। কালক্রমে ইনিই হ'ন পঞ্চম জর্জ।

যুবরাজ আসছেন!...চারিদিকে ধূম প'ড়ে গেল। দলে দলে লোক আসতে শুরু করল মফস্বল থেকে কলকাতায়। রেল, স্টীমার, গোরুর গাড়ি বোঝাই জনতার মিছিল চলল মহানগর অভিমুখে। রাজদর্শনেচ্ছু জনতা।

রাজধানী কলকাতায় তিল ধারণের স্থান বুঝি নেই!

নেতাদের কারো কারো মনে সংশয় জাগল: এত প্রচার, এত প্রচেষ্টা, অভ্যুত্থানের জন্যে এত আন্দোলন—সবই কি তবে রাতারাতি ধামা চাপা প'ড়ে যাবে?

কিন্তু, অনতিবিলম্বে তাঁদের বুঝতে বাকি থাকে না।—এর পেছনে রাজভক্তি যত না আছে, তার চেয়ে অনেক পরিমাণ আছে অশিক্ষিত মনের অহেতুক কৌতূহল: যে-রাজার জাতটার এত দাপট, এত প্রতিপত্তি, তাদের রাজপুত্তুর—না-জানি কোন্ পয়গম্বর!

যুবরাজ কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন।

আলোয় আলোয়, তোরণে তোরণে, নাচে গানে বাজনায়—কলকাতার

ভোল পালটে গিয়েছে। পথে পথে যুবরাজের অভ্যস্ত কানে ধ্বনিত হচ্ছে,
'God save the Prince of Wales !'

গদগদ চিত্তে তিনি ভাবছেন : এমন রাজভক্ত দেশে কিনা রাষ্ট্রবিপ্লব সম্ভব ?

চিৎপুর আর হ্যারিসন রোডের মোড়।

একটা মাছি গলবার ঠাঁই মেলে না। ভিড় আর ভিড়। কাতারে কাতারে উৎসুক জনতা, বালক বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে দাঁড়িয়ে আছে যুবরাজের গমন-পথের দুধারে সাগ্রহ প্রতীক্ষায়।

ভিড়ের মধ্যে তরুণ বিপ্লবী কর্মীদের সংগঠন—জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী—ক্ষিপ্র তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। তাদের নিয়ন্ত্রিত করছেন যতীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য নেতারা। বিশেষত, ভিড়ের সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃত দুর্জনের অত্যাচার যাতে করে প্রবল না হয়ে ওঠে দুর্বলদের ওপর, সেদিকে যতীন্দ্রনাথ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।

জনতার সহর্ষ সম্ভাষণের সঙ্গে ভিড়ের চাপ বৃদ্ধি পায় : "এসেছেন ! ......God save—"

অর্থাৎ, প্রিন্স অব ওয়েলসের গাড়ি এসেছে।

সহসা যতীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল করুণ অপমানজনক এক দৃশ্য। ভিড়ের এক কোণে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ভেতরে কয়েকজন পর্দানসীন বাঙালী যুবতী ও বৃদ্ধা।

ভিড়ের চাপে প্রিন্স অব ওয়েলসকে ভালভাবে দেখবার অজুহাতে, বিশ্রী রসিকতার অভিপ্রায়ে চট্‌পট্‌ সেই ঘোড়ার গাড়ির ছাদে গিয়ে উঠল কয়েকটি ফিরিঙ্গী সাহেব—জনা পাঁচ-ছয়।

মজা দেখবার এবং মজা দেখাবার নেশায় মশগুল হয়ে গাড়ির ছাদের প্রান্তে তারা চেপে বসল। গাড়ির জানালার সামনে, মহিলাদের মুখের ওপর সারি সারি বুট-সমেত সাদা কয়েক-জোড়া পা নাচতে লাগল।

বিবর্ণ হয়ে গেল মহিলাদের মুখ।...

পা দোলাতে দোলাতে খিল খিল করে হাসতে থাকে সাহেব-নন্দনেরা।

গাড়ির পাশে কয়েকজন বাঙালী যুবক। বিব্রত বেদনাহত দৃষ্টি। বোঝা যায়, মহিলাদের অভিভাবক এঁরা। নিরুপায় হয়ে হজম করছেন রাজার জাতের সস্নেহ এই কৌতুক। রাজ-দর্শন মাথায় ওঠে।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকেই উপভোগ করছেন নতুন মজার এই দৃশ্য!

"কী স্পর্ধা!" যতীন্দ্রনাথ ব'লে উঠলেন। তাঁর তরুণ সঙ্গীদের বললেন, "দাঁড়া তো। আসছি এখুনি। এখন থেকে এক-পা কেউ নড়িসনে।"

উল্কার বেগে যতীন্দ্রনাথ উঠলেন গিয়ে ঘোড়ার গাড়িটার মাথায়। সাহেবেরা ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবন করতে পারবার আগেই—দুটি সাহেবের মাথা ধরে মোক্ষম ঠুকে দিলেন যতীন্দ্রনাথ।

তারপর ঠাস ঠাস ক'রে তাদের গালে কয়েকটা চড় লাগাতে না-লাগাতে তৎপরতার সঙ্গে বাকি চারজন আক্রমণ করল তাঁকে যুগপৎ। পেছন থেকে।

গুটি তিন সটান পদাঘাতেই তিনটি সাহেবনন্দন গাড়ির ছাদ থেকে ঠিকরে গিয়ে ভূলুণ্ঠিত হ'ল, একেবারে চিৎ হয়ে। চতুর্থ জনও চোখের পলকে শায়িত হ'ল গিয়ে প্রথম তিনটির পাশে।

ওপরের সাহেব-দুটির ঘোর তখনো কাটে নি। মোহাবিষ্টের মত টলছে তাদের মাথা।

ক্ষণতরে বুঝি যুবরাজের গাড়ি থেমে যায়—সাদা চামড়ার এই শোচনীয় সমাদর দেখে। খাস রাজধানীর বুকে এমন কাণ্ড?

ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত সকলে কানাকানি করতে লাগল অসমসাহসিক বাঙালী যুবকের কাণ্ড দেখে।

বেগতিক দেখে তিরস্করণী মন্ত্রের শরণাপন্ন হ'ল সাহেবেরা: ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিলিয়ে গেল তারা, হদিস করা গেল না।

সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এলেন মহিলাদের অভিভাবকেরা। অভিনন্দনে বিগলিত হবার পরিবর্তে যতীন্দ্রনাথ গর্জে উঠলেন বেপরোয়া ভৎ'সনায়, "মা-বোনকে লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করবার সামর্থ্যটুকু যাদের নেই, তারা কোন লজ্জায় মুখ দেখাতে আসে? ভবিষ্যতে আর কোনদিন মা-জননীদের অপমান করবার জন্যে এভাবে বের হবেন না দয়া করে!"

মুখ কাঁচুমাচু করে ভদ্রলোকেরা উঠলেন গিয়ে অপেক্ষমাণ গাড়িতে। তরুণ সঙ্গীদের নিয়ে যতীন্দ্রনাথ পা বাড়ালেন ভিন্ন পথে।...

১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাস।

যুবরাজ কলকাতায় যখন আসেন, রাজধানীতে অস্বাভাবিক ভিড় হয়। তারই ফলস্বরূপ ঘরে ঘরে শুরু হ'ল অসুখ-বিসুখের প্রকোপ।

তার মারাত্মক ছোঁয়াচ লাগল এসে যতীন্দ্রনাথের ঘরে।

প্রথম পুত্র টবু অসুস্থ হয়ে পড়ল। অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। ডাক্তার বললেন, কলেরা।

মাত্র কয়েক বছর আগেই, মজঃফরপুরে চাকরি করবার সময় মায়ের অসুখের খবর পেয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। গ্রামে এসে দেখেছিলেন: কলেরা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মা ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

সেই কলেরাই আজ আবার অভ্যাগত!

ভগবানের নাম স্মরণ করতে থাকেন যতীন্দ্রনাথ। একমনে স্মরণ করেন তিনি সর্বমঙ্গলময়কে। পরম স্নেহভরে বুকে তুলে নেন তিনি ছোট্ট টবুকে।

রাত কেটে যায় প্রহরের পর প্রহর।

টবুকে বুকে নিয়ে ঈষৎ-উচ্চস্বরে ভগবানের নাম জপ করেন যতীন্দ্রনাথ। মনে মনে স্মরণ করেন একমাত্র ভরসা, গীতার শ্লোকগুলি।

আলোয় হেসে ওঠে কালরাত্রির সত্তা: সাগ্নিক বীর্যবান ব্রাহ্মণের ভক্তি-প্রণত প্রার্থনা কি পৌঁছায় নি ভাগ্যবিধাতার সর্বজ্ঞ শ্রবণে?

টবুর অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যায়।

ভোরবেলা। যতীন্দ্রনাথ বোঝেন আসন্ন-কালের দেরি নেই। ঝিমিয়ে পড়ছে টবু ধীরে ধীরে।

চমক ভাঙে যতীন্দ্রনাথের। ইন্দুবালা লুটিয়ে পড়েন টবুর বুকে। সংযমের প্রতিমূর্তি বিনোদবালা চোখ মোছেন আঁচলের খুঁটে। ত্রস্তপদে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। ব্যথায় বিবর্ণ তাঁর মুখমণ্ডল। ব্যথায় তীব্র আঘাতে অথৈ প্রবাহে জেগে ওঠে সুপ্ত কবি-সত্তা তাঁর।...

অবিচল যতীন্দ্রনাথ টবুর নিষ্প্রাণ কচি দেহটা শুইয়ে দেন সন্তর্পণে। গম্ভীর মুখে উঠে যান। বারান্দায় শুরু হয় পায়চারী।

শূন্য ঘর...

পাশের ঘরে নীরবে অশ্রুমোচন করেন ইন্দুবালা। বাড়ির আর-সবার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ গিয়েছেন শ্মশানে, টবুর শেষকৃত্যের জন্যে।

খাতার ওপর ঝুঁকে বসেছেন বিনোদবালা। একহাতে অশ্রু মোছেন,

অন্যহাতে অশ্রান্ত লেখনী।

"...হরি দয়াময়, তোমার কোমল হাতে গড়া এ হৃদয় কি কঠিন! জগদীশ, এ-মরুভূমিময় জীবন ত ধূধূ করিয়া জলিতেছিল। জলুক। চিরদিন একভাবেই জলিত। এ আবার কি করিলে, এ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে স্বর্গীয় সুধা-প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া সুশীতল করিলে কি জন্য? সেই সুধা-প্রস্রবণ কাল মার্তণ্ডের প্রখর তাপে শুখাইলে কি এ হৃদয়-মরুভূমি দ্বিগুণ-তর পোড়াইবার জন্য? বিধাতা হে, তোমার বিধি অতি নিদারুণ হইলেও আমার এ দগ্ধ হৃদয়ের নিদারুণ জালার কাছে আর কোথায় স্থান পাইবে? এই দেখ আমার প্রাণের ধন টবু-হারা উত্তপ্ত হৃদয়ের জলন্ত অগ্নি বুকে করিয়া কেমন বসিয়া আছি। দেখ দেব! তুমি কি না জান? তবে যদি ভুলে যাও, ভোলানাথ, তাই মনে করিয়া দিতেছি—সেই করুণার প্রস্রবণরূপিণী মমতাময়ী স্বর্গকন্যাস্বরূপা ওই স্নেহময়ী জননীর শোকে যে এ হৃদয় একেবারে দগ্ধীভূত হইতেছে।...

"...নিরন্তর এ অন্তরে থাকিয়া দেখিতেছ—দেখ দেখি পাষাণ টুটিয়াছে কি? গলিয়াছে কি? দেখ হরি চেয়ে দেখ এ পাষাণময় বুক পাতিয়া তোমার কালের পাষাণময় আঘাত গ্রহণ করিলাম, আর কি চাও? তুমি যাহা চাও, তাই করিব। এ পাষাণ হৃদয় তোমার চরণে ফেলিয়া রাখ। তোমার মহিমাময় চরণপর্শে পাষাণ মানুষ হইয়া যায় শুনিয়াছি, তাই ত হরি ভিক্ষা চাই এ পাষাণ হৃদয় জুড়িয়া তোমার চরণদুটি রাখ, শোকতাপ দূর করিয়া দাও; আমার যে হৃদয়ে সাধের টবুধনের স্নেহাধিপত্য বিরাজ করিয়া আজ টবুর শোকে ভাঙিয়া পড়িতেছে, তুমি আমার সেই শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া থাক। আমি যেন সর্বান্তঃকরণে বলিতে পারি দয়াময়, তুমি মঙ্গল-বিধাতা! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক! তোমার ইচ্ছা ভিন্ন এ অন্তরে যেন বিন্দুমাত্র কামনাও স্থান না পায়। সংসারের বিষময় আলিঙ্গনে হৃদয় জর্জ-রিত হইয়াছে। মহাদেব! তুমি যে দেবাসুরের যুদ্ধে গরল ভক্ষণ করিয়াছ। পিতা ভোলানাথ, আমার সংসার...আসীন হইয়া সকল বিষ হরণ কর।...

"...হে অনাথের নাথ, হরি! হে দয়াময়!...এ আবার কি খেলা করিলে? আজ জীবনের একি ভীষণ পরীক্ষা হরি? এ চিরদগ্ধ জীবনের ভগ্নহৃদয় জুড়িয়া যে একটি রত্ন রাখিয়াছিলে এ জলন্ত হৃদয়ে অনন্ত অগ্নিশিখা নির্বাপিত করিয়া যে বাৎসল্য-সলিলে সিক্ত করিয়া একটি স্বর্গের ফুল রাখিয়া-

ছিলে, দয়াময়! তোমার সেই করুণার দান আমার সেই যত্নের রত্ন হৃদয়ের ধন বাপজীবন টবুরতন আজ কাড়িয়া লইলে কেন? আমি সেই মুখখানি এই তাপিত বুকে রাখিয়া বুক জুড়াইতাম, আমার সে বুক জুড়ান ধন কে নিষ্ঠুর হইয়া কাড়িয়া লইল? সে কি তুমি দয়াময়? না, না, কখনই নয়! তবে সে নিয়তি? সে ত বড় নিষ্ঠুর? সে নিদারুণ নিয়তি কার আজ্ঞাধীন? তোমার না আমাদের অদৃষ্টের?...আমাদের অদৃষ্টই ইহার মূল। আমাদের কর্মই এই ভীষণ পুত্রশোক বজ্রাকারে হৃদয় দগ্ধ করিল।...

"...বুকে রাখিলে বুক শীতল হয়। মুখ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়! প্রাণে বড় আনন্দ হয়! এমন ধন তুমি দিয়াছিলে, তুমি বড় দয়াময়। কিন্তু যে এমন ধন চুরি করে সে যে কত নিষ্ঠুর, তার নিষ্ঠুরতার ইয়ত্তা নাই। যে বালিকা জননীকে কাঁদাইয়া পুত্রশোক পারাবারে ভাসাইয়া সেই ধন লইয়া যায় তাহারও নিষ্ঠুরতার ইয়ত্তা নাই। কি বলিব? আর বলিতে পারি না, বুক ফাটিয়া মরি! হে ভগবান! হে নিষ্কলঙ্ক দেব! নিজ কর্মদোষে এত দুঃখ ভোগ করিয়া আবার কাহার দোষ দিই? দোষ কার জানি না কি? আপনার কর্মফলে আপনি দুঃখভোগ করি—দারুণ কর্মফলের এই শাস্তি!... দয়াময় এ প্রাণের জ্বালা আর সহে না: দুর্বলের বল তুমি, হরি হে, প্রাণে বল দাও! পুত্রশোকাতুর ইন্দু জ্যোতির প্রাণে শান্তি প্রদান কর!"...*

কাব্যময় গদ্যের কূল ছাপিয়ে ছন্দোবদ্ধ কবিতার সুরধুনি নেমে আসে কবি বিনোদবালা দেবীর লেখনী-মুখ নিঃসৃত হ'য়ে। এই রচনা থেকে শুধু-মাত্র বিনোদবালা দেবীর হৃদয়ের ছবিটুকুই মহত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে দেখি না: দিদির, ভাইয়ের, ভাই-বউয়ের এই ত্রয়ী আশা-আকাঙ্ক্ষায়ও ঈশ্বরে তন্ময়তায় নিবিড় পারিবারিক জীবনের পূর্ণ আলেখ্যটিই প্রোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে আমাদের দৃষ্টির সামনে।

বিনোদবালা দেবীর দীর্ঘ কবিতাটি থেকে কয়েকটি স্তবক চয়ন ক'রে দিই:

একা যাস কোথা বাপ জীবন আমার
বুক চিরে রাখি তোরে
আয় বাপি আয় ফিরে

* বিনোদবালা দেবীর খাতা থেকে হুবহু উদ্ধৃতি। বহু জায়গায় ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে কতকাংশ বাদ পড়েছে।

যেও না যেও না চাঁদ করি অন্ধকার
মুদিলে কি আঁখি—ফিরে চাও একবার !

...

ও মুখখানি কে করিল মলিন এমন ?
যে মুখের হাসিরাশি
মনের কেলেশ নাশি'
হৃদয়ের দুখতাপ করিত হরণ,
সেই মুখ হেরি হিয়া বিদরে এখন।
খেলিতে খেলিতে বাপ পরিশ্রান্ত হ'লে
ত্যজি সব খেলাদোলা
ছুটিয়ে সাঁজের বেলা
উঠি জড়সড় হ'তে জননীর কোলে,
জানাতে মনের কথা 'ঘুম শোব' বলে !

রোগ অবসাদ মাখা আজি তব প্রাণ,
বল বাপ কার কোলে
'ঘুম শোব' বলে শুলে
এ চিরঘুমের কালে কোথা পেলে স্থান,
কার বুকে মাথা রাখি লভিলে আরাম ?
সন্ধ্যা হ'লে ঘর হ'তে লইতে বাহিরে
হয়নি ভরসা মনে
পাছে ঠাণ্ডা লাগে জেনে
রেখেছি রে সাবধানে বুকের মাঝারে,
কে যায় সে ধনে আজি লয়ে গঙ্গাতীরে ?
নিষ্ঠুর জগতে এত কঠিন বিধি রে ?...
গঙ্গার শীতল বায়
বাছার যে খালি গায়
লাগিবে দারুণ ঠাণ্ডা দারুণ শিশিরে,
আয় ফিরে আয় ধন লয়ে যাই ঘরে !

ওহো, না, বুঝিনি ! বাপ, আমারি এ ভুল
তব দেহ সুকুমার
স্নেহময়ী গঙ্গামা'র
সুশীতল কোলে শান্তি লভিবে অতুল,
ব্যাধির পীড়নে আর না হ'বে আকুল !

...

কুসুম-কোমল তব দেহ সুকুমার
যেথায় তোমার সম
পরাজিত নিরুপম
ফুটে রয় আলো করি নন্দনকানন
সেই তব যোগ্য স্থান, তথা যাও ধন !

...

যতীন্দ্রনাথ বোঝেন—শোকের এই বিহ্বল মুহূর্তে একমাত্র সান্ত্বনা দিতে পারেন উপযুক্ত গুরু। শাস্ত্রদত্ত জ্ঞানকে উদ্দীপিত করতেই গুরুর প্রয়োজন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই জ্ঞানকেই তো গুরু পারেন মোহ-রান্বিত ক'রে দিতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রভাবে। প্রত্যক্ষ পরামর্শ, দৃষ্টান্ত, উপদেশ দিয়ে তিনি পরিচালনা করবেন সংসারের ধারাকে ঈশ্বরের অভি-প্রেত পথে।

বাল্যবন্ধু কুঞ্জলাল সাহারায়ের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বার হ'ন তীর্থ-পরিক্রমায়।

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—শাশ্বত ভারতের জ্ঞানমঞ্জুষা আজো লুপ্ত হ'য়ে যায় নি। লুপ্ত হওয়া অসম্ভব। মহাদেবী ভগবতী সতীর অঙ্গ একান্নটি ভাগে বিকীর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন স্বয়ং মহাদেব। সেই একান্নটি পীঠ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের একান্নটি তেজস্ক্রিয় কেন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে রেখেছে ভারতবাসীর অন্তরাত্মাকে।

সেই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের ধারক বাহক মুনি ঋষি যাঁরা ছিলেন, বংশ-পরম্পরায়, সম্প্রদায় থেকে সম্প্রদায়ে ও গুরু শিষ্যে আজো সন্ন্যাসীরা প্রোজ্জ্বল রেখে দিয়েছেন অর্জিত তাঁদের পরাচেতনার সেই অনির্বাণ শিখাকে। সিদ্ধ-পুরুষেরা আজো তাই বিরল নন ভারতের পর্বতে, কান্তারে।

যতীন্দ্রনাথ খোঁজেন জ্ঞানদীপ্ত সেই সিদ্ধপুরুষকে—যিনি তাঁকে দিতে

পারবেন অভীষ্ট পাথেয় আর কাটিয়ে দিতে পারবেন তীব্র ঐহিক বেদনার কুজ্ঝটিকা।

অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে হিসেবেই দেশের মুক্তির তপস্যায় ব্রতী হয়েছেন যতীন্দ্রনাথ। গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁর সাধনা যে অপূর্ণ থেকে যাবে।

খুঁজে চলেন যতীন্দ্রনাথ।

কোথায় সেই মহাজ্ঞানী? কোথায় বাঞ্ছিত গুরু?…তীর্থের পর তীর্থ অতিক্রান্ত হয়।

যতীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন কুম্ভমেলায়। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে ফেরেন তিনি ঈপ্সিত সেই মহাপুরুষকে।

হরিদ্বার।…

গঙ্গার পশ্চিম তীর বরাবর দৃপ্ত অথচ ধীর সংযত পদক্ষেপে টিলার পর টিলা পার হ'য়ে চলেছেন যতীন্দ্রনাথ। পরিব্রাজক যতীন্দ্রনাথ।…বিশ্ব-সংসারের বুক বেয়েই তো চলেছে ঈশ্বরের অলৌকিক পরিব্রজ্যা।

শীতের বিকেল। সূর্যাস্ত। বিষণ্ণ বিলীয়মান রঙে রঙে আকাশ সমাচ্ছন্ন। একা যতীন্দ্রনাথ। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

চকিতে—বিশ্বপ্রকৃতির এই শোক-সন্তপ্ত রূপ গভীরভাবে বিচলিত ক'রে যতীন্দ্রনাথকে। বুকটা কেমন যেন মুচড়ে ওঠে, ক্ষণিক হাহাকারে ভ'রে যায় অন্তর। অপরিচিত অতল এক শোক-পাথারের তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ে তাঁর সত্তার কূলে কূলে।

স্তব্ধ যতীন্দ্রনাথ ফিরে দাঁড়ান পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার দিকে। বিষণ্ণ গোধূলির গৈরিক আলোকে প্রলম্বিত তাঁর ছায়াটা গিয়ে লুটিয়ে পড়ে পুণ্য-তোয়া গঙ্গার সর্বসন্তাপহারী শান্তিপ্রদায়ী বুকে।

কান পেতে যতীন্দ্রনাথ শোনেন—গভীর বাঁশির সুর-মন্ত্রে কে যেন দূরে বহুদূরে পূরবীর করুণ মূর্ছনায় মেলে ধরেছে তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের কান্না!

গঙ্গার ঢেউয়ে ঢেউয়ে সাড়া তোলে সেই মূর্ছনা।…

এমন সময়ে যতীন্দ্রনাথের কানে এল মধুর এক আহ্বান: "আরে শুন্ বেটা!…য়ে মেরা শুরবীর, শুন্ মেরা বাহাদুর!"

পেছন ফিরে যতীন্দ্রনাথের মুগ্ধ দৃষ্টি, থমকে দাঁড়ায়: নীল চশমা চোখে পাগড়ি মাথায়, অত্যন্ত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রৌঢ় এক সাধু এগিয়ে আসছেন।

"শোন্ বেটা আমি যে তোকে ডাকছি!"…

সাধুর সর্বাঙ্গে জ্যোতির আভা। অন্তর্মুখী এক হাসিতে প্রসন্ন বদন। প্রতিটি পদক্ষেপে সৌম্য-শ্রী! যতীন্দ্রনাথকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকলেন তিনি।

সাধুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেন যতীন্দ্রনাথ: "আপনি আমায় ডাকছেন?"—সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

সাধু জবাব দেন, "হ্যাঁ বাবা। তোকেই যে খুঁজছি আমি। তুই যে এতদিনে আসবি, আমি জানতাম।"

সদানন্দের লাবণ্যে সাধুর চোখ-মুখ আপ্লুত। যতীন্দ্রনাথের চোখে তিনি সস্নেহ চোখ রাখলেন। যতীন্দ্রনাথের মনে হ'ল তাঁর সব শোক, পৃথিবীর সব শোক সমস্ত ব্যথা ইনি যেন মুছে দিতে সক্ষম। এঁর মাঝে তন্ময় হ'য়ে রয়েছে অমিত বীর্য, অক্ষয় আনন্দের আত্মভোলা নির্ঝর।

সন্ন্যাসীর মুখে জাগে হিন্দীতে মিষ্টি তিরস্কার: "ছি বাবা, তোমার মনেও ময়লা? যাও, সাফ ক'রে এস নিজেকে, এখুনি যাও।"

বিচার-বুদ্ধি চায় পরখ ক'রে নিতে, "কী ময়লা আমার মনে দেখছেন আপনি?"

যতীন্দ্রনাথের আরো কাছে এসে সাধু দাঁড়ালেন। তাঁর কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, "এখনো ছলনা? দেশের জন্যে জাতির জন্যে কত বড় হ'তে হবে, আরো কত বড় বড় ব্যথা সইতে হ'বে তোকে, তুই কি জানিস না? তোর গর্ভধারিণীর স্বপ্ন সার্থক ক'রে তুলতে হবে না? তোকে হ'তে হ'বে কত বড় ত্যাগী। আর সেই তুই কিনা সামান্য পুত্রশোকে আজ কাতর?"

যতীন্দ্রনাথের অন্তরে কে যেন ব'লে দিল: এঁকেই তুই খুঁজে ফিরছিলি তীর্থে তীর্থে!

সাধু যতীন্দ্রনাথকে আদেশ দিলেন, "যা বেটা, গঙ্গায় অবগাহন ক'রে আয়। ধুয়ে ফেল দেহের মনের সমস্ত ময়লা।"

যতীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নামেন গিয়ে জননী গঙ্গার বুকে। নিজেকে ছড়িয়ে দেন গঙ্গার শীতল কোলে। স্নান সেরে এসে দেখেন—সাধু তখনো দাঁড়িয়ে।

১০৮ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের কাছে দীক্ষা নিলেন যতীন্দ্রনাথ।

স্বামীজী যতীন্দ্রনাথকে নিভৃতে বললেন, "তোর কোন কথা আমার

অজানা নেই বাবা। রামদাস স্বামী যেমন শিবাজীর পথ চেয়ে বসেছিলেন, আমিও তেমনি তোর প্রতীক্ষায় ছিলাম। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—আমি সর্বান্তঃকরণে তা' মানি। তোকেও সেই পথেই এগিয়ে যেতে হ'বে।"

ইন্দুবালা আর দিদি বিনোদবালাকেও যতীন্দ্রনাথ নিয়ে এলেন। তাঁরাও দীক্ষা নিলেন স্বামীজীর কাছে। অন্তরে পেলেন তাঁরা অনাবিল শান্তির স্বাদ।

স্বামীজীর সঙ্গে এঁদের স্থাপিত হ'ল নিবিড় নির্ভরতার সম্পর্ক। স্বামীজী কলকাতা এলেই ডাক পাঠাতেন যতীন্দ্রনাথকে। শোনা যায় কলকাতায় যখন স্বামীজী প্রাতভ্র'মণে বার হ'তেন, একটি পার্কে ব'সে যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে পড়তেন বেদ, উপনিষদ, গীতা। অন্যান্য আলোচনার মধ্যে দেশের কাজের প্রসঙ্গও বাদ যেত না। স্বামীজীর প্রত্যক্ষ সহানুভূতিও ছিল বিপ্লবের প্রতি।

॥ ছয় ॥

১৯০৬ সাল।

কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে অ্যাল্‌ফ্রেড থিয়েটারে শিবাজী-উৎসবের আয়োজন হয়েছে। সুসজ্জিত বেদী। কোষমুক্ত একটা তরোয়াল প্রখর আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে বেদীর ওপরে।

যতীন্দ্রনাথের জীবনীকার ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "যাঁহারা এই পরাধীন দেশের শৃঙ্খলমুক্তিকামী তাঁহারা সেই অসিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেশমুক্তির আন্তরিক কামনা করিবেন, এই উদ্দেশ্যে ঐ অনুষ্ঠানটি আহূত ও ঐরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। সরলা দেবী চৌধুরাণীর ঐ অনুষ্ঠানে সভানেত্রী হইবার কথা ছিল। ঐরূপ অনুষ্ঠান তখন কলিকাতায় অভিনব বলিলেও হয়। উহাতে যোগদান বৈদেশিক শাসনকর্তাদের প্রীতিকর হইত না। এবং ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইলে সেখানেই পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইবার আশঙ্কায় অনেকেই সেখানে যাইতেন না।

"যাঁহার সভানেত্রী হইবার কথা, যে কারণেই হোক তিনি সেখানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যতীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে এই

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অসির উপাসক রূপে তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অনুষ্ঠানটির সম্মান রক্ষা ও সফলতা সাধন করিয়াছিলেন।

"যে অল্প-সংখ্যক সন্তান সেখানে উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রনাথ এই বলিয়া তাঁহাদিগকে সংবর্ধনা করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা কামনা করিলে একমাত্র শক্তির উপাসনা দ্বারাই সে কামনা পূর্ণ হইবে এবং ঐ অসিই সে শক্তির প্রতীক। ভারত ও বঙ্গ-জননীর সন্তান মাত্রেরই শক্তির পূজা করা উচিত।"

সদ্য রাইটার্সবিল্ডিং-প্রত্যাগত যতীন্দ্রনাথ—পরণে সাহেবি পোশাক। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বেদী থেকে তুলে নেন ফুলের ডালা।

বীর্যের সঙ্গে অপূর্ব সৌন্দর্যের সমন্বয়ে সভাপতি যতীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল ভাস্বর। আয়ত তেজোগর্ভ নয়নযুগলে যুগপৎ ভক্তি আর আত্ম-প্রত্যয়, স্নেহ আর কর্তব্যনিষ্ঠার দ্যুতি।

অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে যতীন্দ্রনাথ জবাফুল ঢেলে দেন তরোয়ালের ওপর। দরাজ গলায় নতজানু হ'য়ে প্রণতি জানান, "বন্দে মাতরম্ !"

সমস্ত সভাগৃহে প্রতিধ্বনি জাগে তাঁরই কণ্ঠের: বিপ্লবীরা সমস্বরে ব'লে ওঠেন, "বন্দে মাতরম্ !"

নতুন কর্মীরা এগিয়ে আসেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁদের দীক্ষা দেবেন।*

একহাতে গীতা আর তরোয়াল স্পর্শ ক'রে, বুক চিরে রক্ত নিয়ে অঙ্গীকার-পত্রে একে একে স্বাক্ষর পড়ে: "যতদিন আমার দেশ স্বাধীন না হচ্ছে, ততদিন আমার প্রচেষ্টা হবে জননীর বন্ধন মোচন করা। জাগতিক কোন সুখই আমায় বিচ্যুত করতে পারবে না এই ব্রত থেকে।"

দীক্ষা-শেষে, মুঠো মুঠো জবাফুল তরোয়ালের ওপর অর্পিত হয়। নীরবে সবাই স্মরণ করেন—স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন যে-মহাবীর দেখে-

* বিখ্যাত বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু একবার এই দীক্ষার প্রসঙ্গে লিখেছেন: "আমি যুগান্তর দলের একজন সভ্য হইয়াছিলাম। তখন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি নেতা। তাঁহার সহিত একদিন আমার আলাপ হয়। একদিন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট 'বেঙ্গল স্টোর' দোকানের উপরে [এটর্নী] কুমারকৃষ্ণ দত্তের অফিসে আমায় ডাকিয়ে পাঠান হয়। তথায় রাত্রিবেলা নগেন্দ্র মল্লিক, চারু মিত্র, মন্মথ মিত্র, কুমার দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও বোধহয় তাঁহার ভ্রাতা জ্যোতিষ এবং 'সঙ্গীত সমাজের' দলের অনেকে তলোয়ার স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন: আজ থেকে আমরা দেশের জন্য তরবারী ধরলাম। এই ঘটনা ভূপেনবাবুর যুগান্তর সংক্রান্ত জেলের পর হয়।" (অর্থাৎ ১৯০৭ সালে)। ডাঃ ভূপেন দত্তের 'দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' গ্রন্থে অতীনবাবুর জবান দ্রষ্টব্য॥

ছিলেন, সেই শিবাজী মহারাজকে।

সবার মন সঙ্কল্পে ভ'রে ওঠে : দেশজননীর বন্ধনমোচন করতে জীবনও যদি যায়, প্রস্তুত আমরা।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্॥

কৃষ্ণনগর। ১৯০৬ সাল।

যতীন্দ্রনাথের বড়মামা বসন্তকুমারের বাড়ির পাশেই 'আর্য কেমিক্যালস'-এর বাড়ি।

যতীন্দ্রনাথের দুটি বিশিষ্ট শিষ্য থাকেন এখানে: কেমিস্ট বিভূতি চক্রবর্তী, 'আর্য কেমিক্যালসে'ই চাকরি করেন; আর সুরেশ মজুমদার (পরাণ), উত্তরকালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা।

ইংরেজের দমন-নীতি কঠোরতর হয়ে উঠুক, যতীন্দ্রনাথের এই অভীষ্ট। সংঘাত না-লাগলে কাজ এগোবে না। তার জন্যে কয়েকটি কুখ্যাত অত্যাচারী অফিসারকে হত্যা করবার অনুমতি দিলেন যতীন্দ্রনাথ। যাতে করে কাঁটাও তোলা হয়, আবার জনগণের সমর্থনও সেই সঙ্গে পাওয়া যায়।

এই হত্যার ব্যাপারে চাই বোমা।

বিভূতি চক্রবর্তীকে যতীন্দ্রনাথ ভার দিলেন বোমা প্রস্তুত করবার। প্রথম বোমা প্রস্তুতের প্রচেষ্টা। সাগ্রহে কাজ হাতে নিলেন বিভূতিবাবু।*

বারীন ঘোষও চাইতেন, দমন-নীতি কঠোরতর হয়ে উঠুক। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের মতো ভাল-মন্দের বাছ-বিচার তাঁর ছিল না। 'সাহেব মারলেই হল' মনোভাব নিয়ে তাঁর অনুগামী কর্মীদের কাজে নামালেন তিনি।

যতীন্দ্রনাথ 'নিজস্ব' দল বলে কিছু আলাদা গোষ্ঠী গড়ে উঠতে দেন নি : তাঁর ব্রতই হল উপযুক্ত কর্মী বেছে নিয়ে নিজের সঙ্কল্পের বিদ্যুৎ-স্পর্শে তাকে

* ডাঃ ভূপেন দত্ত লিখেছেন,

"এই ক্লাবের একটি B. Sc পাশ যুবকই বাঙ্গলায় আমাদের অনুরোধে ভারতের প্রথম 'বোমা' তৈয়ার করেন। ইঁহার নাম বিভূতি চক্রবর্তী এবং নদীয়া জেলায় বাস। ইনি নিবারণ ভট্টাচার্যের নিকট বিস্ফোরণ রসায়ন শিক্ষা করিতেন। নিবারণবাবু ইহা লেখককে বলেন। 'যুগান্তর' অফিসে তাঁহাকে বারীন্দ্র ও আমি একদিন বলি—বোমা প্রস্তুত করিবার জন্য টাকা মজুদ আছে কিন্তু প্রস্তুত-কারকের অভাবে তাহা সফল হইতেছে না।...এই বোমা লইয়াই বারীন্দ্র পরে হেমচন্দ্র দাস ফুলারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন।...পরে ১৯০৮ খৃঃ হেমবাবু প্যারিসে গিয়া তথাকার ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সাহায্যে বোমা নির্মাণ করা শিক্ষা করেন।..." ("দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম")

উদ্দীপ্ত করে দিয়ে—নিজের পথে এগিয়ে যাওয়া। 'আমার কর্মী' বলে কোনদিন কাউকে তিনি ধরে রাখেন নি।

ফলে, বারীনবাবুর সহকর্মী অনেকেই ছিলেন বিশেষভাবে যতীন্দ্রনাথের recruit, যতীন্দ্রনাথের প্রতিই যাদের অনুরাগ সর্বাধিক, অথচ যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে কাজের তাগিদে তাঁরা যোগ দিয়েছেন বারীনবাবুর সঙ্গে।

'সাহেব মারলেই হল'—মনোভাবের বশবর্তী বারীন ঘোষের কাছে প্রেরণা পেয়ে কুষ্টিয়ার পাদরি হিকেন বোথামের হত্যার আয়োজন করেন ভবভূষণ মিত্র। তিনি কিন্তু ছিলেন যতীন্দ্রনাথের শিষ্য। ঘটনার আগেই তিনি কুষ্টিয়া ছাড়েন এবং শ্রীঅরবিন্দকে খবর দেন। বারীন তখনও কিছু জানেন না।

পরে যখন 'নবশক্তি' অফিসে শ্রীঅরবিন্দের বাসা তল্লাস করা হয়, তখন কুষ্টিয়ার লেবেল আঁটা একটা সাইকেল সেখানে পাওয়া যায়—পুলিশ রিপোর্টে আছে। ভবভূষণেরই সাইকেল বোধ হয় এটি।

এই হত্যা চেষ্টার কথা যতীন্দ্রনাথকে আগে জানানো হয় নি। কিন্তু বারীনবাবুরা ধরা পড়বার আগেই উল্লাসকরের কাছে ঘটনাটা সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ সংবাদ পান এবং তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ব্যারিস্টার জে, এন, রায়কে দিয়ে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করান।

অথচ বারীনবাবু যে তাঁকে ঈর্ষা করতেন, যতীন্দ্রনাথ তা ভালভাবে জানতেন।

একদিন মাণিকতলা বাগানের কর্মীদের কাছে যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাচ্ছিল্যভরে বারীনবাবু মন্তব্য করেন, "সরকারী কেরাণী, ও আবার বিপ্লব করবে!"

কথাটা কর্মীদের সকলেরই প্রাণে বড় করে বাজে। যতীন্দ্রনাথ সর্বদলের যোগসূত্রস্বরূপ ছিলেন। তাই মাণিকতলার বাগানেও তিনি যেতেন। সেদিন, বাগানে এসে সাইকেল থেকে নামতেই তাঁর দিকে গম্ভীর মুখে এগিয়ে এলেন প্রফুল্ল চাকী ও জিতেন রায়চৌধুরী।

"দাদা, আপনি আর এ-বাগানে আসবেন না", বিমর্ষ মুখে ওদের সনির্বন্ধ অনুরোধ। বিস্তারিত ঘটনাও যতীন্দ্রনাথ শুনলেন।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখেছেন, "সাইকেলের সিটের ওপর কনুই ভর দিয়ে দাদা খুব খানিকটা হাসলেন। তারপর ওদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে ওদের

সাথেই বাগানে ঢুকলেন। তারপরও ওখানে কখনো কখনো যেতেন, যেমন যেতেন কলকাতার বিভিন্ন আখড়ায়।"

শ্রীঅরবিন্দ এক সময় যতীন্দ্রনাথকে বলেন, "কিংসফোর্ডকে সরাবার সময় হয়েছে—বারীনকে বোলো।" যতীন্দ্রনাথ বলেন, তাঁর বলার পক্ষে বাধা আছে। তখন আদ্যোপান্ত শ্রীঅরবিন্দকে খুলে বলেন। শুনে শ্রীঅরবিন্দ ব্যথিত হন।

যতীন্দ্রনাথের ওপর ছিল শ্রীঅরবিন্দের অপরিসীম নির্ভরতা। বারীন অনুজ হওয়া সত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দের কাছে সব সময় সব কথা refer করতেন না। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের কর্মসূচীর কিছুই শ্রীঅরবিন্দের অগোচর ছিল না।

উপরোক্ত প্রবীণ বিপ্লবী বলেছেন: "যতীন ব্যানার্জি বারীনের সঙ্গে কলহ করেছেন অনেক বছর ধরে। দাদা তা করেন নাই। তিনি হেসে সরে গিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্র পত্তন করেছেন with Sri Aurobindo's knowledge and approval. এবং সেই কর্মক্ষেত্রে তাঁকে দেখে শ্রীঅরবিন্দ দাদার সম্বন্ধে বলেছেন, he was my right hand man···বারীনের কোনো কাজের এরকম detail বোধহয় শ্রীঅরবিন্দ জানতেন না!"

এখন যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে বারীনের সম্পর্ক যা দাঁড়িয়েছে, তা বুঝে শ্রীঅরবিন্দ বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে গেলেন। যতীন্দ্রনাথ তখন বলেন, অন্যভাবে তিনি একাজের ব্যবস্থা করবেন।

এ-প্রসঙ্গ আসবে যথাসময়ে।

মার্চ। ১৯০৬ সাল।

দীর্ঘকালের প্রচেষ্টার পর বৈপ্লবিক মতাবলম্বী দল-নিরপেক্ষ একটি কাগজ বিপ্লবীরা প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যতীন্দ্রনাথের বন্ধু অন্নদা কবিরাজ রংপুর থেকে দুইশ' টাকা তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কলকাতা থেকে পাওয়া গেল একশ' টাকা। এইভাবে, শ'চারেক টাকা সম্বল করে প্রকাশিত হল বাংলার বিখ্যাত বৈপ্লবিক পত্রিকা, 'যুগান্তর'।

অগ্রণীদের মধ্যে রইলেন ভূপেন দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই), বারীন ঘোষ এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য। দেবব্রত বসুর সঙ্গে বহু আলোচনার পর ভূপেনবাবু 'যুগান্তর' নামটি নির্বাচন করেন ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর সামাজিক উপন্যাসের নাম থেকে।

"শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।" লিখেছেন ভূপেনবাবু। "যুগান্তর' ছিল দলের কাগজ। টাকা সংগ্রহ, মতামত ও প্রবন্ধ লেখা সমস্ত কর্মই পার্টির অভিপ্রায় অনুসারে হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপরে ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, দেউস্কর এবং অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী।*

"যুগান্তরের' পশ্চাতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী বৈপ্লবিক সমিতিই ছিল। ইহা তাঁহাদেরই কাগজ। এই সময়ে যাঁহারা পি. মিত্রের তাঁবেদার ছিলেন ও যাঁহারা লাঠি ঘুরাইবেন, তাঁহারা একদল হইলেন; তাহা ছাড়া বঙ্গের সমস্ত কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছিল এবং আমরা অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে কার্য করিতাম।** এই প্রকারে বঙ্গে বৈপ্লবিক দলের মধ্যে সর্বপ্রথমে দলাদলির ছায়া প্রকাশ পায়। কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি এবং ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি† ও তাহাদের শাখাসমূহ পি. মিত্রের সরাসরি অধীনে ছিল; তাহা ছাড়া বঙ্গে যে-সব বৈপ্লবিক কেন্দ্র ছিল তাহাদের সকলেই আমাদের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে কর্ম করিতেন এবং সংখ্যাতেও আমাদের দিকের লোক বেশি ছিল। অথচ বাৎসরিক কন্‌ফারেন্সে সকলেই পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীনে মিলিতাম।...লোকের সম্মুখে

* যতীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধেয় বন্ধু অবিনাশবাবু সম্বন্ধে ডাঃ ভূপেন দত্ত লিখেছেন, "১৯০৬ খৃঃ যখন বিপ্লববাদের উপরোক্ত তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয় এবং কানাই ধর লেনে কর্মীদের বাসা স্থাপিত হয়, তখন হইতে আমরা তাহার নেতৃত্বাধীনে চলিতাম। এই সময়ে প্রমথনাথ মিত্র ছিলেন আমাদের কাছে নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্মস্বরূপ, আসলে মস্তকোপরি থাকিতেন অরবিন্দ ও অবিনাশ। ইহার মধ্যে অবিনাশবাবুর সহিত আমাদের নিত্যকর্ম সম্বন্ধে বেশি যোগাযোগ ছিল। তবে তিনিও অরবিন্দের অধীনস্থ ছিলেন।...যাঁহারা যুগান্তর কাগজ পরিচালনা করিতেন, তাঁহারাই অরবিন্দের বেশি ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু বেশির ভাগ কর্মী অবিনাশবাবুর সহিত মিশবার সুবিধা পাইতেন।..."

** সরকারি ফাইলে দেখি, এই সময়ে 'যুগান্তর' দলের চারটি প্রধান কেন্দ্র ছিল সরকারের চোখে মারাত্মকঃ (১) মেদিনীপুরে নেতা সত্যেন বসু; (২) কুষ্টিয়ায়, নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; (৩) বাঁকুড়ায়, নেতা রামদাস চক্রবর্তী; (৪) চন্দননগরে, নেতা চারু রায়।

† "সুহৃদ সমিতি" পরে হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরীর "সাধনা সমাজ"-এর সঙ্গে একত্র হয় এবং হেমেন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে "যুগান্তর" দলের কর্মসূচীতে যোগ দেয়। কলকাতায় এই সম্মিলিত দলের প্রথম প্রতিনিধি মণীন্দ্রকুমার (বা মণি) চৌধুরী ১৯৬৩ সালে একটি সাক্ষাৎকারের সময়ে বলেন যে তিনি যতীন্দ্রনাথের তৎকালীন সহকর্মীদের অন্যতম ছিলেন।।—পৃথ্বীন্দ্রনাথ

বলিতাম পি. মিত্র আমাদের সভাপতি, কিন্তু তিনি সতীশ বসু ও পুলিন দাস ছাড়া আর কিছুই বুঝিতেন না। আসল কার্যের সময় এই বিভেদ ধরা পড়িত।...”

এর পাঁচ মাসের মধ্যেই, ১৯০৬ সালের অগাষ্ট মাসে প্রকাশিত হ’ল ‘Bande Mataram’ দৈনিক এবং জাতীয় কলেজেরও প্রতিষ্ঠা হল। দুটোরই পরিচালনায় শীর্ষে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। অক্টোবর মাস থেকে বিপিন-চন্দ্র পাল ‘বন্দে মাতরম্’ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন, শ্রীঅরবিন্দের ওপর একক দায়িত্ব ন্যস্ত ক’রে।

তার একমাস আগে, ‘বন্দে মাতরম্’ পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা রুজু হয়। সে-ইতিহাস আজ অজ্ঞাত নয়। এবং বৈপ্লবিক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠ-পোষকরূপে যতীন্দ্রনাথের ভূমিকাও অজ্ঞাত নয় সে-যুগের কর্মীদের কাছে। যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে তার সম্যক আভাস পাওয়া যায়।

॥ সাত ॥

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাস। ২৮শে চৈত্র।...

আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় যতীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে অফিস সেরে, ফিরেছেন প্রায় মাঝ-রাতে—তাঁর অভ্যস্ত পন্থায়: চলন্ত মালগাড়ি থেকে নেমে গোরাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, কয়ায় এসেছেন সাঁতার দিয়ে!

ভোরবেলা। দাঁতন করছেন যতীন্দ্রনাথ পূজো মণ্ডপের সামনে। আদুড় গা। আটহাতি একটা ধুতি লুঙ্গির মত করে জড়ানো। প্রশস্ত সুন্দর বুকে শোভা পাচ্ছে গুরুদত্ত রুদ্রাক্ষ।

একজন-দুজন করে গ্রামবাসীরা আসছে। প্রণাম করছে দাদাবাবুকে। বেশ সমীহ-ভরে বসছে তাঁর আশেপাশে, মাটির ওপর। অধিকাংশই মোড়ল-শ্রেণীর লোক। যতীন্দ্রনাথ সস্নেহে সাগ্রহে জানতে চাইছেন তাদের কুশল।

যখনি যতীন্দ্রনাথ গ্রামে ফেরেন, দূর দূর গ্রাম থেকেও এদের মত আরো কত লোক আসে। অকপটে তারা দাদাবাবুর কাছে জানায় তাদের সুখ-দুঃখের কথা। জানায় তাদের অভাব-অভিযোগের কথা। কারো হয়তো জমিদারের কাছে খাজনা বাকি প’ড়ে গিয়েছে—বড়মামা বসন্তকুমার

জমিদার : তাঁকে ব'লে যদি কিছু করা যায়। নয়তো সকলের অগোচরে তাকে অর্থসাহায্যও করেন যতীন্দ্রনাথ। কারো আবার ছেলে গ্রামের পাঠ শেষ করেছে—এখনো পড়তে চায় : তার পড়াশুনোর ব্যবস্থা করতে হবে।' কারো-বা আর্জি : তাদের গ্রামে একটা পাঠশালা বসানো হ'ক।

যতীন্দ্রনাথ যেন কল্পতরু।

গ্রামবাসীদের আসতে দেখে অভ্যর্থনা জানান যতীন্দ্রনাথ। আন্তরিক হাসিতে মিষ্টি আলাপে আপন ক'রে নেন তাদের। ঘন হয়ে বসে গ্রাম-বাসীরা তাঁকে ঘিরে, ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অন্ধি-সন্ধি অসঙ্কোচে উদ্ঘাটন করে তারা দাদাবাবুর কাছে। নিবিষ্ট-চিত্তে যতীন্দ্রনাথ শোনেন তাদের কথা। অল্প দু-চার কথায় দিয়ে দেন তাদের সমাধান, পথের সন্ধান।

কয়ার দু-মাইল দূরে রাধাপাড়া গ্রাম। সেখান থেকে এসেছে জন-দুই চাষী। উৎকণ্ঠিত স্বরে তারা জানায়, "দাদাবাবু, গাঁয়ে এক্ডা কেঁদো আয়চে!"

"কেঁদো? বলিস কী?" যতীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। কারণ কেঁদো বলতে ছোটখাট বাঘ বোঝায়।

"হাঁ, দাদাবাবু।" রাধাপাড়া গ্রামের চাষীদুটো জানাল যে, বেশ কিছু-কাল থেকে বাঘটা এর বাড়ির গরু, তার খোঁয়াড়ের ছাগল মহা-আনন্দে খেয়ে বেড়াচ্ছে। আরও কত রকম অত্যাচার আর উৎপাত।

কথায় কথায় যতীন্দ্রনাথ বললেন, "হ্যাঁ রে চ'! দেখে আসি কেমন কেঁদো তোদের!"

তারপর ধুতিটা মালকোঁচা মেরে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে একটা দার্জিলিংয়ের কুকরি (ছোট্ট ছোরা) নিয়ে।

"কোথায় চললি, জ্যোতি?" দিদি জানতে চাইলেন।

সবকথা খুলে বললেন যতীন্দ্রনাথ। দিদি আপত্তি জানালেন, "না রে। তোর শিকারের পুরো সরঞ্জাম বন্দুক-টন্দুক একদম নিয়েই যা। অমন ন্যাড়া-হাতে যাওয়া আমার ভাল ঠেকছে না।"

যতীন্দ্রনাথ হাসলেন, "ভাবি তো কেঁদো। আর এক্ষুণি যে মারব, তারও কোন লেখাজোখা নেই। ঘুরে দেখে আসি আগে। তারপর

মারলেই হবে।" ব'লে রাধাপাড়ার লোকদুটির সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

কিছু দূর যেতে না যেতে যতীন্দ্রনাথ দেখলেন: বড়মামার ছেলে ফণী আর মেজমামার ছেলে অমূল্য ছুটতে ছুটতে আসছে। রুদ্ধশ্বাসে তারা এসে ধরল তাঁকে, "বড়দা, আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।"

অমূল্যর হাতে একটা পাখি-মারা বন্দুক। তাই দেখে যতীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "কি রে, এই বন্দুক দিয়েই তুই কেঁদো মারবি নাকি?"

লজ্জিত অমূল্য বন্দুকটা লুকিয়ে ফেলে।···

রাধাপাড়া গ্রামের শেষপ্রান্ত। ভরা-ক্ষেত। আখের চাষ হয়েছে। একটা জায়গায় আখগুলো সামান্য দুলে দুলে উঠছে যেন!···

চাষীদের সাবধান ক'রে দিয়ে চুপিচুপি যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে চললেন সে-দিকে—প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে।

বেশিদূর যেতে হ'ল না। দেখলেন, আখের ক্ষেতে, একটা ঝোপের আড়ালে বিরাট এক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার—প্রসাধনরত।

"এই তোদের কেঁদো?" চাপাগলায় যতীন্দ্রনাথ বললেন; তারপর, সবে উঠে দাঁড়াতে গিয়েছেন, এমন সময় উত্তেজনার মাথায় অমূল্য তার পাখি-মারা বন্দুকে ট্রিগার টিপে দিল।···

দড়াম ক'রে ছুটে গেল গুলী; সঙ্গে সঙ্গেই অসহ্য প্রতিবাদে হুঙ্কার দিয়ে উঠল সুন্দরবনের রাজা। পাখি-মারা বন্দুক অভিমুখে তাগ্ ক'রে সে লাফিয়ে পড়ল ক্রুদ্ধ গর্জনে।

"সরে যা!" ব'লে, একছুটে যতীন্দ্রনাথ গিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন অমূল্যকে।

ইষ্টনাম স্মরণ ক'রে বাঘের বিক্রমেই তিনি ফিরে দাঁড়ালেন বাঘের দিকে—অমূল্যকে আড়াল ক'রে। বাঘকে যেন আমন্ত্রণ জানালেন শক্তি-পরীক্ষার।

বাঘ প্রথমে একটু থতমত খেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল যতীন্দ্রনাথের ওপর। অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় যতীন্দ্রনাথ একটু সরে গিয়ে বাঁ বগলদাবায় চেপে ধরলেন বাঘের ঘাড়টা। আর ডানহাত দিয়ে চালালেন উপর্যুপরি ছোরার আঘাত।

সামনের দিকে রুখে উঠল বাঘটা। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ততক্ষণে কুস্তির প্যাঁচ মেরে বাঘকে সাপটে ধরেছেন মাটির সঙ্গে।···

বাঘে-মানুষে মল্লযুদ্ধ বেধে গেল।

একবার বাঘ যতীন্দ্রনাথকে পেড়ে ফেলে মাটির ওপর, আবার চোখের পলকে বাঘকে নিচে ফেলে যতীন্দ্রনাথ চেপে বসেন তার ওপর।

অমূল্য প্রথম চোটেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। দু-চারজন তাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। খবর পেয়ে ইতিমধ্যে বন্দুক হাতে মাতব্বরেরা অকুস্থলে এসে পড়েছেন।

কিন্তু অমন ধস্তাধস্তির মধ্যে, কাকে মারবেন শেষ অবধি—সেই ভয়ে, হাতগুটিয়ে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন সকলে। মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতে লাগলেন অভাবনীয় এই মল্লযুদ্ধ!

বহুক্ষণ চলল এই ধস্তাধস্তি।

ক্ষেতের মাটি এক-মাথা থেকে অন্য-মাথা কেউ যেন চ'ষে ফেলল। ভেঙে পড়ল কয়েকটা আখের গাছ।...

ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল বাঘ। যতীন্দ্রনাথও বুঝলেন, আর বেশিক্ষণ যোঝা সম্ভব হবে না। এমন সময় হঠাৎ বাঘকে বাগে পেয়ে দেহের শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় ক'রে ছোরাসমেত দৃঢ়বদ্ধ ডানহাতটা তুলে ধরলেন।

নিমেষ-মধ্যে সজোরে মোক্ষম এক আঘাত বসিয়ে দেওয়ামাত্র—ছোরা ঢুকে গেল বাঘের খুলি ভেদ ক'রে। অবর্ণনীয় আর্তনাদে সমস্ত পল্লী-অঞ্চল কেঁপে উঠল।

বাঘও মরণ-কামড় বসিয়ে দিল যতীন্দ্রনাথের ডান হাঁটুর ওপরে।... তারপরেই ঢ'লে পড়ল—সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। যেন পোষা বেড়াল ঘুমিয়ে পড়ল মনিবের হাঁটুতে মাথা রেখে।

অবসন্ন যতীন্দ্রনাথও টান টান হ'য়ে শুয়ে পড়লেন বাঘের নিস্পন্দ দেহের ওপর।

হৈ হৈ ক'রে ছুটে এল সমবেত জনতা। মাতব্বরেরা সন্তর্পণে আগে যতীন্দ্রনাথকে সরিয়ে এনে—মড়ার ওপর চালালেন খাড়ার ঘা: গুড়ুম ক'রে দারুণ আস্ফালনে গর্জে উঠল তাঁদের বন্দুক।

যতীন্দ্রনাথের জ্ঞান তখনো অটুট। হেসে বললেন, "ওর চামড়াটা অনর্থক ফুটো করে দিলি? ও কি আর ওঠে?"

অপরিসীম ক্লান্তিতে আড়ষ্ট হ'য়ে গেল তাঁর সর্বাঙ্গ। দরদর ক'রে ছুটে চলেছে তাজা রক্ত। হাঁটু থেকে নড়বড় ক'রে ঝুলছে ডান পা।

তবু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। মিলিয়ে যায় নি তাঁর সর্বক্ষণের সাথী—মুখের সরল সুন্দর হাসি!

যন্ত্রণার সামান্য অভিব্যক্তিও ফুটল না মুখে।

চার-পাঁচজন গ্রাম্য যুবক যতীন্দ্রনাথকে সযত্নে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে চললেন বাড়ির দিকে। পেছন-পেছন মরা বাঘ নিয়ে এগিয়ে এল বিরাট মিছিল।···সবাই বিহ্বল। নির্বাক। গর্বিত।···

ইষ্টমন্ত্র জপের ফাঁকে ফাঁকে মৃদুস্বরে যতীন্দ্রনাথ উৎসাহ দিচ্ছেন তাঁর সঙ্গীদের।

এমন-সময়, পথের দু-ধারের সমবেত জনতা ভেদ ক'রে ছুটে এল এক মুসলমান বুড়ি। হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে বুড়ি, "ও বেটা আমার, তুইও শেষ পর্যন্ত চ'লে গেলি আমায় রেখে?"···

যতই তাকে সবাই শান্ত করতে চেষ্টা করে, ততই অঝোরে কাঁদে বুড়ি বুক চাপ্‌ড়িয়ে।

বুড়ির মুখে শোনা গেল এক আজব কাহিনী।

কয়েক বছর আগের কথা। চৈত্র বৈশাখ মাস। প্রকাণ্ড গড়ুই নদীরও জল গিয়েছে শুকিয়ে, এমন খরা। প্রশস্ত সেই চড়ার ওপর ভর-দুপুরে বসে আছে বুড়ি। পাশে তার ধানের একটা বোঝা।

কাতর চিন্তিত হয়ে পড়েছে বুড়ি। বেলা বেড়ে যাচ্ছে।

কত লোক আসছে। যাচ্ছে। বুড়ি তাদের আকুল মিনতি জানাচ্ছে, "বাবা, আমার বোঝাডা মাথায় তুলে দে। ঘরে ফিরব। বেলা অনেক হল। একুড়া গরু ঘরে আছে, ঘাস-জল দিই নি তাকে। আমার বোঝাডা মাথায় তুলে দে, বাবা"!

কিন্তু বুড়ির আহ্বানে কে আর কান দেবে? পাশ কাটিয়ে যে যার মত চ'লে যাচ্ছে নিজের নিজের পথে। কারো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঘোড়ায় চ'ড়ে সেই পথে চলেছেন যতীন্দ্রনাথ।

সাহেব-মানুষ। সাহায্য চাওয়াই মিছে। বুড়ি তাই সাহস ক'রে তাঁকে আর অনুরোধ জানাল না। কিন্তু বুড়ির কাতর চিন্তিত চেহারা দেখেই ঘোড়া থেকে যতীন্দ্রনাথ নেমে পড়লেন। এগিয়ে গেলেন বুড়ির কাছে। জানতে চাইলেন, বুড়ি কী চায়।

বুড়ি ভয়ে ভয়ে তাঁকে বলল সব কথা। শুনে সহিসকে ডাক দিলেন

যতীন্দ্রনাথ।

বুড়ি ভাবল, সহিস বুঝি ওর মাথায় তুলে দেবে ওর বোঝা! যা-হোক একটা হিল্লে হবে তা' হলে এতক্ষণে।—

কিন্তু, নাঃ! বাবু তো সহিসকে সেসব কিছু বললেন না। সহিসকে শুধুমাত্র বললেন, "ঘোড়াটা তুই বাড়ি নিয়ে যা। আমি পরে আসছি।"…

তারপর, বাবু তুলে নিলেন বুড়ির বোঝাটা। বোঝা-ভরতি ধান—বেজায় ভারি! নিজের মাথায় বাবু যখন বোঝা তুলে নিলেন, বুড়ি থতমত খেয়ে গেল প্রথমটা। সাহেবের এ আবার কোন্ দেশী রগড় ?

বাবু ওদিকে একটু হেসে বুড়িকে ডাকলেন, "চল্ মা।…কোন্ পথে যাই ?"…

দামী চকচকে কোট পরণে। ভিজে নোংরা ধানের বোঝা চুইয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল ঝরছে গায়ে মাথায়। সেদিকে বাবুর হুঁস নেই। বুড়িকে কিনা ডাকছেন, "চল্ মা!…"

বুড়ির এমনিই শক্তসমর্থ এক ছেলে ছিল। তিন-কুলে আপন বলতে আর কেউ নেই। কিন্তু খোদার মর্জি! বুড়ির চোখের মণি—সোমত্ত সেই ছাওয়াল্‌কে খোদা টেনে নিলেন নিজের জিম্মায়!…

বাবুর মুখে অমন মিষ্টি 'মা' ডাক শুনে বুড়ির বুক কেঁপে ওঠে।…তবু, বাবুকে কিছুতেই সে বোঝাতে পারল না যে ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে যেতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না।

কিন্তু বুড়ির ওজর-আপত্তি না শুনে বাবু এগিয়ে চললেন ওর সঙ্গে সঙ্গে, সেই বোঝা মাথায়। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে বুড়ি ঘরের পথে পা বাড়ায়।

রাস্তার লোকে দেখে অবাক! ভদ্রলোকের ছেলের এ আবার কী সখ ?

ভর-দুপুরের প্রখর রোদে বুড়ির ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে তিন মাইল পথ গেলেন যতীন্দ্রনাথ। বুড়ির ঘর কাসিমপুর গাঁয়ে।

বুড়ির কুঁড়ের সামনে বোঝা নামিয়ে যতীন্দ্রনাথ বসলেন তার দাওয়ায়। দ্রবীভূত হৃদয়ে বুড়ি বলল তাঁকে তার সমস্ত দুঃখের কাহিনী।…বুড়ির আর কেউ রইল না। রইল একটা-মাত্র দুধেল গাই। বাড়ি বাড়ি তার দুধ বেচে কোনমতে দু-বেলার নুন-পান্তাটা জোটে তার।

"কই মা। আমার খিদে পেয়েছে যে!" ব'লে জোর ক'রে বাবু বায়না

ধরলেন, ওর ঘরে থাবেন। সূর্য তখন প্রায় হেলে পড়েছে পশ্চিমের আকাশে। জোর ক'রে বাবু খেলেন ওর ঘরের নুন-পান্তা। ওকে ব'লে এলেন, "মা, আমাকে তোর সেই হারানো ছেলে মনে করিস। যখন যা' চাই, বলিস।"

সেই থেকে মাসে মাসে যতীন্দ্রনাথ গিয়ে বুড়ির সঙ্গে দেখা ক'রে আসেন। তাকে দিয়ে আসেন হাত-খরচের টাকাটা, পরণের কাপড়-চোপড়।

তাই—বুড়ির কান্না আর থামে না আজ। উর্ধ্বশ্বাসে বুড়ি কাসিমপুর গাঁ থেকে ছুটে এসেছে, তার ছেলেকে রাধাপাড়ায় বাঘে কামড়েছে শুনে।...

একা বুড়িই নয়।

পথের দু-ধারে এমনি আরো-কত উপকৃতের ভিড়। অঝোরে কাঁদছে তারা। সবার মুখেই নতুন নতুন কাহিনী। প্রতিটি কাহিনীতেই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে জনপ্রিয় মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের বিরাট অন্তঃকরণের এক-একটা দিক।

যতীন্দ্রনাথের সঙ্গী যাঁরা, অবাক হন তাঁর এই জনপ্রিয়তার পরিচয় পেয়ে। তাঁর এই জন-হিতকর মহান ব্রতের ইতিবৃত্ত জেনে।

কতই বা যতীন্দ্রনাথের বয়স, আর কতটুকু সময়ই বা থাকেন তিনি গ্রামে ?

তাই বুঝি যতীন্দ্রনাথের দিদি বিনোদবালা দেবী লিখেছেন, "কোথাও কাহারও বিপদের কথা শুনিলে তিনি সর্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইতেন ; কখনও বা মুখের গ্রাস ফেলিয়া ছুটিয়া সেখানে যাইতেন। অতি শৈশব হইতেই তাঁহার প্রকৃতি এইরূপ ছিল। এ বিষয়েও তাঁহার জননীই তাঁহার আদর্শ ছিলেন।..."

বাড়ি এসে পৌঁছল মিছিল।

ওই অবস্থা দেখে বাড়ির লোক তো ভয়ে কাঠ। চণ্ডীমণ্ডপের দালানে যতীন্দ্রনাথের বিছানা পেতে দেওয়া হল। সেখানে তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হল।

"দিদি, দেখুন, আমি ফিরে এসেছি!" বলে হেসে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ, দিদির মনের ভয়টা যাতে কেটে যায় খানিক।

দিদি লিখেছেন, "তিনি তখন ৪।৫ জন লোকের স্কন্ধে রক্তাক্ত শরীরে মৃত

বাঘ সহ বাড়িতে ফিরিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সকলেই ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহার মুখে হাসি এবং অবিচলিত দৃঢ়তা বিরাজমান। ক্ষতস্থান হইতে দরদর ধারে রক্ত বিগলিত হইতেছে।

"তিনি বাড়ি পৌঁছিতেই লোকের স্কন্ধের উপর হইতে মাথা তুলিয়া তাঁহার স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতিকে ধীরে ধীরে অভয় দিতে লাগিলেন।

"জীবনে কখনও কোন শারীরিক বেদনা বা মানসিক দুর্বলতা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।..."

দিদি এসে পাশে বসলেন। যতীন্দ্রনাথ চেয়ে নিলেন তাঁর গীতা। চেয়ে নিলেন জপের মালা। চোখ বুঁজে স্মরণ করতে লাগলেন ভগবানের নাম। জপের মালা বুকে নিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

মামারা শশব্যস্ত হয়ে ডেকে আনলেন স্থানীয় কয়েকজন ভাল ডাক্তার।

দিদি লিখছেন, "ডাক্তারেরা যখন তাঁহার ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছেন, তখন যতীন্দ্রনাথ বলিলেন: আমাকে এই মুহূর্তেই কলিকাতা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা কর!"

বেলা তখন প্রায় দশটা।

কলকাতায় যতীন্দ্রনাথের মেজমামার কাছে তার করে দেওয়া হল।

ট্রেনের আর দেরি নেই। মরা বাঘটা সমেত, আহত যতীন্দ্রনাথকে তখুনি কলকাতা পাঠান হল। স্টেশনে পর্যন্ত দূর দূর থেকে লোক ছুটে এল, দাদাবাবুকে দেখবার জন্যে।

মেজমামা ডাঃ হেমন্তকুমার, আর তাঁর বন্ধু স্বনামধন্য ডাঃ সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারী ওদিকে কলকাতায় সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন। যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় পৌঁছতেই, ডাঃ সর্বাধিকারীর তত্ত্বাবধানে যতীন্দ্রনাথের অপারেশন সম্পন্ন হল।

সুরেশচন্দ্র চাইলেন যতীন্দ্রনাথের ডান পা-টি অপারেশন করে একদম বাদ দিয়ে দিতে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের আপত্তি দেখে মেজমামা ডাঃ সর্বাধিকারীকে নিবৃত্ত করেন। মেজমামা বললেন, যথাসাধ্য চেষ্টা করা হোক পা না-কেটেই চিকিৎসা চালানোর। কারণ যতীন্দ্রনাথের অসাধারণ মনোবল যে অঘটনও সম্ভব করতে পারে, তিনি জানতেন।

অপারেশনের পর। অবস্থা খারাপের দিকে। প্রলাপের ঘোরে দু-একবার বাঘের মত হুঙ্কার শোনা গেল যতীন্দ্রনাথের মুখে।

কোন-এক আত্মীয় সেই সময় যতীন্দ্রনাথকে দেখতে গিয়েছেন। হঠাৎ, অমন গর্জন কানে যেতে তিনি বিহ্বল হয়ে মূর্ছা যান।

তার একটু পরেই, জ্ঞান হল যতীন্দ্রনাথের। ব্যাপার দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন : এ-সব দুর্বল লোককে যে কেন আসতে দেওয়া হয় : ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও এখান থেকে !...

প্রায় ছ'মাস শয্যাশায়ী থাকলেন যতীন্দ্রনাথ।

ডাঃ সর্বাধিকারীর বিচক্ষণ অস্ত্র প্রয়োগে ও মেজমামার ঐকান্তিক যত্ন, চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় যতীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলেন তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির কল্যাণে। যতীন্দ্রনাথের ক্ষত সম্পূর্ণ শুকিয়ে না যাওয়া অবধি নিয়মিত ডাঃ সর্বাধিকারী এসে নিজে হাতে ক্ষতস্থান ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে পটি পালটে দিয়ে গিয়েছেন—সহকারীদের কারও হাতে ছেড়ে দেন নি তাঁর পরম আদরের ও গৌরবের এই রোগীটিকে।

দিদি লিখেছেন, "দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ যতীন্দ্রনাথের মহৎ জীবন আরও অধিকতর গৌরবের সহিত ভবিষ্যতে অন্যত্র অবসান হইবে বলিয়াই বোধহয় তখন ভগবান ঐ প্রকার মৃত্যুমুখ হইতে তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। নতুবা, যতীন্দ্রনাথ যে বাঘ মারিয়াছিলেন তাহা ক্ষুদ্র নহে। তাহার চামড়াখানি ডাঃ সর্বাধিকারীকে যতীন্দ্রনাথ উপহার দিয়াছিলেন।...

"এই বাঘ-মারা ব্যাপার হইতে তাঁহার জীবন রক্ষা হইলেও কিছুদিন তাঁহাকে crutch ব্যবহারে হাঁটিতে হইয়াছিল, পরে আবার তাঁহার পা সহজ সরল হইয়াছিল। পূর্বে যেমন হাঁটিতে দৌড়াইতে পারিতেন, তাহার পরেও তেমনি সরলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পথ হাঁটিবার এবং চলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।..."

দিদি বিনোদবালা এরপরে একটি কাহিনী শুনিয়েছেন, সহোদরের কষ্টসহিষ্ণুতার প্রসঙ্গে।

বাঘ মারবার কিছুকাল আগে, সরকারি চাকরিতে থাকাকালীন ঘটনা। "ছোটলাট একদিন হাজারিবাগ হইতে রাঁচি আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কর্মচারীগণ পুষ পুষ গাড়িতে আসিতেছিলেন। হাজারিবাগ হইতে রাঁচি সত্তর মাইলের উপর হইবে। যতীন্দ্রনাথ প্রায় সমস্ত রাস্তা হাঁটিয়া আসেন। তাহা দেখিয়া লাটসাহেব কেবলই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে থাকেন," দিদি লিখেছেন।

কাগজে কাগজে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সেদিন যতীন্দ্রনাথের বাঘ মারবার ঘটনা। ছড়িয়ে পড়ল একটি-মাত্র নাম: 'বাঘা যতীন'! ঘরে ঘরে আলোচিত হতে লাগল অসমসাহসিক বীরত্বের এই কাহিনী: মহাবীর যতীন্দ্রনাথের কাহিনী!

ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারী দীর্ঘ একটি ইংরেজি প্রবন্ধ লিখলেন, The Bengali Nemrod যতীন্দ্রনাথের অপূর্ব শৌর্য, অসাধারণ সহ্যশক্তি ও দেব-তুল্য চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে। সেই প্রবন্ধও জনসাধারণের চিত্ত হরণ ক'রে নিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে (যতীন্দ্রনাথের আত্মনিবেদনের অনতিকাল পরে) ডাক্তার সর্বাধিকারী পরম বীর যতীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার অভিপ্রায়ে বেঙ্গল রেজিমেণ্ট গঠন ক'রে ১৯১৬ সালে মেসোপটেমিয়ায় পাঠিয়ে দেন। এই সংবাদ সম্পূর্ণ সমর্থন করেন ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারীর উপযুক্ত পুত্র ডাঃ কনক সর্বাধিকারী।

বাংলা সরকারেরও টনক নড়ল।

ছোটলাটের সেক্রেটারি মিঃ হুইলার অত্যন্ত প্রীত ছিলেন কর্মক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথের আন্তরিক নিষ্ঠার দরুন, স্বভাবে চেহারায় তাঁর অসাধারণত্বের দরুন।

ছোটলাটকে দিয়ে মিঃ হুইলার বড়লাটের কাছে আবেদন পাঠালেন: বাঘের সেরা যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, তারই ইস্পাতের মত দুর্ভেদ্য খুলি একটা ছুরি দিয়ে যে-মহাবীর ভাঙতে পেরেছেন, সম্মুখযুদ্ধে নেমে হত্যা করেছেন সেই ন' ফুট লম্বা বাঘকে—তাঁকে সম্মানিত করা যে শৌর্যের উপাসক বৃটেনেরই মহান ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা।

ছোটলাটের উৎসাহে, বাংলা সরকারের তরফ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হল যতীন্দ্রনাথকে।

ছোটলাট স্বহস্তে যতীন্দ্রনাথকে অর্পণ করলেন বিরাট এক পদক: যতীন্দ্রনাথের বাঘ মারবার দৃশ্য তার ওপরে খোদাই করা!

বাংলার তথা ভারতের অন্যান্য বিপ্লবীদের পক্ষ থেকেও অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানানো হল যতীন্দ্রনাথকে। দেশের তরুণদের মনে জাগল নতুন উদ্দীপনা। যতীন্দ্রনাথের বীরত্বের সংবাদে, প্রবীণ বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, "মনে হল আগের যুগে বীর জন্মাত, আমার যুগে

কই জন্মায় ? এমন সময় ১৯০৬ সালে খবরের কাগজে বের হল একজন যুবক এক প্রকার খালি-হাতেই একটা বাঘ মেরেছেন। গৌরবে দশ বুক হাত হল। কারণ আমি বীরের যুগের লোক হয়ে গেছি।...তাঁকে সপ্রশংস নয়নে অনেকদিন দেখতাম। নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি যে আমার 'শূরবীর'—এই মমত্ববোধ তাঁর প্রতি আমার জন্মে গেল !..."

বাঘ মারবার পর যতীন্দ্রনাথের চিকিৎসার দরুন যে হাজার দুই-আড়াই টাকা খরচ হয়, তা' যতীন্দ্রনাথ পরে শোধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে, জনৈক মাড়োয়ারির কাছে তাঁর সে-সময় যে-ধার (১১০০ টাকা) ছিল, সেই টাকা তিনি পরম বন্ধু জনৈক লাহিড়ির হাত দিয়ে শোধ পাঠান। লাহিড়ি সেই টাকা আত্মসাৎ করে বন্ধু-বাৎসল্যের ও বীর-পূজার পাট সম্পন্ন করেন।

অথচ, যতীন্দ্রনাথের জনৈক শিষ্য বলেছেন যে, উক্ত লাহিড়ির সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের এত দূর ঘনিষ্ঠতা ছিল যে তার মাকে যতীন্দ্রনাথ মা বলতেন ! এবং সে-সময়ে বিভিন্ন source থেকে যতীন্দ্রনাথেরই পাওনা ছিল কয়েক হাজার টাকা।

রাইটার্স বিলডিং !

মাইনের দিন। সন্ধ্যা হয়-হয়। আণ্ডার-সেক্রেটারির অফিস থেকে যতীন্দ্রনাথ বার হলেন। পরণে ঝকঝকে স্যুট। আত্মভোলা উদাসী চোখ-মুখ।

রাস্তা পার হয়ে যতীন্দ্রনাথ পৌছন গিয়ে সামনের ফুটপাতে।

আপন মনে চলতে চলতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ান। লালদীঘির মোড়ের কাছে, একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে—কে ওটা ?

কাছে এগিয়ে যান যতীন্দ্রনাথ।...

তাই তো ! এ যে পরাণ : যতীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন সুরেশ মজুমদার।

"হ্যাঁ রে, পরাণ, এখানে তুই হঠাৎ ?...কী ব্যাপার ?" সুরেশের পিঠে হাত রেখে ব্যাকুল কণ্ঠে যতীন্দ্রনাথ জানতে চান।

একটু ইতস্তত করে অশ্রু-সজল চোখে সুরেশ জানায়, "দাদা, বাড়ি থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। বাবার দারুণ অসুখ। বেশ মোটা টাকা এখুনি না পাঠালে ডাক্তার এ-কেস হাতে নেবেন না বলে দিয়েছেন।...আমি এখন কী

করি, দাদা ? মোটা টাকা…কোথায় পাই ?…

"ওঃ, এই কথা ?"

মধুর হাসিতে যতীন্দ্রনাথের মুখ ভরে যায়। বলেন, "আমি ভাবছি—কী না কী হল শেষ পর্যন্ত। তা' কত টাকা চেয়েছে ডাক্তার ? হ্যাঁ রে ?"

সুরেশদের অবস্থা খারাপ। যতীন্দ্রনাথ ওকে প্রায়ই সাহায্য করেন। নিজের ছোট-ভাইয়ের মতন যত্ন করেন, দেখাশোনা করেন ওকে।

যতীন্দ্রনাথের মাইনের পরিমাণ সুরেশের অজানা নয়। ঠিক তত টাকারই তার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তা' নইলে তার বাবার—

নির্লিপ্ত মনে যতীন্দ্রনাথ সত্যিই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, বের করে আনলেন পুরু একটা সাদা খাম! ছাঁৎ করে উঠল সুরেশের বুক। মুখ তার ছাই-এর মত সাদা।

অন্য পকেটগুলো হাৎড়ে মুঠো-ভরতি আরো যা টাকা পেলেন, বের করে সবসুদ্ধ যতীন্দ্রনাথ ধরে দিলেন সুরেশের হাতে। বললেন, "বাবা কেমন থাকেন, জানাস কিন্তু!"

বলে নির্বিকারচিত্তে যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে চললেন নিজের গন্তব্য অভিমুখে।

সুরেশ তখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল ল্যাম্পপোস্টে ঠেস দিয়ে। যেন বজ্রাহত, গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাণহীন একটা দেহ।…

হঠাৎ সংবিত ফেরে সুরেশের।

"একি, দাদা যে ফিরে আসছেন আবার!" চমকে উঠে সে স্বগতোক্তি করল।

ওঁর কাছে এসে যতীন্দ্রনাথ হাত পাততেই সুরেশ মনে মনে বলল, "বুঝেছি! অত টাকা দিয়ে ফেলে নিশ্চয়ই পস্তাচ্ছেন। ফেরত নিয়ে যাবেন—"

"হ্যাঁ রে, পরাণ, পাঁচটা পয়সা দিতে পারিস আমায় ?" যতীন্দ্রনাথ বললেন, "ট্রামের ভাড়া নেই। একটু কাজ আছে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে!"

গুণে গুণে পাঁচটা পয়সাই দিল সুরেশ।

যতীন্দ্রনাথ হৃষ্টমনে চলে গেলেন পয়সা-পাঁচটি নিয়ে। সুরেশের মাথায় সব তালগোল পাকিয়ে গেল! যুগপৎ বিস্ময় আনন্দ অনুশোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার অন্তর।

"দাদা কি মানুষ নন ?" অস্ফুট স্বরে জাগে তার জিজ্ঞাসা!

পরদিন।—

যতীন্দ্রনাথের মেজমামার বাড়ি। শোভাবাজার। অন্যান্য দিনের মতই বন্ধু ও শিষ্যদের নিয়ে, সহকর্মী নেতাদের নিয়ে নানা আলাপ-আলোচনা করছেন যতীন্দ্রনাথ। সুরেশও সেখানে উপস্থিত।

এমন সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ এল।

যতীন্দ্রনাথ একটু অস্বস্তি নিয়ে উঠে গেলেন, "নাঃ, পাওনাদারটা বড়ই জ্বালাচ্ছে।" বলে বাইরের দরজা খুলতে যাবেন, এমন সময় সুরেশ তার আসন ছেড়ে উঠে এল, অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে যতীন্দ্রনাথের পথ আগলে দাঁড়াল।

সুরেশের চোখে জল।

ওদিকে পাওনাদার আরো জোরে কড়া নেড়ে ওঠে। যতীন্দ্রনাথ এই নাটকীয় পরিস্থিতি দেখে জানতে চান্ "কি রে পরাণ, কিছু বলবি? বাড়ির খবর আর-কিছু পেলি নাকি?"

তখন আগের দিনের সমস্ত টাকাটা সুরেশ যতীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়ে ফোঁপাতে লাগল ছোট ছেলের মতোই।

"দাদা, আমায় ক্ষমা করবেন!" বলে যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী এক নেতৃ-স্থানীয়ের নাম করল সুরেশ, তিনি তাকে আগের দিন লালদীঘির ধারে ওভাবে সুরেশকে পাঠিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করতে।

পাওনাদার সমানে কড়া নেড়ে চলেছে।…

"কী ব্যাপার রে? একটু খুলে বল্ দেখি? তোদের হেঁয়ালি আমি বুঝছিনে বাপু। কী হয়েছে?" যতীন্দ্রনাথ জানতে চান।

সুরেশ তখন বলে: "গতকাল সকালে আপনার খোঁজে আমি এসে-ছিলাম। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি, এমন সময় আপনার টেবিলে দেখলাম একটা চিঠি পড়ে। কৌতূহল হল। দেখি, বৌদির চিঠি। তোমায় লেখা।"

একটু চুপ করে সুরেশ বলে চলল, "নিজেরই অজান্তে চিঠিটা তুলে নিলাম। দেখি, বৌদি লিখেছেন যে, টাকার অভাবে সংসার আর চলে না। ছেলেদের পরণে কাপড় নেই। একফোঁটা দুধ জোগাড় করা যাচ্ছে না। চারিদিকে দেনা!"…

অসহিষ্ণু পাওনাদার এবার দরজা ধাক্কাতে লেগেছে। বাঙালী-বাবুকে

আজ বাগে পাওয়া গিয়েছে!…আত্মপ্রসাদে ওর বিক্রমও তাই বেড়ে গিয়েছে!

"আসছি, দাঁড়াও!" যতীন্দ্রনাথ হাঁকলেন।

"এদিকে এখানকার অবস্থাও আমার তো অজানা নেই! মাসের পর মাস আপনি মাইনের সব টাকাটাই তো প্রায় দিয়ে দিচ্ছেন সংগঠনের কাজে। তার ওপর একে ওকে তাকে পাঁচ টাকা দশ টাকা করে মাসোহারা দেবার কথাটাও তো আমার অজানা নেই!…"*

তারপর সুরেশ ইতস্তত করে বলল, "দলের দু-একজন আপনাকে পরখ করে দেখবার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন। এই অবসরে তাঁরা ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বেছে নিলেন আমায়। বললেন, দেখা যাবে, দাদা কত বড় দানী!…

"বুঝতেই পারছেন—বাবার অসুখের খবর মিথ্যে। আপনার কাছে কোনদিন মিথ্যে কথা বলতে হবে ভাবি নি। কিন্তু এঁদের প্ররোচনায় পড়ে—"

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ। বললেন, "যা, এখনকার মত এই ভূতটাকে তবে ঠাণ্ডা করে আয়!"

ঘরের আর-সবার মাথা তখন হেঁট।

তাই দেখে যতীন্দ্রনাথ বললেন, "এতে লজ্জার কি আছে? মন যখন চেয়েছে, যাচাই না-ক'রে নিলে কি চলে তখন?"

আবার সেই শিশুসুলভ হাসিতে তিনি মুছে দেন সবার মনের গ্লানি।

তাই বুঝি যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী ও সহকারী ডাক্তার যাদুগোপাল লিখেছেন, "মানুষ হয়তো পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু পূর্ণতার কাছাকাছি যাঁরা পৌঁছেছেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের স্থান সুনিশ্চিত। অনেকবার ভেবেছি, আমি কি মোহগ্রস্ত হ'য়ে গেলাম? তাঁর খুঁত খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছি।

*যতীন্দ্রনাথের অপর-এক শিষ্য সতীশ সরকার (নির্বাণ স্বামী) বলেছেন যে, এই সময়ে মামারা ও অন্যান্য গুরুজনেরা যতীন্দ্রনাথের পরোপকার ব্রত নিয়ে এত মাথা ঘামাতে শুরু করেন যে, যতীন্দ্রনাথ তাঁর মুখাপেক্ষী বহু ছাত্র, কেরানী ও স্বল্পবিত্তের যুবকদের ব'লে দিতেন বাগবাজারের মদনমোহনের মন্দিরে যেতে; সেখানে তিনি সবার অলক্ষ্যে এঁদের হাতে টাকা গুঁজে দিতেন। সতীশ সরকার পরপর কয়েক মাস এই ঘটনা লক্ষ্য করেন॥

"কিন্তু যতীন্দ্রনাথের চরিত্রে কোনো খুঁতই চোখে পড়ল না।"

এই সহকর্মীই যতীন্দ্রনাথকে অভিহিত করেছেন "রূপ-মূর্ত গীতা" ব'লে।

॥ আট ॥

১৯০৬ সাল।

বিদেশী রাষ্ট্রগুলি কে কি মনোভাব পোষণ করে বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে, তা' ঘনিষ্ঠরূপে লক্ষ্য করছেন যতীন্দ্রনাথ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি বিরূপ-মনোভাবসম্পন্ন সরকারগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, অস্ত্রপাতি সংগ্রহ ক'রে দেশে আনানো প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু বিপ্লবীকর্মীকে বিদেশ পাঠানোর পরিকল্পনাও করছেন যতীন্দ্রনাথ।

ইতালীয় বিপ্লবের ইতিহাস যতীন্দ্রনাথের নখ-দর্পণে। ভিক্তর এমানুয়েল, কাভুর, গারিবাল্দির কার্যকলাপ থেকেই সম্ভবত বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ।

কিন্তু বিদেশে কর্মী পাঠাতে গেলে প্রথমেই চাই অর্থ।

৪৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে 'অনুশীলন' স্থাপিত হবার সময় থেকেই যতীন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল সেখানে। এবং সেখানেই যাঁরা যতীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্ত হন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন মাগুরার শিক্ষক হীরালাল রায়। যতীন্দ্রনাথের প্রস্তাবক্রমে হীরালালবাবু যশোরের মাগুরায় গুপ্ত-সমিতির কাজ ত্বরান্বিত করতে থাকেন এবং ভূষণায় 'মহম্মদপুর সম্মিলনী' গ'ড়ে তোলেন।

যশোরে ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথের খুব অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু আউড়িয়ার কবিরাজ বিজয় রায় যথেষ্ট সক্রিয়। তাঁর নেতৃত্বের প্রতি স্থানীয় কর্মীদেরও গভীর আস্থা।

যতীন্দ্রনাথের অর্থের প্রয়োজন?—কথাটা কবিরাজ বিজয় রায়ের কানে গেল।

নড়াইলের জমিদারীতে অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারের কাজ করেন বিজয় রায়ের বিশিষ্ট অনুচর ইন্দুভূষণ মিত্র। বিজয়বাবুর নির্দেশে ইন্দুবাবু নড়াইল জমিদারীর এক লক্ষ এগারো হাজার টাকা এনে দিলেন বিজয়বাবুর হাতে,

এবং নিরুদ্দেশ হলেন।*

সেই অর্থের সমস্তটা বিজয়বাবু তুলে দিলেন যতীন্দ্রনাথের হাতে।

অর্থ সংগৃহীত হ'ল। এখন কর্মী নির্বাচনের প্রশ্ন।

হীরালালবাবু মাগুরায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাঁর স্বদেশ-প্রেমের জন্য। একদিন তাঁর স্কুলের ছেলেদের তিনি প্যারেড করাচ্ছিলেন। এই অপরাধে স্কুলের সম্পাদক স্থানীয় S. D. O. সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয় ও চাকরি যায়। স্বতই, এই ঘটনায় স্থানীয় সকলের শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেন এবং গুপ্ত-সমিতির কাজের দিক দিয়েও এতে তাঁর সুবিধা হয়। যথেষ্ট ভাল ভাল কর্মীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'য়ে যায়।

যতীন্দ্রনাথ এই ঘটনার পরেই হীরালালবাবুর কাছে একবার যাবেন বলেন।

১৯০৬ সাল। হীরালালবাবু 'সীতারাম উৎসব'-এর আয়োজন করলেন মাগুরা থেকে এগারো-বারো মাইল দূরে, রাজা সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুরে। মাঝে পড়ে একটা নদী।

'সীতারাম উৎসব' আয়োজনের কাজে হীরালাল রায়ের সহযোগিতা করেন ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। এই সুরেন্দ্র-নারায়ণবাবুও একজন 'চিহ্নিত' কর্মী: ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালের কন্‌ফারেন্সে যে-ভলান্টিয়ার্স দল অদ্ভুত কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন, সুরেন্দ্র-নারায়ণবাবু ছিলেন সেই দলের নায়ক! মহম্মদপুরে তাঁরই বাড়িতে ছিল হীরালাল রায়ের স্থানীয় কেন্দ্র।

যতীন্দ্রনাথ মাগুরায় পৌঁছলেন 'সীতারাম উৎসব' উলক্ষে। তাঁর সঙ্গে গেলেন বিপ্লবী কর্মী তারকনাথ দাস।

সীতারাম উৎসবের আয়োজন নিয়ে হীরালালবাবু ব্যস্ত ছিলেন মহম্মদপুরে। যতীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে মাগুরায় এসে, নিজের বাড়িতেই এঁদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তিনি মহম্মদপুরে ফিরে যান। তারক দাসের সঙ্গে হীরালালবাবুর কলকাতায় পরিচয় থাকলেও, আলাপ বিশেষ হয় নি। এবারে তাঁরা পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানলেন।

* দুর্ভাগ্যবশত, অবিলম্বে ইন্দুবাবু ধরা পড়ে যান এবং তাঁর তিন বছরের কারাদণ্ড হয়। সমাজে এই নিয়ে প্রচুর দুর্নামও তিনি ভোগ করেন। তবু, গুপ্ত-সমিতির নির্দেশ অমান্য ক'রে ভিতরের খবর তিনি জানান নি কখনো।।

মহম্মদপুরে ফিরে যাবার আগে হীরালালবাবু যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কয়েকটি স্নেহভাজন কর্মীর আলাপ করিয়ে দেন; সত্যেন সেন এবং শ্রীশ সেন তাঁদের অন্যতম।* এঁরা দু'জনে সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। যতীন্দ্রনাথের দেখাশুনার দায়িত্ব এঁদেরই ওপর ন্যস্ত ক'রে যান হীরালালবাবু। শ্রীশ ও সত্যেন তখন মোহিনী দেবীর বাড়িতে থাকেন।

এই সময়ে অধর লস্করও থাকতেন মাগুরায়। ইনি এবং সত্যেন সেন ছিলেন কবিরাজ বিজয় রায়ের একান্ত ভক্ত ও স্নেহভাজন কর্মী।

হীরালালবাবুর কাছে জানা যায়, খুব serious কিছু একটা আলোচনার জন্যে যতীন্দ্রনাথ এই সময়ে যাঁদের ডেকেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন তারক দাস, অধর লস্কর, শ্রীশ সেন এবং সত্যেন সেন। এ-আলোচনা সম্বন্ধে বিশদ কিছু জানবার অবকাশ হীরালালবাবুর হয় নি; কারণ ব্যক্তিগত জীবন ও ধর্মজীবন ছাড়া তার বাইরে যতীন্দ্রনাথ কাউকেই বড় বিশেষ কিছু বলতেন না, যখন যার যেটুকু কর্তব্য, তারই নির্দেশটুকু মাত্র দিতেন—হরিকুমার চক্রবর্তী, অতুল ঘোষ, ক্ষিতীশ সান্যাল 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর পবিত্র দত্ত, নলিনী কর প্রভৃতি যতীন্দ্রনাথের সহকর্মীরা সকলেই একবাক্যে এ-কথা বলেছেন। তা ছাড়া পলিটিক্স বা পরিকল্পনা কি কার্যসূচী নিয়েও কারো সঙ্গে তিনি আলোচনা তেমন করেছেন বলে যতীন্দ্রনাথের সহকর্মীদের কারো স্মরণ নেই। তাই ব'লে যতীন্দ্রনাথের মধ্যে যে frankness-এর অভাব, এ-অভিযোগ তাঁর অতি বড় শত্রুও কোনদিন করতে পারবেন না (যদিও শত্রু

* শ্রীশ সেন বাংলার অগ্নিযুগের প্রথম পর্বেই বিদেশ যান, প্রচ্ছন্নভাবে দলের বহু কাজ করেন। সেইসঙ্গে জার্মানীর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে Philosophy with Special Reference to Vedic Philology নিয়ে পড়াশুনো করেন। কিন্তু যুদ্ধ লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবী দলের মূল্যবান কিছু সংবাদ নিয়ে দেশে চ'লে আসেন—Doctorate-এর মমতা ত্যাগ ক'রে। পরে লক্ষ্ণৌ, লাহোর, অমৃতসর কলেজে অধ্যাপনা করতেন। এঁর Philosophy of the Upanishads বিশেষ পরিচিত গ্রন্থ। ডাঃ ভূপেন দত্ত এঁকে ভারতীয় বিপ্লবীদের 'বার্লিন কমিটি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন।

সত্যেন সেনের বাড়ি কুষ্টিয়ায়। মাগুরা ও কলকাতায় পড়াশুনো করেন। যতীন্দ্রনাথ এঁকেও বিদেশে পাঠান ১৯১১ সালে। ইনি কালিফোর্নিয়ায় ডাঃ তারক দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৯১৪ সালে জাপানে রাসবিহারী বসু ও ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের সঙ্গেও দেখা ক'রে দেশে ফেরেন; ওঠেন যতীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বউবাজারে কবিরাজ বিজয় রায়ের ডিস্পেন্সারীতে; এঁর সঙ্গে আসেন পিংলে। বিস্তৃত বিবরণ যথাসময়ে দ্রষ্টব্য॥—পৃথ্বীন্দ্রনাথ

তাঁর সে-যুগে কেউ ছিল ব'লে জানা যায় নি)!

তবে হীরালালবাবুর বাড়িতে ব'সে তারক দাস, অধর লস্কর প্রভৃতিকে যে বিদেশে পাঠানোর কথাই যতীন্দ্রনাথ আলোচনা করেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের আর কোনও অবকাশ থাকে না, যখন দেখি যে এর ঠিক পিঠ-পিঠই তারক দাস বিদেশ গেলেন, দু-চার বছরের মধ্যে অধর লস্কর, শ্রীশ সেন, সত্যেন সেন—সব ক'জনেই ইওরোপ নয়তো আমেরিকা গেলেন, এই বিপ্লবের কাজেও যখন তাঁদের জড়িত থাকতে দেখি বিদেশী সরকারের কাগজপত্রে।

মাগুরা থেকে মহম্মদপুরে 'সীতারাম উৎসব' পরিদর্শন ক'রে যতীন্দ্রনাথ ফিরে গেলেন কলকাতায়।

তারক দাস পাগড়ি বেঁধে 'তারক ব্রহ্মচারী' নাম নিয়ে ময়মনসিং চ'লে গেলেন; সেখানে উঠলেন গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের ড্রয়িং মাষ্টার রজনী চৌধুরীর বাড়িতে। এই রজনীবাবু ছিলেন ময়মনসিং-এর দলভুক্ত মণি চৌধুরীর পিসেমশাই। মণিবাবু ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে তারকবাবুর এখানে আলাপ; ময়মনসিং-এর নেতা, যতীন্দ্রনাথের বন্ধু হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরীর সঙ্গেও তারকবাবু এখানে রাজনীতি-সংক্রান্ত কিছু-আলোচনা করেন। তারকবাবু ও হেমেন্দ্রবাবুর সম্পর্ক খুবই অন্তরঙ্গ ছিল। বিদেশে যাবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও আলাপ করেন এবং শহরের বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা ক'রে এই উদ্দেশ্যে টাকাকড়িও সংগ্রহ করেন তিনি; গৌরীপুর, মুক্তাগাছা প্রভৃতির বড় বড় জমিদার-প্রধান জায়গাতেও যান।

তারপর কলকাতায় ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের বউবাজারের বাড়িতে তারক দাসকে দেখা যায় বাখু্ জেলার গণেশ দত্তকুমার প্রভৃতি বহু কর্মীকে right and left বিপ্লবের কাজে টেনেছেন। সরকারি রিপোর্টেও এর সমর্থন মেলে। পরে আমেরিকাতে এই কুমার ও সুরেন বোসকে দিয়ে তারক দাস United India House প্রতিষ্ঠা করেন। সে পরের কথা।

এরপর দেখি সন্ন্যাসীবেশে তারক দাস উপস্থিত হয়েছেন মাদ্রাজে। সেখানে বিখ্যাত উকিল চিদাম্বরম পিলাই-এর আতিথ্য তিনি গ্রহণ করেন প্রথমে। পরবর্তী কালের তিনেভেলি মামলার বিখ্যাত বিপ্লবী এই চিদাম্বরম পিলাই, সুব্রহ্মণ্য শিব, নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তারক দাসের কাছে দীক্ষা পান বিপ্লবের কাজে। এখানেও এই 'বাঙালী সাধু' যে প্রেরণার আগুন

জ্বালিয়ে দেন যুবমনে, আজও অনেকে তা' স্মরণে রেখেছেন। বিপিন পাল, শ্রীঅরবিন্দ এবং বিশেষত এই 'বাঙালী সাধু'র প্রভাবেই মাদ্রাজে প্রথম বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে ব'লে নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী দাবি ক'রে থাকেন। এবং এই 'বাঙালী সাধু' আসবার পরেই চিদাম্বরম পিলাই তাঁর "স্বদেশী স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী" স্থাপন করেন; কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত বিভিন্ন বৈপ্লবিক পত্রিকাতেও দেখা যায় উক্ত কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। বিভিন্ন ব্যায়ামাগার ও স্বদেশী কর্মের কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়।*

মাদ্রাজ থেকে জাহাজ নিয়ে তারক দাস জাপানে যান; সংগৃহীত অর্থই তাঁর পাথেয় ছিল ব'লে জানা যায়।

জাপান থেকে আমেরিকায় গিয়ে ইনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন এবং মিলিটারি ট্রেনিং-এর কোর্স গ্রহণ করলেন।†

এর কিছুকাল পরে অধর লস্করের বিদেশ যাত্রার পালা। পাথেয় সবটাই যতীন্দ্রনাথ দেন এবং যতদুর জানা যায় তারক দাসের জন্যেও অধরবাবুর হাতে যতীন্দ্রনাথ যথেষ্ট অর্থ পাঠান। এই টাকাতেই Free Hindusthan কাগজ কয়েক বছর চলে।

এর পরেই শ্রীশ সেন, সত্যেন সেন প্রমুখের বিদেশে যাবার পালা।**

১৯০৬ সাল। ডিসেম্বর মাস। নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবার প্রাক্কালে বিপ্লবীদের তরফ থেকে আমন্ত্রিত হ'য়ে লোকমান্য তিলক কলকাতায় এলেন। অজস্র প্রকাশ্য সভায় বিপ্লবীরা দাবি করলেন, কংগ্রেস অধিবেশনে লোকমান্য তিলককে সভাপতি করতে হ'বে।

কিন্তু নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জনমতের এই পরিস্থিতি দেখে টেলিগ্রাম ক'রে দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি হ'তে সম্মত করালেন। দাদাভাইও নরমপন্থী। তিনি রাজী হ'লেন।

* ডাঃ ভূপেন দত্তের 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে'ও এর উল্লেখ পাই—পৃথ্বীন্দ্রনাথ

† পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

** হাওড়া মামলার রেকর্ডে পাওয়া যায় ওই চার-পাঁচ বছরের মধ্যে (১৯০৬-১৯১০) যতীন্দ্র-নাথের নেতৃত্বে নদীয়া, খুলনা, ২৪ পরগণা, যশোর, হাওড়া, হুগলি, রাজসাহী, পাবনা, প্রভৃতি জেলায় বেশ বড় ধরণের দল গ'ড়ে ওঠে। তা'ছাড়া নরেন চাটুজ্যে, নরেন বসু (বেনারস) প্রভৃতি যান বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে কাজ করতে। এবং চেতলার চারু ঘোষ প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলী-বারুদ সংগ্রহ করেন। এইসবের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়।—পৃথ্বীন্দ্রনাথ

বিপ্লবীদের তরফ থেকে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, বৃটিশ এবং অন্যান্য বিদেশী শক্তির শাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা—স্বরাজ—অর্জন ক'রে স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র গঠন করাই হ'বে তাঁদের লক্ষ্য। এবং এই লক্ষ্যে পৌছবেন তাঁরা—যে ক'রেই হ'ক: নীতির দিক থেকে বাধবে না।

এবং কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বিপ্লবী মতবাদেরই প্রকাশ্য বিজয়-দুন্দুভি বেজে উঠল।

এই সময়ে—

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে বৈপ্লবিক-পার্টির প্রথম সম্মেলন আহূত হ'ল। সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র।

শ্রীঅরবিন্দ, মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী, অন্নদা কবিরাজ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য, বারীন ঘোষ, দেবব্রত বসু, ভূপেন দত্ত, কলকাতার অনুশীলন সমিতির সতীশ বসু, নদীয়া কেন্দ্রের প্রতিনিধি ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (যতীন্দ্রনাথের ছোট মামা), ময়মনসিং-এর পরেশ লাহিড়ি (মহাদেবানন্দ গিরি), ঢাকার পুলিন দাস, নিখিল রায় মৌলিক ('ছাত্রভাণ্ডার'), মেদিনীপুরের জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু (শহীদ সত্যেন বসুর দাদা), 'আত্মোন্নতি' সমিতির ইন্দ্র নন্দী, যশোহরের বীরেশ্বর ভট্টাচার্য (মাগুরা) প্রভৃতি কলকাতার ও বিভিন্ন জেলার কর্মীরা ও নেতারা এই সম্মেলনে উপস্থিত হ'য়ে বিপ্লবের বহুমুখী খাতকে একত্রে প্রবাহিত করবার কর্মসূচী স্থির করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ডাঃ ভূপেন দত্ত লিখেছেন*: "ডেলিগেটদের সনাক্ত করিয়া যোগদান করিতে দেওয়া হয়। বর্ধমানের বিভূতিবাবু পুলিশে কেরাণীর কর্ম করিতেন। ললিতবাবু (চট্টোপাধ্যায়) তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তিনি পুলিশে চাকুরি করেন। ইহাতে ললিতবাবু চেঁচামেচি করেন যে পুলিশের লোক ভিতরে ঢুকিয়েছে।

"এই সময়ে লেখক (ভূপেন দত্ত) বাহিরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি (যতীন্দ্রনাথ) তখন ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে সবে আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছেন। আমি তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে

* 'দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ডাঃ ভূপেন দত্ত॥

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, 'এখনও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠি নাই'। এই সময়ে ললিতবাবুর ব্যস্ততার কথা শ্রবণ করিয়া আমি তথায় যাই এবং হাসিয়া বলি, বিভূতিবাবু আমাদের লোক, আমি তাঁহার জন্যে guarantee হইতেছি।...

"তৎপর সভাপতি তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমেই সকলকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা discipline মানিতে রাজী আছেন কিনা?' সকলে একবাক্যে বলিলেন, 'আমরা রাজী আছি।' এই উত্তরের পর তাঁহার বক্তব্য তিনি বলিতে লাগিলেন। তিনি বাঙ্গলার বৈপ্লবিক কর্মের সর্ববিভাগের কথা বলিলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকার কথা বলিলেন এবং ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পরে, একটা নিভৃত স্থান ক্রয় করিয়া তথায় সামরিক শিক্ষা দিবার কথা উঠে। মিত্র-মহাশয় ইহাতে বিশেষ জোর প্রদান করিয়াছিলেন।...শেষের কথা উঠিল, কে কোন্ জেলার বিপ্লবের ভার গ্রহণ করিবেন। অনেকেই নিজ নিজ জেলার ভার লইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।..."

১৯০৭ সালের শেষেও দ্বিতীয়বার বৈপ্লবিক পার্টির অধিবেশন বসে। বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা নেতাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পার্টির পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারণ করেন এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতির রিপোর্ট পেশ করেন।

যতীন্দ্রনাথ রাণাঘাট যাচ্ছেন।

ট্রেনে—তৃতীয় শ্রেণীর আসনগুলো লোহার শিক দিয়ে ভাগ করা। যতীন্দ্রনাথের পিছন দিকের সিটেই চলেছেন বুড়ো এক ভদ্রলোক; সঙ্গে তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে।

পথের দু-ধারে ছুটে চলেছে গ্রামের পর গ্রাম। দৃশ্যের পর দৃশ্য।

হঠাৎ চমক ভাঙে যতীন্দ্রনাথের।

পেছনের সিট থেকে একটা গোলমালের আওয়াজ আসছে। তিনি ফিরে তাকালেন।

দেখলেন দু'জন সাহেব কখন কামরায় এসে উঠেছে। এবং, বসবি তো বস একদম ভদ্রলোকের যুবতী কন্যার দুই পাশ ঘেঁষে।

সাহেবদের ধারণা, এদেশে তাদের সাতখুন মাপ। তাই তারা অভদ্র রসিকতায় যুবতীর সম্বন্ধে আলোচনা করছে আর হাসছে মুখ বিকৃত ক'রে।

অসহায় বৃদ্ধ। সংরক্ষণশীল সমাজের মুখ চেয়ে কাতর মিনতি জানাচ্ছেন সাহেবদের কাছে। গাড়িসুদ্ধ সকলের কাছে জোড়হাতে অনুনয় জানাচ্ছেন, এই বিপদে তাঁকে রক্ষা করতে।

কিন্তু একচুল নড়েও বসল না কেউ।

"কেউই নেই তবে? অসহায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই সঙ্কটে কেউই আপনারা সাহায্য করলেন না? বাঙালীর মেয়ের এই লাঞ্ছনা আপনাদের কারো গায়েই লাগল না?"

কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ।

এই অবিচারের প্রতিবাদ জানাবার মত সাহস বাঙালীর বুকে আজো যে ভগবান দেন, তারই প্রমাণস্বরূপ যতীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন।

বৃদ্ধ তাকালেন যুবকের দিকে। মনে তাঁর আশার গুঞ্জরণ: গীতায় তো তবে মিথ্যা বলে নি—"যদা যদা হি ধর্মস্য!..."

গরাদের পিছন থেকে যতীন্দ্রনাথ ভরাট গলায় মার্জিত ইংরেজিতে সাহেবদুটিকে বললেন, "এত আসন থাকতে তোমরা এই অসভ্যতা করছ কেন? অন্যত্র উঠে গিয়ে বস!"

চকিতে সাহেবদুটো ঘুরে বসে অমন সুন্দর ইংরেজি শুনে।* তারপর, কালা আদমি দেখে দাঁত বের ক'রে তারা জবাব দেয়, "কেন বাবা, তোমার গায়ে লাগছে কেন? বেশ তো আছি। সাত-সমুদ্র পেরিয়ে এসেছি কি তোমার কাছে নীতি উপদেশ নোব বলে?"

অন্যজন টিপ্পনী কেটে বলে, "কালা মুখের বাড় দেখ না। উনি আমাদের

* যতীন্দ্রনাথের শিষ্য ভবভূষণ মিত্র (স্বামী সত্যানন্দ) লিখেছেন, "একটি ছোট্ট সভাতে প্রসিদ্ধ ওকাকুরা মিঃ এ চৌধুরীর ইংরেজী বক্তৃতা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, এইরূপ শুদ্ধ উচ্চারণ, বাগ্মিত্ব, প্রকাশভঙ্গী কোন ইংরেজের মুখেও শুনি নি। ঈশ্বর করুন জাপানকে যেন এই রকম ইংরেজী শিক্ষা না করিতে হয়।—স্থানটি ছিল কলিকাতা। সেই সভাটি ছিল গুপ্ত। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন মিঃ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ), পি মিত্র, কেরাণা বীর ফাইটার সেণ্ট মার্টার জ্যোতি মুখুজ্যে।..."

যতীন্দ্রনাথের ইংরেজিও ছিল এমনি। ভবভূষণবাবু লিখেছেন, "পোষাক-পরিচ্ছদ চাল-চলন ত্রুটিশূন্য। শুদ্ধ ইংরেজী—শুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া বলিতে পারিতেন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের উচ্চারণে—অর্থাৎ ফিরিঙ্গীদের উচ্চারণে যে ত্রুটি তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং ঠিক সেই রকম ভাবে উচ্চারণ করিয়া বক্তৃতা করিতেন এবং বন্ধুদের মধ্যে আনন্দ দান করিতেন। কেরিকেচার করিতে অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন।..."

হুকুম করছেন উঠে যেতে !…"

প্রথমটি অমনি যোগ দেয়, "আসুন না বড়াসাব, আপনার জায়গা ক'রে দি ?" ব'লে দু'জনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। যাত্রীরাও অনেকে উপভোগের ভঙ্গীতে চেয়ে থাকে যতীন্দ্রনাথের দিকে।

"আসছি। রোস তোমরা !" গর্জে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ !

তারপর, লোহার শিক সবলে ফাঁক ক'রে যতীন্দ্রনাথ ক্ষিপ্র গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাহেবদুটির ওপর। বাজপাখির মত ছোঁ মেরে তাদের একটির কলার চেপে তুলে ধরলেন এক হ্যাঁচকা টানে। আছাড় দিলেন তাকে কামরার মেঝেতে।

গুঞ্জন জাগল কামরায়।

অন্য সাহেবটা উঠে দাঁড়াতেই দুই থাপ্পড়ে ফাটিয়ে দিলেন তার গাল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে প্রথমে থতমত খেয়ে গিয়েছিল সাহেবদুটো। তারপর ঘোর একটু কাটতেই তারা একত্রে যতীন্দ্রনাথকে পাল্টা আক্রমণ করল।

যতীন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন। অচিরে তারা টের পেল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। রক্তাক্ত বদন, সাশ্রুনয়ন, ক্লেদাক্ত শরীর—সাহেবদুটোর হুঁস হ'ল, তারা নতজানু হ'য়ে ব'সে আছে যুবতীর পদতলে, আর যতীন্দ্রনাথ তাদের ঘাড় ধ'রে আদেশ করছেন—

"বাঁচতে চাও তো ক্ষমা ভিক্ষা কর। নইলে পিটিয়ে ছাল তুলে নেব !"

অগত্যা, নতি স্বীকার ক'রে সে-যাত্রা রেহাই পেল সাহেবদুটো।…

তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ ideal follow করলে তবে তখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা এভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিস, তা হ'লে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ করতে শিখবে।"

এই মহাপ্রাণতাই ছিল যতীন্দ্রনাথের চরিত্রে সহজাত।

॥ নয় ॥

দার্জিলিং চলেছেন যতীন্দ্রনাথ।

চাকরিতে পদোন্নতি হ'য়েছে। বেতনও বৃদ্ধি হয়েছে। যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী ভবভূষণ মিত্র লিখেছেন, "উপরওয়ালা সাহেবগণ যতীন্দ্রনাথের কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁকে একটা মেথর, চাপরাশী থেকে আর বড়সাহেব পর্যন্ত সকলেই ভালবাসিতেন।..."

যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আছেন দিদি বিনোদবালা, সহধর্মিণী ইন্দুবালা, এবং ছদ্মবেশে ভবভূষণ মিত্র এবং আরেকজন শিষ্য—তখন পুলিশের চোখে 'সন্দেহভাজন ব্যক্তি'। যতীন্দ্রনাথের ডাকে দার্জিলিং চলেছেন।

সেই ট্রেনেই একটি বৃটিশ রেজিমেণ্টও চলেছে দার্জিলিঙে। চারজন উচ্চপদস্থ অফিসার যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে। মাঝে মাঝে দু-একটা স্টেশনে অফিসার-চারজন নামছেন এবং ভবভূষণবাবুর ভাষায়, "পদগর্বে ও পদভারে মেদিনী কাঁপাইয়া সামরিক কর্মচারীদের ধারাতে পায়চারী করিতেছেন। একে সামরিক দল—তারপর 'তাঁহাদেরই' দেশ—এসব কালা আদমী, সবই অগ্রাহ্যের বস্তু!..."

যতীন্দ্রনাথের কামরায়, অপরিচিত এক যাত্রীর দারুণ জ্বর। বেচারা ছটফট করছে; একটু জল চেয়ে চেয়ে গলা দিয়ে তার আওয়াজ আর বের হয় না। চোখ-মুখ ডগডগ করছে লাল।

অতগুলো যাত্রী। যতীন্দ্রনাথ লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, কেউই গায়ে মাখছে না পীড়িতের এই আকুল আহ্বান।

বেচারার শুশ্রূষায় বসলেন যতীন্দ্রনাথ। সামনেই শিলিগুড়ি স্টেশন। কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ি সেখানে থামবে। দিদির কাছ থেকে একটা গেলাস নিয়ে যতীন্দ্রনাথ তৈরি থাকলেন।

গাড়ির গতি শ্লথ হ'য়ে এল।...

যতীন্দ্রনাথের শিষ্য ভবভূষণ এগিয়ে এসে গেলাসটি নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। গাড়ি থামতেই গেলাস নিয়ে ভবভূষণ চ'লে গেলেন জলের সন্ধানে।

ভবভূষণ ফিরছেন না। রোগীর অবস্থা ক্রমে কাহিল হ'য়ে আসছে। দিদির কাছে আর একটা গেলাস নিয়ে স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ গেলেন জল আনতে।

প্ল্যাটফর্ম ছেয়ে গিয়েছে মিলিটারি সাহেবে। তাদের হাসি-তামাসা হৈ-হল্লায় আর উৎপাতে ভীত সন্ত্রস্ত সমস্ত যাত্রী। কাঁটা হ'য়ে রয়েছে

সবাই।

যতীন্দ্রনাথ ছুটে চলেন জলের সন্ধানে।

সামনেই কল। গেলাসে টলমল ক'রে ওঠে স্বচ্ছ জল। রোগীর বহু-আকাঙ্ক্ষিত জল। এই মুহূর্তে অমূল্য তা'!...

জলের গ্লাস নিয়ে যতীন্দ্রনাথ ফিরছেন। ট্রেন ছাড়বার আর বিশেষ দেরি নেই।

প্ল্যাটফর্মের ঠিক মাঝখান আলো ক'রে মস্করা করছেন মিলিটারি অফিসার-চারজন। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের দণ্ডমুণ্ড-বিধানের চার বিধাতা। পরণে কেতাদুরস্ত মিলিটারি পোশাক।...

যতীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি আসছেন। হাতে গেলাস ভরতি জল। সাহেব-চারজন পথ আগলে দাঁড়িয়ে রসিকতা করছে। পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ।

হঠাৎ একজন অফিসার স'রে দাঁড়াতেই যতীন্দ্রনাথের গায়ে তার গা ঠেকে গেল।

দারুণ রাগে অবজ্ঞায় রুষে উঠল সাহেবের হাতের ছড়ি। 'কালো চামড়া'র ওপরে সপাং ক'রে বর্ষিত হ'ল ছড়ির আকস্মিক শাসন।

লাল হ'য়ে উঠল 'কালো চামড়া'।

জঘন্য সম্ভাষণ জাগল সাহেবের মুখে। এক পলকের জন্যে যতীন্দ্রনাথ ফিরে দাঁড়ালেন। হাতে তাঁর গেলাস ভরতি জল। কামরায় একজন রোগী একফোঁটা জলের জন্যে ছটফট করছে।...সম্মান বড় না কর্তব্য?...

সামনেই কামরা। মৃত্যুপথ-যাত্রীর করুণ প্রতীক্ষিত দৃষ্টির সামনে জলের গেলাস পৌঁছে দিয়েই তিনি ফিরে চললেন সাহেবগুলোর দিকে।

'নেটিভ'টাকে ফিরে আসতে দেখে কৌতুকে কুৎসিত হ'য়ে উঠল সাহেবদের মুখ। মুখব্যাদান-রত সেই কাপুরুষদের কাছে পৌঁছে চোখের নিমেষে যতীন্দ্রনাথ চেপে ধরলেন সেই অফিসারটির হাতের ছড়ি।

"মারলে কেন?"

এ-প্রশ্ন শুনে সাহেব-চারজন প্রথমে তো অবাক! একে সাদা চামড়া। তায় আবার সামরিক বীর। এই রকম কালা নেটিভদের তাঁরা যে মারবেন, তাতে আবার প্রশ্ন উঠবে কেন? অন্তত এ-দেশবাসীদের এবং সাহেবদের তো এ-ই চিরদিনের বদ্ধমূল ধারণা!

অতএব, জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না অফিসারটি। যতীন্দ্রনাথের চোয়াল লক্ষ্য ক'রে চালাল এক বিরাশী-সিক্কার ঘুঁষি।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে পাশে স'রে গিয়েই "একেবারে বাংলা চড় মেরে সাহেবকে ফেলে দিলেন সটান স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের জমির উপর" লিখেছেন ভবভূষণবাবু।

"দ্বিতীয় সেনানী এলেন ঐ রকম ঘুঁষি মারিতে। যতীন্দ্রনাথ ঐ রকম বাংলার চড় মেরে তাকেও একেবারে ভূতলশায়ী করলেন।*

"তৃতীয় সেনানী এলেন মারিতে। তিনিও ঐ রকম ভূমিশয্যা নিলেন অবলীলাক্রমে।

"তখন, বাঘ মেরে যতীন্দ্রনাথের একটা পা খোঁড়া হইয়া আছে—অন্য পা দিয়া একটি আঘাতে চতুর্থ অফিসারটিকে তিনি ভূমিসাৎ করিলেন।

"এমন সময় তৃতীয়-জন উঠিয়া সঙ্গিনের (বেয়নেটের) ছোড়া দিয়া যতীন্দ্রনাথের পায়ে আঘাত করিল।

"সেই সময় দিদি ও বৌদিদি যতীন্দ্রনাথের প্রাণের আশঙ্কা করিতেছিলেন।

"যতীন্দ্রনাথের বন্ধুটি 'সন্ন্যাসী'—যার পকেটে একটি ৪৫০ বোরের রিভলভার ছিল। তাহা লইয়া তিনি কেবলমাত্র উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

"যতীন্দ্রনাথের অন্য বন্ধুটির হাতে অনেকগুলি বাঁশের লাঠি দার্জিলিঙের ক্লাবের জন্য।

"কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তাহাদিগকে একবার রূঢ়ভাবে বলিলেন: 'তোমরা যেমন আছ, তেমনিই থাক। নড়চড় করিও না!'...

এমন সময় অকুস্থলে মিলিটারি পুলিশ হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়ল। অফিসার-চারজনকে নিরস্ত ক'রে তারা যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করল বৃটিশ রেজিমেণ্টের সঙ্গে মারপিটের অভিযোগে।

* যতীন্দ্রনাথের শিষ্য অতুল ঘোষের কাছে শুনেছি, "প্রথম দৃষ্টিতে সাধারণ বাঙালীর চেয়ে খুব পৃথক লাগত না যতীন্দ্রনাথের চেহারা। তাঁর ওই অমিত বিক্রম আসত যেন কোন্ অদৃশ্য লোক থেকে। আর সেই বিক্রমকে, দেহের সমস্ত সামর্থ্যকে যতীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে একাগ্র ক'রে ফুলতে পারতেন তাঁর যে-কোনও অবয়বে, দেহের যে-কোনও অংশে—এমনি ছিল প্রচণ্ড তাঁর ইচ্ছাশক্তি; তাঁর হাতের একটি আঘাতই ছিল যথেষ্ট সাজ্ঘাতিক।"

যতীন্দ্রনাথ বললেন: "তা' বেশ! তবে আসছে কাল আমার অফিসে জয়েন করবার দিন। ফলাফল বুঝে যা' ভাল বোঝ, কর!"

"ও অঞ্চলে যতীন্দ্রনাথ বাঙালী ও ইংরেজদের সবারই পরিচিত ও প্রিয়", লিখছেন ভবভূষণবাবু। "তিনি দার্জিলিং ক্লাবের সদস্য ও ভাল খেলোয়াড়। স্বয়ং পুলিশ অফিসার যখন যতীন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিলেন, তিনি বলিলেন: সেকি, আপনার এই কাজ?"*

'যতীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন—'আমি যাহা করিয়াছি, কোন আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন ভদ্রলোকই তাহা এড়াইতে পারিতেন না।'

"ব্যক্তিগত জামিনেই যতীন্দ্রনাথ দার্জিলিং গেলেন।"

যাবার আগে নিজের নাম-ঠিকানা সমেত কার্ড দিয়ে অফিসার-চারটিকে যতীন্দ্রনাথ বললেন, "চাও যদি, দার্জিলিঙে গিয়ে খোঁজ নিও আমার।"

স্তম্ভিত বিমূঢ় জনতা ভেবে পেল না—একজন বাঙালী যুবক কোথা থেকে পেলেন প্রাণে-মনে এই অসুরের উদ্যম, অসুরের বল?

"এদিকে, 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার', আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার 'বঙ্গবাসী' (তখনকার পুরনো বাংলা কাগজে)—যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে দৈনিক ও সাপ্তাহিকভাবে ইংরেজী ও বাংলায় প্রবন্ধ ছাপিতে লাগিলেন।" লিখেছেন ভবভূষণবাবু। "যুবকদল যতীন্দ্রনাথের এই কীর্তিতে বিশেষ গৌরব বোধ করিতে লাগিল এবং জড়তা ত্যাগে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ কেহ জানেন না যে তিনি বিপ্লবী নেতা।"

দেশের সর্বত্র কাগজে কাগজে এই সংবাদ দেখে যতীন্দ্রনাথের বড়মামা দার্জিলিঙে টেলিগ্রাম করলেন, "কী ব্যাপার, জানাস্!"

* স্বামী সত্যানন্দ (ভবভূষণ মিত্র) কয়েক বছর পরের একটি ঘটনা সম্বন্ধে লিখেছেন, "আমি জনৈক সি আই ডি এবং জনৈক বড় পুলিশ কর্মচারীর আলোচনা নিজ কানে শুনিয়াছি। প্রথম জন বলেন: 'যতীন মুখার্জি ক্রাইম করিতে পারেন এ-বিশ্বাস আমি করিনে!'...অন্য পুলিশটি বলিলেন: 'বাস্তবিকই মুখার্জি একজন অদ্ভুত মানুষ!'...

"এ-সব কথা নীরবেই তাঁহারা আলোচনা করিতেছিলেন—কোন মৎলব তাঁহাদের ছিল না। আমিও বলিব, যতীন্দ্রনাথকে আমার চেয়ে বেশি কেহ জানেন, এ-কথা বলিলে আমার ঈর্ষ্যা হইবে।' যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঐ পুলিশ কর্মচারীদ্বয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমি বিশ্বাস করি। এঁদের একজন ছিলেন রায়বাহাদুর বিনোদ গুপ্ত—যিনি শ্রীঅরবিন্দের হাতে হাতকড়া দিয়েছিলেন। অপর ব্যক্তি ছিলেন রায়বাহাদুর পূর্ণ লাহিড়ি।...বাঙালী চিরকাল ঘৃণার সহিত ইঁহাদের কথা স্মরণ করিবে"॥

ফিরতি টেলিগ্রামে যতীন্দ্রনাথ জবাব দিয়ে দিলেন, "Four military aggressors along with Captain Murphey substantially taught" —"কাপ্তেন মার্ফে সমেত সামরিক বিভাগের চারটে আততায়ীকে উত্তম-মধ্যম লাগিয়ে দিয়েছি।"

দিন-কয়েক হাসপাতালে থেকে, সাহেব-চারটে গেল দার্জিলিঙে। যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনল ফৌজদারী মামলা।

যতীন্দ্রনাথের বড়মামা বসন্তকুমার গবর্নমেণ্ট প্লীডার। ভাগ্নেকে তিনি পরামর্শ দিলেন, "চালিয়ে যা মামলা। পিছ-পা হ'স্‌নে!"

ভারতীয় ইংরেজদের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' উঠতে-বসতে ভারতীয় 'অসভ্য'দের দণ্ডবিধান করতে সদাই উদ্যত। তাঁদের গরম গরম ইংরেজি প্রবন্ধ বের হ'তে লাগল, কালা আদ্‌মির ঐ ধৃষ্টতার সমুচিত শিক্ষা দেবার উস্কানি সমেত।

ভবভূষণবাবুর জবান: "কোর্টে সাহেব মারা বিচার তখন চলছিল। বিচারের সময় হাকিম ঐ সেনানী চতুষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা চারজন বৃটিশ সামরিক কর্মচারী। একজন বাঙালী যুবক তোমাদের ন্যায় চারজন সামরিক কর্মচারীকে মেরে আহত ক'রে—দাঁত ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন জমিতে। এইসব কলঙ্কজনক ব্যাপার। দেশে এখন নানা গোল-যোগ। কাগজওয়ালাগণ নানাভাবে বৃটিশ সামরিক কর্মচারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছে। তোমাদের এই মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া উচিত নয় কি?'

"সত্যসত্যই জজের এই উক্তি সত্য।"...

"তখনকার প্রসিদ্ধ ইংরেজ-চালিত—বাঙালীর ও ভারতবাসীর চিরশত্রু 'ইংলিশম্যান' কাগজ—লিখিয়াছিল: 'বাঙালী কেরাণী কী ঘৃণ্য জীব—এই ঘৃণ্য লজ্জাজনক কথা কোর্টে নালিশ করে?'...

" 'অমৃতবাজার', 'বেঙ্গলী'র মত সম্ভ্রান্ত ইংরেজী কাগজের কথা বলিতেছি না—তদানীন্তন 'বঙ্গবাসী'র 'পঞ্চানন্দ'—'ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখিয়াছিলেন: 'এবার কেরাণী যতীন মুখার্জী মুষল হয়ে বেরিয়েছেন। এখন ইংরেজ-জাতির এই কলঙ্কজনক মামলা করা উচিত কি?'...তিনি ঐ রকম একটা হাস্যজনক ও মর্মবিদারক উক্তি করিয়া ইংরেজ-জাতির চৈতন্য উদয় করিতে এবং বাঙালী তথা ভারতবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

" 'অমৃতবাজার'-এর মতিলাল ঘোষও তখন প্রচুর লেখালেখি করিয়াছিলেন।..."

শোনা যায়—বাংলার গভর্নরের সেক্রেটারি মিঃ হুইলারও যতীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে অফিসার-চারজনকে আড়ালে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। তার ওপরে, আদালতে যখন জজসাহেব স্বয়ং মামলা তুলে নিতে চাপ দিলেন অফিসার-চারজন বেগতিক বুঝে নরম হ'ল।

কিন্তু তবু তাদের শঙ্কা যায় না।

"আমরা কেস্ তুলে নিতে পারি। কিন্তু মিঃ মুখার্জি যদি proceed করেন ?"

তক্ষুণি যতীন্দ্রনাথ কোর্টকে বললেন "আমি কেন আবার কেস্ চালাতে যাব ? আমাকে অপমান করা হয়েছিল, আমিও তার পাণ্টা জবাব দিয়েছিলাম।"

মামলা তুলে নেওয়া হ'ল।

এবং এই ঘটনার পরই যতীন্দ্রনাথকে দার্জিলিং থেকে কলকাতার দপ্তরে বদলি করা হল সাত-তাড়াতাড়ি।

কিন্তু, শোনা যায়, সে-বার যতীন্দ্রনাথকে তিন বছরের জন্যে দার্জিলিং পাঠানো হয়েছিল স্থানীয় দপ্তরের বিশেষ দায়িত্ব সমেত। তদনুযায়ী যতীন্দ্রনাথ একটা বাড়ি তিন বছরের লীজ নিয়েছিলেন।

তিনি ওপরওয়ালাকে জানালেন "আমি তিন বছরের জন্যে লীজ নিয়ে বাড়ি ভাড়া করেছি। সরকার তিন বছরের জন্যে এখানে স্থায়িভাবে আমাকেই নিযুক্ত করেছিলেন যে ?..."

কর্তৃপক্ষ তখন এই বাড়িওয়ালার খোঁজ ক'রে তাকে ডেকে সব মিটমাট করতে বাধ্য হ'ন। এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ক'রে তারপর যতীন্দ্রনাথের বদলির আয়োজনে হাত দিলেন।

এই ঘটনার পরে একদিন হুইলার-সাহেব রহস্য ক'রে যতীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, মুখার্জি, তুমি একা-হাতে ক'জনকে ঘায়েল করতে পার, বলতো ?"

রহস্য করেই যতীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, "যদি ভাল লোক হয়, একজনের সঙ্গেও লড়তে পারি না। কিন্তু অসংখ্য দুষ্টের দমন আমি একা-হাতেই করবার সামর্থ্য রাখি !"

ফিরতি পথেরও কতক বর্ণনা দিয়েছেন ভবভূষণবাবু।

"যতীন্দ্রনাথ সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

"বেশ আসিতেছেন। এমন সময় শিলিগুড়ি স্টেশনে পুলিশ ও পল্টন আসিয়া যতীন্দ্রনাথের গাড়ি তল্লাস করিতে লাগিলেন।

"যতীন্দ্রনাথ বলিলেন: 'ব্যাপার কি?'

"পুলিশ উত্তর করিল: 'চীফ সেক্রেটারীর অর্ডার—অমুক ইংরেজ কর্ম-চারীর রাইফেল চুরি গিয়াছে; ভুলক্রমে আপনার কাছে থাকে যদি, তবে আপনাকে ধৃত করিতে হইবে, ইহাই হুকুম।'

"যতীন্দ্রনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন: 'তা' বেশ! কিন্তু গাড়ি ফেল হ'তে পারি যে? জিনিস-পত্র সব গাড়িতে চড়িয়ে তল্লাস করুন। অন্যথায় দুই পক্ষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা।'

"যতীন্দ্রনাথ সর্বজন-পরিচিত। পুলিশগণও যতীন্দ্রনাথকে জানেন। তাই বিনা দ্বিধাতে—দ্রব্যাদি অন্য গাড়িতে উঠাইয়া তবে বিশেষভাবে তল্লাস হইতে লাগিল।

"যতীন্দ্রনাথের এক বন্ধু আসিয়া বলিলেন: 'ওরে, আমার ওখানে খেয়ে যাবি।'

"যতীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন: 'কি খাওয়াবি?'

"বন্ধু বলিলেন: 'গরম ভাত এবং ভাল ফাউল কারী!'

"যতীন্দ্রনাথ জবাব করিলেন: 'ভাই, অনেক দিন থেকে নিরামিষ হবিষ্যান্ন করছি!'

"বন্ধুটি বলিলেন: 'ও! তাই বুঝি তোর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা?'

"যতীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন: 'হ্যাঁ। মন্ত্র নিয়েছি!'*

---

* যতীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ভবভূষণবাবু অন্যত্র লিখেছেন: "...তিনি একটি উজ্জ্বল কোহিনুর। গৃহস্থ, ভক্ত, বিশ্বাসী, বিপ্লবী, সংযত যুবক—অত্যন্ত সুরসিক—হাস্য-পরিহাসরত। কবিতা লিখতে—গদ্য রচনাতেও সুনিপুণ হস্ত, দিদি বিনোদবালার মত।...

"প্রথম জীবনে ও কর্মজীবনে, যাঁরা তাঁহাকে না জানিতেন, তাঁহারা দেখিয়া ভাবিতেন—অত্যন্ত বাবু, বিলাসী বুঝি। তাহা একেবারে ভুল। সুট পরিতেন, পাগড়ি বাঁধিতেন, ধুতি পাঞ্জাবীও পরিতেন।...

"দীর্ঘকাল নিরামিষ ভোজন করিতেন। সুট পরিবার সময় রুদ্রাক্ষ কণ্ঠাতে থাকিত। কখন কখন খুব ছোট্ট একটি লেডীজ পিস্তল, ৩৪০ বোরের—হাতীর দাঁতের হাতলওয়ালা, খুব ছোট—

মামলা-মোকদ্দমা, বদলির হাঙ্গামা, অফিসের কাজ, সংসার, সংগঠনের দায়িত্ব—এত সবের মধ্যেও কীভাবে যতীন্দ্রনাথের ঘটনাবহুল জীবনের অতল-স্রোত প্রাণ-প্রবাহ বয়ে চলেছিল দুর্যোগময় এই পর্বেও, তার দু-তিনটি টুকরো ছবি দিই।—

দার্জিলিঙের পথে চলেছেন যতীন্দ্রনাথ।

হন্তদন্ত হয়ে একটি কিশোর এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে: "আপনিই তো শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়?"

"হ্যাঁ ভাই", ছেলেটার চোখে আগুনের ফুলকি দেখে সস্নেহে যতীন্দ্রনাথ জবাব দেন, "কেন, বলতো?"

"বারীনদা বলেছিলেন, আপনি আমায় সাহায্য করতে পারেন?"

"কোন বারীনদা?"

"বিপ্লবী বারীন ঘোষ। আমার নাম প্রফুল্ল চাকী। মানিকতলার বোমার বাগানে কাজ করতে এসেছি। আপনাকে তো আমি রংপুরে দেখেছি।"

"তা তুমি কি করতে চাও, ভাই?" প্রফুল্লর পিঠে হাত রেখে যতীন্দ্রনাথ জানতে চান।

"আমি এসেছি স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারকে মারতে। আপনি আমায় সাহায্য করবেন না?"

প্রফুল্লকে যতীন্দ্রনাথ বাড়ি নিয়ে যান। সযত্নে খাইয়ে-দাইয়ে বিশ্রাম করিয়ে তাকে বললেন, "তোমায় সাহায্য আমি করব। কিন্তু এখনো যে ও-কাজের সময় হয় নি! হলেই তোমায় বলব। এখন তুমি কলকাতায় ফিরে যাও।"*

জনৈক বন্ধু চুরি করে দিয়াছিলেন—দীর্ঘকাল কণ্ঠে সর্বদা ধারণ করিতেন একটা ছোট্ট হরিনামের ঝুলির মধ্যে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন: উহাতে শিবপূজা করি। সর্বদা সেই ঝুলির মধ্যে ছোট্ট গীতা থাকিত।...

"কিছুদিন খুব নৈষ্ঠিক ছিলেন। মুরগী খেতেন না। বাড়িতে দার্জিলিঙের দুইশত কাপ চা হইত—তখন এক কাপও খান নি। চুরুট খান নি। আবার চুরুট চা ধরেন। এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মুখভার দেখে—একদিনেই ছাড়িয়া দিলেন।"...

* পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে প্রকাশিত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্মৃতিকথা' (পৃঃ ৩৫০) দ্রষ্টব্য।

—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে বাঁধা পড়ে গেল প্রফুল্ল চাকী। বুক-ভরা অসীম ভরসা আর আনন্দ নিয়ে সে ফিরে গেল কলকাতায়।

একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছি, এই প্রফুল্ল চাকী বারবার ছুটে যেতেন যতীন্দ্রনাথের কাছে—যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেই।

দার্জিলিং।

ছোটলাটের খাস-কামরায় কি একটা কাজে যতীন্দ্রনাথ নিবিষ্ট। নির্জন কামরা। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ শর্টহ্যাণ্ডে লিখিত নোটের পাঠোদ্ধার করছেন।

ঘরে এসে ঢুকল একটা বেয়ারা।

বাবু কাজ করছেন দেখে সে খানিক দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু বিশেষ বিব্রতভাবে তারপর সে এগিয়ে গেল যতীন্দ্রনাথের দিকে।

"বাবু!" অস্ফুট স্বরে বেয়ারা ডাক দিল।

"কিরে? কী বলছিস?" মুখ তুলে যতীন্দ্রনাথ জানতে চান।

বেয়ারাটা বলল: অফিসের ক্লার্ক ভগবতী চাটুয্যের বড় ছেলের বসন্ত হয়েছে। ভগবতীবাবুরা কেউ বাড়ি নেই। দার্জিলিঙের বাইরে গিয়েছেন। ছেলেটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কোন প্রতিবেশীই তার ঝক্কি ঘাড়ে নিতে চাইছে না বলে সে ছুটে এসেছে তাঁর কাছে।

"একা পড়ে আছে বেচারা?" কাজ থামিয়ে যতীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। "দেখি কী করতে পারি", ব্যগ্র স্বরে বললেন। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভগবতীবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখেন, বেয়ারার কথা সত্যি। স্মল-পক্সে আক্রান্ত রোগী যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। ধারে-কাছে জনপ্রাণী নেই।

ব্যথিত হয়ে যতীন্দ্রনাথ ছেলেটাকে তখুনি নিয়ে চললেন নিজের বাড়িতে। নিজের বিছানায় তাকে শুইয়ে দিয়ে শুরু করলেন তার শুশ্রূষা। অষ্টপ্রহর তার শয্যাপার্শ্বে বসে সেবা করলেন। যথারীতি চিকিৎসার কোনও ত্রুটি রাখলেন না।

ছেলেটা সেরে উঠল। পথ্যি করল।

ভগবতীবাবুরা ফিরে এলেন। যতীন্দ্রনাথ ছেলেটিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলেন। কৃতজ্ঞতায় যতীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরলেন ভগবতীবাবু।

ছেলেটারও দু-চোখে অশ্রু।

দিদি বিনোদবালা লিখেছেন, "তাঁহার জীবনের কার্যকলাপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি যে কেবল শারীরিক বলেই বলীয়ান ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার মানসিক বল এবং উদারতা অপরিসীম ছিল। রোগীর শুশ্রূষা করিতেও তিনি অসাধারণ ছিলেন।...

"এইরূপ রোগীর শুশ্রূষা তিনি অনেক স্থলেই করিয়াছেন। বসন্তের রোগী, নিউমোনিয়ার রোগী লইয়া তাঁহার একাদিক্রমে পনেরো-কুড়ি দিন বিনিদ্রভাবে রাত্রি কাটিয়া গিয়েছে। আহার নিদ্রা ভুলিয়া তিনি একান্তে রোগীর সেবা করিয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া দিয়াছেন। নিয়ত কঠোর পরিশ্রমেও কখনো ক্লান্তি বোধ তাঁহার ছিল না।

"প্রাণে কি বিশাল উদারতা লইয়াই তিনি কর্মক্ষেত্রে জীবনকে সর্বদিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন।..."

দার্জিলিং। ১৯০৭ সালেরই কথা।

যতীন্দ্রনাথ একদিন সন্ধ্যেবেলা বেড়িয়ে ফিরছেন। অসম্ভব মেঘ করেছে। দারুণ ঠাণ্ডা। কুয়াসায় ঢেকে গিয়েছে চারিধার।

পথের ধারেই একটা বাড়ি থেকে বেজায় হৈ-চৈ শুনে থমকে দাঁড়ালেন যতীন্দ্রনাথ।

এগিয়ে গিয়ে দেখলেন—বাড়ির সামনে বেশ ছোটখাট একটা ভিড় জমেছে। উত্তেজিত জনতা। মাঝখানে উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার এক বাঙালী যুবক। কয়েকজন মহিলা চেঁচামেচি করে কী বলছেন, আর দু-চার ঘা কিল চড় সবে বর্ষিত হতে শুরু হয়েছে ছেলেটার ওপর। কেমন যেন দিশেহারা তার ভাব!

যতীন্দ্রনাথ ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। "কী ব্যাপার মশাই?" জিজ্ঞেস করলেন গৃহস্বামীকে। গৃহস্বামী তাঁর পূর্বপরিচিত।

যতীন্দ্রনাথকে দেখে জনতার উত্তেজনা একটু স্তিমিত হল। তিনি সবাইকে থামিয়ে ঘটনাটা শুনলেন প্রথমে। গৃহস্বামীর কাছে জানা গেল: ভর-সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ তাঁর স্ত্রী দেখেন, চেনা নেই শোনা নেই, এই লোকটা শুয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে, ভদ্রলোকের বিছানায়।

তাঁর চেঁচামেচি শুনে লোকজন সবাই ছুটে এসেছে শয়তানটাকে

শায়েস্তা করতে।

যুবকের চেহারাটা কিন্তু খুব শয়তানের মত ঠেকল না যতীন্দ্রনাথের কাছে। বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে বলে মনে হল। যুবকের আদর্শবাদী চেহারা দেখে আকৃষ্ট হলেন যতীন্দ্রনাথ।

গৃহস্বামীকে বললেন, "দিন মশাই, ওকে আমার হেফাজতে দিয়ে দিন। যা ব্যবস্থা করবার আমি করব।"

সরকারি উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী যতীন্দ্রনাথ। তার ওপর দেশজোড়া তখন তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে পড়েছে। গৃহস্বামী তাঁর হাতে ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

যেতে যেতে ছেলেটার কাছে শুনলেন, তার নাম ফণী চক্রবর্তী। সম্পর্কে বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারিক বিদ্যাভূষণ মশাইয়ের নাতি। দার্জিলিঙে বেড়াতে এসেছে। বাড়ি চব্বিশ পরগণায়।

"ও বাড়িতে গিয়ে ঢুকলে কেন হঠাৎ?" যতীন্দ্রনাথ তাকে প্রশ্ন করলেন।

সঙ্কুচিত হয়ে ছেলেটা যা বলল, শুনে সজোরে হেসে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ। —বেচারা একটু-আধটু সিদ্ধির নেশা করে। সেদিনও সিদ্ধি খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। কিন্তু বেজায় ঠাণ্ডায় ভারি ঘুম ঘুম পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নেশার ঘোরে কখন গিয়ে পথের ধারের ওই বাড়ি চোখে পড়েছে, সামনেই অমন সুন্দর বিছানা পাতা আছে দেখে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, বেচারার খেয়াল নেই।

তারপর মহিলারা টের পেয়ে চেঁচামেচি করেন। তাতেই ওর এই নাজেহাল অবস্থা।

ফণীকে যতীন্দ্রনাথের ভাল লেগে গেল।

বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাঁকে পরিপাটি করে খাইয়ে-দাইয়ে তোয়াজ করে রেখে দিলেন ক'দিন নিজের কাছে।

ফণী যতই দেখেন তাঁর বিপদের দিনের এই আশ্রয়দাতাকে, ততই অবাক হন: এ সাধারণ মানুষ নাকি? সংসার করছে, তবু সংসারী নয়। সরকারি চাকরি করছে, তবু কথায়-বার্তায় বেপরোয়া স্বাধীন চিন্তার আগুন ঠিকরে পড়ছে। কে এই মহাপুরুষ?…

ছোটখাট দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই ফণীর চোখে এই ক'দিনে ধরা পড়ে গেলেন যতীন্দ্রনাথ।

যেমন—পর পর ক'দিন ফণী দেখলেন, যতীন্দ্রনাথের জন্যে রোজ আলাদা একসের দুধ আসে। আর তাঁর প্রভুভক্ত ভৃত্য রোজ সেটি জ্বাল দিয়ে রেখে দেয়। সেই দুধে যখন পুরু সর পড়ে, চাকর সেই সর ফুটো করে একটা সরু নল চালিয়ে দিয়ে বেশ খানিকটা দুধ খেয়ে নিয়ে জল ঢেলে রেখে দেয় মনিবের অলক্ষ্যে।

পর পর ক'দিনই এই ব্যাপার দেখে ফণী একদিন যতীন্দ্রনাথকে বলে দিলেন কথাটা।

রেগে, যতীন্দ্রনাথ একটা চড় লাগালেন চাকরকে।

খানিক পরেই কিন্তু দারুণ অনুতাপ এল তাঁর মনে। "সামান্য দুধের জন্যে গরীব বেচারাকে মারলাম আমি?" ফণীকে উনি বললেন বার-দু'য়েক।

তারপর ডাক দিলেন "ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি"কে! বললেন, "শোন্, কাল থেকে গয়লাকে বলবি আরো আধ সের করে দুধ যেন দিয়ে যায়!"

সেই উপরি আধ সের দুধটা সেদিন থেকে বরাদ্দ রইল যতীন্দ্রনাথের ভৃত্যের জন্যে।

"এত মমতা? এত উদার?" ফণী মনে মনে ভাবেন, "কে এই মহাপুরুষ?"…

তারপর ফণী ফিরে যান কলকাতায়। বন্ধুদের কাছে বলে বেড়ান, "এবার দার্জিলিঙে একজন মহামানবকে দেখে এলাম! দেবচরিত্রের মানুষ!"…

বন্ধুদের মধ্যে হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য (M N Roy), শৈলেশ্বর বসু প্রভৃতি নিষ্ঠাবান বিপ্লবী কর্মীও ছিলেন। তাঁদের মনে তখন যতীন্দ্রনাথের আসন অনেক উঁচুতে। ফণীকে বলেন, "উনি এবার কলকাতায় এলে আমাদের নিয়ে যাবি ওঁর কাছে?"

সেইসূত্রে যতীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেন এঁরা। এঁদের হাতে তখন যথেষ্ট শক্তিশালী দল গড়ে উঠেছিল। গোটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দলটা চলে এল যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত নির্দেশে কাজ করবার সঙ্কল্প নিয়ে।

অনতিকাল পরেই নরেন ভট্টাচার্য, হরি চক্রবর্তী, শৈলেশ্বর বসু, ফণী

চক্রবর্তী প্রভৃতি হয়ে উঠলেন যতীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগত শিষ্যদের অন্যতম।

কী মধুর সম্পর্ক যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের যে গড়ে উঠেছিল, একদিনের ছোট্ট ঘটনাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

যতীন্দ্রনাথের ছিদাম মুদি লেনের আড্ডায় ফণী একদিন ঢুকছেন। বাইরে থেকে ঘরে পা দিয়েছেন, অন্ধকার-অন্ধকার লাগছে। কে আছে না আছে ভাল টের পান নি।

একজন সহকর্মীকে দেখে বললেন, "হ্যাঁরে, দাদা শালাটা গেল কোথায় রে? কী যে গুণ করেছে! একদণ্ড না দেখলে স্থির থাকতে পারিনে।..."

"কিরে ফণে, কী বলছিস কী?" ওধার থেকে সহাস্য আহ্বান শুনেই ফণী তো জিভ কেটে দে চম্পট।

ঘরের এককোণে একটা তক্তপোষে বসে স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ!...তিনি হেসে খুন, গেঁয়ো ছেলেটার কাণ্ড দেখে!

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যেসব বিপ্লবী কর্মী একে একে আসরে নামছেন, তাঁদের খানিকটা পরিচয় পাই হরিকুমার চক্রবর্তীর একটি রচনায়।*

হরিবাবু লিখেছেন, "১৮৮২ সালের নভেম্বরে আমার জন্ম। কোদালিয়া গ্রামে আমরা তিনজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলুম—নরেন ভট্টাচার্য (এম এন রায়), শৈলেশ্বর বসু এবং আমি। তিনজন অভেদাত্মা। একটা কিছু করতে হবে বলে ছটফট করছি। সে ১৯০৬ সালের মত সময়। রামদাস বাবাজীর সঙ্গে সেই সময় আমাদের পরিচয় হল। তিনি আমাদের সন্ন্যাসী করতে চাইলেন। আমরা দ্বিধায় দুলছি।...হাতে পড়ল স্বামীজীর 'কর্মযোগ'। চোখে পড়ল লেখা আছে—It is better to be attached than to be un-attached. এ কি কথা! সন্ন্যাসী বলছেন অ্যাটাচমেণ্টের কথা! সারারাত 'কর্মযোগ' পড়লুম—উত্তেজিত হয়ে উঠলুম এমনই যে রাত্রে ঘুম হল না।

"কিছুদিন পরে স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' পেলুম। এবার আমাদের জীবনের গতি স্থির হয়ে গেল। স্বামীজীর কর্মসন্ন্যাসই আমাদের আদর্শ। কর্মত্যাগের সন্ন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন মতের কথা শুনেছি। যতীন

* 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থের 'বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব' প্রবন্ধ॥

মুখার্জির (বাঘা যতীন) সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। চোখের সামনে ভাসছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মা যা হইবেন' সেই স্বপ্ন। বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ', 'বর্তমান ভারত' দিল আমাদের অনুসরণের আদর্শ আব কর্মপন্থা।..."

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আপন পরিচয়ের উল্লেখ যতীন্দ্রনাথ কারো কাছেই হয়তো করেন নি। কোন কথাই সচরাচর কাউকে বলা তাঁর রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। ধর্ম ছিল তাঁর ধ্যান, কর্ম ছিল তাঁর জ্ঞান। তাঁর শিষ্যেরাও তাই জানতেন শুধু—দাদা আর গদা!

তবু, কথায় কথায় স্বামীজীর প্রতি যতীন্দ্রনাথের মনোভাব কী করে এক-দিন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, হরিকুমারবাবু তার বিবরণ দিয়েছেন।

"...বড় বড় বিপ্লবীরা সকলেই বিশেষ স্বামীজী-ভক্ত। যারা পরে বেলুড়মঠের সন্ন্যাসী হয়ে যায় তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। যতীন মুখার্জীর কথাই ধরা যাক।

"দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লব আন্দোলন যতীনদার সৃষ্টি। তাঁর যে কী আকর্ষণী শক্তি ছিল—সকলকে তিনি কাছে টেনে রাখতে পারতেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে তিনি ছিলেন সুপার লীডার। তাঁর নেতৃত্বে যে বিপ্লব পরিষদ গড়ে উঠেছিল তার কার্যকরী সমিতির...আমরা ছিলুম সদস্য।

"সে যাই হোক। একবার নরেনের (এম এন রায়) সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক ও ঝগড়া। আমি স্বামীজীর অদ্বৈত বেদান্তকে গ্রহণ করেছি, মূর্তিপূজা আর ভগবানে বিশ্বাস কবি না ; নরেনের মূর্তি এবং ভগবান, দুয়েই বিশ্বাস। আমি বললুম, স্বামীজীর মত, ভগবান নেই ; নরেন বলল, স্বামীজীর মত, ভগবান আছেন।

"যতীনদা ঝগড়ার কথা শুনলেন। শুনে বললেন, চল্ আমার গুরুর কাছে।

"তাঁর গুরু ভোলাগিরি। তিনি কলকাতায় এসে রয়েছেন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে ভক্তের বাড়িতে। যতীনদার সঙ্গে আমরা প্রবেশ করতেই তিনি 'আরে বেটা' বলে যতীনদাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। তাতেই যতীনদার উপর তাঁর ভালবাসার পরিমাণ বোঝা গেল।

"যতীনদা আমাদের সমস্যার কথা জানালেন।

"ভোলাগিরি তখন আমার দিকে ফিরে বললেন—বেটা, তোমার কথাই

ঠিক, ভগবান নেই। আমার বুক দশ হাত—চেয়ে দেখি নরেনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু।

"তারপর নরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, না, ভগবান আছেন। পরে বললেন, যার যেমন ভাব।

"আমরা হতভম্ব। বাইরে আসতে আমরা যতীনদাকে বললুম, এ কি হল, উত্তর যে পেলাম না! যতীনদা বললেন, আরে স্বামীজীর কথা নিয়ে কি ঝগড়া করতে আছে? তিনি কত বড় ছিলেন, তার ধারণা করবে কে? তাঁর কথা যদি ভারত শোনে ভারতের মহিমার কি সীমা থাকবে?

"যতীনদা ছিলেন ভোলাগিরির শিষ্য। তবু স্বামীজীর প্রতি তাঁর এই ভাব।..."

॥ দশ ॥

কুমোরখালি। যতীন্দ্রনাথের পরিচিত দরিদ্র এক ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে।

ঘরের ছেলের মত যতীন্দ্রনাথও এসেছেন, আর সবার সঙ্গে কাজে মেতেছেন, মহা আনন্দে মাতিয়ে রেখেছেন অন্যান্য সকলকে।

বরযাত্রীরা এল।

লগ্নের তখনো দেরি আছে। তাই তাদের নিয়ে গিয়ে খেতে বসিয়ে দেওয়া হল।...সাধ্যাতীত আয়োজন করেছেন গৃহস্বামী। কিন্তু, পরিবেষণ করতে করতে যতীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন না—বরযাত্রীদের কেন মন উঠছে না!

খেতে খেতে তাদের একজন হঠাৎ দইয়ের খুরি উলটে দিল পাকা রুইয়ের মুড়োয়। আরেক জন একমুঠো নুন ঢেলে ফেলল আলুবখরার চাটনিতে! দেয়ালে দেয়ালে ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হল মিহিদানা, পান্তুয়া, সন্দেশ।

গতিক সুবিধের নয় দেখে মেয়ের বাবার কাছে যান যতীন্দ্রনাথ। চুপি চুপি জিগ্যেস করেন: কী ব্যাপার বলুন তো? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "আর বল কেন, বাবা? ওঁরা নগদ যত টাকা চেয়েছিলেন, আমাকে বেচলেও অত টাকা কোনদিন জোগাড় হবে না। জেনেশুনেও

মেয়েকে ওঁরা যখন নিচ্ছেন, গয়না-গাঁটি জিনিস-পত্র মিলিয়ে সব ত্রুটি আমি ভরে দিতে চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও, এখন আমার মুখে চুনকালি দেবার জন্যে—চেয়ে দেখ কী ব্যবহারটাই না—"

"বটে? এই কথা?" চাপা গলায় গর্জে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ, "দেখাচ্ছি মজাটা!"

ব্রাহ্মণ শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন, "না বাবা, কাজ নেই ওঁদের ঘাঁটিয়ে। ভালয় ভালয় আমার মেয়ের আইবুড়ো নাম খণ্ডালেই—"

"তা হলে মেয়েকে পাথরে বেঁধে গড়ুইয়ের জলে ফেলে দিলেই তো পারতেন!"

"বাবা, আমি অক্ষম ব্রাহ্মণ—গরীব হয়েও ভাল-ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ বলেই না ওদের কাছে এই হেনস্থা। এ তো আমায় মুখ বুঁজেই সইতে হবে। তুমি ওঁদের কিছু বোল না—"

"অন্যায় অত্যাচার সইতে হবে?" প্রতিবাদে দীপ্ত হয়ে ওঠেন যতীন্দ্রনাথ। "দেখুন, এইভাবেই তো দুর্বলতার অজুহাতে আমরা অত্যাচারীকে আস্কারা দিই। এর একটা বিহিত এখুনি করা চাই।…"

তখুনি যতীন্দ্রনাথ তাঁর অনুগত তরুণদের বলে দিলেন এক একটা লাঠি নিয়ে আসতে। তারপর ফিরে গেলেন তিনি বরযাত্রীদের খাওয়ার তদারক করতে।

পরিবেষণরত একটা ছেলেকে একজন বরযাত্রী হাঁক দিলেন, "কই হে? চম্‌চম্ কই?"

স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ তাঁর পাতে দিলেন গোটা-দুই চম্‌চম্। আর অমনি—থপ্ করে সেই চম্‌চম্ নিয়ে ভদ্রলোক ছুঁড়ে দিলেন সামনের দেয়ালে।

হো হো করে হেসে উঠল অন্য বরযাত্রীরা।

"ওকি করছেন?" শক্ত গলায় যতীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন। তারপর ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "মশাই, একটু উঠতে হবে। আসুন দেখি একবার আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যাওয়া?" বলে ভদ্রলোক রসিকতা করতে যাওয়া-মাত্র এক হ্যাঁচকা টানে হিড়হিড় করে যতীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে গেলেন দেয়ালের ধারে।

ডাঁই করা চম্‌চম্, দরবেশ, রসগোল্লা, সরপুরিয়া পড়ে রয়েছে সেখানে।

"আজ্ঞে, এইখানে!" বলে হুকুমের সুরে যতীন্দ্রনাথ বললেন, "এখান

থেকে আপনার ফেলা মিষ্টিগুলো খুঁজে বার করুন তো? গরীব ব্রাহ্মণের কষ্টের উপচার—এভাবে ফেলা-ছোঁড়ার জন্যে হয়নি। খেতে হবে!"

"খেতে হবে!"

অব্যক্ত রাগে অপমানে বরযাত্রীরা সোরগোল করে উঠল, "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—···দেখি বিয়ে কে দেওয়ায়!···ভাড়াটে লোক এনেছে? ···তোল্, এখুনি বরকে গাড়িতে তোল্!···"

বলে হৈ চৈ করে তারা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই জনকয়েককে বগল-দাবায় পুরে যতীন্দ্রনাথ এনে বসিয়ে দিলেন যার যার আসনে।

"সাধ্য থাকে তো বরকে গাড়িতে তুলবেন গিয়ে। আগে খেয়ে যেতে হবে।" যতীন্দ্রনাথ হুকুম করলেন। তারপর, তাঁর ইসারাতে, নীরবে লাঠি হাতে এক এক করে কয়েকটি তরুণ এসে দাঁড়াল বরযাত্রীদের পেছনে।

মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত সুড়সুড় করে গোঁজ হয়ে বসল সবাই আসনে।

"যে যা-কিছু ছুঁড়ে ফেলে নষ্ট করেছেন, দয়া করে সেগুলো আগে তুলে নিয়ে আসুন। সেগুলো খেয়ে, আরো চেয়ে নেবেন ভদ্রভাবে: আমরাও ভদ্রলোকদের খাইয়ে তৃপ্তি পাব 'খন। আয়োজন প্রচুর—আপনাদের সেবার জন্যেই!"

ঘাড় গুঁজে খেতে বসল সবাই।

মুখ ফস্‌কে একজন চাপা গলায় জানান দিল, "মেয়ের ওপর শোধ তোলা যাবে—"

"এই না হলে ভদ্রলোক?" ব্যঙ্গের হাসি হেসে যতীন্দ্রনাথ তার সামনে দাঁড়ালেন। "মশায়ের ঘরে বুঝি মেয়ে নেই?···সামনাসামনি ঘাট মেনে, আড়ালে শোধ তুলবেন অবলা এক মেয়ের ওপর?···নিন্ মশাই, আজকের মত প্রাণ নিয়ে আপনারা ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারছেন এই যথেষ্ট মনে করবেন। তার বেশি বীরত্ব করতে যাবেন না!"

তারপর শোনা গেল তাঁর বজ্রকণ্ঠ, "যদি কোনদিন আমার কানে আসে—এই মেয়ের ওপর সামান্য একটু দুর্ব্যবহারও হয়েছে, ঝাড়কে ঝাড় উজাড় করে দেব। এটুকু মনে রাখবেন। কথার খেলাপ আমি করি না!"

বিয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় গেল।

ব্রাহ্মণের কাছে তারপর কয়েকবার যতীন্দ্রনাথ খবর নিয়ে জেনেছেন—মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোক খুবই যত্ন-আত্তি করে মেয়েকে।

শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন যতীন্দ্রনাথ।

বাঘ মারবার পর সেরে উঠেই যতীন্দ্রনাথকে দেখা যায় সংগঠনের কাজে স্বয়ং খুব বেশি ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছেন। বাড়ির কেউ যদি আপত্তি করতেন, যতীন্দ্রনাথ বলতেন, "মনে কর না, বাঘের কামড়ের পর আগের সেই আমি মরে গিয়েছি? মায়ের সেবার জন্যেই মা আমায় বাঁচিয়ে তুলেছেন যে?"

ক্রাচ ছেড়ে তখনো ভাল করে চলতে পারেন না তিনি। চলাফেরায় যথেষ্ট কষ্টও।

প্রত্যেক সপ্তাহেই, বিশেষত শনি-রোববার নাগাদ হাতে একটা সৌখীন গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ আর অন্য হাতে একটা ছড়ি নিয়ে বের হতেন। মধুমতীর ধার দিয়ে কোন কোনদিন চলে যেতেন গ্রাম থেকে গ্রামে, পরিদর্শন করে আসতেন প্রতিটি গ্রামের যুবসঙ্ঘগুলি। প্রত্যক্ষ কর্মের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে—এমন সব সম্ভাবনা-সম্পন্ন তরুণ আর যুবকদের বেছে নিচ্ছেন তিনি।

১৯০৬ থেকে ১৯১০ সাল হচ্ছে যতীন্দ্রনাথের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়: তাঁর সমস্ত সাধনার সম্পদ, সমস্ত উপলব্ধি তিনি এই সময় বাস্তবের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছেন পরীক্ষামূলকভাবে। এ-ই তাঁর মহা-নায়কত্বের প্রস্তুতি-পর্ব।

বাইরে থেকে এই পর্বে দেখা যায়: যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি নামে সর্বজন পূজিত এক বাঙালী যুবক,—শারীরিক আত্মিক বলে অস্বাভাবিক-রকম বলীয়ান, সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সদা-খড়্গহস্ত, দুর্বলের একান্ত সহায়, বজ্রের মত কঠোর অথচ ফুলের চেয়েও কোমল অন্তর, লাট-সাহেবের খাস সেরেস্তায় মোটা মাইনেয় চাকরি করেন, দেব-দ্বিজে ভক্তি প্রবল, আন্তরিকতায় অদ্বিতীয়, খ্যাতনামা সাধু ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্য, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, সুরেন ঠাকুর, ব্যারিস্টার জে এন রায়, ব্যারিস্টার রজত রায় প্রভৃতির বন্ধু, সমাজের সব মহলেই অবাধ আনাগোনা, দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক, দান-ধ্যান প্রচুর, খেলাধূলো ও গীতা পড়ানোর সূত্রে দেশের তরুণ এবং যুবামহলে কল্পনাতীত-রকমের জনপ্রিয়, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবতুল্য চরিত্রের মানুষ—সুখী সম্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাংসারিক জীবন যাপন করছেন।

এ হল যতীন্দ্রনাথের মোটামুটি পোশাকি ছবি।

এই ছবির প্রতিটি রঙের উৎস হচ্ছে তাঁর চরিত্রের বিশিষ্ট মৌলিক রংটি: আধ্যাত্মিক সাধনার সাধক তিনি, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক প্রগতি ব্যাহত থাকছে বলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনায় ও প্রস্তুতিতে অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি অন্যতম কর্ণধারের ভূমিকায়।

অথচ, নিজেকে সর্বদা পাদপ্রদীপের আলো থেকে আড়াল করে রাখাই হচ্ছে তাঁর সহজাত প্রচেষ্টা।

তাই কুশীলব খাড়া করে গিয়েছেন তিনি অজস্র: নিজে অন্তরালে দাঁড়িয়ে যেমনভাবে এঁদের পরিচালনা করেছেন, তেমন তেমনই অভিনয় করে গিয়েছেন আর সকলে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়েছে কুশীলবেরাই সর্বাত্মক এবং একমাত্র সত্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কিন্তু প্রবীণ বিপ্লবী দার্শনিক ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখেছেন—"Everyone was groping in the dark through that period of thirty years. এর ভিতর বলতে গেলে একমাত্র consistent thinker ছিলেন…যতীন্দ্রনাথ, এবং ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত he inspired the entire generation!"

ইনি প্রসঙ্গান্তরে লিখছেন, "পরশু এক ভদ্রলোক এসেছিলেন…ইনি পাটনা, লণ্ডন, উইসকনসিন্ ও মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গেই কাজ করছেন। জাতীয় মহাফেজখানায় আমার নিকটবর্তী আসনেই এখন Historical Records Commission-এ কিছু কাজ করে দিচ্ছেন।…বললেন: 'বিভিন্ন বই, Documents, pledges পড়ে এবং…কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে বিপ্লবীদের সম্পর্কে আমার যে ধারণা হয়েছিল তা কাটল তোমার সঙ্গে আলাপে। আমার ধারণা হয়েছিল যে অনুশীলন সমিতির* বা ঐ চরিত্রের লোকেদের দিয়েই বুঝি সবটা পরিচালিত হয়েছিল! আর এঁদের সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছিল revivalist, communal, sectarian ও bigotted, এবং totalitarian outlook-এর লোক এঁরা। অথচ এঁরা আসছেন সবাই নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। এঁদের ally খোঁজা উচিত ছিল পরবর্তী নিম্নশ্রেণীর মধ্যে, অর্থাৎ masses-এর ভেতর। তাতে এদের অনেকের যাওয়া উচিত ছিল কংগ্রেসে, অনেকের কম্যুনিস্ট পার্টিতে। তা-ও অনেকে গিয়েছে দেখছি। কি করে সেটা হল এতদিন বুঝতে পারি নি। আর 'অনুশীলন'-

* ঢাকার অনুশীলন বলে বিখ্যাত॥

এর outlook-এ যাওয়া উচিত সাভারকর, ভাই পরমানন্দের মতো হিন্দু-মহাসভায়। এঁরা শুধু anti-muslim নন, anti-lower class-ও !"

"আমি বললাম : 'খুব early stage-এই বঙ্কিমের চেয়ে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ আমাদের এদিকে প্রভাবান্বিত করতে শুরু করেন।'

"যতীন্দ্রনাথের outlook-টা ইনি খুব appreciate করলেন : গণ-জাগরণের আগে সামরিকধাঁচের সংগঠন গড়বার দিকে ঝুঁকলে carbo-narism এসে পড়তে বাধ্য।

"হাওড়া মামলার ফাইলেও দেখছি, কি রকম loose confederated type-এর সংগঠন তিনি করে গেছেন—আর এটা একেবারেই ওঁর (যতীন্দ্র-নাথের) নিজের হাতে গড়া।"

ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ একক এবং অভিনব অবদান—এই loose confederated ধাঁচের সংগঠনটার স্বরূপ খানিকটা আভাসে জানা যায়, সাম্প্রতিক বহু গবেষণার কল্যাণে, জগতের বিভিন্ন মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটতে পারবার সুবাদে !

'আত্মোন্নতি' সমিতির ইন্দ্র নন্দী ও নরেন বোস, 'যুগান্তর'-এর নিখিল রায়মৌলিক ও অন্নদা কবিরাজ, 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর পবিত্র দত্ত, শিবপুরের ননী গুপ্ত ও নরেন চট্টোপাধ্যায়, খিদিরপুর দলের ডাঃ শরৎ মিত্র, ডায়মণ্ড-হারবার (নেংড়া)-এর হেম সেন, চেতলার চারু ঘোষ, যশোরের বিজয় রায় ও শিশির ঘোষ প্রভৃতিকে উৎসাহী সংগঠক ও নিপুণ নেতার ভূমিকায় দেখি আমরা আলোচ্য এই পর্বে : ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে। পরস্পরের সম্বন্ধে এঁরা জানেন খুবই কম। অথচ সরকারি কাগজ-পত্রেও প্রমাণ মেলে যে এঁরা প্রত্যেকে ছিলেন যতীন্দ্রনাথের immediate সহচর। জেনেশুনে সমস্ত দায়িত্ব নিজেরা নিয়ে এঁরা কাজ করে গিয়েছেন 'সুপার লীডার' যতীন্দ্রনাথকে আড়াল করে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপেন দত্ত লিখেছেন, "হাওড়া মামলার proceedings, পবিত্র দত্ত, নির্বাণ স্বামী,* খুড়ো† প্রভৃতির statement মিলিয়ে পাচ্ছি যে, যতীন্দ্র-নাথের লোক বিভিন্ন জায়গায় দল করছেন, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করছেন,

* নাটোরের সতীশ সরকার। এঁকে ও বীরেন দত্তগুপ্তকে ১৯১০ সালে যতীন্দ্রনাথ পাঠান সামসুল হত্যা করতে। ইনি জীবিত আছেন এখনো॥

† 'দেবীপ্রসাদ রায় : গোড়া থেকেই যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ ও

target practise করছেন, দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে বাংলায় ও বাংলার বাইরে কথাবার্তা বলছেন, বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যোগ স্থাপন করছেন।

"কিন্তু তাঁর সঙ্গে এইসব কাজের কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যেন নেই—এঁরা সবাই যেন সব বিষয়ে Autonomous—পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন খানিকটা প্রয়োজনে আর কতকটা নিজেদের স্বভাবের অথবা অসাবধানতার বশে। কিন্তু কোনও sphere-এরই খুব বেশি লোক অন্য কোন sphere-এ কে কি করছেন সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। এ-কথা বিভিন্ন লোকের মুখেই পাচ্ছি।...সমস্ত period-টাই, মোটের ওপর বলতে গেলে ননীবাবুই Delegated power নিয়ে নেতৃত্ব করেছেন। মনে হয় বুঝি policy-ও guide করেছেন।...

"কিন্তু আসলে যতীন্দ্রনাথের হয়ে সব জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন 'ছাত্রভাণ্ডার'-এ বসে নিখিলেশ্বর রায়মৌলিক। তিনিও যেন ছিলেন যতীন্দ্রনাথের duplicate, যেমন ছিলেন তিনি অসাধারণ কর্মী, তেমনিই ধীশক্তিসম্পন্ন। শ্রীঅরবিন্দেরও তিনি বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন।..."

খিদিরপুর দলের প্রসঙ্গে দুর্গাচরণ বসু ও পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলেছি। জাঠ বাহিনীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের যোগ স্থাপনের কাজে এঁদের যেমন হাত ছিল, তেমনি—বোধ হয় এঁদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অদ্ভুত করিৎকর্মা বিপ্লবী নরেন চট্টোপাধ্যায়ের। এবং মেদিনীপুরের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট অবিনাশ দত্তেরও প্রচেষ্টা এইসূত্রে স্মরণীয়।

শ্রীভূপেন দত্ত লিখেছেন, "নরেন চাটার্জী ঐ সৈন্যদের সঙ্গে একদিকে শিবপুরে ননীগোপাল সেনগুপ্তের ও ভুবন মুখার্জীর এবং অপর দিকে খিদিরপুরে শরৎ মিত্রের পরিচয় করিয়ে দেন। এই কাজে তিনি মুসৌরি এবং লাহোর পর্যন্তও যান, বোধ হয় রাসবিহারীর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। হাওড়া মামলার ইনি পলাতক আসামী। তখন বোধহয় বেনারসে ছিলেন।

"আঞ্চলিক সংগঠকদের মধ্যে সবচেয়ে important শিবপুরের ননীবাবু। ...পাগল বলে ওঁকে ১৯১৭ সালে ছেড়ে দেয়। মনে হয় পাগলামি ওঁর ভাণ। ১৯০৭ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত যত ডাকাতি হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকটার সংগঠক ইনি।

সুরেন ঠাকুরের সঙ্গে যেমন, তেমনি অম্বিকা উকিল ও ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গেও ইনি যতীন্দ্রনাথের যোগসূত্র রক্ষার কাজে লিপ্ত ছিলেন।' —পৃথ্বীন্দ্রনাথ

"যোগেশ মিত্র (মাদারু) ছিলেন দাদার আর শিবপুর দলের messenger.

"আর-একজন খুব important লোক চেতলার চারু ঘোষ। অস্ত্র সংগ্রহ এবং শেখানো এঁর কাজ ছিল। অসাধারণ sacrifice এঁর।*

"সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র বোধ হয় তখন ছিলেন নেৎড়ার হেম সেন, দাদার (যতীন্দ্রনাথের) অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। খিদিরপুরের শরৎ মিত্রও খুব important লোক।...

"এঁরা ছাড়া অন্যান্য important লোক যশোরের বিজয় রায় ও শিশির ঘোষ, ছাত্রভাণ্ডারের অন্নদা রায় ও পবিত্র দত্ত, আত্মোন্নতির ইন্দ্র নন্দী ও নরেন বোস।..."

এঁদের সঙ্গে এসে হাত মিলিয়েছিলেন হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy) প্রমুখ ২৪ পরগণা দলের নেতারা।

এইসব নেতা ও দুর্লভ কর্মীকে সামনে রেখে যতীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন সুদূরপ্রসারী এক confederated সংগঠন। এঁরা, বলা যায়, বিকেন্দ্রিক ছিলেন। একটা দল বা একজন কর্মী যদি ধরা পড়ে যান দৈবাৎ, অন্য দল-গুলো ও কর্মীরা তা সত্ত্বেও পূর্ববৎ কাজ করে যেতে পারতেন এই ধরণের সংগঠনের কল্যাণে।

কিন্তু বারীন ঘোষ, দলপতির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের বাইরে অন্যদের কাজ করতে দেওয়ার পদ্ধতিতে বাঁধা পড়তে নারাজ হলেন। ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি সময় নাগাদ তিনি সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করলেন মানিক-তলার বোমার বাগানের কাজে। দলের অন্যান্য কর্মসূচী ও 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এই সময়েই ছিন্ন হল।

শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন নিখিল রায়মৌলিক, কিরণ মুখার্জি প্রমুখ যতীন্দ্রনাথের অনুরক্ত নেতৃবৃন্দ।

* সরকারি কাগজ-পত্রে দেখি, চারু ঘোষকে এক কিস্তিতেই যতীন্দ্রনাথ থোক সতেরো হাজার টাকা দিয়েছিলেন অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। চেতলার অস্ত্রব্যবসায়ী নুর খাঁ চারুবাবুকে অস্ত্র বিক্রী করতেন। সরকারি report-এ আছে: এ-সময়ে যতীন্দ্রনাথের দলগুলোর হাতে ছোট বড় ১৫০টা আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। অধিকাংশই চারুবাবুর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। যতীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দলের সভ্যদের সুন্দরবনে, ডায়মণ্ডহারবারে এবং ফুলেশ্বরে নিয়ে গিয়ে চারুবাবুই লক্ষ্য অভ্যাস করাতেন। হাওড়া মামলার সময় চারুবাবু অসুস্থ হন। জামিনে খালাস পেলেও শোচনীয় মৃত্যু ঘটে তাঁর। জেল থেকে বেরিয়ে চারুর মাকে যতীন্দ্রনাথ সহস্রাধিক টাকা দেন ঋণ-কর্জ শোধ করবার জন্য।

কবিরাজ অন্নদা রায় এখনো রইলেন 'যুগান্তর'-এর পৃষ্ঠপোষক।

এই পর্যায়ে যতীন্দ্রনাথকে দেখা যায় সমগ্র বিপ্লব-প্রচেষ্টার যোগসূত্রস্বরূপ। শ্রীঅরবিন্দের ঠিক পরেই।

নাটোরের সতীশ সরকার (নির্বাণস্বামী)* বলছেন: "দাদার (যতীন্দ্রনাথের) সঙ্গে 'সন্ধ্যা' কাগজের সূত্রে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের এবং 'নবশক্তি'র সূত্রে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার খুব পরিচয় হয়েছিল। সেই সুবাদে আমরাও উপাধ্যায় ও মনোরঞ্জনবাবুর কাছে যাতায়াত করতাম। মনোরঞ্জনবাবুর গিরিডির বাড়িতে আমরা যে-কেউ যখন খুশি গিয়ে খেতে বসে যেতাম।

"দাদার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে আমার কাজ করবার সৌভাগ্য হয়।

"দেবব্রত বসুর ডালিমতলা লেনের বাড়িতে (স্টার থিয়েটারের পেছনে) দাদা মাঝে মাঝে যেতেন। বারীন ঘোষের দল যখন বোমা ফুটিয়ে জাতিকে জাগাতে চেষ্টা করবেন ব'লে সঙ্কল্প নিলেন, দেবব্রত একদিন বললেন, 'কত্তা, ইংরেজের সঙ্গে কি অমনি ল'ড়ে পারা যাবে?'

যতীন্দ্রনাথ আলোচনা-প্রসঙ্গে যা বলতেন, তার সারমর্ম 'শিক্ষিতদের মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের পাঠাতে হবে গ্রামে গ্রামে। জনসাধারণের (mass) এইভাবেই বিপ্লবের আদর্শে জেগে উঠবে!"

"আমরাও এই রকম দু-একটা আলোচনায় উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম, দেবব্রত বসু ও জে এন ব্যানার্জির বাড়িতে যখন দাদা যেতেন।"

যতীন্দ্রনাথ অর্থ সাহায্য ক'রে বৌবাজারে এনে বসালেন যশোরের কবিরাজ বন্ধু বিজয় রায়কে: চমৎকার ডিস্পেন্সারী খোলা হ'ল। আবার আঞ্চলিক নেতা হিসাবে বিজয়বাবুর এই ডিস্পেন্সারী হ'য়ে উঠল গুপ্তসমিতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি চক্র।

স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এখানে কর্ম-বিতরণের আলোচনার জন্যে বৈঠক ডাকেন।

* এঁর উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। ১৯০৫ সালেই ইনি নাটোর থেকে কলকাতায় যাতায়াত করতেন। মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় ছিল। অবিনাশবাবুর ভাই গুণীন আর যতীন্দ্রনাথের শিষ্য দেবীপ্রসাদ রায় (খুড়ো) একত্রে অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ করতেন। সেই সূত্রে খুড়োর সঙ্গে ও জ্ঞান মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়। এঁরা সতীশবাবুকে নিয়ে যান যতীন্দ্রনাথের কাছে। 'যুগান্তর' অফিসে যতীন্দ্রনাথের অন্যান্য সহকর্মীর (নিখিল রায়মৌলিক, কার্তিক দত্ত প্রভৃতির) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। কিরণ মুখার্জি আর সতীশ 'যুগান্তর'-এর পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে টাকা আনতেন। ইন্দ্র নন্দী, হরিশ শিকদার প্রভৃতির সঙ্গে সতীশও 'যুগান্তর' বিক্রি করতেন।

এই ডিস্পেন্সারীর মতোই, হ্যারিসন রোডের পি মুখার্জীদের ভাড়াটে বাড়িতে বসে 'স্বাস্থ্যসহায়' নামে আরেকটি কবিরাজী দোকান। যতীন্দ্রনাথের কয়েকজন সহকর্মী এ-বাড়ির বাসিন্দা। কবিরাজ ব্রাদার্স ধরণী গুপ্ত ও নগেন গুপ্ত (সাত বছর জেল হয় এঁদের), কুমিল্লার মহেন্দ্র নন্দীর পুত্র বিখ্যাত অশোক নন্দী (প্রথম বোমার মামলায় অভিযুক্ত) প্রভৃতি থাকেন এখানে।

উল্লাসকরের তৈরি মারাত্মক এক বাক্স বোমাও এখানকার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত।

মাণিকতলার বোমার আখড়ার চিঠিপত্রাদি এ-বাড়ির ঠিকানাতেই তখন আসত যেত।

এর কিছুদিন আগে 'যুগান্তর' অফিসে অবিনাশ ভট্টাচার্যের কাছে রজনী নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে বন্ধুত্ব করেন। অবিনাশবাবু সরল মনে তাকে বিশ্বাস করে বারীনবাবুর কাছে নিয়ে যান। বারীনবাবুর বুঝতে দেরি হয় না, রজনী পুলিশের লোক। কিন্তু তার আগেই দলের গোপন কিছু কথা এবং পরিচালকমণ্ডলীতে কে কে আছেন অনুমান করে নিয়েছে রজনী।

দেখতে দেখতে অজস্র ছদ্মবেশী গুপ্তচর লেগে গেল 'যুগান্তর' দলের প্রধান কেন্দ্রগুলির আশে-পাশে। গ্রে স্ট্রীটে শ্রীঅরবিন্দের বাড়ি, ক্রীক রোতে 'বন্দেমাতরম' অফিস, মীর্জাপুর স্ট্রীটে 'যুগান্তর' অফিস, কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ি, শোভাবাজারে যতীন্দ্রনাথের বাড়ি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে সদ্য ফ্রান্স-প্রত্যাগত হেম কানুনগোর বাড়ি প্রভৃতি সর্বদাই পুলিশের নেক-নজরে রইল।

এই প্রহরা এতদূর সতর্ক ছিল যে, পুলিশের চোখে ধুলো দেবার উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথের বন্ধু বিপ্লবী কুঞ্জলাল সাহা শাড়ি প'রে আলতা-পায়ে একদিন হেম কানুনগোর বাড়িতে যান—সেই report-ও পুলিশের ফাইলে পাওয়া যায়। মাণিকতলা বাগানেও রাখাল রাহা* নামে সন্দেহজনক এক কর্মী এসে আড্ডা গাড়লেন।

যতীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ বারীনবাবুদের অনুরোধ করেন—নাম-ঠিকানা

---

* এই রাখাল রাহাই (মেদিনীপুর) এঁদের সবাইকে ধরিয়ে দেবার মূলে ছিলেন। ইনি ইন্সপেক্টর রামসদয় মুখুজ্যের নির্দেশে বাগানে গিয়ে ঢোকেন গুপ্তচর হিসাবে।

সমেত বই, খাতা, চিঠি-পত্র যেন কোথাও না রাখা হয়, যে-কোনদিন তল্লাস হতে পারে। তা সত্ত্বেও যথেষ্ট সাবধান তাঁরা হন নি।

উপরোক্ত রজনীর ঘটনার কিছুকাল বাদেই মজঃফরপুরের বোমা সংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিশ হানা দিল এসে মাণিকতলার বোমার বাগানে। সে-কাহিনী পরে বলছি। মাণিকতলার বাগান তল্লাস করে প্রচুর চিঠিপত্র, নাম ও ঠিকানাসমেত খাতা, বই প্রভৃতি পাওয়া গেল।

পূর্বোক্ত 'স্বাস্থ্যসহায়' ঔষধালয়ের ঠিকানাতে জনৈক বীরকুমার মুখার্জীকে লেখা ২/৩ খানা চিঠিও এই ধর-পাকড়ের সময় মাণিকতলার বাগান থেকে পুলিশ পায়। চিঠিগুলির প্রেরক জনৈক স্বামী কৃষ্ণানন্দ, দার্জিলিঙের চাঁদমারি পোস্ট অফিস থেকে পাঠানো।

বোমার মামলার সময় Birley সাহেবের কোর্টে পুলিশের রামসদয় মুখার্জী বলেন "এই স্বামী কৃষ্ণানন্দ ও বীরকুমার মুখার্জীকে যে-করেই হোক আমি বার করব!"

তিনি বার করেও ছিলেন।

ভবভূষণ মিত্র জানাচ্ছেন যে স্বামী কৃষ্ণানন্দ হচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এবং বীরকুমার হচ্ছেন যতীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ভবভূষণ মিত্র।

সম্ভবত এই প্রথম যতীন্দ্রনাথ পুলিশের সন্দেহভাজন হলেন প্রত্যক্ষরূপে।

॥ এগারো ॥

কলকাতা।

কুমারটুলি ফুটবল ক্লাবের উৎসাহী দুই সদস্য, যতীন্দ্রনাথ আর অ্যাটর্নী দুর্গাচরণ বাঁড়ুজ্যে ফুটবল খেলে ফিরছেন সন্ধ্যেবেলা।

কৃতী সেণ্টার-হাফ ব'লে পরিচিত-মহলে যতীন্দ্রনাথের যথেষ্ট খ্যাতি। তিনি খেলতে নামলে খেলোয়াড়দের মধ্যে জাগে অজানা এক উদ্দীপনা। খেলার মোড়ই ফিরে যায়।*

* ভবভূষণবাবু বলেন, কুষ্টিয়ার সেরা মাঠ—কুষ্টিয়া ফুটবল ফিল্ডে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা ম্যাচে তার প্রথম মোকাবেলা হয়: বল নিয়ে দু'জনে দু'পক্ষের হয়ে চার্জ করতে গিয়ে ধাক্কা লাগে। "এখন যা foul তখন তা' গর্বের বিষয় ছিল: ঠ্যাং ভাঙা, গুঁতোগুঁতি করা, ফেলে দেওয়া—খেলার অঙ্গবিশেষ ছিল!..." যতীন্দ্রনাথের দুই মামাতো ভাইও সেদিন (মোহনবাগানের প্রসিদ্ধ ফণী চাটুজ্যে ও Aryans-এর নির্মল চাটুজ্যে) উপস্থিত ছিলেন।

সাইকেল চড়ে ফিরছেন যতীন্দ্রনাথ আর দুর্গাবাবু নাটোর পার্ক থেকে। অন্ধকারে হঠাৎ নারীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল।

সাইকেল থামালেন যতীন্দ্রনাথ। নেমে পড়লেন।

একটু এগিয়ে যেতেই তাঁর চোখে পড়ল, সরু একটা গলির মধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের এক মুসলমান মহিলাকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা।

বিনাদ্বিধায় যতীন্দ্রনাথ সটান এক পদাঘাত চালালেন একটি আততায়ীকে লক্ষ্য করে। তাই দেখে চোখ-কান বুঁজে চম্পট লাগাল বাকি দুই কাপুরুষ।

ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে মহিলা বসে পড়েন। যতীন্দ্রনাথ তাঁর শুশ্রূষায় মন দিলেন। এই সুযোগে আহত গুণ্ডাটিও পিঠটান দিল।

মহিলা তখনো উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেয়ে আছেন দেখে যতীন্দ্রনাথ তাঁকে অভয় দিলেন, "দিদি, আপনি ভাববেন না, নির্ভয়ে আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি।"

স্বস্থানে মহিলাকে পৌঁছে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ আর দুর্গাবাবু বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

ফিরে যাই ১৯০৭ সালের প্রসঙ্গে।

একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ আর ছড়ি হাতে যতীন্দ্রনাথ প্রতি শনি-রোববার গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাঁর বিকেন্দ্রিক সংগঠনের জন্যে নতুন নেতা, নতুন কর্মী, নতুন নতুন কেন্দ্রের সন্ধান করছেন—সেই আমলের কথা।

এইভাবে একদিন যতীন্দ্রনাথ গিয়েছেন কয়ার কাছেই—এৎমামপুর গ্রামে। তাঁর সঙ্গে ক্ষিতীশ সান্যাল, ফকির চৌধুরী* প্রভৃতি দু-একজন কর্মী। এই এৎমামপুরে নাকি কয়েকটি খুব ভাল ছেলে খেলাধুলো, শরীরচর্চা, জনসেবা প্রভৃতির আয়োজন করেছে। তাদের একবার দেখতে চান যতীন্দ্রনাথ।

এৎমামপুরে যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করল বিশেষ করে দুটি তরুণ। একজন অতুলকৃষ্ণ ঘোষ। অন্যজন, নলিনীকান্ত কর। বছর-তিনেকের মধ্যেই এঁরা যতীন্দ্রনাথের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রিয় সহকর্মী হয়ে ওঠেন।

* পরে ইনি পুলিশের চাপে প'ড়ে বহু কথা ফাঁস করে দেন।

অতুলকৃষ্ণ আর নলিনীকান্ত ছিলেন জ্ঞাতিভাই, আবাল্য হরিহরাত্মা। এঁদেরই জবানে বলি তা' হলে যতীন্দ্রনাথের এৎমামপুর পরিদর্শন ও তৎ-পরবর্তী কয়েকটি কথা।—

তরুণ দুটির ব্যায়ামপুষ্ট দেহসৌষ্ঠব ও আদর্শদীপ্ত উন্নত দৃষ্টি দেখে যতীন্দ্র-নাথ মুগ্ধ হয়ে আলাপ করলেন তাদের সঙ্গে। কথায় কথায় বললেন: গীতা পড়েছিস? পড়েনি শুনে—ব'লে দিলেন: নিয়মিত গীতা পড়িস, উপকার হবে।...তারপর চলে যখন গেলেন, গ্রামের এক যুবক পুরোহিত এসে তরুণ দুটিকে বললেন: চিনতে পারলি নে ওঁকে? উনিই তো যতীন মুখার্জী!

যতীন মুখার্জী!...

গর্বে শ্রদ্ধায়, আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠল এঁদের বুক! স্বয়ং যতীন মুখার্জী ওদের সঙ্গে কথা বলে গেলেন, উপদেশ দিয়ে গেলেন গীতা পড়তে?... অতএব, শুরু হল নিয়মিত গীতা পাঠ। মনের পটে জেগে রইল উজ্জ্বল এই স্মৃতি।...

এর অল্পকাল পরে—অতুল ঘোষ তখন কলকাতায় এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছেন, আর 'অনুশীলন' সমিতির সভ্য হয়েছেন—নলিনী করও ভিড়েছেন গিয়ে ৪৯ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে 'অনুশীলন' কেন্দ্রের আড্ডায়।—স্বগ্রামে গারিবাল্‌দি-ম্যাৎজিনি প্রভৃতির জীবনী সম্বন্ধে আলোচনার একটি ক্লাসও খুলেছেন অতুল ঘোষ। লাড্‌লি মিত্র, সতীশ সেন প্রভৃতির সাহচর্য পাচ্ছেন,—বন্ধুত্ব হয়েছে যতীন্দ্রনাথের স্নেহাস্পদ নরেন ভট্টাচার্য ('নম্বুদা'—ভবিষ্যতের M. N. Roy), হরিকুমার চক্রবর্তী, পুলিন মুখোপাধ্যায়, সতীশ বসু প্রভৃতির সঙ্গে।

এমন সময়, এপ্রিল কি মে মাস নাগাদ, কুষ্টিয়ার বলদেব রায় এবং যশোরের যতীশ মজুমদার (চণ্ডী) এসে নলিনী কর ও অতুল ঘোষকে ডাক দিলেন। বললেন, "দাদা কাল কয়া ফিরছেন। বলে দিয়েছেন, তাঁর বাড়ি গিয়ে তোরা যেন দেখা করিস একবার।"

আনন্দে নেচে উঠল এঁদের মন। যতীন মুখার্জীর সঙ্গে একদিনের সেই সাক্ষাৎকারের স্মৃতি বারে বারে তাঁদের প্ররোচিত করেছে আবার তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু সাহস হয় নি—কী বলবেন ওঁর কাছে গিয়ে?...

সেই 'দাদা' শেষ পর্যন্ত ডাক দিলেন!

পরদিন, রোববার, বেলা দশটা নাগাদ কয়ার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন ক্ষিতীশ সান্যাল, নলিনী আর অতুল। উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাবছেন—বিরাট এই প্রাঙ্গণের কোনদিক দিয়ে যেতে হবে—এমন সময়, বদনা হাতে, চণ্ডীমণ্ডপের পেছন দিক থেকে লুঙ্গি-পরণে খালি গায়ে বেরিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ।

এঁদের দেখে তো সাদর অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, "কিরে? খুব কুস্তি করছিস মনে হচ্ছে? খাসা চেহারা হয়েছে?…"

তারপর দুই পা সামান্য ফাঁক করে দিয়ে নলিনীকে প্রথম ডাক দিলেন, "কেমন গায়ে জোর হয়েছে, দেখি! নে, ঠ্যাল্ আমায়!"

"আমরা তখন কিঙ্কর সিং-এর এক সাকরেদের কাছে নিত্যি কুস্তি লড়ছি, সাজোয়ান চেহারা আমাদের," নলিনীবাবু বলছেন, "কিন্তু একচুল নড়াতে পারা দূরে থাক, মনে হল যেন বিরাট একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে ধাক্কা মারছি বৃথাই।"

তখন, হেসে যতীন্দ্রনাথ অতুলকেও ডাক দিলেন, "আয়, দু'জনে ঠ্যাল্ দেখি!"

দু'জনে ঠেলেও তিলমাত্র নড়াতে না-পেরে এঁরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন দেখে প্রাণ-খোলা হাসি হেসে টান মারলেন যতীন্দ্রনাথ এঁদের দু'জনকে, "চল্, চল্, ঘরে চল্!"

এঁরা তো অবাক। অমন সুপুরুষ অথচ নিরীহ চেহারায় কোথা থেকে আসে এই অবিশ্বাস্য শক্তি? এই কি দৈবীশক্তি?…

"দিদি, ও দিদি," হাঁক পাড়েন যতীন্দ্রনাথ অন্তঃপুরে গিয়ে "এই নাও, তোমার আরো তিনটে ভাই এসেছে!" ব'লে, এঁদের নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁর ঘরে।

সেখানে ইতিমধ্যেই জমায়েৎ হয়েছেন শরৎ বোস, সতীনাথ, বলদেব রায়, অমিয় মজুমদার, রাধারমণ নন্দী প্রমুখ কর্মীরা। শেষোক্ত জন স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত, ভাল সংস্কৃত জানেন, গীতার ক্লাসও বুঝি নেন।

"দিদি তখুনি মালপো-টাল্‌পো এনে পেটপুরে খাওয়ালেন। তারপর শুরু হল নানা আলোচনা। দেখতে দেখতে ডাক পড়ল দুপুরের খাবার।… দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল।"…বিকেলে যতীন্দ্রনাথ এঁদের নিয়ে

গেলেন কুষ্টিয়ায় বলদেবের বাড়িতে। সেখানে চিঁড়েভাজা দিয়ে জলখাবার খেয়ে, খানিক গল্পসল্প করে সপার্ষদ যতীন্দ্রনাথ গেলেন কুমারখালি (এলঙ্গি), তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। স্বদেশপ্রেমমূলক বহু গান গাওয়া হল। রাতে সেখানেই খুব খাওয়া-দাওয়া হল। তারপর যতীন্দ্রনাথকে ঢাকা মেলে তুলে দিয়ে অতুল আর নলিনী ফিরে গেলেন এৎমামপুরে। যাবার আগে যতীন্দ্রনাথ ব'লে গেলেন : "সামনের রোববারেও আসিস কিন্তু!—তোদের গ্রামে যাব ওদিন!"

অতুল ঘোষ বলছেন : "বাড়ি ফিরে গিয়ে সে-রাতে আর ঘুম হল না আমার। আমি বিশ্বাস করতাম না ভগবানে। গীতা-টীতা ওসব ধাপ্পা ব'লে মনে হত। কিন্তু দাদার ব্যক্তিত্বে কী একটা মধুর আকর্ষণ অনুভব করলাম, যা' আমার চোখ খুলে দিল : আমি বুঝতে পারলাম, এ সেই টান, যে-টানে পাগল হয়ে দলে দলে গোকুলের যুবতী কুলের ভয় ভুলে ছুটে যেত যমুনা-কিনারে!...বুঝতে পারলাম, শ্রীকৃষ্ণ কিম্বদন্তী-মাত্র নন। বুঝলাম, গীতা ধাপ্পা নয়! কেমন যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে সেদিনটা দাদার সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিলাম, হাসলাম, গল্প করলাম, গান গাইলাম, খেলাম—সবটাই কেমন যেন একটা অবাস্তব আনন্দের ছন্দে রঙিন হয়ে উঠেছিল।...মনে বারবার সন্দেহ জাগতে লাগল : দাদা কি মানুষ নন?...আবার তাঁর দর্শন পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।..."

পরের রোববারেও ওই একই ভাবে এঁরা সমবেত হলেন কয়ার বাড়িতে। দুপুরে ওখানে খেয়ে-দেয়ে, বিকেলের ট্রেনে কুমারখালি (এলঙ্গি) গিয়ে জলখাবার খেয়ে, নৌকো করে পৌঁছলেন এৎমামপুর—সন্ধ্যের আগেই। ছেলেরা ড্রিল, খেলাধুলো প্রভৃতির প্রদর্শনী দিল ওঁর সামনে। রাতে অতুল ঘোষদের বাড়িতে খেয়ে, যতীন্দ্রনাথ ট্রেনে চাপলেন।

এই হল ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। সেই থেকে শোভাবাজারেও যতীন্দ্রনাথের বাড়ীতে এঁরা যাতায়াত শুরু করলেন। সেখানেও বসে তখন বিরাট এক আসর, প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলাতেই উপস্থিত হন সেখানে বিপ্লবী বন্ধুরা। গীতাপাঠ, নানা রকম সৎ আলোচনা, মহৎ চিন্তা, ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দূরকে কাছে টেনে আনা, দিদির ও ইন্দুবালা দেবীর সযত্নে তৈরি খাবারের প্রাচুর্য দিয়ে সবাইকে আপ্যায়িত করা,—পরিহাসে কৌতুকে আন্তরিক যতীন্দ্রনাথের বাড়ির এই ছিল আকর্ষণ!

এইভাবেই তখন ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র দেশে যতীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রভাব!

১৯০৭ সাল শেষ হয়ে আসে।

রাজদ্রোহী প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে শ্রীঅরবিন্দের নামে প্রথম মামলা রুজু হল। বিপিনচন্দ্র পালকে সরকার পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হল সাক্ষ্য দিতে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের গুণমুগ্ধ সহকর্মী দেশবরেণ্য নেতা বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন।

আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হল বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে। সারা দেশে হৈ হৈ পড়ে গেল। দলে দলে জনতা উপস্থিত হল গিয়ে আদালতে। তিল ধারণের জায়গা নেই সেখানে। দলে দলে সার্জেণ্ট হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ভিড় সামলাতে। যথেচ্ছভাবে হাতের ছড়ি তারা ব্যবহার করছে।

যতীন্দ্রনাথের স্নেহাস্পদ এক বালক—সুশীল সেন। ধমনীতে তার তাজা রক্ত বইছে। সার্জেণ্টের বেত যেই তার পিঠে এক ঘা পড়েছে, পনেরো বছরের ছেলে সুশীল সেনের উদ্যত মুষ্টি সঙ্গে সঙ্গে তার বদ্‌লা লাগাল সার্জেণ্টের নাক লক্ষ্য করে।

কিংসফোর্ড সাহেব সুশীলের দণ্ডবিধান করলেন—পনেরো ঘা বেত মারা হোক প্রকাশ্য আদালতে। দেশবাসী দেখুক রাজদ্রোহের শাস্তি কত নির্মম হতে পারে।

একটা একটা করে বেত পড়ছে আর সুশীল প্রতিবার 'বন্দেমাতরম্' বলে চেঁচিয়ে উঠছেন।

সুশীলের পিঠ কেটে রক্ত ঝরে পড়ল।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল দেশের গণ-চেতনা। জনতার বিক্ষোভ বাণী পেল বাংলার কাব্যবিশারদের লেখনীতে:

"আমায় বেত মেরে কি মা ভোলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে?"

ভারতের নব-জাগরণকে পিষে মারবার জন্যে বৃটিশ আমলাতন্ত্র তৎপর

হয়ে উঠে এইভাবে বিপ্লবীদের লাঞ্ছিত করছে প্রতি পদে, তার প্রতিকার চাইল জনগণ।

এই অত্যাচারের, এই লাঞ্ছনার অন্যতম উদ্যোক্তা কিংসফোর্ডকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দেওয়া স্থির করলেন গুপ্ত-সমিতির পরিচালকবৃন্দ।

একটা মোটা বইয়ের মধ্যিখানে চৌকো করে কেটে, সেই খাঁজের ভেতর এমনভাবে বোমা পুরে দেওয়া হল যে, বইটা খোলা মাত্র বোমাটা ফেটে যাবে।

এইভাবে পার্সেল ক'রে বিপ্লবীরা বোমা পাঠিয়ে দিলেন কিংসফোর্ডের ঠিকানায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিংসফোর্ড বহুদিন সে-পার্সেলে হাতই দিলেন না।

যথাসময়ে বিপ্লবীদের এই উপহারের খবর গোয়েন্দা বিভাগের কাছে পৌছে যেতেই ওদিকে সরকার থেকে চটপট কিংসফোর্ডের রক্ষী-সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হল।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাস।

রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে বিপ্লবী দলের দ্বিতীয় গুপ্ত-সম্মেলন বসল। উদ্দেশ্য: পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করা এবং আঞ্চলিক দলপতিদের রিপোর্ট আলোচনা করা।

এই সম্মেলনের শেষে যতীন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরে চিঠি পেলেন—তাঁর দ্বিতীয় সন্তান আশালতার ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদ।

প্রবীণ বিপ্লবী দার্শনিক ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখেছেন:

"অরবিন্দ কোনো উপলক্ষে দাদাকে (যতীন্দ্রনাথকে) বারীনের সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন। দাদা তখন তাঁর প্রতি বারীনের মনোভাবের উল্লেখ করেছিলেন। শুনে অরবিন্দ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।...

"অরবিন্দ দাদাকে বলেন: বারীনকে বল কিংসফোর্ডের ওপর attempt নিতে। তখন দাদা বারীনের মনোভাবের উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি অন্যভাবে ব্যাপারটা manage করবেন।

"সুশীলকে বেত মারার পর প্রফুল্ল (চাকী) কিংসফোর্ডের উপর ক্ষেপে যায় এবং দাদাকে তার মনের কথা বলে।

"অরবিন্দের সঙ্গে কথা হবার জের টেনে দাদা বলেন: পারবি কিংস-ফোর্ডকে মারতে ?—প্রফুল্ল লাফিয়ে ওঠে।—দাদা বলেন: তা' হলে তোর বারীনদাকে বলতে হবে এবং তাঁর মত করাতে হবে।

"এর পরেই বারীনবাবু সিদ্ধান্ত নেন।...*

১৯০৮ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে রংপুরের দুঃসাহসী কিশোর বীর প্রফুল্ল চাকী আর মেদিনীপুরের কিশোর বীর ক্ষুদিরাম বসু বোমা নিয়ে রওনা হলেন কিংসফোর্ডের ভবলীলা সাঙ্গ করতে।

মজঃফরপুরের সাহেব-মহলের গতিবিধি যতীন্দ্রনাথের সবই জানা। তাঁর কাছ থেকে বিশদ নির্দেশ নিয়ে এবং তাঁর পদধূলি মাথায় নিয়ে প্রফুল্ল চাকী রওনা হলেন।

১লা মে। ১৯০৮। মামাতো ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে যতীন্দ্রনাথ কয়ায় গিয়েছেন।† এমন সময় টেলিগ্রাম এল—মজঃফরপুরে বোমা ফেটেছে। তবে, দুর্ভাগ্যক্রমে এ-যাত্রাও কিংসফোর্ড বেঁচে গেল। তার গাড়িতে যাচ্ছিলেন যতীন্দ্রনাথের পুরাতন boss ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী আর কন্যা। সামান্য ভুলের জন্যে এই দুটি নিরপরাধ নারীর জীবন নাশ হল।

কেনেডিদের বাড়িতে প্রথম জীবনে যে আন্তরিক সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছেন যতীন্দ্রনাথ—তা' অবিস্মরণীয়। মনটা তাঁর উদ্বিগ্ন হল মিসেস ও মিস কেনেডির জন্যে যেমন, তেমনিই—ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্লর কথা ভেবে।

* Birley সাহেবের কাছে বারীনবাবু যে স্বীকারোক্তি দেন, তাতেও এই উক্তির সমর্থন পাই:

"Profulla Chaki insisted on going with a bomb to Mozaffarpore to do away with Mr. Kingsford because he had tried the case against the Nationalist papers. The people in the country demanded his death."

ক্ষুদিরামও বারীনবাবুর মনোমত ছিলেন না। মেদিনীপুরের দলের কাউকেই তিনি পছন্দ করতেন না। বারীন ঘোষের confession-এ আছে,

"Upendra Nath and I consented to Profulla going, and Hemchandra recommended Khudiram Bose of Midnapore ; he was also allowed to go. I gave them two revolvers because they wanted to kill themselves if they were caught. Khudiram was an outsider. He did not know of the garden house or of 15 Gopimohan Dutt's Lane (এখানে কানাইলাল থাকতেন এবং বোমা তৈরি করতেন) !"

† ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

বরযাত্রী যতীন্দ্রনাথ। মামাতো ভাই-এর বিয়ে হয়ে গেল। অনেক রাত অবধি চলল আনন্দানুষ্ঠান। উৎসবের ফাঁকেই ভবভূষণ মিত্র কলকাতা থেকে উপস্থিত। চুপি চুপি যতীন্দ্রনাথকে তিনি জানালেন বিশেষ জরুরি খবর!...

উঠে পড়লেন যতীন্দ্রনাথ! তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসলেন নির্জন এক পুকুর-পাড়ে। ভগ্নদূতের মুখে সংবাদ শুনলেন যে, মাণিকতলার বোমার বাগানে পুলিশ হানা দিয়েছে। বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর, শিশির ঘোষ, কুঞ্জলাল সাহা (যতীন্দ্রনাথের প্রথম শিষ্যদের অন্যতম) প্রভৃতি ধরা পড়েছেন। অন্যান্য আস্তানা থেকে ধরণী গুপ্ত, নগেন গুপ্ত (কবিরাজ ব্রাদার্স), অশোক নন্দী, হেম কানুনগো প্রভৃতি ধরা পড়েছেন।

এবং শ্রীঅরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত বিপ্লবীদেরও পুলিশ জালে ফেলবার চেষ্টা করছে।

"তোমায় সাবধান হতে অনুরোধ জানিয়ে আমায় কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছে। তোমার এখন বিরাট দায়িত্ব!"

"আমার জন্যে ভাবনা কী?" যতীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন। "ভাবনা হচ্ছে: এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে যে আগুন জ্বালা হল, তা কি এ-ভাবেই ব্যর্থ হয়ে যাবে? চল্, এখুনি কলকাতা যাই!"

কলকাতায় এসে যতীন্দ্রনাথ খবর পেলেন, ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হয়েছেন। আর প্রফুল্ল চাকী মোকামাঘাটে ধরা পড়া মাত্রই রিভলভার বের করে আত্ম-হত্যা করেছেন।

যে সাব-ইন্সপেক্টরটি প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করতে এগিয়ে যায়, তার নাম নন্দলাল ব্যানার্জী। ব্যথিত গলায় প্রফুল্ল তাঁকে বলেন, "আপনি বাঙালী হয়ে আমায় ধরিয়ে দেবেন?"

সে-অনুনয়ে কান পাতেনি নন্দলাল।

যতীন্দ্রনাথের অন্তর বিচলিত হল প্রফুল্লের এই অন্তিম উক্তি শুনে। সামান্য পদোন্নতি বা দু-এক হাজার টাকার লোভে যে কুলাঙ্গার এমন একটা অমূল্য জীবনের ওপর যবনিকা ফেলে দিল, সেই দেশদ্রোহীকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেওয়া মনস্থ করলেন যতীন্দ্রনাথ।

মজঃফরপুরে বোমা ফেলা সমর্থন করে, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে সমর্থন করে লোকমান্য তিলকের লেখনী থেকে আগুন ঠিকরে বার হল।

'কেশরী' পত্রিকায় লোকমান্য লিখলেন: "বোমার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করতে হলে তিনটি বিষয় স্থিরভাবে বিবেচনা করা দরকার—ভারতবর্ষে বোমা ব্যবহারকারীদের আবির্ভাব হল কী কারণে? এ-দেশে সে-দলের অবস্থা কী হবে? এই দল সরকার ও দেশের ওপর কী প্রভাব বিস্তার করবে?..."

তারপর লোকমান্য তিলক একে একে দেখিয়ে দিলেন এর কারণগুলো, "কী কারণে এই দলের আবির্ভাব হয়েছে, সে-সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত। শাসক-সম্প্রদায় যে অত্যাচার করে, দেশবাসীকে যে-রকম উত্যক্ত করে, এবং যেভাবে জনমত উপেক্ষা ক'রে চলে—তারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ এই দলের আবির্ভাব হয়েছে।

"সরকারী কর্মচারীরা যে-ব্যবহার করেছেন, তাতেই বাংলার যুবকদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছে। কাজেই, এর জন্যে রাজনৈতিক আলোচনা, রচনা বা বক্তৃতাকে দায়ী করা চলে না—কর্মচারীদের হঠকারিতা ও এক-গুঁয়েমিই এর জন্যে দায়ী!"

মজঃফরপুরে বোমা ফেলা সমর্থন করবার অপরাধে লোকমান্য তিলক এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লেন। শুধু কারাদণ্ডই নয়, দেশান্তরও। মান্দালয় জেলে তিলককে পাঠানো হ'ল।

সরকারী গোয়েন্দা সক্রিয় হ'য়ে উঠল তিলক ও শ্রীঅরবিন্দের যোগসূত্র আবিষ্কার করতে।

তিলকের কারাদণ্ড উপলক্ষে বোম্বাইয়ে দাঙ্গা বেধে গেল। সরকারী কাগজ-পত্রে দেখি লেখা আছে, কয়েকজন বাঙ্গালী preachers এই দাঙ্গা বাধানোর জন্যে দায়ী।

যতীন্দ্রনাথের শিষ্য ভবভূষণ মিত্র মাণিকতলার বোমার বাগান থেকে অন্তর্ধান করেন খানা-তল্লাসী হবার প্রাক্কালেই—সম্ভবত খানা-তল্লাসীর সূচনাতেই। এবং ঘুরতে ঘুরতে অদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মচারী ছদ্মনামে তিনি বোম্বাইয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ন।

ভবভূষণবাবু বলেছেন, "কলকাতার ২৭৫ নম্বর আপার চিৎপুর রোডের বাড়ি থেকে নাসিকে কুম্ভ মেলার সময় আমার (অদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মচারীর) নামে কুড়ি টাকার মনি-অর্ডার আসে। প্রেরকের নাম স্বামী কৃষ্ণানন্দ। অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ।

"সে-টাকা পুলিশ detain ক'রে অনুসন্ধান চালাতে লাগল, কে এই

স্বামী কৃষ্ণানন্দ। ২৭৫, আপার চিৎপুর রোডের বাড়িতে খোঁজ নিতে গেল। সেটা যতীন্দ্রনাথের বাসস্থান, তাঁর মেজমামা ডাঃ হেমন্তকুমারের বাড়ি। মেজমামা স্পষ্ট তাড়িয়ে দিলেন পুলিশকে : এখানে কৃষ্ণানন্দ ব'লে কেউ কোনদিন থাকেনি বাপু!

"ওদিকে ব্রহ্মচারী অদ্বৈতানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে স্বামী ভূমানন্দে পরিণত হলেন। বোম্বাই-পুণা যাতায়াত করতে লাগলেন।

"তিলকের মামলার দিনে উক্ত ভূমানন্দ, বরিশালের শ্রীনাথ ব্রহ্মচারী, 'পেট্রিয়ট' কাগজের সম্পাদক দেবীপ্রসাদ মুখার্জী (ওরফে সন্তবাবা—পরে পুলিশের গোয়েন্দা হন), পশ্চিমবঙ্গের স্বামী শালকানন্দ, নদীয়ার বীরেন ব্রহ্মচারী, শ্রীরামপুরের হীরক-ব্যবসায়ী ও স্বদেশী বক্তা স্বামী আনন্দঘন, জব্বলপুরের সতীশ মুখার্জী (ওরফে পার্থসারথি, ওরফে স্বামী শুভানন্দ) প্রভৃতি কয়েকজন একত্রিত হ'য়ে চড়াও হলেন সার্জেন্টদের উপর।

"সার্জেন্টদের হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে এই ক'জন 'সন্ন্যাসী' ডাণ্ডার মত ক'রে সেই রাইফেল ব্যবহার করতে লাগলেন।

"দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'ল। দাঙ্গার এ-ই হ'ল মূল কথা।"

ভবভূষণবাবুর এই জবান থেকে বোঝা যাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে শ্রীঅরবিন্দ ও জে. এন. ব্যানার্জীর সূত্রে যতীন্দ্রনাথের পরিচিতি বিপ্লবী কর্মী যথেষ্ট ছিলেন, যাঁদের অত অল্প সময়ের মধ্যে ভবভূষণবাবু একত্রিত ক'রে এই দাঙ্গার সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'লেন।

মাণিকতলা বোমার বাগান সংক্রান্ত মামলা উপলক্ষে কিছুকালের মধ্যেই ভবভূষণবাবুকে গ্রেপ্তার ক'রে পুলিশ যখন কলকাতায় নিয়ে এল, তিনি কালা-বোবা সেজে রইলেন। মর্মান্তিক পীড়নেও পুলিশ তাঁকে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ ব'লে প্রমাণ করতে পারলেন না মাসের পর মাস—তাঁকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হ'ল শেষ পর্যন্ত।

॥ বার ॥

সারা দেশে ব্যাপক ধর-পাকড় চলল। একমাত্র মেদিনীপুর থেকেই শ'খানেক কর্মীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। দেশের সমস্ত সমিতিগুলো বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি, সুহৃদ ও

সাধনা সমিতি, (ময়মনসিংহ), বান্ধব সমিতি (বরিশাল), ব্রতী সমিতি (ফরিদপুর) প্রভৃতি বেআইনী আড্ডা বলে প্রকাশ্যে ঘোষিত হ'য়ে গেল।

সমস্ত সমিতি উঠে গেল।

বিপ্লব আন্দোলন বুঝি আর টেঁকে না! চিন্তান্বিত হলেন যতীন্দ্রনাথ। দেশের লোক যেটুকু আশায় বুক বেঁধে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তা' এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে দেখে অবশিষ্ট কর্মীরা উদ্‌ভ্রান্তের মত হ'য়ে পড়লেন।

যতীন্দ্রনাথ চাইলেন তাদের নতুন ক'রে একত্রিত করে ইংরেজকে বুঝিয়ে দিতে, দেশবাসীকে জানাতে—বিপ্লব মরে নি, বিপ্লব শাশ্বত, সনাতন। ভারত যতদিন না স্বাধীন হচ্ছে ততদিন অন্তত মরতে পারে না ভারতের বিপ্লব আদর্শ।

হতাশ চিত্তে কিছু কর্মী ঘরের ছেলে ঘরমুখো পা বাড়িয়েছিল।

মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে, গোষ্ঠী সম্প্রদায় দলের ভেদ ভুলিয়ে দিয়ে তাদের ডাক দিতে লাগলেন, "ওরে, দেশে যে এখনো যতীন্দ্রনাথ রয়েছেন! যতীন মুখার্জীর মতো মহামানব তো এখনো হাল ধ'রে ব'সে রয়েছেন। এই কি ঘরে ফেরবার সময়?"

দানবীর মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর এই আহ্বান আর যতীন মুখার্জীর নাম—মন্ত্রের মতো কাজ করল জন-চিত্তে। নতুন উৎসাহ নিয়ে যতীন্দ্রনাথকে ঘিরে অগ্রসর হলেন বিপ্লবীরা।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ধ্বনিত করেছেন তাঁর মহামন্ত্র। গোটা জাতিকে তিনি জাগিয়ে দিতে শুরু করেছেন তাঁর অগ্নিস্রাবী লেখনীর দাহন দিয়ে।

তিনি আজ কারাগারে।

এখন যদি যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক না এগিয়ে আসেন সেই মন্ত্রকে বাস্তবের বুকে কর্মের উন্মাদ আবর্তে প্রস্ফুট ক'রে তুলতে, এখন যদি সেনানীরা এগিয়ে না আসেন দধীচির আত্মত্যাগী সাধনার সঙ্কল্প নিয়ে—তবে, আর কবে বিদেশীর শাসন-পাশ ছিন্ন ক'রে ভারত-জননী উঠে দাঁড়াবেন? আর কবে তিনি জগৎ-সভায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের আসন গ্রহণ করবেন?

ইতালির মাৎসিনি তীব্র আকুতি নিয়ে যে-স্বাধীনতার প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন, সেই স্বাধীনতারই আদর্শ নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তুখড়

রাজনীতিবিদ কাভুর। আর এই দু'জনের সম্মিলিত ভাবধারাকে অসির বুকে প্রস্ফুট করবার জন্যে দেখা দিলেন অমর সেনানায়ক বীর যোদ্ধা গারিবাল্‌দি।

এই পরম্পরাতে ভারতীয় বিপ্লবের পুরোধায় দেখা দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, লোকমান্য তিলক আর মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ।*

পূর্বোক্তদের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবের এই পুরোধা তিনজনের তফাৎ—এঁদের একজন ঋষি, অন্যজন জ্ঞানযোগী, তৃতীয় জন সাধক।

তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যতীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে, "He was my right-hand man···And his stature was like that of a warrior!"

যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রথম স্ফুরণেই পাই 'নায়মাত্মা বলহীনের লভ্যঃ'—বাণীর মূর্ত বিকাশ। শক্তির আরাধনাকে তাই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি তাঁর সমগ্র সত্তায়, তাঁর শরীরে, তাঁর মনে, তাঁর প্রাণে।

প্রবল দুঃখ, প্রখর শারীরিক পীড়ন তাঁকে সহাস্যবদনে সহ্য করতে দেখেছেন তাঁর শিষ্য ও সহকর্মীরা। মনে পড়ে গিয়েছে প্রাচীন কালের স্টোইক দর্শনের কথা। নূতন যুগের এই দুঃখ-বরণের ভাবধারা, পরার্থপর তিতিক্ষার ব্রত স্বার্থে অন্ধ ভয়ে মুহ্যমান জাতিকে তিনি দিতে চেয়েছেন, জাতিকে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন শক্তিমন্ত্রে।

যতীন্দ্রনাথের গুরু স্বামী ভোলানন্দ গিরি অদ্বৈত বেদান্তবাদী ছিলেন। অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বলে: আত্মা নিত্য, মুক্ত, অজর, অমর, শাশ্বত। আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ: স্বয়ংপ্রকাশ, স্বাধীন। বেদান্তে পাই সবলতার প্রশংসা, দুর্বলতার নিন্দা। বেদান্তের প্রার্থনাই হ'ল যতীন্দ্রনাথের আবাল্য প্রার্থনা: হে পরমাত্মা, তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বলবান কর; তেজস্বরূপ, আমাকে বীর্যবান ক'রে তোল; ওজস্বরূপ, আমাকে ওজস্বী কর। ক্রোধস্বরূপ, পাপের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত কর আমার ক্রোধকে।†

এই তো ছিল স্বামী বিবেকানন্দেরও ধর্ম।

ওঁ তেজো'সি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোস্যোজো ময়ি ধেহি।

* ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' দ্রষ্টব্য॥

† যতীন্দ্রনাথের গুরুভাই স্বামী প্রেমানন্দ গিরির রচনা অবলম্বনে॥ —পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোসি সহো ময়ি ধেহি॥

যে মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তি প্রভাবে বিমোহিত আত্মা নিজেকে পরিচ্ছিন্ন জীব ও স্বভাব-দুর্বল, জন্ম-মৃত্যু-শোকগ্রস্ত মনে করে; মায়াবশতই আত্মার এই পরিচ্ছিন্নতা ও পরতন্ত্রতা। আত্মস্বরূপ অনুবোধ দিয়ে তাকে বিদূরিত করাই বেদান্তের সাধনা।

স্বাধীন রাষ্ট্র-সত্তা ব্যতীত পরাধীন জাতির এই সাধনায় অধিকার জন্মায় না।

পারমার্থিক মোক্ষলাভও ঘটে না। বেদান্ত-সাধনায় 'দাস-সুলভ' মনোভাবের আদর নেই। বরং তার বিরোধী উপদেশই আছে: "মা তে লঘুমাদদীত"—নিজেকে তুমি ক্ষুদ্র জ্ঞান কোর না!

ইসলাম ও খৃষ্টীয় সভ্যতাতেই একমাত্র ধর্মের নামে 'দাস্যভাব' প্রচলিত। আর্যজাতির মধ্যে এই ভাবধারা সম্প্রসারিত হবার ফলে অনার্যসুলভ দুর্বলতা প্রবেশ ক'রেছে আমাদের সমাজে। এ-ভাবধারাকে ধুয়ে মুছে ঝেঁটিয়ে সাফ করতে চেয়েছেন যতীন্দ্রনাথ।

তাই, পরমাত্মাবাদী জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী হ'য়েও যতীন্দ্রনাথের গুরু ১০৮ শ্রীশ্রীস্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ উদাসীন ছিলেন না দেশের ও জাতির পরাধীনতাজনিত দুরবস্থা সম্বন্ধে। জনসাধারণের মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং ব্যবহারিক দুর্দশা দেখে সবার মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই তো গিরি-মহারাজ বেদান্তের প্রচার করেছেন জীবনের ব্রত জ্ঞান ক'রে। এমন কি শোনা যায় বিপ্লবের কাজে গিরি মহারাজ স্বয়ং যতীন্দ্রনাথের হাতে একবার থলি-ভরতি অর্থ তুলে দিয়েছিলেন।*

দ্বিতীয়ত, যতীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনায় দেখি—শক্তিলাভ করাটাই মানব-জীবনের সর্বশেষ লক্ষ্য নয়। শক্তিমান হওয়া তো মহত্ত্বের সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় গুণ মাত্র। নিছক শক্তির সাহায্যে মানুষ অবনত হ'য়ে পড়বে পশুর পর্যায়ে, হ'য়ে পড়বে অসুরের সামিল—যদি উচ্চতর গভীরতর সত্যতর কোনও লক্ষ্য, কোন আদর্শ, কোন আধ্যাত্মিক ব্রত তার জীবনের ধ্রুবতারা না হয়।

* স্বামী রামানন্দ গিরির সূত্রে প্রাপ্ত।

কী সেই মহান আদর্শ ?

আজন্ম যতীন্দ্রনাথ দেখেছেন—কী দারুণ গ্লানি, কী মারাত্মক অন্ধকারে মুহ্যমান হ'য়ে রয়েছে ভারত। ভারত ভুলতে চলেছে তার ঐতিহ্য, তার জ্ঞানলব্ধ সিদ্ধির কথা, ভারত ভুলতে বসেছে তার আত্ম-মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, স্বকীয়তা। এর উৎস কোথায়, কে এর জন্যে দায়ী ?

যতীন্দ্রনাথের সমস্ত চেতনা, সমস্ত সংবিৎ আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে—এর একমাত্র উৎস, এইসব হীনতার মূলদেশে রয়েছে বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়, অত্যাচারী নৃশংস ইংরেজ।

যতদিন ভারত পরাধীন থাকবে, যতদিন ভারতের জনগণ নিজেদের পরে নির্ভর করতে না শিখছে—ততদিন চলবে এই অনাচার, এই অদিব্য আসুরিক শক্তির নৃত্য চলবে দেবী ভারতবর্ষের বুকের ওপর, যে-ভারতবর্ষকে ধ্যানলোকে উপলব্ধি করেছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, গেয়েছেন অভিভূত কণ্ঠে—'বন্দেমাতরম!'···যে-ভারতবর্ষকে স্মরণ ক'রে অতিমানসের মন্ত্রদ্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত নদী, বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।"

শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেছেন, "মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে—না, মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়িয়া যায় ?"

যতীন্দ্রনাথের সমস্ত অনুভূতিতেও সোচ্চার হ'য়ে উঠেছে তাঁর সংকল্প: মহাকালীর দেহ-বিশেষ এই জননী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা—প্রথমে রাজনৈতিক, তারপরে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা চাই। ভগবানের ইচ্ছার রূপ নিয়ে এই স্বাধীনতা আসবে, যতীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝতে পারেন।

তাইতো অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধারের ভূমিকায়, মহানায়করূপে।

জাতীয়তা তো কেবলমাত্র একটা রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি নয়, জাতীয়তা হ'ল ঈশ্বরপ্রদত্ত ধর্ম। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: জাতীয়তা কখনই বিনষ্ট হ'বে না, ভাগবত শক্তিতেই জাতীয়তা টিঁকে থাকবে, যে-কোন অমোঘ অস্ত্রই এর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হক না! জাতীয়তা অমর, কারণ তা' মানবীয় জিনিস

নয়—ভগবানই জোগাচ্ছেন এর প্রেরণা।

"ভগবানকে মারা যায় না, ভগবানকে সেলে পাঠানো যায় না।"

গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে এই আদর্শকেই বাস্তব ক'রে তুলতে চেয়েছেন সে-যুগের নেতৃবৃন্দ। যতীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম।

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর নাম আমরা জানি। যতীন্দ্রনাথের এই তরুণ দুঃসাহসী শিষ্যটি ছিলেন কালীসাধক। বজ্র দিয়ে গড়া কঠোর তাঁর চরিত্র। রাতের পর রাত বীরাচারী সাধনায় তিনি ঘুরেছেন শ্মশানে শ্মশানে। প্রশ্ন করেছেন নিজেকে : কঃ পন্থা ?

এমনি অন্বেষণের শেষে চিত্তপ্রিয় উপনীত হলেন যখন যতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "দাদা, বলুন তো—দেশের কাজে কি ভগবানকে পাব ?"

অটল দৃঢ় স্বরে চিত্তপ্রিয়ের চোখে চোখ রেখে যতীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছেন, "তা' যদি না পাওয়া যেত, আমায় অন্তত এ-পথে তবে দেখতে পেতে না।"

আনন্দের এক তন্ত্রী কেঁপে উঠেছিল চিত্তপ্রিয়ের প্রাণের গহনে মহানায়কের এই উত্তর শুনে। সত্তা তার ভরে ওঠে মন্ত্রের মোহন এক দিশারী অনুভবে। আর, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি গতিধারা নতুন এক অর্থ পরিগ্রহ করে এই উক্তির আলোকে।

আর, যতীন্দ্রনাথের জীবনেরও প্রতিটি ঘটনা, প্রত্যেক মুহূর্ত, প্রতি কর্মও উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে নতুন তাৎপর্যের আলোকে।

যা-কিছু দেবে না সদ্‌গময়ের প্রার্থনা, অন্ধকার থেকে আলোক অভিমুখে চলবার পাথেয়, অমৃতত্বের চিরন্তন স্বাদ—তা' নিয়ে যতীন্দ্রনাথ কী করবেন ?

পার্থিব সুখ, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য, যৎপরোনাস্তি সামাজিক প্রতিপত্তি, রূপ, যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা—ভগবান তো অযাচিতভাবে অকৃপণ হাতে যতীন্দ্রনাথের ওপর এ-সবই বর্ষিত করেছেন অকুণ্ঠ আশীর্বাদের ছন্দে।

তবে কেন যতীন্দ্রনাথ তা' নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন নি ? কেন তিনি ভাবেন নি তাঁর বংশধরদের প্রতিষ্ঠার কথা ? ভাবেন নি কেন নাবালক তিনটি সন্তানের ভবিষ্যৎ ? সর্বগুণে গুণান্বিতা সুন্দরী ভার্যা ইন্দুবালা দেবীর কথাই বা ভাবেন নি কেন ?

অভিভাবকেরা, গুরুজনেরা পদে-পদে যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন

তাঁর সংসারের দিকে, কন্যা আশালতা, দুই পুত্র তেজেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথের দিকে। ঐহিক উপার্জনের দিকে, প্রতিষ্ঠার দিকে।

যতীন্দ্রনাথ উদাসী আত্মভোলা হাসি হেসেছেন।

সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছেন সংসারী পাটোয়ারী বুদ্ধির আদালতে, "ভগবানই ওদের জন্যে ভাবছেন। এই ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই কেবল আমার সংসার নয়, জগৎ সংসারই আমার সংসার। সংসারে পুরুষ হ'য়ে জন্মেছি, পুরুষের কাজ করতে হ'বে। জীবনে ভয় করলে কখনও কোন কাজ করা হয় না। এই মুহূর্তে যদি কলেরা হ'য়ে তোমাদের কোলের ওপর মরে যাই, তোমরা কি আমায় ধ'রে রাখতে পারবে ?"*

বারান্তরে যতীন্দ্রনাথ এমনও বলেছেন, "সমষ্টির হিত-কামনায় ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করতে হবে। বাঘের মুখ থেকে ভগবান যে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন তা বোধহয় ক্ষুদ্র এই সংসারের জন্য নয় ; নিশ্চয়ই তাঁর এমন-কোনও মহদুদ্দেশ্য তিনি আমায় দিয়ে সাধিত করে নেবেন—এই তাঁর ইচ্ছা। ক্ষুদ্র থেকে মহতের উৎপত্তি হয়, ক্ষুদ্র শক্তি ক্রমশ মহৎ শক্তি লাভে বিরাট মূর্তি ধারণ করে। সেই সর্বশক্তিমান বিরাট পুরুষের ইচ্ছাতেই মানুষ পরি-চালিত হচ্ছে এবং হবে।"…†

ভগবানের অভ্রান্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল যতীন্দ্রনাথের আন্তর-শ্রবণে। নতুন জীবন নিয়ে তাই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। শরীর, প্রাণ, মন, ভাবনা, চিন্তা, কামনা, বাসনা, হিত, অহিত—সবই তাই ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ ক'রে দিয়ে নিঃশঙ্ক নিরলস নির্ভরশীল এগিয়ে চললেন তিনি নিবে-দিতের মত !…

তাই বুঝি যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে মুগ্ধ জীবন-চরিতকার "বিপ্লবের বলি" গ্রন্থে অসমসাহসিক এই উক্তি করেছেন যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, "স্বার্থ কখনো যতীন্দ্রনাথের অন্তর স্পর্শও করিতে পারে নাই। অকপট স্বদেশপ্রেম ও প্রাণে বিশাল উদারতা লইয়া তিনি সর্বজন-হিত সাধনে ব্রতী ছিলেন। বহুল গুণ-সম্পন্না স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা, সকল ছাড়িয়া স্বদেশের জন্য এককথায় যে এমন করিয়া জীবন বিসর্জন দিয়া চলিয়া যাইতে পারে—তাহা দ্বারাই দেখা যায় যতীন্দ্রনাথ কত বড় আসক্তিশূন্য বীর ও কর্মী ছিলেন।

---

* দিদি বিনোদবালা দেবীর খাতা থেকে॥ —পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

† ঐ

"জগতের মহাপুরুষগণের সহিত তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের তুলনা করিয়া বলিলে ইহা অত্যুক্তি হইবে না যে, যতীন্দ্রনাথ বুদ্ধ-চৈতন্যের ন্যায় স্বীয় অন্তরের মন্ত্র সাধনার জন্য স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মহা-সন্ন্যাস লইয়া সংসারের বাহিরে অবাধে যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন!"

মহানায়ক

॥ এক ॥

ডিসেম্বর, ১৯০৮ সাল।

আঠারো শ' আঠারো সালের তিন আইন প্রয়োগ ক'রে বিদেশী শাসকেরা দমন-নীতির আশ্রয় নিলেন। তার আগেই 'প্রেস আইন' ও 'বিস্ফোরক আইন' নতুন ক'রে সংশোধিত হ'ল। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা-গুলোর কণ্ঠরোধ করতে চাইলেও সকলের অলক্ষ্যে 'যুগান্তর' প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশ হ'তে লাগল, চড়া দামে লোকে তা' সাগ্রহে কিনতে লাগল। যাবতীয় সন্দেহজনক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ হ'য়ে গেল।

আদা-নুন খেয়ে গোয়েন্দারা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র।

মূল 'অনুশীলন' সমিতি উঠে গিয়েছে। এরই প্রধান কেন্দ্রে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের ভাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথকে সঙ্গে ক'রে এনে শুনিয়ে-ছিলেন নতুন নতুন স্বদেশী গান। মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী, রাজা সুবোধ মল্লিক, রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি এক কথায় হাজার হাজার টাকা দান করেছিলেন সংগঠনের স্বার্থে। শ্রীঅরবিন্দ এসে নিঃস্ব বৈরাগীর মত উঠেছিলেন, বরোদার বিরাট চাকরি ছেড়ে দিয়ে। জে. এন. ব্যানার্জী শিখিয়েছিলেন রণনীতি, বিপিনচন্দ্র রাষ্ট্রনীতি, সখারাম গণেশ দেউস্কর অর্থ-নীতি; মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লোকমান্য তিলক, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের পদধূলিতে ধন্য এই 'অনুশীলন' কেন্দ্র। 'ডন' সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়, 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি চিন্তাবিদ ও যতীন্দ্রনাথ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারা এখানে আসা-যাওয়া করেছেন। 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের প্রথম সঙ্কল্প নেওয়া হয়েছিল এই আস্তানাকেই কেন্দ্র ক'রে।—ভারতীয় বিপ্লবের মহা তীর্থস্থান এই মূল 'অনুশীলন' সমিতি ১৯০৮ সালের শেষভাগে উঠে গেল।

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ইতিপূর্বেই বিকেন্দ্রিক হ'য়ে কাজ করছিলেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞা শুনে তাঁরা সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে পড়লেন

ব্যাপকরূপে। ছড়িয়ে পড়ল আমন্ত্রণ : এস তরুণ, এস দেশজননীর নির্ভীক সৈন্যদল! লগ্ন এসেছে। আমাদের এগিয়ে যেতে হ'বে।

সমিতির সভ্যদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল, জনগণের মধ্যে দেশহিতকর কাজ করবার অজুহাতে বিপ্লবের আগুন অনির্বাণ রাখবার উদ্দেশ্যে। একদলকে সমবায়-প্রথায় চাষ-আবাদ করবার সঙ্কল্প নেওয়া হ'ল। Bengal youngmen's Co-operative Credit and Zamindary Society নামে একটি সমিতি স্থাপন ক'রে সরকারী অনুমোদন সংগ্রহ করা হ'ল। সুন্দরবনের গোসাবা-তে বিখ্যাত ব্যবসায়ী হ্যামিল্টন সাহেবের সহায়তায় জমি পাওয়া গেল সমিতির এই কাজের জন্যে। জজ সারদা মিত্রও যথেষ্ট সহযোগিতা করলেন। তিনিই হ'লেন সমিতির চেয়ারম্যান।

বিপ্লবী যাদুগোপাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "বাকী যারা রইল তারা কলকাতায় নৈশ বিদ্যালয়ে, সোদপুর জন-শিক্ষায়তনে (শশীদার), গ্রামে গ্রামে দল বেঁধে গিয়ে প্রচার, দেশহিতৈষণা-বর্ধক পড়াশুনো নিয়ে রইল। অনেকগুলি পাঠাগার গড়ে তোলা হল। কোথাও কোথাও ব্যয়ামাগার। কোথাও বা কপাটি-পার্টি, কোথাও বা ঘোড়দৌড়ের ক্লাব, কোথাও নৌকা-চালান। কলকাতায় কয়েকটা সেবা-সমিতিও গ'ড়ে তোলা গেল।"

যতীন্দ্রনাথের শিষ্য নলিনীকান্ত কর বলছেন, "আমিও গেলাম গোসাবা-য়, এগ্রিকালচার শিখতে। সেখানে আমরা সবাই অনুশীলনের সভ্য ছিলাম। ঘর তোলা হ'ল। মাগুরার হীরালাল রায় এখানে আমাদের ইন-চার্জ ছিলেন। তাঁর এক ভাই ('চাচা'), জ্ঞান মিত্র, চুনীলাল দত্ত, আচার্য প্রফুল্ল রায়ের ভাইপো বলাইদা (বিষাক্ত সাপ ধরতেন) প্রভৃতি অনেকে ছিলাম। এখানেই বীরেন দত্তগুপ্তের সঙ্গে আমার আলাপ।

"আমার ম্যালেরিয়া ধরল। কলকাতায় ফিরে এলাম। ৪৯ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে উঠলাম—পুরানো 'অনুশীলন' অফিস। দেখি বীরেন প্রভৃতি আরও অনেকে শুয়ে।

"দু-একদিন বাদে আমার নামে এক-ঝুড়ি ফল এসে হাজির। ওই বাড়ির নীচের তলায় 'ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড কোম্পানী' নামে মনোহারী ও চায়ের একটা দোকান ছিল। তার মালিক ছিলেন ক্ষেত্র গুহের আখড়ায় 'দাদা'র বন্ধু। ইনি ফলগুলো দিয়ে বললেন : 'তোর 'দাদা' এগুলো পাঠিয়েছেন।' —নাম বললেন না।

"কিছুদিন বাদে সেরে উঠলাম। দাদা ডাক দিলেন। ফণী রায়, ক্ষিতীশ সান্যাল ও বলদেব রায় (কুষ্টিয়া), গিরীন ভৌমিক (ওকালতি পড়তেন, ভাল সংস্কৃত জানতেন, গীতার ক্লাস নিতেন আমাদের), 'আত্মোন্নতি'র প্রভাস দে, হরিশ শিকদার, বিপিন গাঙ্গুলী, অহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন মুখার্জী,* রণেন গাঙ্গুলী, সাতু দে, (Bengal Lamp-এর)** প্রভৃতি মিলে আমরা শোভারাম বসাক লেনের বিখ্যাত মেস গড়লাম।

"তারপর ফণী রায়, ক্ষিতীশ সান্যাল, বলদেব রায়, যতীশ মজুমদার (চণ্ডী), অহীন চাটুজ্যে, সতীশ সরকার প্রভৃতি দাদার একান্ত অনুচরেরা উঠে যাই স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের সামনে, মহেন্দ্র দত্তের ছোট একটা দোতলা বাড়িতে। 'খুড়ো' (দেবীপ্রসাদ রায়) দু-জায়গাতেই আসতেন-যেতেন।..."

নাটোরের সতীশ সরকার বলছেন, "এ-মেস উঠে গেল সামসুল হত্যার পর। দাদা (যতীন্দ্রনাথ) দার্জিলিং থেকে টাকা পাঠাতেন। আমি ম্যানেজার ছিলাম। ক্বচিৎ কখনো দাদা আসতেন এখানে † ...শোভারাম বসাকের মেসের পর সিমলার এই মেসই আমাদের সর্বশেষ মেস।..."

নলিনীকান্ত বলছেন, "দাদা আমাদের বললেন, গ্রামে গ্রামে আবার কাজে যেতে হ'বে ; আমরা কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়াশুনো ক'রে constructive কাজে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ব ব'লে তৈরি হ'তে লাগলাম। এই সময়ে বীরেন দত্তগুপ্ত 'একটা কিছু' করবে বলে খেপে উঠেছে। সামসুল হত্যার কথা দাদা তখন চিন্তা করছেন। বারবার বীরেনের অনুরোধে অতিষ্ঠ হ'য়ে দাদা এর কিছু পরে ওকে আর সতীশ সরকারকে সামসুল মারতে পাঠান। ‡..."

* পরে বিদ্যাসাগর কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল॥

** এঁরা তিনভাই দলে ছিলেন ; তিনকড়ি দে (পরে বঙ্গবাসী কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক), পতিতপাবন এবং সতীশ। প্রথম দু'জন মুখ্যত রণেন গাঙ্গুলির কাছে যাতায়াত করতেন এবং অচিরেই তাঁরা রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করেন। সতীশ হিন্দু হোস্টেল দলে ভেড়েন ও প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বিশেষত রডা অস্ত্র লুঠ প্রসঙ্গে রাজবন্দী হন।

† সঙ্গে থাকতেন অতুল ঘোষ।

‡ সতীশ সরকারের জবানের সঙ্গে নলিনীকান্তের জবান হুবহু মিলে যাচ্ছে। তবে সতীশবাবু বলেন, "যতীশ মজুমদারকেই যতীন্দ্রনাথ এ-কাজে প্রথম পাঠান। যতীশ নার্ভাস হ'য়ে পড়েন পরপর ক'বার। তারপর বীরেন ও আমাকে দাদা পাঠালেন॥"—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

সারা কলকাতা এবং মফস্বলেও যতীন্দ্রনাথ গ'ড়ে তোলেন অজস্র ছোট-বড় কেন্দ্র যাতে ক'রে সন্দেহভাজন নেতা ও কর্মীরা এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে গিয়ে আত্মগোপন করতে পারেন, এবং একটি কেন্দ্র দৈবাৎ যদি পুলিশ আবিষ্কার ক'রে ফেলে, অন্যগুলি তবুও নিরাপদ থাকবে।

শোভাবাজারে, যতীন্দ্রনাথের মেজ মামার ২৭৫, আপার চিৎপুর রোডের বাড়িই যে যতীন্দ্রনাথের প্রধান আস্তানা ছিল, তা' বলা বাহুল্য। তা' ছাড়া বিভিন্ন সময়ে যেসব কেন্দ্রগুলিতে তিনি যাতায়াত করতেন ও তাঁর স্নেহ-ভাজনদের আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে ছিদাম মুদী লেনে অতুল ঘোষ ও অমর ঘোষের বাসা বোধহয় সর্বপ্রধান ও উল্লেখযোগ্য; এঁরা দুই ভাই এবং এঁদের বাড়ির লোকেরা যতীন্দ্রনাথকে ঘরের ছেলের মতো ভালবাসতেন; যতীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় যতগুলি দল ছিল, তাদের সবগুলি যখন-তখন এসে আশ্রয় নিয়েছেন এঁদের বাড়িতে—এঁরা তাঁদের আশ্রয় দিয়েছেন নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ ক'রে। এমন কি ছিদাম মুদী লেনের বাড়িতে যখন স্থান সঙ্কুলান করা যেত না—অতুল ঘোষের দিদি ৺মেঘমালা দেবীর শ্বশুর-বাড়িতে (বিখ্যাত অধাপক কে. পি. বসুর বাড়িতে) পর্যন্ত পরম সমাদরে আট-দশজন ক'রে কর্মীকে নিয়ে গিয়ে তুলেছেন এঁরা।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র---বিভিন্ন সময়ে—ছিল সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে কবিরাজ বিজয় রায়ের আস্তানা (কালিদাস ঘোষ, চুনী মিত্র, যোগেশ মিত্র বা 'মাদারু', মাগুরার সত্যেন সেন প্রভৃতি যতীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট শিষ্যদের নিবাস); ইডেন হিন্দু হোস্টেল; মীর্জাপুর স্ট্রীটে মিকাডো ক্লাব; নরেন সেন স্কোয়ারে সাতকড়ি ব্যানার্জীর মেস; দর্জিপাড়ায় দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটের কালী মন্দির (পুরোহিত স্বয়ং ও তাঁর ভাই-পো সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য যতীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন); পূর্বোক্ত শোভারাম বসাক লেনের 'আত্মোন্নতি' মেস (পূর্বলিখিত ক'জন ছাড়াও—যতীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-হস্ত অতুল ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নরেন বোস, খুলনার মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতিও কিছু-কাল এখানে পাকাপাকি অবস্থান করেন); হরিতকিবাগান লেনে গোপেন রায়ের আস্তানা (দলের প্রায় সব কর্মীই এখানে আসতেন ১৯১৪ সাল নাগাদ); হ্যারিসন রোডে ময়মনসিং-এর মণি চৌধুরীর মেস; সিমলায় মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে মণি ভট্টাচার্য ও ধীরেন ভট্টাচার্যের মেস (সুবোধ ঘোষ, সুরেন মিত্র প্রভৃতি যশোরের কর্মীদের আড্ডা); পঞ্চানন ঘোষ লেনে

শৈলেন ঘোষ ও ব্রজেন দত্তের মেস ; শৈলেন ঘোষ হিন্দু হোস্টেল ছেড়ে এসে এই মেস গড়েন,—ব্রজেন্দ্র দত্ত বা জগাদা ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর চেয়ে এক বছরের জুনিয়র মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন এঁরা। এই মেসের সামনেই থাকতেন বিস্ফোরক-বিশারদ সুরেশ দত্ত ; জগাদা নিরুদ্বেগ, sober প্রকৃতির লোক : ডাকাতি ক'রে এসে বাঁশি বাজাতে বসতেন,* আমহার্স্ট' স্ট্রীটে C.M.S. হোস্টেল (যতীন্দ্রনাথের প্রিয়ভাজন কৃতী স্কলার ফরিদপুরের ৺নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের আড্ডা—যতীন্দ্রনাথের আকর্ষণে মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি এখানেও আসতেন) ; উত্তরবঙ্গের খুব উল্লেখযোগ্য কর্মী যোগেন দে সরকারের ৩, মুক্তারাম বসু স্ট্রীটের মেস (শীতলাই গ্রামের জমিদার যোগেন মৈত্র, রাজসাহীর ধীরেন ঘটক, হেমন্ত সরকার, মৃন্ময় দাশগুপ্ত প্রভৃতি বগুড়ার যতীন রায়ের সহকর্মীরা এখানে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ পেতেন ; মৃন্ময়ের এক দাদা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—আমহার্স্ট' স্ট্রীটে তাঁর বাড়িতে তিনি বহু বিপ্লবীকে আশ্রয় দিতেন যতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা-পরবশ হয়ে ; এই মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের মেসেই যতীন্দ্রনাথ ছিলেন, যখন সুরেশ মুখার্জীকে হত্যা করতে যান চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী প্রমুখ বিপ্লবীরা) ; ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের মেস ; বরাহনগরের বাড়ি ; ডাঃ নীলরতন ও জীবনরতন ধরের মেস (এখানে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস, নীলরতন ধর প্রমুখ ভবিষ্যৎ ভারতের দিকপাল মনীষীরা যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন) ; শেয়ালদায় 'আর্যনিবাস' হোটেল ; পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি—প্রভৃতি বহু আস্তানার নাম এই ক'বছরের বৈপ্লবিক কর্মসূচীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মীয়, 'সোমপ্রকাশ' প্রসিদ্ধ ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ১২নং মীর্জাপুর লেনের (এখন কলেজ রো) বাড়িতেও যতীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে আত্মগোপন করতেন ব'লে শোনা যায় ; দ্বারকানাথবাবুর নাতি ফণী চক্রবর্তী ছিলেন যতীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য—আগে বলেছি তাঁর কথা।

বাংলার বাইরেও বিভিন্ন অঞ্চলে বহু কেন্দ্র এইভাবে স্থাপিত হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের বিকেন্দ্রিক রাজনীতির পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি কেন্দ্র ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ; একমাত্র তাদের নেতার সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে যতীন্দ্রনাথের সংস্পর্শ ছিল কার্যসূচীর সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য।

* ১৯৬৫ সালে এই গ্রন্থ রচনাকালে ইনি জীবিত ছিলেন॥

উক্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে উড়িষ্যার সেই কেন্দ্রটি, বালেশ্বর থেকে কয়েক মাইল দূরে কাপ্তিপদার জঙ্গলে যেটিকে স্থাপন করা হয় ১৯০৮ সালে। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অম্বিকা উকীল প্রভৃতির ব্যবস্থায় যতীন্দ্রনাথের শিষ্য ৺দেবীপ্রসাদ রায় (খুড়ো) ১৯০৮ সালে কাপ্তিপদায় যান বিপ্লবীদের আত্মগোপনের উপযুক্ত একটি আশ্রয়স্থলের সন্ধানে।

সেখানে নদীয়ার মণীন্দ্র চক্রবর্তীর দুই পুরুষ যাবৎ বাস ও বহু জমি-জমা। মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেবীপ্রসাদবাবুর এখানে বিপ্লবীদের আত্মগোপনের ব্যবস্থা আগেই পাকা হয়।

১৯১০ সালে সামসুল হত্যার অপরাধে বীরেন দত্তগুপ্ত যখন ধরা পড়লেন, তাঁর সঙ্গী সতীশ সরকার অন্তর্ধান করে এইখানেই এসে কিছুদিন গা ঢাকা দেন। হাওড়া মামলার প্রাক্কালে ১৯১০ সালেই, যতীন্দ্রনাথের অপর শিষ্য নলিনী করও এখানে এসে আত্মগোপন করেন।

এবং ১৯১৫ সালে যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং এখানে আসেন।—সে-কথা যথাস্থানে বলব।

মাণিকতলা বোমার বাগানে ধর-পাকড়ের পর নতুন উৎসাহে সংগঠন যখন দানা বেঁধে উঠল, তলায় তলায় সমাজের সর্বস্তরের লোকই তখন মনে মনে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করছে। সরকারী সৈন্যবাহিনীর দীনতম সৈন্য থেকে শুরু ক'রে উচ্চপদস্থ অনেক অফিসার, শিল্পপতি, ব্যবহার-জীবী, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি সাড়া দিলেন যতীন্দ্রনাথের দীপক আমন্ত্রণে। সারা দেশে সে-আগুন ছড়িয়ে পড়ল।

'দশম জাঠ বাহিনী' বিশেষ ক'রে মরণপণ মেনে নিয়ে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইল: সময় হ'লেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে কর্মক্ষেত্রে।

যশোর, খুলনা, নদীয়া, ২৪ পরগনা, হাওড়া ও কলকাতার আঞ্চলিক নেতারা যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে অর্থসংগ্রহে মন দিলেন: শ্রীঅরবিন্দ-প্রমুখ বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন ক'রে মামলার ব্যবস্থা, সন্দেহভাজন যেসব বিপ্লবী ধরা পড়েন নি তাঁদের নিভৃতবাস ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা, দলের গঠনমূলক কর্মসূচী অপ্রতিহত রাখা—অনেক দায়িত্ব তখন এঁদের।

যতীন্দ্রনাথের বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা, বিশেষ ক'রে ব্যারিস্টার ৺জে. এন. রায়, ৺রজত রায় প্রভৃতি সাগ্রহে ব্রতী হয়েছেন এই সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে

বাংলার বিপ্লবীদের সাহায্য করতে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অবদানও আজ অজ্ঞাত নেই। নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন ক'রে জয়যুক্ত হ'লেন অবশেষে।

ইতিমধ্যে, শ্রীরামপুরের নরেন গোসাঁই রাজসাক্ষী হ'য়ে সামান্য যা-কিছু তার জানা ছিল গুপ্ত-সমিতির খবর—সবই ব'লে দিল। কিন্তু সেসব অধিকাংশই গুপ্ত-সমিতির বহির্বিভাগের উড়ো উড়ো অসংলগ্ন খবর—যা' থেকে শেক্সপীয়র-সুলভ উদ্যম ও নৈপুণ্য নিয়ে নর্টন-সাহেব ফেঁদে বসলেন চমৎকার এক কাল্পনিক সুগ্রথিত কাহিনী!

নরেন গোসাঁইয়ের রাজসাক্ষী হবার খবর পেয়ে মেদিনীপুরের গৌরব, ক্ষুদিরাম বসুর নেতা সত্যেন বসু*—জেলে ব'সে সঙ্কল্প নিলেন: দেশদ্রোহীর উপযুক্ত শাস্তি দিতে হ'বে, যে-করেই হোক!

বিপ্লবীরা রিভলভার পৌঁছে দিলেন জেলের মধ্যে।

৩১শে অগাস্ট। ১৯০৮ সাল। জেলের হাসপাতালে বিপ্লবীর আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। দেশের বুক থেকে মীরজাফরের আর একটি মানস-পুত্র বিদায় নিল।

কানাই আর সত্যেনের ফাঁসীর হুকুম হ'ল। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী জেলখানায় গেলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভাইপো সত্যেনকে আশীর্বাদ করতে। শাস্ত্রী-মশাই ফিরে এলে সবাই জানতে চাইল, "আপনি সত্যেনকে আশীর্বাদ ক'রে এলেন, কানাইকে করলেন না যে?"

শাস্ত্রী-মশাই জবাব দিলেন, "কানাইকে দেখলাম, সে পায়চারি করছে, যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ। বহু যুগ তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করবার যোগ্যতা অর্জন করে।"

অর্থের প্রয়োজন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, অথচ অর্থ হাতে নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহের কোনও উপায়ও দেখা যায় না। অগত্যা, সাময়িক অনুমতি দিলেন যতীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদীদের টাকা লুঠ করতে।

রাওলাট রিপোর্ট, খুলনা মামলা ও বিখ্যাত হাওড়া মামলার রেকর্ড মিলিয়ে দেখা যায় যে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে-সব দল কাজ করত, তাদের হাতে নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী লুঠের টাকা এসেছে:

* সত্যেনের দাদা জ্ঞান বসুর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ১৯০২ সালেই॥

(১)	শ্রীহরিণাপাড়া	(এপ্রিল,	১৯০৮)	...	৪০০,
(২)	বিঘাতি	(সেপ্টেম্বর,	,,)	...	৫৩৬,
(৩)	রায়তা	(নভেম্বর,	,,)	...	১৯১৫,
(৪)	মোরহাল	(ডিসেম্বর,	,,)	...	১৩০,
(৫)	মাশুপুর	(ফেব্রুয়ারী,	১৯০৯)	...	৫০০,
(৬)	নেতড়া	(এপ্রিল,	,,)	...	২৪০০,
(৭)	নাংলা	(অগাস্ট,	,,)	...	১০৭০,
(৮)	হোগলবুনিয়া	(সেপ্টেম্বর,	,,)	...	৫০,
(৯)	হলুদবাড়ি	(অক্টোবর,	,,)	...	১৪০০,
(১০)	বিকারা	(ডিসেম্বর,	,,)	...	৮১৪,
(১১)	বোলগাতি	(ফেব্রুয়ারী,	১৯১০)	...	২০০,
(১২)	ধলগ্রাম	(,,	,,)	...	৬১৭৫,
				মোট :	১৫,৫৯০,

প্রশ্ন উঠতে পারে—এত টাকার কী প্রয়োজন তখন ছিল ?—ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে টাকার প্রয়োজন কতখানি ছিল—চেতলার চারু ঘোষকে যতীন্দ্রনাথ অস্ত্র-সংগ্রহের ভার দিয়েছিলেন, আগেই বলেছি। এই পর্বে এক কিস্তীতেই যতীন্দ্রনাথ সতেরো হাজার টাকা (১৭,০০০,) দিয়েছিলেন চারু ঘোষকে—সরকারী কাগজ-পত্রে এ-কথা পাওয়া যায়। এর আগে অস্ত্র-সরবরাহকারী নূর খাঁকে চারুবাবু যে চার হাজার টাকা দেন, তার উল্লেখও উক্ত রেকর্ডে আছে।* ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে নেতড়া ডাকাতির আগে যতীন্দ্রনাথের অধীন দলগুলোর হাতে ছোট-বড় দেড়শ' আগ্নেয়াস্ত্র ছিল—এ-কথা পাওয়া যায় হাওড়া মামলার proceedings থেকে।

তাছাড়া কবিরাজ বিজয় রায়ের যে-ডিস্পেন্সারী কলকাতায় খোলা হয়, তার কতক অর্থ যতীন্দ্রনাথ দেন। সত্যেন সেন ও অধর লস্করকে তিনি বিলেত পাঠান সম্পূর্ণ নিজের অর্থে। এবং অধর লস্করের হাতে ডাঃ তারক

---

* সরকারি রিপোর্টে পাই :

"Nur Khan, an arms dealer, near Charu Ghosh's house at Chetla, shows large quantities of ammunition destroyed, Lolit says. Nur belongs to the conspiracy." (ললিত, অর্থাৎ রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তী।)

দাসের জন্যেও বেশ কিছু টাকা যতীন্দ্রনাথ পাঠান।...দেশেও দুঃস্থ বিপ্লবী-কর্মীদের পরিবারকে সাহায্য করতে হয় তাঁকে।

দেশে ও বিদেশে সংগঠনের পরিচালনায় এইভাবে যতীন্দ্রনাথকে তখন ব্যস্ত থাকতে দেখি এই পর্বে। এবং অর্থ-সংগ্রহের অনুমতি দেবার পর কলকাতায়, শহরতলীতে, হুগলি, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ববঙ্গের বহু জেলায়ও কিছু অর্থ স্বকীয় করে নেবার দৃষ্টান্ত এই পর্বে পাওয়া যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দ্বিতীয় বার অনন্যোপায় হ'য়ে যতীন্দ্রনাথ টাকা লুঠ করবার অনুমতি দেন।

১৯০৮ সাল। মে মাস।

ওকালতির কাজে এবং জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—যতীন্দ্রনাথের বড় মামা। চিকিৎসার জন্যে তাঁকে কলকাতায় (শোভাবাজারে) মেজ মামা হেমন্তকুমারের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ পার্ভিস লুকিস বড় মামাকে পরীক্ষা ক'রে বলেন নার্ভাস ব্রেক ডাউন।

অক্লান্ত সেবায় শুশ্রূষায় বড় মামাকে অনেকটা সুস্থ ক'রে তুললেন যতীন্দ্রনাথ। কিন্তু বাড়ির সবার মনের আশাভঙ্গ ক'রে শেষ পর্যন্ত বসন্তকুমার ইহলীলা সম্বরণ করলেন। মাত্র একান্ন বছরের কর্মময় জীবনে নদীয়ার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নতির যথেষ্ট সহায়ই শুধু ছিলেন না বসন্তকুমার—ভাগ্নে যতীন্দ্রনাথের প্রাণের আগুনকে তিনি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করতেন, তার ইন্ধনও জোগাতেন মাঝে মাঝে।

বসন্তবাবুর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে—১৯০৭ সালের দুর্গাপূজোয়, মহানবমীর দিন—কয়ার চাটুজ্যে-বাড়িতে বলির সময় খাঁড়া হঠাৎ আটকে যায়। পূজো বন্ধ হ'য়ে যায়। সবার মনেই বিষম খট্‌কা লেগেছিল।

সেই অমঙ্গলেরই ছায়া প্রকট হ'য়ে উঠল বসন্তকুমারের মৃত্যুতে। এই তারিখটি থেকেই একের পর এক দুর্দশা নেমে এল কয়ার যৌথ সংসারে।

১৯০৮ সাল। ৯ই নভেম্বর।

প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়ে দেবার অপরাধে পুলিশ কর্মচারী নন্দলাল

বন্দ্যোপাধ্যায়কে মৃত্যুদণ্ড দিলেন যতীন্দ্রনাথ। দেশের শত্রু, সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু হ'ল নন্দলালের মত লোকেরা : সামান্য পদোন্নতির লোভে, দু-এক হাজার টাকার লোভে দেশের মঙ্গলের পথে অন্তরায় হ'তে এদের বাধে না।

যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ নিয়ে এবং নেতড়ার হেম সেনের পরিচালনায় নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy), গুণেন দাশগুপ্ত এবং নরেন বসু রিভলভার পকেটে বার হলেন। নন্দলালের রক্তে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর মত বীরাত্মার তর্পণ করতে হ'বে।

সন্ধ্যেবেলা। কাজ থেকে নন্দলাল ঘরে ফিরছে। হঠাৎ তার বাড়ির পাশের এক গলি থেকে গর্জে উঠল রিভলভার।

নন্দলালের নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ল।*

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাস।

প্রফুল্ল চাকীকে দার্জিলিং থেকে এর বছরখানেক আগে যতীন্দ্রনাথ ফেরত পাঠিয়েছিলেন, লাট সাহেব এণ্ড্রু ফ্রেজারকে মারবার সময় এলে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তার কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রেজারের গাড়িতে বোমা ফেলেন বারীন ঘোষের কয়েকজন শিষ্য ; ট্রেন লাইনচ্যুত হ'লেও লাট-সাহেব প্রাণে বেঁচে যান।

যতীন্দ্রনাথ এবার পাঠালেন ২৪ পরগনার জিতেন রায়চৌধুরীকে ফ্রেজার হত্যার নির্দেশ দিয়ে।

* নন্দলাল হত্যা-প্রসঙ্গে সরকারি রিপোর্ট বলছে,

"Lolit says he was asked by Madaru and Nanigopal Sengupta to watch Nandalal Banerjee's house on Serpentine Lane. Banerjee was then daily attending the Alipore Bomb Case. Lolit under orders took a revolver from Charu Ghose to Hem Sen (Netra), and Lolit was asked to watch the house again on 11. 11. 1908. In the evening Hem Sen, Noren Bose and Bhusan Mitra met him at St. James Sq. shortly after he heard Nanda (was) murdered and went to see the body.

"One Bhagaban Das, a Durji...was examined and said, three men committed the murder. One of them was a bigger man. He could identify none. None of the three could be called tall."

Y. M. C. A. হল্—কলকাতা। ফ্রেজার এসেছেন এখানে বক্তৃতা দিতে। জিতেন পিস্তল নিয়ে উপস্থিত হ'লেন সেখানে। ফ্রেজারের বক্তৃতা চলছে, এমন সময় জিতেন উঠে দাঁড়ালেন। পিস্তল তাগ করলেন।

কিন্তু বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাব তাঁকে ধ'রে ফেললেন। ফায়ার করা আর হ'ল না দুর্ভাগ্যক্রমে। লাটসাহেব এ-যাত্রাও বেঁচে গেলেন; জিতেনকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

সরকারীমহলে সাড়া পড়ে গেল, এই দুষ্কৃতকারীদের মূল সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করতেই হ'বে।

জিতেনের ওপর শুরু হ'ল অত্যাচার।

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯ সাল।

মাণিকতলার বাগানে ধৃত বিপ্লবীদের বিচার চলেছে আলিপুর কোর্টে। সরকারপক্ষের অত্যন্ত কুখ্যাত উকীল আশুতোষ বিশ্বাস বিপ্লবীদের রীতিমত নাজেহাল ক'রে তুলেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য, নিত্য নতুন ভুয়ো অভিযোগ একের পর এক খাড়া ক'রে।

যতীন্দ্রনাথের অনুগত সহকারী চারু বসু। সুন্দর বলিষ্ঠ তাঁর চেহারা। তেজস্বী নির্ভীক মন। কিন্তু তাঁর ডান হাতটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

চারু বসু যতীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন, "দাদা, এত লোককে এত কাজে পাঠাচ্ছেন। আমায় কাজ দিলেন কই ?"

"সময় এলেই পাবি, চারু !" সস্নেহ জবাব।

কিন্তু তাতে আশ্বস্ত হয় না চারুর মন। চারু বসু বেছে নিলেন আশুতোষ বিশ্বাসকে ধরাধাম থেকে অপসারণের দায়িত্ব। যতীন্দ্রনাথকে তিনি বলেন, "দাদা, অন্যেরা তো আরো কত-কী করতে পারবে। এ-কাজটুকুর ভার আমায় দিন না। দেখুন—পারি কিনা ? আপনার অনুমতি আর আশীর্বাদ পাই যদি, আশু বিশ্বাসকে তা' হ'লে শেষ ক'রে দিয়ে আসতে পারি। জীবনটা সার্থক মনে করব তা'হলে।"

চারুর মুখে আন্তরিক নিষ্ঠার দীপ্তি দেখে, খানিক ইতস্তত ক'রে যতীন্দ্রনাথ বললেন—তথাস্তু।

চারুর ডান-হাতে যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং রিভলভার বেঁধে দিলেন। চাদরের আড়ালে সেই অকেজো হাতখানা ঢেকে, যতীন্দ্রনাথের পদধূলি ও স্নেহাশিষ

নিয়ে চারু বসু রওনা হলেন।

মনে তাঁর আনন্দের জোয়ার। এতদিনের সাধনায় মায়ের কাজের অধিকার মিলেছে। চারুর দৃঢ় সঙ্কল্প : আশু বিশ্বাসের মুখ চিরতরে বন্ধ না-ক'রে ফিরবেন না তিনি।

ভর দুপুর। কোর্ট বসেছে। মহানগরী কলকাতার হাইকোর্ট।...

অকস্মাৎ গর্জন ক'রে উঠল চারু বসুর রিভলভার। সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাসের মুখ দিয়ে অস্ফুট গোঙানী বার হ'ল—আশু বিশ্বাসের দেহটা সশব্দে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

হৈ হৈ ক'রে আততায়ীকে সবাই ধ'রে ফেলল। ধ'রেই চমকে উঠল : একী? ভুল হ'য়ে গেল নাকি? এই পঙ্গু কী ক'রে এমন মারাত্মক কাজ সম্পন্ন করল?

কেনই বা করল?

তাদের মনের ভাব অনুমান ক'রে চারু বসু তুলে ধরলেন তাঁর সশস্ত্র ডান-হাতটা। তখনো ক্ষীণ ধোঁয়ার রেশ রিভলভারের বুকে।

আশু বিশ্বাসের ততক্ষণে সব শেষ হ'য়ে গিয়েছে।

ধৃত চারু বসুর নামে মামলা আনা হ'ল। সেশনে সোপর্দ করা হ'ল তাঁকে। গুরু যতীন্দ্রনাথের নাম স্মরণ ক'রে স্মিত আননে অথচ আশ্চর্য-রকম অবিচলিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন ইংরেজিতে "বিচারে কাজ নেই। আমায় কালই ফাঁসীতে লটকে দাও!"

তবু, জেরা থামতে চায় না।—"কে তোমাকে এই অপকর্ম করতে পাঠাল?...কেন তুমি এ-কাজ করলে?..."

টুঁ শব্দ বার হ'ল না চারু বসুর মুখ দিয়ে।

অবশেষে জেরায় জেরায় উত্যক্ত হ'য়ে চারু বসু ব'লে উঠলেন—"আশুবাবু যে আমার গুলীতে প্রাণ দেবেন আর আমায় যে ফাঁসী যেতে হ'বে, এ-সবই বিধি-নির্দিষ্ট ব্যাপার। বিলম্বে কাজ কী?"...

চারু বসুর ফাঁসী হ'য়ে গেল।

অসাধারণ শহীদের দল জন্ম নিয়েছিলেন এই যুগে। বীর প্রফুল্ল চক্রবর্তী, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসুর নামের পাশে অক্ষয় হ'য়ে রইল অসাধারণ শহীদ চারু বসুর নাম।

এঁদের কথা স্মরণ করেই এঁদের সতীর্থরা সগর্বে উচ্চারণ করছেন, "কুলং

পবিত্র; জননী কৃতার্থা!"

শিষ্য-গৌরবে যতীন্দ্রনাথের বুক ফুলে ওঠে। যে-কলঙ্কের শুরু হয়েছিল নরেন গোসাঁইয়ের পাপে—মহান এই বীরদের সুপবিত্র শোণিত-ধারায় তা' ধুয়ে-মুছে সাফ হ'য়ে গেল।

এঁদের প্রসঙ্গেই তো শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন: "এই নিশ্চিত ভাব কঠিন কুক্রিয়াভ্যস্ত হৃদয়ের পক্ষে অসম্ভব; তাহাদের মধ্যে কাঠিন্য, ক্রূরতা, কুক্রিয়াসক্তি, কুটিলতা লেশমাত্র ছিল না। কি হাস্য কি কথা কি খেলা তাহাদের সকলই আনন্দময়, পাপহীন, প্রেমময়।...এইরূপ ক্ষেত্রেই ধর্মবীজ বপন হইলে সর্বাঙ্গসুন্দর ফল সম্ভবে। যীশু কয়েকজন বালককে দেখাইয়া শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন: 'যাঁহারা এই বালকের তুল্য, তাঁহারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।' জ্ঞান ও আনন্দ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যাঁহারা দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন না, যাঁহারা সকল অবস্থায় আনন্দিত প্রফুল্লিত, তাঁহাদেরই যোগে অধিকার। ...জানি না কোথা হইতে একটি স্রোত আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া নিয়া গেল। যে কখনও ভগবানের নাম করে নাই, সেও সাধনা করিতে শিখিল। আর সেই পরম দয়ালুর দয়া অনুভব করিয়া আনন্দমগ্ন হইয়া পড়িল। অনেক দিনের অভ্যাসে যোগীর যাহা হয়, এই বালকদের দু-চারি মাসের সাধনায় তাহা হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বলিয়াছিলেন, 'এখন তোমরা কি দেখ্‌ছ—ইহা কিছুই নয়, দেশে এমন স্রোত আসছে যে, অল্প বয়সের ছেলে তিন দিন সাধনা করে সিদ্ধি পাবে।' এই বালকদিগকে দেখিলে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না।"*

একবার চারু বসুর মতই মৃত্যু-পণে অগ্রসর একটি তরুণ শিষ্যকে যতীন্দ্রনাথ যখন বিদায় দিচ্ছেন, তাকে তিনি প্রথমে বললেন, "দেশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি একটি ক'রে পূর্ণাহুতির প্রয়োজন আছে। নইলে মৃত্যুভয়ভীত আত্মবিশ্বাসহীন অলস স্বপ্নবিলাসী জাতির মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ সঞ্চার করা যাবে না। তুই ধন্য—আজ তুই ভাবী দেশকে গ'ড়ে তোলবার মহাসুযোগ লাভ করেছিস। বইতে পড়েছিস—মৃত্যুভয়, সে শুধু শিশুর অন্ধকারে যাবার ভয়ের মত—নইলে, জীবন-মরণের অবিরাম স্রোতই তো মানবসমাজকে প্রকাশ ক'রে রেখেছে।...

*শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা পুস্তক 'জগন্নাথের রথ' দ্রষ্টব্য॥

"আমার বিশ্বাস তুই তোর কর্তব্য সাধন করবি!"

বলেই সেই আত্মোৎসর্গকারী বীর যুবককে তিনি বুকে চেপে ধরলেন।

সে বিদায় নিল।

ছেলেটি যখন চ'লে যাচ্ছে, যতীন্দ্রনাথ তার দিকে ছুটে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "তবে শোন্, একটা কথা। যদি কখন দুর্বলতা আসে, পৃথিবীর মায়া কর্তব্যের চেয়ে বড় মনে হয়, তবে আমার নাম ব'লে দিলে, আমি অন্তত তোকে ক্ষমা করব।"

—অন্তত আমি তোকে ক্ষমা করব!…

কথাটা তরুণ মনে মনে দু'বার আবৃত্তি ক'রে ফেলল মোহাবিষ্টের মত। কথাটা তাকে গভীরভাবে বিচলিত ক'রে তুলল। আশ্চর্যান্বিত, আহত হ'ল। তারপর কিছু আর না-ব'লে, যতীন্দ্রনাথকে প্রণাম ক'রে সে চলে গেল সঙ্কট-যাত্রায়।

এই কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে যতীন্দ্রনাথের আর এক সহকর্মী ছুটে এলেন।

"এ-কথা আপনি কেন বলতে গেলেন, দাদা?" আকুল কণ্ঠে কর্মীটি যতীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন; কারণ ভুল ক'রেও কেউ যদি যতীন্দ্রনাথের নাম এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে ফাঁস ক'রে দেয়—কোথায় থাকবে বিরাট এই বিপ্লব-আন্দোলনের প্রচেষ্টা?

এই প্রতিবাদ শুনে যতীন্দ্রনাথ রাগ করলেন না। রাগ তাঁকে কেউ কোনদিন করতে দেখে নি। তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জবাব দিলেন, "দেখ্, আমি নিজে যা পারি, দলের মুখ চেয়ে আর কাউকে তা' করতে দিই না। কিন্তু যাকে যে-কাজে পাঠাই, তার সঙ্গে তো মনে মনে সব-সময়েই থাকব। তবে, ওর সঙ্গে জীবনের ওপারেও যাবার সাথী হ'তে চাইব না কেন?"…

যেহেতু যতীন্দ্রনাথের শারীরিক বল ছিল অসামান্য, যেহেতু অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেন নি কোনদিন, যেহেতু তাঁর জীবনের ব্রত ছিল দুর্বলকে রক্ষা ক'রে দুর্জনকে শাস্তি দেবার—অনেকেই তাই ভেবে থাকেন আচারে, ব্যবহারে তিনি অস্বাভাবিক দাম্ভিক কিংবা বদ্‌মেজাজী ছিলেন হয়তো-বা।

কিন্তু—যিনি শক্তিমান, যিনি যথার্থ বিক্রমের অধিকারী, শক্তির অপ-প্রয়োগ তিনি করেন না কখনো। তাঁর অপরিসীম বীর্য, অগাধ তেজ যেন সমুদ্রেরই মত বিশাল অতল। সেই অসীমেরই গহনে তো বিরাজ করে সংযমের শান্তির স্নিগ্ধতা।

বিশেষত যতীন্দ্রনাথ, যাঁকে তাঁর সহকর্মীরা একবাক্যে অভিহিত করেছেন রূপমূর্ত গীতা ব'লে। গীতার আদর্শ পুরুষ ব'লে। ন্যায়ের, স্নেহের, ক্ষমার, দাক্ষিণ্যের অবতার ব'লে!—

বিপ্লবীদের মধ্যেই একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি খুব ঈর্ষা পোষণ করতেন যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। চেষ্টা করতেন মহানায়কের মধ্যে কোনও খুঁত পাওয়া যায় কিনা। অথচ যতীন্দ্রনাথ তাঁকে উত্তরোত্তর নিবিড় স্নেহে আপন ক'রে নিতে চেয়েছেন—ক্ষমা ক'রে এসেছেন তাঁর দুর্ব্যবহার।

একদিন সেই নেতাটির উপর্যুপরি কয়েকটি ভুল-ভ্রান্তির পর, যতীন্দ্রনাথের বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ বার হ'য়ে এল—"দেখ্, এই লোকটার কোনও মানে হয় না।"

এর চেয়ে অন্য-কোনরকম কটু কথা কেউ যতীন্দ্রনাথের মুখে শোনে নি : লিখেছেন যতীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন কর্মী ভূপতি মজুমদার।

॥ দুই ॥

১৯০৯ সালের ৫ই মে।

স্বাধীনতা-যজ্ঞের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিলাভ করলেন। ঠিক একটি বছরের কারাবাসের অবকাশে তিনি ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করেছেন। কংসের কারাগারে যে-অবতারের জন্ম, কারাগার ছাড়া যোগ্যতর আর কোন্ স্থানে মিলবে তাঁর দর্শন ?

আজন্ম যে শ্রীঅরবিন্দের অন্তর উন্মুখ উন্মীলিত হ'য়ে ছিল ভগবৎ জ্ঞান পাবার আকাঙ্ক্ষায়, সেই ভগবানের সাক্ষাৎ পেলেন তিনি কারাগারে—সমগ্র হৃদয় দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিয়ে, সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে তাঁকেই উপলব্ধি করলেন, কবি নিশিকান্তের ভাষায় :

'যে-দেশে দেশের নেতা
হয়েছেন জগৎ-গুরু,
আমাদের অর্ঘ্যে সেথা
জগতের অর্ঘ্য গুরু!'

আদালতের বিচারের শেষে কাব্যময় ওজস্বিনী ভাষায় ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের রজত-কণ্ঠ মুখর হ'য়ে উঠল, প্রকাশ্য আদালতে তিনি জাতীয়তাবাদের জনক শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্যে তাঁর অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। ভবিষ্যদ্বাণীর মত সেই অর্ঘ্যের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে আজ এত যুগ বাদে সত্য হ'য়ে উঠেছে।

দেশবন্ধু বললেন, "আজকের এই বিতণ্ডা যখন বিলীন হ'য়ে যাবে নীরবতার মধ্যে, থেমে যাবে আজকের কোলাহল দ্বন্দ্ব,—এঁর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে, এঁকে মানুষ স্মরণ করবে শ্রদ্ধা করবে স্বদেশপ্রেমের কবি ব'লে জাতীয়তার নবী ব'লে মানব-প্রেমিক ব'লে। এঁর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে এঁর বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'বে—কেবল ভারতবর্ষেই নয়, দূর-দূরান্তের সাগর-পারে, দেশ থেকে দেশে।"...

শ্রীঅরবিন্দকে মহা-সমারোহে অভ্যর্থনা জানালেন সর্বভারতীয় স্বদেশ-সেবকেরা।

ইতিপূর্বেই, 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রথম মামলার পর শ্রীঅরবিন্দ যখন নির্দোষী সাব্যস্ত হ'ন, বাংলার কবি সম্রাট এগিয়ে এসেছিলেন বিজয়মাল্য নিয়ে, শ্রীঅরবিন্দকে 'নমস্কার' জানিয়ে রচনা করেছিলেন সুদীর্ঘ কবিতা—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।..."

জেল থেকে বেরিয়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ করলেন 'ধর্ম' নামে বাংলায় আর 'কর্মযোগিন্' নামে ইংরেজীতে, দুটি সাপ্তাহিক। আবার ঝঙ্কৃত হ'ল দিব্য-বীণায় বহ্নি-তানের মন্ত্র। দেশাত্মবোধের নতুন আহ্বান। আবার দেশ-বাসীর মন পূর্ণ হ'য়ে উঠল অনির্বাণ প্রতীতির উল্লাসে।

উত্তরপাড়ার বিখ্যাত ভাষণে শ্রীঅরবিন্দ বর্ণনা করলেন কারাগারে তাঁর দিব্য অভিজ্ঞতার কাহিনী।

ঘোর রাত। অন্ধকারের বুক চিরে ট্রেন চলেছে। অনেকটা দূরের পথ। বর্ষাকাল।

হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল।

পাশেই নদী। লাইনের ওপর জল জ'মে একাকার। গাড়ি আর যেতে

পারবে না। চারধারে থৈ থৈ করছে জল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়। রাত কাটে। ভোরের আবছা আলো জাগে। বেলা বাড়ে। দুপুর আসে। ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেন। কী উপায়?

ট্রেনে বহু যাত্রী। শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা অনেক। কেউ-বা অসুস্থ। সকলেরই অবস্থা কাহিল। সবার মুখেই অসহায় প্রশ্ন: কী উপায়?

যতীন্দ্রনাথও এই ট্রেনেরই যাত্রী।

'কী উপায়?' ব'লে অসহায় হ'য়ে বসে বসে কালক্ষেপ করবার পরিবর্তে তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন। উপায় তো একটা-কিছু করা চাই। নিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব, অসহ্য লাগল তাঁর।

অদূরেই একটা গ্রাম পাওয়া গেল। ভর দুপুরের রোদে তিনি গ্রামে গিয়ে ঢুকলেন। দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রথমেই তিনি সংগ্রহ করলেন রোগী ও শিশুর পথ্য—দুধ, চিঁড়ে, বাতাসা, মুড়ি ইত্যাদি।...

অতসব পথ্য নিয়ে যতীন্দ্রনাথকে ফিরে আসতে দেখে যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। চাপা গুঞ্জন উঠল: 'যতীন মুখার্জী এসেছেন, যতীন মুখার্জী এই ট্রেনে যাচ্ছেন, যতীন মুখার্জী যাত্রীদের একটা ব্যবস্থা করছেন—'

সোৎসাহে স্বেচ্ছাসেবকের দল এগিয়ে এল। সেই দুধ আর পথ্য বিলির বন্দোবস্ত ক'রে যতীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আবার বার হ'লেন বাকি যাত্রীদের খাবার আয়োজন করতে।

পকেটে যত টাকা ছিল, গ্রামের মুদীখানায় সব উজাড় ক'রে দিলেন যতীন্দ্রনাথ। প্রচুর পরিমাণে চাল, ডাল, নুন, তেল, মসলা আর শাক-সব্জী সংগ্রহ করলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা সেই রসদ ভারে ভারে ব'য়ে নিয়ে গেল যথাস্থানে। হাঁড়িরও জোগাড় হ'ল।

উনুন কেটে যতীন্দ্রনাথ নেমে গেলেন খিচুড়ি রাঁধতে। রান্না চড়ল। মহা ফুর্তিতে সকলকে মাতিয়ে রেখেছেন যতীন্দ্রনাথ—যেন কয়ার বাড়িতে দুর্গোৎসবের সেই রাজসূয় পরিবেশে ফিরে গিয়েছে তাঁর মন।

খিচুড়ি নামল। যাত্রীদের ধ'রে ধ'রে খেতে বসান হ'ল। এমন সময় কে যেন আক্ষেপ করল, 'আহা! এমন খিচুড়ির সঙ্গে ঘি যদি থাকত—'

তাইতো! ঘি জোগাড় করা যায় না? যতীন্দ্রনাথ লোক পাঠালেন তখুনি।

খোঁজ, খোঁজ!…

একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে খবর দিল: একজন সহযাত্রী স্নানে গিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কয়েক টিন ঘি চলেছে। তাঁকে ব'লে দেখলে হয়।

নিজের কামরায় ফিরে গেলেন যতীন্দ্রনাথ। বাক্স থেকে অবশিষ্ট সমস্ত টাকা বার ক'রে নিয়ে সহযাত্রীটির কাছে যতীন্দ্রনাথ উপস্থিত হ'লেন। তাঁর কাছ থেকে ঘি কেনবার প্রস্তাব শুনেই ভদ্রলোক জিভ কেটে যতীন্দ্রনাথের দুটি হাত জড়িয়ে ধরলেন।

"বলেন কী আপনি?" সহযাত্রী প্রতিবাদ জানান, "সবার জন্যে আপনি এত পরিশ্রম ক'রে এমন আয়োজন করেছেন, এত খরচপাতি করলেন—আর সামান্য একটিন ঘি আমি দেব না? এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। টাকার প্রশ্ন তুলবেন না!"

নিজে হাতে সহযাত্রীটি ঘিয়ের একটা টিন তুলে দিলেন যতীন্দ্রনাথের হাতে।

বিরাট পিকনিক বসে গেল। পরম তৃপ্তির সঙ্গে সবাই খেয়ে উঠল। ধন্য ধন্য করল মনে মনে—মহানায়কের এই সুপ্রচুর ব্যবস্থার জন্যে।

গাড়ির ব্যবস্থাও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কর্তৃপক্ষ ক'রে ফেললেন। যাত্রীদের মনে পাকা রঙে অঙ্কিত রইল দুর্লভ এই দিনটির স্মৃতি।*

১৯০৯ সাল। জুন মাসের শেষ সপ্তাহ।

দ্বিতীয় পুত্র তেজেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদ পেয়ে কয়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। সবে কলকাতা ফিরছেন।

শেয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়েছেন। হাতে ছোট্ট একটা ব্যাগে কিছু দামী অলঙ্কার রয়েছে—দলের কাজে লাগবে ব'লে সংগ্রহ ক'রে এনেছেন।

আমহার্স্ট স্ট্রীট আর মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়েই একটা মুসলমানের বিড়ির দোকান থেকে উচ্চাঙ্গের খেয়াল গানের আওয়াজে আকৃষ্ট হ'য়ে যতীন্দ্রনাথ সেদিকে এগিয়ে চললেন। ভরসন্ধ্যেবেলা। জনমানুষ খুব বেশি আর নেই তখন।

দোকানী সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আসরের এক কোণে যতীন্দ্রনাথকে

---

* কৃষ্ণনগরে, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহভাজন জনৈক রায়সাহেব এই ঘটনার সময় উক্ত ট্রেনের যাত্রী ছিলেন। তাঁর কাছেই ঘটনাটি শোনা যায়।

বসান।

গান শুনতে শুনতে হঠাৎ যতীন্দ্রনাথের চমক ভাঙে। তাঁকে ঘিরে ছ-সাতটা ষণ্ডামার্কা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে পেছন দিকে।

শেষ পর্যন্ত গুণ্ডার হাতে পড়তে হ'ল ?—ভেবে হাতের ব্যাগটা বগল-দাবায় পুরে উঠে দাঁড়াতেই গুণ্ডাগুলো তাঁকে আক্রমণ করল। যতীন্দ্রনাথ প্রস্তুতই ছিলেন। পাল্টা যেই ঘুষি আর লাথি বর্ষণ শুরু করলেন, চোখের পলকে গুণ্ডাগুলো ধরাশায়ী হ'ল।

দোকান থেকে বেরিয়ে যতীন্দ্রনাথ চ'লে গেলেন নিজের পথে।

১৯০৭ সাল থেকেই মোক্ষদা সামাধ্যায়ীর প্ররোচনায় ও নরেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু হয়, মাণিকতলা বোমার বাগানে বিপ্লবীরা ধরা প'ড়ে যাওয়ার পর যতীন্দ্রনাথ এই ডাকাতিতে মত দেন—অর্থ সংগ্রহের অন্য পন্থা না-দেখে। তার আগেই হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য প্রমুখ অবশিষ্ট নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা মিলিত হয়েছেন যতীন্দ্রনাথের পতাকাতলে।

১৯০৮ সালের ২রা জুন ঢাকার বাহ্রা গ্রামে যতীন্দ্রনাথের সহকর্মীদের পরিচালনায় যে-ডাকাতি হয়, তার অস্ত্র ও অর্থ কলকাতায় এসে পৌঁছল।

প্রায় এই সময়েই শিবপুরে যে-ডাকাতি হ'ল তার জের টেনে সামস্থল আলম দলবল নিয়ে উপস্থিত হ'ল কয়াগ্রামে, যতীন্দ্রনাথের মামাবাড়িতে। ছোট মামা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর মুহুরি নিবারণ মজুমদার (কেরুদা) পড়লেন পুলিশের 'নেক'-নজরে !

এ সেই সামস্থল আলম—কলকাতা পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সরকারপক্ষের ভয়ঙ্কর করিৎকর্মা লোক : বোমার বাগানে ধৃত বিপ্লবীদের কী ক'রে চরম শাস্তির মুখে ঠেলে দেওয়া যায়, তারই চক্রান্ত ফেঁদে সামস্থল তখন অষ্টপ্রহর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফাঁসী, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, সশ্রম কারাদণ্ড প্রভৃতি লোভনীয় শাস্তিগুলি বিপ্লবীদের ওপর বর্ষণের ধান্দায় মিথ্যা প্রমাণ, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রভৃতি অম্লান-বদনে সামস্থল জোগাড় ক'রে ক'রে আনছে তখন।

বোমার বাগানের অন্যতম রসিক-চূড়ামণি উল্লাসকর দত্ত শত দুঃখে, দারুণ নিগ্রহের মধ্যেও তাঁর পিতৃদত্ত নামটির মর্যাদা কীভাবে তাঁর বন্দীজীবনে

অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, তার বর্ণনা আজ অনেকেই জানেন।

আলিপুর কেসের সময় আসামীদের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উল্লাসকরের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা যে 'নরক-গুলজার' করতেন, তার অন্যতম উপাদান ছিল সামসুলের নামে ছড়া বানিয়ে তাতে সুর বেঁধে সরস জোরালো কণ্ঠে গান গাওয়া :

ওহে সামসুল !
সরকারের শ্যাম তুমি আমাদের শূল !
(তোমার) ভিটেয় কবে চরবে ঘুঘু
(তুমি) চোখে দেখবে সর্ষে-ফুল :
ওহে সামসুল !

এ-হেন সামসুল আলম উঠে প'ড়ে লাগল ব্যারিস্টার নর্টনের সহকারীর ভূমিকায়—রাজনৈতিক ডাকাতির মূলে কে বা কারা রয়েছেন ? ভাঙা আসর সরগরম ক'রে রেখেছেন কে ? হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা, নদীয়া, সর্বত্র, যেখানে ডাকাতির প্রকোপ বেশি, জাল ফেলল সামসুল আলম।

১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে ময়মনসিং-এর বাজিতপুরে ও সেপ্টেম্বরে হুগলী জেলার বিঘাতি গ্রামে পুলিশের ছদ্মবেশে বিপ্লবীরা টাকা লুট করেন। বিখ্যাত কার্তিক দত্ত এইসূত্রে ধরা প'ড়ে যান। কিন্তু নীরবে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে থাকেন।—এই বছরেই এপ্রিলে শ্রীহরিণাপাড়া (হাওড়া), নভেম্বরে রায়তা (নদীয়া), ডিসেম্বরে মোরহাল (হুগলী) প্রভৃতি অঞ্চলে ডাকাতি হয়।

১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাগুপুরের ডাকাতি উল্লেখযোগ্য। তারপর এপ্রিল মাসে ডায়মণ্ডহারবারের কাছে নেংড়াতে দু-হাজার চারশ' টাকা লুট করা হয় নরেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে। গৃহস্বামীকে বলা হয়, "এই টাকা ইংরেজ তাড়ানোর জন্যে ঋণ নেওয়া হ'ল ; যথা-সময়ে ফেরত পাবেন।"

এই মর্মেই, কয়েক বছর বাদে, রাজনৈতিক ডাকাতির সময় বিপ্লবীদের পাঠানো যে-চিঠি পুলিশের হাতে পড়ে, তার উল্লেখ করি। চিঠির নিচে স্বাক্ষর করতেন—জে. বলবন্ত।

চিঠির ওপরে স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের শিলমোহর : পূর্ব-ভারতের ওপর সূর্যোদয়ের দৃশ্য, আর অখণ্ড ভারতবর্ষের মানচিত্রকে ঘিরে বৃত্তাকারে লেখা—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী', আর তার তলায়, United India লেখা। ওপরে, একদিকে একটা গোলাপ আঁকা ; তার অর্থ সম্ভবত, ভগবানে আত্মসমর্পণ, তাঁর প্রতি নিবেদিত অন্তরের অনুরাগ। অন্যদিকে দেবসেনাপতি কার্তিকের বাহন ময়ূর ; তার অর্থ : বিজয় সুনিশ্চিত। ভগবানের ইচ্ছাই যেন জয়যুক্ত হ'তে পারে।

চিঠির শুরুতে থাকত 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র। ডান-পাশে, ঠিকানার জায়গায় ছাপা থাকত : 'সম্মিলিত ভারতবর্ষের স্বাধীন রাষ্ট্রের শাখা : বাংলাদেশ !'

একটি চিঠিতে লেখা ছিল : "আমাদের কলকাতার রাজস্ব-বিভাগের দু'জন অবৈতনিক কর্মচারী আপনার কাছ থেকে ঋণস্বরূপ নয়হাজার আটশ' একানব্বই টাকা এনেছেন ; পরে সুদসমেত আপনি তা' ফেরত পাবেন। আমাদের মহৎ লক্ষ্য সাধনের জন্যে আপনার নামে এই টাকা আপাতত জমা রাখা হ'ল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা কৃতকার্য হ'লে আপনি টাকা ফেরত পাবেন। আমাদের কর্মচারীরা আপনার কাছে যে-সদ্ব্যবহার পেয়েছেন, তা' আপনার মত মহানুভবের কাছেই আশা করা যায়। আমাদের কর্মচারীরাও আশা করি আপনার সঙ্গে যথোপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। কথায়, কাজে বা অন্য কোনও রকমে আপনি যদি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন বা আমাদের ধরিয়ে দেন, তা' হ'লে আমাদের পক্ষে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হবে না। পুলিশের কর্মচারীরা আমাদের পথের অন্তরায় ; সেইজন্যে সম্মিলিত ভারতবর্ষের স্বাধীন শাসনতন্ত্র উক্ত পুলিশদের উপযুক্ত দণ্ড-বিধানে কখনো ত্রুটি করে নি এবং ইংরেজ সরকার শত চেষ্টা করেও ওই পুলিশ কর্মচারীদের প্রাণ রক্ষা করতে পারে নি। আপনাকে তাই স্মরণ করিয়ে দিই—আপনি যেন এমন-কিছু না করেন, যাতে ক'রে ওই পুলিশদের রক্তে মাতৃভূমিকে কলুষিত করতে আমরা বাধ্য হই। আপনি বিচক্ষণ বিজ্ঞ ; আপনার বোঝা উচিত যে, বৈদেশিক শাসন থেকে দেশকে স্বাধীন করতে হ'লে দেশবাসীর স্বার্থত্যাগ, অর্থদান ও সহানুভূতি অপরিহার্য। আমাদের কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে দেশের ধনীরা যদি মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক কিস্তিতে আমাদের অর্থসাহায্য ক'রে দেশের সনাতন ধর্ম স্থাপনে সহযোগিতা করতেন, তা' হ'লে দেশবাসীকে অনর্থক এ-ভাবে কষ্ট পেতে

হ'ত না। আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ না-করবার জন্যেই এইভাবে আমাদের অর্থসংগ্রহ করতে হচ্ছে। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে নূতন ক্ষাত্র-ধর্ম গ্রহণ ক'রে বিদেশের দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে দেশকে উদ্ধার করবার মহান যজ্ঞে আমরা রত হয়েছি; আপনি কি আমাদের জন্যে কিছু ব্যয়ে কুণ্ঠিত হবেন? জাপানের উন্নতি ও ক্ষমতা-প্রাপ্তির মূলে তার ধনীরাই আছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে দেশবাসীদের উপযুক্ত মন ও অন্তরে উপযুক্ত শক্তি দিন।..."

১৯০৯ সালের আগস্ট মাসে নাংলায় একহাজারের ওপর টাকা, সেপ্টেম্বরে হোগলকুনিয়ায়, অক্টোবরে নদীয়ার হলুদবাড়িতে একহাজার চারশ' টাকা, ডিসেম্বরে বিকারায় প্রায় হাজার-খানেক টাকা বিপ্লবীরা লুট করেন। তা' ছাড়া, নভেম্বরে নন্দলাল ব্যানার্জীকে হত্যার উল্লেখ আগেই করেছি।

ইতিমধ্যে বলেছি, ১৯০৯ সালের জুন মাসে ভূমিষ্ঠ হ'ন যতীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র তেজেন্দ্রনাথ।

এবং ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে, বিপ্লবের সঙ্কটতম মুহূর্তের ঝোড়ো পরিবেশে বসেও মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ যে তাঁর স্নেহভাজন কুমারনাথ বাগচি বিয়েতে স্বয়ং কবিতা রচনা ক'রে উপহার দিয়েছেন, তার উল্লেখও ইতিপূর্বে করেছি।

হলুদবাড়ি ডাকাতির সূত্রে যতীন্দ্রনাথদের কয়াগ্রামের বাড়ি আবার পুলিশ তল্লাস করে। যতীন্দ্রনাথের ছোটমামা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "আলিপুরের সরকারি উকিল আশুতোষ বিশ্বাস—যিনি শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আলিপুর বোমার মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন—১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আলিপুর ফৌজদারী আদালতে প্রকাশ্য স্থানে বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন। এই সময় হইতেই C. I. B. পুলিশ যতীন্দ্রনাথের ওপর বিশেষ নজর রাখিতে আরম্ভ করে। মুরারিপুকুর বাগানের সংস্রবে আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় পুলিশ অন্যান্য যে সকল বিপ্লবীর সন্ধান পাইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই এক বেড়াজালে ছাঁকিয়া তুলিবার মতলবে সকলের বিরুদ্ধে একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা করিবার পরিকল্পনা করিল।* বিপ্লবীদলের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট এইরূপে প্রস্তুত

* যতীন্দ্রনাথও এদের লক্ষ্যস্থল ছিলেন একাধিক কারণে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে

হইতেছিল। ইহার ফলে ১৯০৯ সালে বাংলার মফস্বল শহরে অবধি তল্লাসী আরম্ভ হইল।...”*

নেৎড়া (ডায়মণ্ডহারবার) থেকে ললিত চক্রবর্তী (বেঙা) নামে একজন তরুণ কর্মী নেৎড়ায় ও অন্যত্র কয়েকটি ডাকাতির পর পালিয়ে গিয়ে দার্জিলিঙে আশ্রয় নেন যতীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট স্থানে। ডাকাতির কিছু মোহর ও বালা নিয়ে রাজেন অধিকারী যান দার্জিলিং বাজারে—সেগুলি ভাঙাতে।

দার্জিলিঙেই ১৯০৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর অসুস্থ ললিত (বেঙা) ধরা প'ড়ে গেলেন। পুলিশের অত্যাচারে তিনি আরো অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই রাজসাক্ষী হ'তে রাজী হন।

২৮শে রাতেই ওদিকে নদীয়ার হলুদবাড়িতে ডাকাতি হ'য়ে যায়। কেউ কেউ ধরা পড়েন এই সূত্রে। এবং মীরপুর পুলিশ থানায় তাঁদের আটক রাখা হল।

২৯শে অক্টোবর ললিত (বেঙা) পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করেন।†

ললিত (বেঙা) যে-স্বীকারোক্তি করলেন, তার থেকে পুলিশ জানতে পারল : সারা বাংলাদেশ জুড়ে তখনো একটি অখণ্ড দল রয়েছে, পাঁচ থেকে ছ' হাজার বিপ্লবী কর্মী সেখানে সক্রিয়। সৈন্যবাহিনীর অনেক বাঙালী ও পাঞ্জাবী হাবিলদারও এই দলের সভ্য; তাঁদের অনেকেই খিদিরপুরে ডাঃ শরৎ মিত্রের বাড়িতে যাতায়াত করেন। দলের হাতে দেড়শ' রিভলভার এবং দশটি বন্দুক রয়েছে। নেতাদের অন্যতম হচ্ছেন ননীগোপাল সেনগুপ্ত, শরৎ মিত্র, ভুবন ও ভেঁাতন মুখার্জী প্রভৃতি; এঁদের গুপ্ত-সমিতির অন্যতম

প্রত্যক্ষ কোনও অভিযোগ না থাকায় তাঁকে পুলিশ সহজে গ্রেপ্তার করতে পারছিল না। ললিত-বাবুর ভাষায়, "যতীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্যান্য তরুণ বন্ধুগণকেও এই বিপ্লবের দলে টানিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার কোন কোন বন্ধু মুরারিপুকুর বাগান-বাটীতে তল্লাসীর রাত্রে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন। যতীন্দ্রনাথ ঐ রাত্রিতে তাঁহার এক মামাতো ভাইয়ের বিবাহে যাওয়ায় সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়াই ধৃত হন নাই। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির পর যতীন্দ্রনাথই বাংলার বিপ্লব-ক্ষেত্র কর্মময় রাখিয়াছিলেন ও যে বহ্নি শ্রীঅরবিন্দ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জ্বালাইয়া গিয়াছিলেন তাহা নির্বাপিত হইতে দেন নাই।

* এই তল্লাসীর মূলেই ছিল সামসুল আলমের কুচক্রী বুদ্ধি: আলম স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন অনেক তল্লাসীর সময়॥

† F. C. Dally (D. I. G.) সাহেবের যে রিপোর্ট আই-জি পুলিশের মাধ্যমে বাংলার চীফ সেক্রেটারির কাছে পাঠানো হয়, তারই মর্মানুবাদ দিচ্ছি। —পৃথ্বীন্দ্রনাথ॥

প্রধান একটি কেন্দ্র হচ্ছে কৃষ্ণনগরের 'আর্য কেমিক্যাল ওয়ার্কস'; সে-অঞ্চলের নেতা হচ্ছেন কৃষ্ণনগরের উকিল ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁদের অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির দিকটা দেখাশুনো করে 'ছাত্রভাণ্ডার'। বোমার বাগানের কর্মীরা ধরা প'ড়ে যাওয়ার সময় তিনটি ট্রাঙ্ক নিয়ে এখান থেকে তিন দিকে চ'লে যান যথাক্রমে তারানাথ রায়চৌধুরী, নরেন বসু এবং 'শিবপুর' দলের কয়েকজন কর্মী। বিভিন্ন স্থানে এঁদের ভিন্ন ভিন্ন দল ব'লে উল্লেখ থাকলেও অখণ্ড এক বিরাট দল এটি: 'দার্জিলিঙে সেক্রেটারিয়েটের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যতীনদা এঁদের মধ্যমণি!'*

সি. আর. ক্লীভল্যাণ্ড সাহেবের রিপোর্টে দেখছি সি-আই-ডি বিভাগ থেকে যতীন্দ্রনাথের ছোটমামা উকিল ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে লেখা আছে যে, রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তী (বেঙা) নেৎড়া ডাকাতির পরেই গিয়ে কৃষ্ণনগরে উকিল ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। উকিল ললিতবাবুর মুহুরি নিবারণ মজুমদার (কেরুদা) ললিত চক্রবর্তীকে স্টেশান থেকে নেবার জন্যে লোক পাঠান। নিবারণবাবুও ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত ব'লে জানা যায়।

রাজসাক্ষী ললিত যে যতীন্দ্রনাথের ছোটমামা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় পায়, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে এক-জন ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ললিত (বেঙা)-কে নিয়ে যান কৃষ্ণনগরে। সেখানে সে উকিল ললিতকুমারের বাড়ি ঠিকই দেখিয়ে দেয়। "রাজসাক্ষী ললিত চব্বিশ পরগনায় বাসিন্দা; তার পক্ষে কৃষ্ণনগরের এই বাড়ি দেখিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হত যদি তার এই সাক্ষ্য সত্য না হত," সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে। উকিল ললিতবাবুকে সে শিবপুরে নেতা ননীগোপাল সেন-গুপ্তের বাড়িতেও দেখেছে। রাজসাক্ষী ললিতকে উকিল ললিতবাবুর বড়দার

---

* যতীন্দ্রনাথের loose confederacy বা বিকেন্দ্রিক দলের স্বরূপটা এখানে কতক উদ্‌ঘাটিত হ'তে দেখা যায়; অথচ রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তী কতক অনুমানে আর কতক ভেতরের ব্যাপার দেখে বুঝতে পারেন যে, ছাড়া ছাড়া এই দলগুলো বস্তুত অভিন্নই। যতীন্দ্রনাথ সরকারী চাকরীতে থাকার দরুন, মহানায়ককে background-এ থেকেই কাজ করতে হচ্ছিল; তাঁর সহকর্মীরাও তাঁকে আড়ালে রেখে তাঁরই নির্দেশে কাজ করেছেন। মোরহাল ডাকাতিতে ধৃত কর্মী (পরে রাজ-সাক্ষী) মন্মথ বিশ্বাস (বসন্ত বিশ্বাসের ভাই নন) এবং ললিত চক্রবর্তী (বেঙা)ও যতীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়েই স্বীকারোক্তি করেন প্রথমে। তারপর পুলিশের চাপে প'ড়ে বাজেভাবে তাঁকে জড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু ললিতও যতীন্দ্রনাথকে identify করে নি।

(বসন্তকুমারের) ছেলে নিমাই স্টেশান থেকে পথ দেখিয়ে কৃষ্ণনগরের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলে।

রাজসাক্ষী ললিতকে নেংড়া ডাকাতির পর কৃষ্ণনগরের বাড়িতে আশ্রয় নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ললিতের সাক্ষ্যে উল্লেখ পাই।

উকিল ললিতবাবু প্রভৃতি বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের কাজে বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন যে, তারও উল্লেখ করেছে রাজসাক্ষী ললিত। সে বলেছে যে, ১৯০৭ সালে যখন শান্তিপুরের পাদ্রিকে মারবার দরুন মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে নরেন পরামাণিক বেরিয়ে আসে, তাকে সম্বর্ধনা জানাবার বিশেষ আয়োজন হয়েছিল উকিল ললিতবাবুর বাড়িতে।

উকিল ললিতবাবুকে জেরা করবার সময় জিগ্যেস করা হয়েছিল মুরারিপুকুর বাগানে তিনি বারীন ঘোষের নামে টাকা পাঠাতেন কিনা। তিনি তা' অস্বীকার করেন।* বারীন বা শ্রীঅরবিন্দকে যে জানেন, এ-কথাও অস্বীকার করেছেন তিনি পুলিশের কাছে।

"অথচ এ-প্রমাণ আমাদের হাতেই রয়েছে," ক্লীভল্যাণ্ড রিপোর্ট দিচ্ছেন, "যে ললিতবাবু বারীনের নামে মনি-অর্ডারে টাকা পাঠিয়েছিলেন। 'যুগান্তর' অফিসেও অবিনাশ ভট্টাচার্যের নামে তাঁর চিঠিপত্র পাওয়া গিয়েছে। তাতে দেখা যায় 'যুগান্তর' প্রচারে কী আকুল আগ্রহ তাঁর! সে-চিঠিতে এ-প্রমাণও মেলে যে, বারীন ও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ষোল আনাই পরিচয় ছিল।"

ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি বিশেষ বিভাগীয় তদন্তের রেকর্ডের সঙ্গে এবং হলুদবাড়ি ডাকাতির রাজসাক্ষীর জবানের সঙ্গে ললিতের জবানের বহু মিল পাওয়া গেল।

১৯০৯ সালের ১লা নভেম্বর দার্জিলিং থেকে রাজসাক্ষী ললিতকে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় নিয়ে আসা হল ডায়মণ্ডহারবারে। তার আগে, দার্জিলিঙেই, ললিতের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার রজত রায়—যতীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।† সম্ভবত ললিতকে কিছু নির্দেশ পাঠিয়ে-

* বোমার বাগানের অন্যতম কর্মী সুধীর সরকার বলেছেন যে, শ্রীঅরবিন্দের চিঠি নিয়ে তিনি কৃষ্ণনগরে উকিল ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি যেতেন, ললিতবাবুর কাছ থেকে টাকাকড়ি নিয়ে আসতেন।

† মুরারিপুকুরে ধর-পাকড়ের পর পুলিশের রিপোর্টে দেখা যায় তারা বলেছে যে, অনেক দিন

ছিলেন যতীন্দ্রনাথ, কিন্তু ললিতের পক্ষে সরকারি প্রলোভন জয় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তীকে পুলিশ দার্জিলিং থেকে ডায়মণ্ডহারবারে আনবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে লুফে নিল কুখ্যাত ডেপুটি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—সামসুল আলম! বার বার জেরা ক'রে, নানা রকম টোপ ফেলে ফেলে সামসুল ললিতের থেকে নতুন নতুন তথ্য ও নাম-ঠিকানা বের করতে লাগল। এবং নেৎড়া ডাকাতিতেও ললিত যে ছিল, তা-ও স্বীকার করিয়ে নিল। এইবার চাপ দিয়ে ললিতকে পুরোপুরি রাজী করাল সামসুল রাজসাক্ষী হ'তে। অর্থাৎ সামসুলের ও অন্যান্য সরকারি ওপরওয়ালাদের কপোল-প্রসূত অর্ধসত্য ও অসত্যের সঙ্গে ললিতের জ্ঞাত সত্যটুকু মিশিয়ে জগাখিচুড়ি ক'রে ললিতের জবান ব'লে তা' চালাতে স্বীকৃত হল এই রাজসাক্ষী।

ওদিকে যতীন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে ললিতের পিছু পিছু লোক পাঠিয়ে-ছিলেন। ডায়মণ্ডহারবার থেকে সে খবর নিয়ে যতীন্দ্রনাথকে জানিয়ে দিল ললিতের বিস্তৃত জবানের খবর।

১৯১০ সালের ২১শে জানুয়ারী সামসুল আলম সরকারি হুকুম আদায় ক'রে ফেলল—ললিত যাঁদের যাঁদের নাম উল্লেখ করেছে, তাঁদের সবাইকে গ্রেপ্তার ক'রে আনতে হবে।

যতীন্দ্রনাথকেই ললিত চক্রবর্তী সমস্ত আন্দোলনের নেতা ব'লে উল্লেখ

থেকেই চারটি লোককে তারা দ্বীপান্তরিত করতে বলছিল: শ্রীঅরবিন্দ, প্রমথ মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং রজত রায়কে। সরকার কিন্তু রাজী হন নি। হলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না—ওদের বিশ্বাস। রজত রায় ছিলেন যতীন্দ্রনাথেরই Political duplicate—অর্থাৎ রাজ-নীতির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী ব'লে যেসব কাজ যতীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে করতে পারতেন না, সেগুলো শুনেছি রজত রায়কে এবং ব্যারিস্টার জে. এন. রায়কেও সামনে রেখে করাতেন। এই দুইজন ব্যারিস্টার বন্ধুই ছিলেন বেপরোয়া। এইভাবেই বোধহয় সরকারি ফাইলে রজত রায় গুরুত্ব পেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ, সুরেন ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির সঙ্গেও রজত রায় খুব মেলা-মেশা করতেন ব'লে জানা যায়। এবং উত্তরকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পুত্রের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল ব'লে খবর পাওয়া যায়। প্রবীণ বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখেছেন, "রজত রায় সম্পর্কে আমার সন্দেহটাই বোধহয় সত্যি। উত্তরপাড়ার মিশরিবাবু যেমন পুলিশের চোখে ছিলেন অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর duplicate তেমনি রজত রায় ছিলেন যতীন্দ্রনাথের duplicate; অথচ আমি জানি 'মিশরিবাবুর দল' বলে কোন দল ছিল না। অরবিন্দ, বারীন, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রভৃতিকে যে টাকা অমরদা দিতেন তা' বেশির ভাগ জোগাতেন মিশরিবাবু।...ওখানেই তাঁর রাজনীতির শেষ।..."

করল। সেইসঙ্গে নরেন ভট্টাচার্য, M. N. Roy, ললিত চট্টোপাধ্যায় (যতীন্দ্রনাথের মামা), তাঁর মুহুরি নিবারণ মজুমদার, নরেন বসু, হেম সেন, বিজয় চক্রবর্তী, চারু ঘোষ, সতীশ সরকার প্রমুখ বত্রিশ জনেরও নাম করল।

দ্বিগুণ উৎসাহে সামসুল আলম লেগে গেল 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা' নামে নতুন মামলা সাজিয়ে তুলতে।

॥ তিন ॥

অবিলম্বে সামসুল আলমকে শেষ না করলেই নয়!

মহানায়কের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মজুমদার (চণ্ডী) অস্ত্র নিয়ে রওনা হলেন পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে। অকৃতকার্য হয়ে ফিরেও এলেন। কারণ সামসুলের কেশাগ্রও তখন স্পর্শ করা দুরূহ—সর্বদাই সে প্রহরী-সুরক্ষিত হ'য়ে আনাগোনা করছে।

যতীন্দ্রনাথ চণ্ডীকে আবার পাঠালেন। সঙ্গে এবার সতীশ সরকার। গুলী চালানোর ভার রইল চণ্ডীর ওপর। এবারেও চণ্ডী বিফলমনোরথ হলেন।

আগেই বলেছি, ঢাকার বীরেন দত্তগুপ্ত এ-সময়ে চাঞ্চল্যকর একটা কিছু করবার জন্যে অধীর হ'য়ে উঠেছেন। চণ্ডীর অসাফল্যে অসহিষ্ণু হ'য়ে যতীন্দ্রনাথের কাছে সামসুল হত্যার ভার তিনি চেয়ে নিলেন।

যতীন্দ্রনাথের শিষ্য সুরেশ মজুমদার ('পরাণ': উত্তরকালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা) অ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিল সার্জন সরসীলাল সরকারের বাড়িতে থাকতেন তখন। সরসীবাবুর মামা যাজপুরের (উড়িষ্যার) ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র মৌলিক সে-সময় কলকাতা আসেন। সুরেশবাবু পূর্ণবাবুর রিভলভারটি সরিয়ে আনলেন, যতীন্দ্রনাথের হাতে দিলেন।

এবং ১৯০৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর স্বয়ং সুরেশই দিব্যি ভাল ছেলের মতো পূর্ণবাবুকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন।

সেই রিভলভারটি বীরেনের সঙ্গে দিয়ে দিলেন যতীন্দ্রনাথ। আর সতীশ সরকারকে ব'লে দিলেন বীরেনের সঙ্গে গিয়ে ভাল ক'রে সামসুলকে চিনিয়ে দিয়ে আসতে। এবার আর ফিরে এলে চলবে না।

নির্ভীক যুবক বীরেন দত্তগুপ্ত। সবে কৈশোরের সীমা পার হয়েছে। ধমনীতে উষ্ণ রক্তের প্রতিটি বিন্দু নেচে উঠেছিল—এতদিনে মায়ের কাজের অধিকার পেয়ে।

২৪শে জানুয়ারী। ১৯১০ সাল। সোমবার।

কলকাতা হাইকোর্টে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'আলিপুর বোমার মামলা'র আপীল চলছে। নিত্য তাই সামসুল আলমকে সেখানে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

বেলা প্রায় পাঁচটা। পুরনো পাথরের সিঁড়ি বেয়ে সামসুল আলম নেমে আসছে কাগজ পত্র নিয়ে।

অদূরে অপেক্ষমাণ বীরেন আর সতীশ। সামসুলকে নামতে দেখেই সতীশ বীরেনকে সতর্ক ক'রে দিলেন: "ওই, ওই যে সামসুল!"

তীরবেগে বীরেন ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন সামসুলের মুখোমুখি।

বিস্মিত সামসুল আলম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বীরেনের দিকে তাকাল। পলকে বুঝি শিউরে উঠল তার অবচেতন পাপী মন। মৃত্যুর আসন্ন শীতল এক স্পর্শে বুঝি তার মজ্জায় মেরুদণ্ডে শিহরণ জাগল।

বীরেন রিভলভার বার করলেন। গুলী চালালেন। আর্তনাদ ক'রে সামসুল আলম লুটিয়ে পড়ল। তাজা রক্তের ধারায় পিছল হ'য়ে গেল পাথরের সিঁড়ি।

"পাকড়াও! পাকড়াও!" বলে সামসুলের আর্ত অঙ্গুলি শেষ নির্দেশ দিয়ে গেল শাদি-চাপরাশিকে। বার-কয়েক অস্ফুট গোঙানির পর দেহের মায়া কাটিয়ে চলে গেল তার প্রাণ।

"খুন! খুন!" চিৎকার উঠল।

চারদিক থেকে ছুটে এল আরদালি, চাপরাশি, পাহারাদার, দরোয়ান, উকিল, মক্কেল, সাক্ষীরা। আদালতে দারুণ বিশৃঙ্খলা; অসম্ভব হৈ-হুল্লোড়-উত্তেজনা।

বীরেনও উত্তেজিত হ'য়ে গুলী চালাতে লাগলো।

শ্রীঅরবিন্দ-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকার* ভাষায় "গুলী করিয়া হত্যাকারী যুবক খুব দৌড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নিচে আসে এবং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে সদর রাস্তার উপর আসিয়া পড়ে। চারিদিকে 'খুন,

* সাপ্তাহিক 'ধর্ম' (সোমবার ১৮ই মাঘ ১৩১৬ সাল)।

খুন' শব্দ শুনিয়া এবং যুবককে পলায়ন করিতে দেখিয়া কয়েকজন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। হাইকোর্টের রামধনী কাহার, একজন চাপরাশি, এবং আরো কয়েকজন পিয়ন তখন যুবককে ধরিবার জন্য দৌড়াইতে থাকে। যুবক তখন দৌড়াইয়া হেস্টিংস স্ট্রীটের দিকে যায়। যুবক যখন নিউ কোম্পানির বাড়ির দরজার সম্মুখে আসিয়াছে তখন আলী আহম্মদ খাঁ নামক একজন সোয়ার পুলিশ ঘোড়া লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া পথ রোধ করে। যুবক তাহার প্রতি গুলী নিক্ষেপ করে কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। পশ্চাদ্দিক হইতে ইতিমধ্যে রামধনী পিয়ন আসিয়া যুবককে জাপটাইয়া ধরে ও ধোরান সিং কনস্টেবল তাহার হাত হইতে রিভলভার কাড়িয়া নেয়। কিছুক্ষণ হাইকোর্টে রাখিয়া যুবককে ওয়াটালু' স্ট্রীটের থানায় চালান দেওয়া হয়।

"যেখানে আলম খুন হইয়াছিল, আলম এতক্ষণ সেইখানেই পড়িয়াছিল। প্রায় ২/১ মিনিট মধ্যেই প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিংস, বিচারপতি হারিংটন, বিচারপতি স্টিফেন এবং অন্যান্য বহু উকীল কৌন্সিলি ছুটিয়া আসিয়া সেই-খানে উপস্থিত হন। প্রধান বিচারপতি তাহাকে জল খাইতে দিয়াছিলেন। ...কিন্তু ডাক্তার আসিবার পূর্বেই আলম পঞ্চত্ব পাইয়াছে। তাহার শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে গুলীটা তাহার বুক ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, পরে দেখা গেল যে গুলীটা বারাণ্ডায় পড়িয়া আছে।...

"হত্যাকারী যুবক পুলিশ হস্তে ধৃত হইয়া স্বীয় পরিচয় সম্বন্ধে কোন কথাই বলে নাই। যুবককে ধৃত করিয়া ওয়াটালু' থানায় লইয়া যাওয়া হয়। তথায় ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ড্যালি, এসিস্টেণ্ট ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ডেনহ্যাম এবং পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যালিডে আসামীর পরিচয় জানিবার জন্য 'বিশেষ চেষ্টা' করেন এবং রাত্রি ১টা পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া আসামীকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু আসামী কিছুতেই কোনও পরিচয় প্রকাশ করে নাই। পরে পুলিশ জানিতে পারে যে, পূর্ববঙ্গের লোক, তাহার নাম বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।* সে এখানে তাহার

* শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্য ৺সুরেশ চক্রবর্তী লিখেছেন, "এই সময়ে অরবিন্দ তামিল ভাষা শিখ-ছিলেন।...মনে আছে একদিন তিনি তামিল পাঠ সাঙ্গ ক'রে ফিরে এসে তের-চোদ্দ বছরের স্কুল-বালকের মতো কৌতুক-বোধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললেন—'Do you know what is পীরেন্‌তিরু নাত্‌ তত্‌ত কোপ্‌তা?' আমরা অবশ্য সবাই অজ্ঞতায় বাক্যহীন হ'য়ে রইলাম। তিনি বললেন,

ভ্রাতার সহিত ৬১নং মীর্জাপুর স্ট্রীটে বাস করিত। এই সংবাদ অবগত হইয়া ঘটনার দিবসে মধ্যরাত্রে পুলিশ ঐ বাড়ি খানাতল্লাস করিয়াছে।…

…আসামী কেন এমন কাজ করিল,—তাহার ভ্রাতা কর্তৃক এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে সে বলে, 'আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তাহা করিয়াছি।' পুলিশও যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার ঐ খুন করিবার কারণ জানিতে চাহিয়াছিল। তাহার উত্তরে যুবক বলিয়াছিল,—'তোমরা আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমি কোন কথা বলিতে প্রস্তুত নহি।' যুবক আরও বলে যে সামসুলের উপর তাহার ব্যক্তিগত কোনরূপ আক্রোশ ছিল না।…

"…পুলিশের নিকট আসামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্র বলিয়াছে যে, আসামী মধ্যে মধ্যে গ্রে স্ট্রীটে তাহার কোনও বন্ধুর নিকটে যাইত। উক্ত বন্ধু সম্প্রতি পীড়িত হওয়ায় বীরেন ইদানীং প্রায় সর্বদা তাহার নিকটেই অবস্থান করিত; হত্যার পূর্বদিন হইতে সে হ্যারিসন রোডের মেসে আদবেই আসে নাই।*

"প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহোর নিকট গত বৃহস্পতিবার বীরেন্দ্রের মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। আদালতে পুলিশ, কয়েকজন উকিল, সংবাদপত্রাদির প্রতিনিধি ব্যতীত আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তবে বীরেন্দ্র এরূপভাবে আচার-ব্যবহার করিতেছিল যেন কিছুতে তাহার ভ্রূক্ষেপই নাই। মামলার কি হইতেছিল না হইতেছিল তদ্বিষয়ে তাহার কোনই আগ্রহ ছিল না, সে কখন পুলিশের সহিত কথাবার্তা করিতেছিল, কখনও বা হাসিতেছিল। সরকারী পক্ষে মিঃ হিউম উকিল ছিলেন। সর্বপ্রথমে আলমের শরীর-রক্ষকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। …পিয়ন, সোয়ার ও ডাক্তার ইত্যাদির সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয়। মামলা

'ঐ হচ্ছে তামিলে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।'…" (স্মৃতিকথা) শ্রীঅরবিন্দের মুখে বীরেন দত্তগুপ্তের এই উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় নয় কি?—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

* গ্রে স্ট্রীট নয়, যতীন্দ্রনাথের ২৭৫, আপার চিৎপুর রোডের বাড়িতে বীরেন দত্তগুপ্ত যেতেন; এই সময়ে যতীন্দ্রনাথের এক মামা অসুস্থ হ'য়ে পড়েন ব'লে স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ তাঁর শুশ্রূষা তো করতেনই, দলের অনেকেই পালা ক'রে স্বেচ্ছায় এ-জাতীয় কাজ ক'রে আনন্দ পেতেন। এই মামাকে শুশ্রূষারত অবস্থাতেই যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয় সামসুল হত্যার তিনদিন বাদে, ঘোর রাত্রে॥

এখন চলিতেছে। হাইকোর্টে বিশেষ জুরীর নিকট আসামীর বিচার হইবে।”

বীরেন দত্তগুপ্ত ধরা প'ড়ে গেলেন দেখে সতীশ সরকার হাইকোর্ট থেকে সোজা উপস্থিত হলেন মহানায়কের কাছে, এবং তাঁরই নির্দেশে শ্যামপুকুরে ‘কর্মযোগিন্’ অফিসে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে জানিয়ে এলেন সামসুল আলমের সমাপ্তি-পর্বের বিবরণ।

ধর-পাকড়ের নতুন মরশুমে আবার শ্রীঅরবিন্দকে কারাগারে অভ্যর্থনা করবার অভিপ্রায়ে গোয়েন্দা-বিভাগ তৎপর হ'য়ে উঠল শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথের সম্পর্কের সূত্র আবিষ্কার করতে।

কিন্তু তার আগেই, সামসুল হত্যার মাসখানেকের মধ্যেই, তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা যখন জারী করা হ'ল, তিনি চ'লে গেলেন ইংরেজের নাগালের বাইরে—অন্তরে এক আদেশ শুনে শ্রীঅরবিন্দ চ'লে গেলেন ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে। সেখান থেকে ১৯১০ সালের মার্চ মাসের শেষ নাগাদ ফরাসী জাহাজ ‘দ্যুপ্লে’ চ'ড়ে যতীন্দ্রনাথ মিত্র ছদ্মনামে শ্রীঅরবিন্দ রওনা হলেন ফরাসী-ভারতের প্রধান কেন্দ্র পণ্ডিচেরী অভিমুখে।

ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘কর্মযোগিন্’ সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি দিয়ে গেলেন সিস্টার নিবেদিতার হাতে। আর, সমস্ত বিপ্লব-আন্দোলনের একচ্ছত্র অধিনায়ক যতীন্দ্রনাথকে স্বীকৃতি দিয়ে চন্দননগরের মতিলাল রায়কে ব'লে গেলেন—যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে চলতে।

সতীশ সরকার কিছুদিন কলকাতাতেই আত্মগোপন ক'রে রইলেন ছয় নম্বর ক্রাউচ লেনের একটি মেসে। তাঁর ডাক নাম ছিল ‘কনিষ্ঠ পাণ্ডব’। শ্রীঅরবিন্দকে চন্দননগরে পৌঁছে দিয়ে এসে সুরেশ চক্রবর্তীও সতীশের (ওরফে কনিষ্ঠের) আশ্রয়ে ক্রাউচ লেনের মেসে উঠলেন। এই মেসের সুরেশ চক্রবর্তী কিছুদিন থাকার পরে, “হঠাৎ একদিন একটি ছোট্ট টুকরো কাগজে···অরবিন্দের হাতে লেখা তিন-চার লাইন পেলাম। তাতে এই নির্দেশ ছিল যে, আমাকে পণ্ডিচেরীতে যেতে হবে তাঁর জন্যে একটি বাড়ি ঠিক ক'রে রাখতে।” *

* সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর ‘স্মৃতিকথা’ (পৃঃ ৫৮)॥ এই গ্রন্থ রচনার সময়ে সতীশবাবু ‘নির্বাণ স্বামী’ নামে ইহলোকে ছিলেন, কলকাতার কাছেই এই ছোট্ট মঠে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, কিন্তু চোখদুটি তেমনি অন্তর্ভেদী দীপ্তি হারায় নি। তেমনি প্রখর ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি॥—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

সুরেশবাবুর অনবদ্য ভাষায় সতীশ সরকারের চিত্রটি কেমন ফুটেছে, দেখাই, "মধ্যম দৈর্ঘ্যের ময়লা রঙের পাতলা ছিপ্‌ছিপে মানুষটি এই কনিষ্ঠ পাণ্ডব। বয়েস কুড়ি পেরিয়েছে কিন্তু পঁচিশ পেরোয় নি বলে মনে হয়। পোষাক-পরিচ্ছদে উদাসীন, কেশকলাপের পরিচর্চায় বৈরাগ্যপ্রবণ, আহার জীবনধারণার্থে এবং বিহার অবান্তর। চোখদুটিতে মাঝে মাঝে একটা দৃষ্টি ফুটে ওঠে যা দেখে ইংরাজী ক্রিয়াপদ 'drill' শব্দটি মনে পড়ে—কুচকাওয়াজ অর্থে নয়, তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ধাতু ভেদ অর্থে—তার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে যেন গুপ্ত পুলিশের কোন ছদ্ম-পোষাকই অব্যাহতি পাবে না। কনিষ্ঠ ১৯১০-এর শেষের দিকে পণ্ডিচেরীতে এসে কয়েক মাস আমাদের সঙ্গে এক বাড়িতে ছিলেন। এবং তিন্নেভেলির কালেক্টর অ্যাশ্‌ Ashe সাহেবের হত্যার পর··· সেই যে কনিষ্ঠ একদিন সন্ধ্যার আবছায়াতে তার স্যুটকেসটি হাতে ক'রে পণ্ডিচেরী থেকে এক স্টেশান এগিয়ে ট্রেন ধ'রে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন তার পর এই বত্রিশ-তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে তার কোন খবর পাই নি।"···*

সুরেশ চক্রবর্তী শ্রীঅরবিন্দের জন্যে বাড়ি ঠিক করতে যাবার কিছুদিন পরেই, যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে সতীশ সরকার চ'লে গেলেন উড়িষ্যায়; বালেশ্বরের কাছে কপ্তিপদায় যে-আস্তানা করিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ ১৯০৮ সালে, সেখানে আত্মগোপন ক'রে রইলেন সতীশ এবং যতীন্দ্রনাথের অপর এক শিষ্য নলিনীকান্ত কর। এখানে কয়েক মাস থেকে, সতীশ চলে যান পণ্ডিচেরী।

এই আস্তানাতেই পাঁচ বছর পরে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ আসবেন তাঁর জীবনের শেষ ছয় মাস অতিবাহিত করতে।

সে-কাহিনী এখন থাক॥

॥ চার ॥

বীরেন যেদিন সামসুলকে হত্যা করেন, তার তিনদিন বাদেই—১৯১০ সালের ২৭শে জানুয়ারী—ললিত চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তি ও সামসুলের পরিকল্পনা অনুযায়ী যতীন্দ্রনাথকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল ২৭৫ আপার চিৎপুর রোডের বাড়ি থেকে।

* সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্মৃতিকথা' (পৃঃ ৫৯)।

হাকিম মরে তো হুকুম মরে না।

রাত জেগে যতীন্দ্রনাথ তাঁর এক মামাকে সেবা করতে ব্যস্ত। বীরেন এর চারদিন আগেও যতীন্দ্রনাথের পাশে ব'সে এই মামার শুশ্রূষা ক'রে গিয়েছেন। এদিনও অন্য দু-একজন সহকর্মী উপস্থিত। এমন সময় গভীর রাতের অতিথিরা এসে হাজির।

ওয়ারেণ্ট দেখাতে যতীন্দ্রনাথ মৃদু হাসলেন। যেন বললেন, "মিথ্যা প্রচেষ্টা করছ তোমরা। কোনও অভিযোগেই আমায় জড়াতে পারবে না।"*

তন্ন তন্ন ক'রে তল্লাস ক'রেও আপত্তিকর কিছুর হদিস যতীন্দ্রনাথের বাড়িতে পাওয়া গেল না। সতীশ সরকার ও অন্য দু-একজন শিষ্য সবকিছুই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ইতিপূর্বে।

'The Scheme and Formation of the Vigilance Committee' নামে যতীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ শুধু পাওয়া গেল। সেটাই হস্তগত করল টেগার্ট-সাহেব ও তার সাঙ্গপাঙ্গ।

যতীন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের রিপোর্ট বেরিয়ে গেল শ্রীঅরবিন্দের 'ধর্ম' সাপ্তাহিকে। সেইসঙ্গে লেখা হ'ল, "৫৯নং বেনেটোলা লেন হইতে যতীন্দ্র-বাবুর মামাবাবু অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়কেও পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। অনাথবাবু আলিপুর বোমার মামলায় প্রদর্শিত চিঠিপত্রাদি অনুবাদ করিবার জন্য গবর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ হাইকোর্টের উকিল কিশোরীলাল সরকারের বাটীও তল্লাসী হইয়াছে। তথায় গ্রেপ্তারীও হইয়াছে কিন্তু পুলিশ কিছুই প্রকাশ হইতে দেয় নাই। ১০৭নং আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থ ছাত্রাবাসটিও তল্লাসী হইয়াছে।...বীরেন্দ্র নাকি এই ছাত্রাবাসে বাস করিত। কৃষ্ণনগর হইতে উকিল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার মুহুরিকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনা হইয়াছে। পুলিশের সন্দেহ, তাঁহারা সামসুলের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন।"

ইতিপূর্বে, ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে ললিতবাবুর বাড়ি তল্লাসী হওয়া

* ১৯২৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর উপলক্ষে 'আত্মশক্তি'র যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তার একটি প্রবন্ধে দেখি, যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে ভয়ে উত্তেজনায় টেগার্ট সাহেব এতই উতলা হ'য়ে পড়েছিলেন যে, যতীন্দ্রনাথের দিকে অগ্রসর হ'তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যান; তাড়াতাড়ি, সৌজন্যে নিখুঁত যতীন্দ্রনাথ সাহেবকে তুলে ধ'রে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, "Sorry, Mr. Tegart!" সাহেবের সারা মুখ তাতে রাঙা হ'য়ে ওঠে॥—পৃথ্বীন্দ্রনাথ।

সম্বন্ধে 'ধর্ম' লিখেছিল, "গত ৩০শে নভেম্বর প্রাতঃকালে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গুপ্ত ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রসিদ্ধ কর্মচারী সামস্থল আলম একদল পুলিশ লইয়া কৃষ্ণনগরের উকিল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি ঘেরাও করেন। তল্লাসীর পরওয়ানা দেখাইয়া তাহারা তাহাদের কার্য আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে ভগবান চিরকালই অষ্টরম্ভাই লিখিয়া রাখিয়াছেন দেখিতেছি। কয়েকখানা চিঠি, একখানি 'স্বরাজ' পত্রিকা পুলিশ লইয়া গিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই 'আর্য কেমিকাল ওয়ার্কস'-এর বাড়িটিও পুলিশ তল্লাসী করে।* তথায় জুতার কালি, লিখিবার কালি, তরল আলতা এইরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। পুলিশের কি সন্দেহ হয় বা না হয় তাহা লইয়া বিচার করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। তবে কাঁচের কিছু যন্ত্রাদি পুলিশ হস্তগত করিয়াছে।..."

যতীন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পর।

রয়েড স্ট্রীটের গোয়েন্দা অফিসে যতীন্দ্রনাথকে আনা হয়েছে। অভুক্ত, স্নান বিশ্রামে বঞ্চিত মহানায়কের মুখ থেকে সামান্যতম জবাব আদায়ের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে বর্বর বিদেশী পুলিশ। ছল, বল, কৌশল সবই পরাস্ত হয়েছে।

যে-যতীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য প্রফুল্ল চাকী রেখে গেলেন আত্মত্যাগের নিদর্শন, চারু বসু দেখিয়ে গেলেন বীরত্বের দৃষ্টান্ত, বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত দেখালেন সহনশীলতার উদাহরণ—সেই নেতা যে কী ধাতু দিয়ে গড়া, তা' বিদেশী পুলিশের কল্পনারও অতীত বুঝি।

তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে স্পষ্ট তারা বুঝেছে শ্রীঅরবিন্দেরই পরেই Master-mind বলতে, সুদূর-প্রসারী সূক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারী একচ্ছত্র নেতা বলতে এই একজনই আছেন এ-দেশে। অথচ কিছুতেই আইনের প্যাঁচে বাঁধা পড়ছেন না ইনি।

তাই রয়েড স্ট্রীটে নতুন অপচেষ্টার শরণ নিল গোয়েন্দা বিভাগ।

অদৃষ্টের পরিহাস। চারদিন অভুক্ত রাখবার পর, চারদিন যতীন্দ্রনাথ জলস্পর্শ না করবার পর, এক ইংরেজ অফিসার ভাবল প্রলোভনের পথে এবার যতীন্দ্রনাথকে আয়ত্ত করা হয়তো যাবে।

* স্মরণ থাকতে পারে, এখানেই বিপ্লবীদের প্রথম বোমা প্রস্তুত করেন বিভূতি চক্রবর্তী, ১৯০৬ সালে॥

ঘনিষ্ঠতায় নিবিড় হ'য়ে অফিসারটি বলল, "Mukherjee, perhaps you want young beauties and whisky ?"

মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর চেতনার সাধকের সমীপে ইংরেজের বাধল না নিজের সারমেয়সুলভ মনোবৃত্তি প্রকাশ করতে।

দুর্বিনীত ইংরেজের মূঢ়তা আর স্পর্ধা দেখে আগুন জ্বলে উঠল যতীন্দ্রনাথের আয়তনেত্রে। অফিসারটি দ্বিতীয়বার তার প্রস্তাবটি উচ্চারণ করা মাত্র, বারুদের স্তূপে আগুন লাগবার মতই, পলকে বিস্ফোরণ ঘটল যেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দিয়ে সামনের টেবিলের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিয়ে অপরিসীম ক্রোধ আর ভৎ'সনায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ, "Shut up...nonsense !"

সেই রুদ্র অট্টনাদে গোটা গোয়েন্দা অফিস কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠল ধৃত বিপ্লবীদের অন্তর, মহানায়কের উপস্থিতি এইভাবে ঘোষিত হওয়ায়। কেঁপে উঠল সমবেত অফিসারদেরও মন।

আর, যতীন্দ্রনাথের সহকর্মীরা (যাঁদের অনেকেই তখন বন্দী হয়ে রয়েড স্ট্রীটের গোয়েন্দা অফিসে নীত হয়েছিলেন) বলেন—যতীন্দ্রনাথের সেই প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে সশব্দে ফেটে গেল গোয়েন্দা অফিসের কাঠের টেবিলটার পুরু তক্তা!

অফিসারেরা বোধহয় ভুলে গিয়েছিল যে, এই মুষ্টির আঘাতেই দ্বিখণ্ডিত হয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের কুলীশ-কঠিন খুলি, এই মুষ্টির আঘাতেই একাধিকবার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে অগণিত অত্যাচারীর উদ্ধত শির, এই মুষ্টির আঘাতকেই সবচেয়ে বেশি ভয় ক'রে চলে ভারতের বিদেশী সরকার।

দীর্ঘকাল অনাহারে, অবর্ণনীয় শারীরিক অত্যাচারেও যে-লোকের মুষ্টিতে এত জোর, তাঁকে ঘাঁটানোর পরিণাম স্মরণ ক'রে নিরস্ত হয় গোয়েন্দা অফিসের ক্ষীণজীবী অফিসারেরা।

নির্জন কারাগারে বিচারাধীন যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

সেদিন ছিল ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩ সাল। চারদিন হাজত-বাসের পর পুলিশের ভ্যান এসে থামল হাওড়া জেলে।

সশস্ত্র প্রহরী নামল ভ্যান থেকে। দরজা খুলে দিল। নামলেন পরাধীন বিশাল এই দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত পদদলিত মানুষের মুক্তি-সাধক

যতীন্দ্রনাথ। মহানায়ক।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব থেকে শুরু ক'রে কারাগারের নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত চেয়ে দেখেন সুন্দর-কান্তি সৌম্যদর্শন এই কিম্বদন্তীর নায়ককে। উদাস সন্ন্যাসীর মত আকাশচুম্বী অতল অনিন্দ্য নেত্রে নির্ভীক প্রশান্তি। প্রতি পদক্ষেপে শান্ত সুদৃঢ় আত্মনির্ভরশীলতা।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে।

নিয়ম অনুযায়ী জেলার যতীন্দ্রনাথকে সামান্য পোশাক রেখে আর সব পরিধেয় খুলে ফেলতে অনুরোধ করলেন। তারপর, তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করলেন কানুন-মাফিক সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে কিনা।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল—যতীন্দ্রনাথের গলায় সুতো-বাঁধা কি-একটা ঝুলছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও এগিয়ে এলেন। তিনি বেঁকে বসলেন: উঁহু! ওটা খুলে ফেলতে হবে। ইণ্ডিয়ান কী না কী তুকতাক ওতে আছে, কে জানে? ওটা খুলতেই হ'বে।

যতীন্দ্রনাথ ধীরকণ্ঠে বললেন—ওতে তুকতাক কিছুই নেই! ওটা তাঁর গুরুর দেওয়া রুদ্রাক্ষের মালা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিলোপ-সক্ষম কোনও বিস্ফোরক বস্তু ওতে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাহেবের মন নারাজ হ'ল। ওই কালো ম্যাজিক নিয়ে জেলে ঢোকা চলবে না।

যতীন্দ্রনাথেরও কথার নড়চড় নেই: প্রাণ থাকতে এ-মালা তিনি কাছ-ছাড়া করবেন না। জবরদস্তির দরকার হ'লে তা-ও পিছ-পা হবেন না।*

"বটে? এতখানি স্পর্ধা?" জেলার কয়েকটা সেপাইকে ডেকে আনলেন। "জোর ক'রে ওই মালা কেড়ে নাও। নষ্ট ক'রে ফেল!"

অভ্যস্ত দশাসই সেপাইরা এগিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর গাত্রস্পর্শ করা-মাত্র আবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন তিনি। ভয়ঙ্কর তিরস্কারের সঙ্গে এক ধাক্কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন তিনি।

লৌহভীমের মত কঠোর প্রতিবাদে তাঁর সারা দেহের পেশী ফুলে উঠল থরে থরে। রোষরক্ত বদন দেখে জেলারের কপালে রীতিমত স্বেদের সঞ্চার হ'ল।

*যতীন্দ্রনাথের দেহাবসানের ছবিতেও দেখা যায় তাঁর কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে এই রুদ্রাক্ষ।

সুন্দর-কান্তি সৌম্যদর্শন ওই যুবকের চেহারায় কী ক'রে আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারে এত আগুন, আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারে এমন নিখুঁত এক লৌহমানব—ভেবে পেলেন না জেলের কর্তৃপক্ষ।

এক গোয়েন্দা-অফিসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কি যেন পরামর্শ দিলেন চুপি চুপি। বেগতিক বুঝে, ওই রুদ্রাক্ষের মালা-সমেতই যতীন্দ্রনাথকে প্রবেশাধিকার দিতে হ'ল। নির্জন সেল্-এ স্থান হ'ল তাঁর।

ওদিকে, বীরেন দত্তগুপ্তের ওপরে চলেছে অত্যাচার। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পৈশাচিক পীড়ন আর দুর্জয় প্রলোভনের টানা-পোড়েনে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলছে পুলিশ অবরুদ্ধ প্রতিটি বিপ্লবীর মন।

শ্রীঅরবিন্দ-সম্পাদিত 'ধর্ম' সাপ্তাহিক (২৫শে মাঘ, ১৩১৫) লিখছে, "ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী সামস্-উল আলম খাঁ বাহাদুরের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তকে গত ১লা (ফেব্রুয়ারি) তারিখে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি মহাশয় ও পাঁচজন ইউরোপীয় ও চারিজন দেশীয় লোক গঠিত একটি বিশেষ জুরির সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল।...প্রধান বিচারপতির অনুরোধানুক্রমে শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন বীরেনের পক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"বীরেন্দ্র যখন ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ডকে প্রবেশ করিল তখন তাহার মুখে শান্ত, উদ্বেগশূন্য ভাবই পরিলক্ষিত হইতেছিল। তাহার পা নগ্ন, পরিধানে একখানি ধুতি ও গায়ে একখানি আলোয়ান ছিল। আদালত-গৃহ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হলটেনের কর্তৃত্বাধীনে পুলিশ কর্তৃক বিশেষভাবে সুরক্ষিত হইয়াছিল।

"সর্বপ্রথমে সরকারের কেরাণী অভিযোগলিপি পাঠ করেন—আসামী তৎপ্রতি নিতান্ত ঔদাসীন্য দেখাইয়া নিরুত্তরই ছিল। তৎপরে মিঃ সেন উঠিয়া বলেন যে, আসামীর নিকট তিনি পরামর্শাদি চাহিয়া পাঠান তাহাতে আসামী বলে যে, তাহার উকিলের কোন প্রয়োজন নাই, সে দোষ স্বীকারই করিবে। এরূপ স্থলে, মিঃ সেন বলেন যে, তিনি আসামীর পক্ষ হইয়া এইটুকু মাত্র বলিতে পারেন যে, আসামীর মস্তিষ্ক সুস্থ অবস্থাতেই রহিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা হউক—কী অভিপ্রায়ে যে আসামী এই কার্য করিয়াছে তাহা নিম্ন আদালতের শুনানী হইতে কিছুই স্থির করা যাইতেছে না।

"ইহার পর প্রধান বিচারপতি আসামীকে আহ্বান করিয়া বলেন: বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, তোমার পক্ষ হইয়া এই আদালতে উপস্থিত হইতে আমি কৌন্সিলকে অনুরোধ করিয়াছি, মিঃ সেন দয়া করিয়া ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তুমি ইহাতে রাজী আছ?

"বীরেন্দ্র ইহাতে কোন প্রত্যুত্তর দেয় না। তাহাকে বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দিলে সে বলে: না মহাশয়, আমার কোন কাউন্সেলের প্রয়োজন নাই।

"মিঃ সেনকে প্রধান বিচারপতি ধন্যবাদ প্রদান করেন ও তৎপরে মিঃ আলি ইমাম বলেন যে, আসামী ত নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছে, বিচারপতি মহাশয় তাহাকে প্রথমে নির্দোষী ধরিয়াই 'বিচার করিতে চাহেন কিনা তাহা তিনি জানেন না; ইহাতে বিচারপতি মহাশয় বলেন যে, আসামী নিজ দোষ স্বীকার করিলেও সরকার পক্ষকে প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে। ইহার পর আলি ইমাম মোকদ্দমার মুখবন্ধ আরম্ভ করেন ও তৎপরে সাক্ষী সকলের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। সরকারের পক্ষ শেষ করিলে বিচারপতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন আসামী কি কিছু বলিতে চায়; সে বলে—'না'।

"ইহার পর জুরির নিকট বিচারপতি মহাশয় সকল কথা সংক্ষেপে উপস্থিত করেন এবং আসামীর পক্ষ সমর্থনের জন্য কেহই ছিল না, এমন কি তাহাকে অনুরোধ করিলেও সে স্ব-ইচ্ছায় কোন সমর্থনই চাহে নাই তজ্জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন।...

"জুরি একবাক্যে বীরেন্দ্রকে দোষী বলিয়া নির্দেশ করে। তৎপরে বিচারপতি মহাশয় তাহার প্রাণদণ্ডাদেশ দিতে যাইয়া বলেন: বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, জুরির এক সিদ্ধান্তক্রমে তুমি মৌলবী সামস্-উল-আলমের হত্যার অপরাধী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছ এবং আদালতের দণ্ডাদেশ এই যে, যে স্থান হইতে তুমি আসিয়াছ এস্থান হইতে তোমায় তথায় লইয়া যাওয়া হইবে ও তৎপরে সে-স্থান হইতে তোমাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইবে এবং সেখানে যে পর্যন্ত তোমার মৃত্যু না হয় সে পর্যন্ত গলদেশে রজ্জু দ্বারা তোমাকে লম্ববান করিয়া রাখা হইবে।

"বীরেন্দ্র এই দণ্ডাদেশ অতি শান্তচিত্তেই পরিগ্রহণ করিয়াছে, সে সর্বদাই প্রফুল্ল ও হাসিমুখে ছিল। বিচারের পূর্বে অপরাধীদিগের গারদখানায় অবস্থিতিকালে বীরেন্দ্র কচুরী, সন্দেশ ও রসগোল্লা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ

করিয়াছিল। ডেপুটি কমিশনার মিঃ টেগার্ট'কে এ সংবাদ জানান হইলে তিনি বলেন যে, আসামী যাহা খাইতে চান তাহা যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়—তাঁহার আদেশ কার্যে পরিণত করা হয়। বীরেন্দ্রকে হাইকোর্ট' হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া যাওয়া হয়। তথায়ই তাঁহার ফাঁসী হইবে।"

ইতিমধ্যে, ৩১শে জানুয়ারি তারিখে যতীন্দ্রনাথ, তাঁর দুই মামা—নদীয়ার মহারাজার কলকাতাস্থ প্রতিনিধি অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরের উকিল ও আইন কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়,—ললিত-বাবুর মুহুরি নিবারণ মজুমদার, প্রেসিডেন্সী কলেজের B. Sc. ক্লাসের ছাত্র জ্ঞান মিত্র, কৃষ্ণনগরের সুরেশচন্দ্র মজুমদার (হাইকোর্টে'র উকিল কিশোরী-লাল সরকারের বাড়িতে ইনি থাকতেন—পরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করেন) প্রভৃতিকে সামসুল আলমের হত্যার অভিযোগে পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যালিডের কাছে উপস্থিত করা হয়।

অনাথবাবুকে ১০০০৲ টাকার জামিনে ও যখনই পুলিশ ডাকবে হাজির হবেন—এই শর্তে খালাস দেওয়া হয়। জ্ঞান মিত্রের বাবাও ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যত্নবান হবেন এই অঙ্গীকারে তাঁকে ছাড়িয়ে আনলেন; জ্ঞানের বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ ছিল না।

॥ পাঁচ ॥

১৯১০ সাল। ৪ঠা এপ্রিল।

দিদি বিনোদবালার চিঠির জবাবে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে যতীন্দ্রনাথ যে চিঠি দিলেন, তার প্রতিটি ছত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠল সাধক বিপ্লবীর দিব্য মনোভাব।

এইখানে পত্রটি উদ্ধার ক'রে দিলাম—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদী পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম—আপনারা সকলে ভাল আছেন জানিয়া সুখী হইলাম।—আপনি আমার অসুখের সংবাদে ব্যস্ত হইয়াছেন; ব্যস্ত হইবেন না। আমি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি, তবে অসুখটা একটু বেশী হইয়াছিল তাই

দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, আবার শ্রীগুরুর কৃপায় আস্তে আস্তে সবল হইতেছি।—যাহা হউক, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই চরণে আমাকে নিবেদন করিয়া রাখুন, তিনি যেমন আমাকে শৈশব হইতে নানা বিপদে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এস্থলেও তিনিই একমাত্র ভরসা। তিনি যাহাকে যত বেশী ভালবাসেন তাহাকে তত বেশী পরীক্ষা করেন এবং সেইজন্যই নানা বিপদের মুখে নিপাতিত করিয়া তাঁহারই অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেন—তিনি যাহা করিবেন তাহার উপর মানুষের কিছুমাত্র হাত নাই; মানুষ কেবল তাঁহাতে নির্ভর করিয়া পুরুষকার করিতে পারে; ফলাফল তাঁহারই হাতে। যাহা হউক আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। তাঁহার প্রতি চাহিয়া বুক বাঁধিয়া সংসারে অবস্থান করুন।—আমাপেক্ষাও ভগবানের অধিক স্নেহ আপনার প্রতি, তাই আপনার পরীক্ষা আমাপেক্ষা অধিক ও কঠিনতর। যাহা হউক, তাঁহার দয়া ভুলিবেন না। অথবা তাঁহাতে অবিশ্বাস করিবেন না। ইন্দুকে* ও অপর সকলকে এই পত্রই দেখাবেন। মেজমামাকে† আর একবার সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন।—তাঁহারা সকলে কেমন আছেন?

শ্রীচরণে নিবেদনমিতি

প্রণত সেবক

জ্যোতি।—

১৯১০ সালের ২৫শে এপ্রিল, 'হাওড়া-শিবপুর' রাজনৈতিক ডাকাতির মামলাসংক্রান্ত যে-রিপোর্ট' বাংলার আই-জি পুলিশ দাখিল করেছে, তার থেকে জানা যায়—

এ-যাবৎ এই মামলার জন্যে ছেচল্লিশজন দেশকর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে; ছ'জন অন্তর্ধান করেছেন; পঁচিশজনকে জেরা করা হয়েছে, তাঁদের দু'জন—ললিত চক্রবর্তী ও যতীন হাজরা, রাজসাক্ষী হয়েছেন। সাক্ষী যেসব সংগ্রহ করা গিয়েছে, তারা সকলেই ডায়মণ্ডহারবার সাবডিভিশনের লোক—নেতড়ার ডাকাতি ও সুন্দরবনে রিভলভার শিক্ষার ব্যাপারে এরা সাক্ষ্য দিয়েছে।

সরকারি রেকর্ডে উপরোক্ত বিপ্লবী কর্মীদের দলে দলে ভাগ করা হয়েছে;

* যতীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী ইন্দুবালা দেবী।

† শোভাবাজারের ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়; ইনিই যতীন্দ্রনাথের আত্মীয়দের তরফ থেকে জেলে গিয়ে দেখা ক'রে আসতেন সচরাচর।

যদিও এঁরা কেউই উক্ত দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। এঁদের সকলেই যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে আপাতদৃষ্ট এই রকম পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করলেও প্রতিটি দলের সঙ্গেই প্রত্যেকের যোগাযোগ ও আদান-প্রদান ছিল আঞ্চলিক নেতাদের সুবিধানুযায়ী এবং—সর্বোপরি, যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে। একেই জনৈক প্রবীণ বিপ্লবী দার্শনিক অভিহিত করেছে Loose Confederation. বা 'বিকেন্দ্রিক দল' ব'লে। সাধারণত প্রত্যেক দলের নেতাই শুধু সংযোগ রাখতেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং যতীন্দ্রনাথের স্নেহের ধারাই এমন অকুণ্ঠ ছিল যে, প্রত্যেক নেতারই ধারণা হত তিনি স্বয়ং যতীন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তস্বরূপ! অনেক ক্ষেত্রেই দলের লোকেরা বিশেষ কেউ জানত না সর্বাধিনায়ক যতীন্দ্রনাথের ভূমিকা বা তাঁর সঙ্গে দলগুলির সম্পর্কের কথা। এ-ই ছিল যতীন্দ্রনাথের গুপ্ত-সংগঠনীর রীতি।

সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী নিম্নোক্ত দলগুলি এই সময়ে ধরা পড়ে:

(ক) **হাওড়া-শিবপুর দল**—(১) ননীগোপাল সেনগুপ্ত, (২) ভুবন মুখার্জী (৩) ভোঁতন মুখার্জী, (৪) যোগেশ মিত্র, (৫) বিষ্ণুপদ চ্যাটার্জী, (৬) শৈলেন চ্যাটার্জী, (৭) অতুল মুখার্জী।

ললিত চক্রবর্তীর জবান অনুযায়ী এই দলের এই সাতজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলেও এঁরা ছাড়াও দলের আরো সভ্য যে আছেন, সে-বিষয়ে সরকারের জ্ঞান বেশ টনটনে দেখা যাচ্ছে। এঁদের মধ্যে ননীগোপালই সবচেয়ে গভীর জলের মাছ ব'লে গোয়েন্দাদের বিশ্বাস। ললিতের জবান অনুযায়ী ননীগোপাল, ভুবন, ভোঁতন ও যোগেশ সমিতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং বিষ্ণুপদ প্রত্যক্ষভাবেই নেতড়া ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। (৬) এবং (৭) নম্বর আসামীরা হলুদবাড়ি ডাকাতির মামলায় বিচারাধীন।

তা' ছাড়া দশম জাঠ বাহিনীর সুর্জন সিং স্বীকার করেন যে, শিবপুরেই তাঁকে গুপ্ত-সমিতির দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল; দীক্ষার স্থান হিসাবে তিনি ভুবন ও ভোঁতনের বাড়ি সনাক্ত করেছেন। নরেন চ্যাটার্জী (ভোলা) তাঁকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন ব'লে সুর্জন স্বীকার করেছেন; নরেন গা-ঢাকা দিয়ে আছেন—তাঁকে এখনো ধরা যায় নি।

রাজসাক্ষী যতীন হাজরা ও অন্যান্য সাক্ষীর জবান অনুসারে স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্থানের ডাকাতিগুলি এই শিবপুর দলের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে : শিবপুরে, বিষাতিতে, প্রতাপচকে, মোরহালে, কালচরিয়ায়, মাগুপুরে (২ বার), নেতড়ায়। তা' ছাড়া দশম জাঠ বাহিনীতে বিদ্রোহ ছড়ানোর মূলেও এঁদেরই হাত আছে ব'লে পুলিশের বিশ্বাস।

অধিকাংশ আসামীই চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা; অধিবাসীরা প্রধানত রাইটার্স বিল্ডিংসের চাকুরে হওয়ায় যতীন্দ্রনাথের পরিচিত; যতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁদের কারো কাছ থেকে অনুসন্ধান করেই কোন কথা আদায় করা যায় নি। জনৈক সাক্ষীর মতে ননীই নিঃসন্দেহে এ-দলের নেতা; ননীর বাড়ির কাছেই একটা পুকুরে কিছু কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে এবং ননীর সহকর্মীরা সকলেই ডাকাতিতে লিপ্ত ছিলেন; মহারাজপুরের ডাকাতিতে ছিলেন ব'লে যোগেশ মিত্রকে সনাক্ত করানো কঠিন নয়; হলুদবাড়ি ডাকাতির মামলায় শৈলেন ও অতুল বিচারাধীন। কুর্চি গ্রামে অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, শিবপুর থেকে সেখানে প্রায়ই লোক যেত এবং শিবপুরে ননীর আখড়াতেও কুর্চির অনেকের যাতায়াত ছিল। শিবপুর এবং খিদিরপুর দলের মধ্যেও যথেষ্ট যোগ ছিল॥

(খ) **কলকাতায় যাঁরা শিবপুর শাখার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখতেন—** (৮) গণেশ দাস, (৯) শৈলেন্দ্র দাস, (১০) হরেন ব্যানার্জী।

(৮) এবং (৯) নম্বর আসামীও হলুদবাড়ি মামলায় বিচারাধীন। এঁরা তিনজনেই ননীগোপালের সঙ্গে কাজ করতেন শৈলেন্দ্র তা' স্বীকার করেছে; ললিত চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তিতেও দেখা যায় যে, এই তিনজনেই বিপ্লবী-দলের কাজে সক্রিয় ছিলেন এবং নেতড়া ডাকাতিতেও লিপ্ত ছিলেন। হরেন্দ্র মূলত ইন্দ্রনাথ নন্দীর সহকর্মী, 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর কাজেও ছিলেন। উপেন্দ্র দে'র বাড়িতে একটি তালিকা পাওয়া যায়, তাতে শৈলেন ও গণেশের নাম কর্মিরূপে চিহ্নিত ছিল। জোগাছার এক আসামীর বাড়িতে অন্য একটি তালিকা পাওয়া যায়; এটি স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়েছে কী ব্যাপক এক ষড়যন্ত্রে এই দু'জন লিপ্ত ছিলেন : গণেশ তো 'যুগান্তর' বিক্রেতাও ছিলেন এবং মাণিকতলা বোমার মামলায় প্রদর্শিত জিনিস-পত্রের মধ্যে অবিনাশ ভট্টাচার্যের যে-ডায়েরি ছিল, তাতেও গণেশের উল্লেখ মেলে।

(গ) **খিদিরপুর—**(১১) শরৎচন্দ্র মিত্র, (১২) সুরেশ মিত্র, (১৩)

সতীশ মিত্র, (১৪) নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (ধরা যায় নি এখনো), (১৫) বিমলা দেব।

ললিতের মতে এই পাঁচজনই খিদিরপুর দলের প্রধান কর্মী, অত্যন্ত সক্রিয়। (১১) নম্বর হচ্ছেন এঁদের নেতা, হলুদবাড়ি মামলার প্রদর্শিত জিনিস-পত্রের মধ্যে যে বিষের বড়ি আছে, ইনিই সেগুলো সরবরাহ করেন। (১২) নম্বর নেতড়া ডাকাতিতে অংশ নিয়েছিলেন। নরেন চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল শিবপুর, প্রতাপচক, নেতড়া প্রভৃতির ডাকাতিতে অংশ নেওয়া এবং দশম জাঠ বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগানো। উক্ত বাহিনীর সুর্জন সিং-এর সঙ্গে এবং তাঁর পরিচয়ে বিপ্লবের কাজে ইনি পাঞ্জাব পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এবং শিবপুর ও খিদিরপুরের মধ্যে যোগসূত্রও ইনিই। শরৎবাবুদের আসল বাড়ি হচ্ছে সোনারপুর।

(ঘ) **কুর্চি**—(১৬) যতীন হাজরা (রাজসাক্ষী), (১৭) শিবু হাজরা, (১৮) অতুল পাল, (১৯) দাশরথি চ্যাটার্জী, (২০) হরিপদ অধিকারী, (২১) মন্মথ রায়চৌধুরী।

এই শাখাটি সম্বন্ধে ললিত চক্রবর্তীর প্রত্যক্ষ বিশেষ জ্ঞান নেই। সে বলেছে, যদিও তার জানা ছিল যে, এঁদের মধ্যে দু'জন হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে দিয়ে এসেছিলেন নেতড়া ডাকাতিতে যোগ দিতে। অবশ্য যতীন হাজরা স্বীকার করেছে যে, কুর্চি ও তার প্রতিবেশী গ্রাম ঘোষ-ভবানীপুরে যে শাখা দু'টি আছে, তা' ননীগোপালের নেতৃত্বে শিবপুর দলেরই অধীন। প্রতাপচক, মোরহাল, কালুচরিয়া ও মাগুপুরে (২ বার) যে-ডাকাতি হয়, তার অনেকেই এখানকার লোক।

এ-কথা নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, স্থানীয় নেতা শিবু হাজরা খিদিরপুরের এমন একটি দোকানে কাজ করতেন যেখানকার সব কর্মীই গুপ্ত-সমিতির সভ্য—এঁদের কেউ কেউ মোরহাল ডাকাতি মামলায় বিচারাধীন আছেন এবং মন্মথকে সাত-বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। বর্তমান অনুসন্ধানের সময় এঁদের কেউ কেউ স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, মোরহাল ডাকাতির মূলে ছিলেন 'ছাত্রভাণ্ডার' দলের ভোলানাথ। এই ভোলানাথই যে নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (ধরা পড়েন নি)—সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। শিবু হাজরার বাড়ি তল্লাস করে একটি রিভলভার পাওয়া গিয়েছে।

(ঙ) **মজিলপুর**—(২২) রজনী ভটাচার্য, (২৩) তিনকড়ি দাস, (২৪)

ভূপেন ব্যানার্জী, (২৫) ইন্দুকিরণ চক্রবর্তী, (২৬) চুণীলাল নন্দী।

(২২), (২৩), (২৫) এবং (২৬) নম্বরের আসামীকে ললিত বিপ্লবী-সমিতির সভ্য ব'লে উল্লেখ করেছে এবং নেতড়া ডাকাতিতে এঁরা ছিলেন বলেছে। (২৩) নম্বর এঁদের নেতা এবং কেশবলাল দে'কে ইনিই হত্যা করান।* (২৬) নম্বর ছিলেন 'ছাত্রভাণ্ডার' দলের সভ্য এবং কিছুকাল ইন্দ্রনাথ নন্দীর নেতৃত্বেও কাজ করেছেন।

নেতড়া ডাকাতির সময় এঁদের সকলকেই বিশেষভাবে সন্দেহ করা হয়, কারণ এঁরা সকলেই ছিলেন মজিলপুর ইয়ংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন নামে এক স্বেচ্ছাসেবক-সমাজের সভ্য। ডাকাতির পূর্বাহ্নে এঁরা যেখানে গিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, সেখানে কিছু কাগজের চিরকুট পাওয়া যায়; এগুলো (২২) নম্বর আসামীর। তার মধ্যেই একটিতে (২২) নম্বরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মজিলপুর ইয়ংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশনের একটি বৈঠকে যোগ দেবার জন্যে। এই অনুসন্ধানের ফলে মজিলপুর ও কলকাতায় বেশ-কয়েকটি তল্লাস করা হয়। চুণীলালের ডায়েরিতে (১১) নম্বর আসামীর (শরৎ মিত্রের) ঠিকানা পাওয়া যায়। তিনকড়ি যে মাঝে মাঝে শরতের ওখানে যেতেন, তার প্রমাণও পাওয়া যায়।

একটি উল্লেযোগ্য সংবাদ: এইসব অনুসন্ধানের সময় স্পেশাল ডিপার্ট-মেন্টের ইন্সপেক্টর যোগেন মুখার্জী লক্ষ্য করে দেখেন, একটা লোক সর্বদাই তাঁর পিছু পিছু ঘুরছে; তাকে গ্রেপ্তার ক'রে দেখা যায়, সে রজনীর ভাই সত্য-কিরণ। ললিত এ'কে মজিলপুর অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য ব'লে উল্লেখ করেছে।

(চ) **নেতড়া**—(২৭) ললিত চক্রবর্তী (রাজসাক্ষী) এবং (২৮) হেম সেন (৪৬, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট)।—গ্রামবাসীদের মতে ললিতও ওইসব বন্দেমাতরম্ দল-টলের সভ্য ছিল। ২৮ নম্বরের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন অভিযোগ নেই।†

* নির্বাণস্বামী (সতীশ সরকার) বলেন, কেশব দে'কে সত্যিসত্যি হত্যা করা হয় নাই। কিন্তু ললিত যখন নাটোরে আশ্রয় নিয়ে ছিল, তখন তার ভাবচরিত্র দেখে আশঙ্কা হয়, সে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারে। তখন তাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে একটা জায়গা দেখিয়ে বলা হয়, কেশবকে মেরে সেখানে পুঁতে রাখা হয়েছে। এ থেকেই কেশব-হত্যার কাহিনী রটে।

† অথচ পুলিশ জানে না কী গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে হেমবাবু অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যতীন্দ্রনাথের কত প্রিয় সহকর্মী ইনি ছিলেন॥

(ছ) **কোদালিয়া-সোনারপুর**—(২৯) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ভবিষ্যতের এম. এন. রায়), এবং (৩০) ভূষণ মিত্র (গুলে)।

ললিত বলেছে নরেন্দ্রও নেতড়া ডাকাতিতে ছিলেন, কিন্তু ললিতের সনাক্তকরণ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। চাংড়িপোতা মামলায় নরেনকে বিচারাধীন রাখা হয়েছিল, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ওখান থেকে তাঁকে "আরো গভীরের মাছ" ব'লে পাঠিয়ে দিয়েছেন। চাংড়িপোতা কেসের থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে এর সম্পর্ক—এবং কলকাতায় তো ইনি খাস আদি 'অনুশীলন' দলের বাড়িতেই থাকতেন। ভূষণ মিত্র বয়সে তরুণ হলেও অত্যন্ত মারাত্মক কর্মী। ললিতের মতে ইনি নেতড়া ডাকাতি, এবং সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জী ও নেতড়ার কেশব দে'কে হত্যার মধ্যে ছিলেন। চাংড়িপোতা ডাকাতিতে সন্দেহভাজন হয়ে ইনি অন্তর্ধান করেন। এঁর আত্মীয় চেতলার চারু ঘোষ যাঁদের রিভলভার চালানো শেখাতে সুন্দরবনে নিয়ে যেতেন, ইনিও তাদের অন্যতম ছিলেন বোধহয়।

(জ) **কৃষ্ণনগর এবং কলকাতায় কৃষ্ণনগরের লোক**—(৩১) উকিল ললিত চট্টোপাধ্যায়, (৩২) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (৩৩) সুরেশ মজুমদার ওরফে পরাণ এবং (৩৪) নিবারণ মজুমদার।

এই চারজনের সঙ্গে ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সামসুল-আলমের হত্যার সম্পর্ক দেখিয়ে একটি রিপোর্ট ইতিপূর্বেই পেশ করা হয়েছে। রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তীর স্বীকৃতিতেই প্রথম তিনজনের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে ; উকিল ললিত চট্টোপাধ্যায় ও নিবারণের বিরুদ্ধে প্রমাণ অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ও পরাণের হাত এতে সুস্পষ্ট। বীরেন দত্তগুপ্তের বিবৃতি, ললিতের স্বীকারোক্তি এবং যতীন্দ্রনাথের ঘরে তল্লাসীর সময় গুপ্ত-সমিতি গঠনের যে-পরিকল্পনাটি পাওয়া যায়—এ-সব মিলিয়ে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ খুবই মারাত্মক। পরাণের ক্ষেত্রে অবশ্য পরাণ যে-রিভলভারটি চুরি ক'রে আনেন সেটি সম্বন্ধে আদালতের মতামতই চূড়ান্ত গণ্য হবে—এই রিভলভারটি দিয়ে সামসুলকে হত্যা করা হয়। সাক্ষ্য দ্বারা সম্ভবত একথাই প্রমাণিত হবে যে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরাণের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরাণের খাতায় যেসব ষড়যন্ত্রকারীর নাম পাওয়া গিয়াছে, তা থেকেই ললিতের স্বীকারোক্তির সত্যতা অনেকাংশে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

(ঝ) **আত্মোন্নতি সমিতি**—(৩৫) হরিদাস চক্রবর্তী, এবং (৩৬) নরেন্দ্র-

নাথ বসু।

ললিতের মতে ইন্দ্রনাথ নন্দী ও তাঁর বেশ কিছু বন্ধু ছিলেন 'আত্মোন্নতি' নামে এক বিপ্লবী সমিতির সভ্য। ৩৫ এবং ৩৬ নম্বর আসামী এই সমিতিরই সভ্য। সমিতিটি এখন উঠে গিয়েছে, এবং জামালপুরের দাঙ্গা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে জানা গিয়েছে যে নরেন বোসও এই দাঙ্গায় গিয়েছিলেন। ললিত বলেছে যে নরেন অত্যন্ত সক্রিয় এবং করিৎকর্মা সভ্য; নন্দলালকে হত্যা এবং নেতড়া ডাকাতি—দুটোতেই ইনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। জামালপুরের যে-চারজন ধরা পড়েন, তাঁরা হচ্ছেন: নরেন্দ্রনাথ বসু, বিপিন গাঙ্গুলী, ইন্দ্রনাথ নন্দী এবং শিশির ঘোষ।* আলিপুর বোমার মামলায় শিশিরবাবু সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইন্দ্রনাথ নন্দী সে-মামলায় অব্যাহতি পান। বারাণসীতে অনুসন্ধান ক'রে জানতে হবে সেখানে নরেন বসুর কার্যাবলী কি কি ছিল। †

(ঞ) ঝাউগাছা—(৩৭) উপেন্দ্র দে, (৩৮) কালীচরণ চক্রবর্তী, এবং (৩৯) পুলিন সরকার।

ললিত এবং যতীন হাজরার স্বীকারোক্তি: হলুদবাড়ি মামলায় বিচারাধীন আসামী উপেন্দ্রই ছিলেন আঞ্চলিক নেতা। এঁরা তিনজন প্রতাপচক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। উপেন্দ্রের বাড়িতে একটি নামের তালিকা পাওয়া যায় তাতে গণেশ দাস (৮ নম্বর), শৈলেন দাস (৯ নম্বর) প্রভৃতির নামও ছিল।

(ট) চেংলা—(৪০) চারু ঘোষ, এবং (৪১) কিরণ রায়। প্রত্যেক দলের ছেলেদের নিয়ে চারু সুন্দরবন অঞ্চলে, ফুলেশ্বর ও বাদার

* যশোরের কবিরাজ বিজয় রায়ের মাধ্যমে শিশির ঘোষ যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন বঙ্গভঙ্গের সময় বা তারো আগে; যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে যশোর-খুলনা অঞ্চলে ইনিই প্রথম কর্মী সংগ্রহে নামেন বোধহয়। ইনি, বীরেন, হেমেন এবং জিতেন, চার ভাই-ই যতীন্দ্রনাথের দলে ছিলেন; ছাড়া পেয়ে বীরেন ঘিয়ের দোকান করেন যশোর শহরে; যতীন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল সেখানে॥

† বারাণসীতে বিপ্লবের খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র অগ্নিযুগের সূচনা থেকেই ছিল, এবং নরেন্দ্রনাথ সেখানে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ নিয়ে যাতায়াত করতেন; একটা ব্যবসাও ফেঁদেছিলেন পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। ইতিপূর্বে Dally এবং Cleveland-এর রিপোর্টে দেখেছি, ললিত তার স্বীকারোক্তিতে বলছে, তারানাথ রায়চৌধুরী, নরেন বসু প্রভৃতি কর্মীরা অস্ত্রভর্তি এক-একটি ট্রাঙ্ক নিয়ে কৃষ্ণনগর থেকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চ'লে যান বোমার বাগান, ধরা পড়ে যাবার সময়॥

কাছাকাছি অন্যত্রও যেতেন রিভলভার চালানো শিক্ষা দিতে। ভূষণ মিত্র (৩০ নম্বর) ছিলেন এঁর সহযোগী। কিরণ রায় বর্তমানে হলুদবাড়ি মামলায় বিচারাধীন। তাঁর বাড়ি তল্লাস ক'রে বহু সাঙ্কেতিক রিপোর্ট ও পঁয়ত্রিশটা রিভলভারের কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে।

(ঠ) **বেলিয়াশিশি ও উত্তর নদীয়া**—(৪২) বিধু বিশ্বাস, (৪৩) সুশীল বিশ্বাস, (৪৪) নরেন বিশ্বাস, এবং (৪৫) মন্মথ বিশ্বাস।

ললিতের স্বীকারোক্তি: প্রথম দু'জন গুপ্ত-সমিতির সভ্য। (৪৪) নম্বরের বিরুদ্ধে প্রমাণ সামান্যই পাওয়া গিয়েছে। হলুদবাড়ি মামলায় সুশীলের সাত বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। সম্ভবত এই মামলায় সে রাজসাক্ষী দাঁড়াতে রাজী হবে। মন্মথও বোধহয়; রায়পুর বোয়ালিয়া (রাজসাহী) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মন্মথই; এটিও একটি গুপ্ত-সমিতি। পুঁটিয়ার কুমার নৃপেন রায় বলেছেন যে গণেশ দাস, মন্মথ ও বিধুকে তিনি একত্রে নাটোরে দেখেছেন।

(ড) **নাটোর-দীঘাপাতিয়া**—(৪৬) শ্রীশ সরকার, (৪৭) বিজয় চক্রবর্তী, (৪৮) সতীশ সরকার।

বিপ্লবী দলের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক শাখা আছে নাটোরে এবং উপরোক্ত তিনজন সে-শাখার পরিচালক। শ্রীশ সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ (যা ললিতের স্বীকারোক্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে)—এক স্যাকরার খাতায় দেখা যাচ্ছে কিছু সোনার গয়না তিনি বিক্রি করেছেন; ললিত বলেছিল, পাটনায় থাকাকালীন শ্রীশ ওই অলঙ্কার চুরি করেছিলেন "কাজে" লাগবে বলে। অনুসন্ধান ক'রে জানা যায় যে, পাটনায় শ্রীশ যখন গিয়ে উকিল কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন, তখন কেদারবাবুর স্ত্রীর একটি গয়না হারিয়ে যায়।

বিজয় চক্রবর্তীর দীঘাপাতিয়ার বাড়িতে চারটে রিভলভার পাওয়া যায়। ললিতের জবানের সঙ্গে এটাও মিলে যাচ্ছে।—সতীশ সরকারও দলের অত্যন্ত করিৎকর্মা একজন সভ্য; আলিপুর বোমার মামলায় এঁর বহু চিঠি আদালতে তোলা হয়। বোধহয় উপেন বাঁড়ুজ্যে, শৈলেন্দ্র বসু এবং মুরারিপুকুর বাগানের আরো অনেক কর্মীর সঙ্গে এঁর যোগ ছিল। পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস, সামসুল হত্যার সময় ইনিও বীরেন দত্তগুপ্তের সঙ্গে হাইকোর্টে যান।

"ললিতের স্বীকারোক্তি থেকে সরকারের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়েছে যে, এই মামলা কোন-একটা মাত্র ডাকাত দলের বিরুদ্ধে নয়, খোদ বিপ্লবী সংগঠনেরই বিরুদ্ধে, দেশে কর্মরত তাঁদের এক বিরাট অংশের বিরুদ্ধে,"—উক্ত সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ পাই। "ললিতের উক্তিতে কোথাও দেখা যায় না ননীগোপালকে গোটা সংগঠনের নেতা ব'লে উল্লেখ করতে ; ললিত শুধু-মাত্র দেখিয়েছে বিরাট এই সংগঠনে ননীরও ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, বা ইন্দ্র নন্দী, শরৎ ডাক্তার কিংবা অন্য-কোনও শাখার নেতাদের চাইতে উঁচুতে ননীকে কোথাও বসায় নি ললিত। গুপ্ত-সমিতির পরিচালনায় যতগুলি প্রকাশ্য অঘটন ঘটানো হয়েছে, তার অনেকগুলোতেই যে ননী অংশ গ্রহণ করেছেন সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ ; এর থেকে বোঝা যায় তাঁর কর্মক্ষমতা ও সংগঠন-নৈপুণ্য কতখানি ছিল, এবং সংগঠনের এই শাখাটি তাঁর নেতৃত্বে কত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল—কী অস্ত্রে-শস্ত্রে, কী বিশ্বস্ত কর্মীতে।

"ললিতের স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ননীগোপালেরও মাথার ওপর একজন বা একাধিক নেতা আছেন, এবং বিভিন্ন শাখাগুলি পরস্পর মুখাপেক্ষী না হ'য়েও সমবায় প্রণালীতে পরস্পরের সহায়তা ক'রে কাজ ক'রে চলেছেন। এই বিপ্লব-সংগঠনের প্রকৃত নেতাদের মূলে কুঠারাঘাত করা—একমাত্র অরবিন্দ ঘোষের ক্ষেত্রে ছাড়া—আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব মনে হয়েছে বরাবর। এবং এ-ক্ষেত্রে আমরা বলতে বাধ্য হ'ব যে, অনেককাল আগেই যদি ব্যারিস্টার পি. মিত্র, রজত রায়* এবং সখারাম গণেশ দেউস্করকে গ্রেপ্তার করা হ'ত, তবে অবস্থা আজ এতটা সঙ্গীন হ'তে পারত না।"...

উপরোক্ত দলগুলি ছাড়াও অভিযুক্তদের মধ্যে 'যুগান্তর', 'ছাত্রভাণ্ডার', খানাকুল-কৃষ্ণনগর, মুরারিপুকুর বাগান প্রভৃতি শাখার সভ্যরাও আছেন। সাক্ষী শৈলেন দাসের মতে কাঁথি, বাঁকুড়া, ব্যারাকপুর, বারাণসী প্রভৃতি বহু জায়গায়ই এঁদের শাখা আছে। এ মামলার অভিযুক্তদের তালিকা সম্পূর্ণ হ'বে না রায়তা ডাকাতির অভিযোগে ধৃত আসামীদের নাম না করলে।

* সরকারের চোখে রজত রায় যে যতীন্দ্রনাথেরই Duplicate অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কার্যাবলীর জন্যে তাঁরা রজত রায়কে দায়ী মনে করতেন—একথা আগেই বলা হয়েছে।

সুশীল বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় এঁদের নাম :

(৪৯) প্রকৃতি মজুমদার, (৫০) কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, (৫১) রমাপদ মুখার্জী, (৫২) বিভূতিভূষণ মুখার্জী, (৫৩) ভূপেন্দ্র রায়চৌধুরী, (৫৪) শান্তিপদ মুখার্জী, (৫৫) সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (ধরা পড়েন নি)। সুশীলের স্বীকারোক্তিতে দেখি (৫১) নম্বরের নেতৃত্বে এঁদের কেউ কেউ রায়তা ডাকাতির ঠিক আগেই সেখানে গিয়েছিলেন, বায়োস্কোপ এবং ম্যাজিক লণ্ঠন দেখেছিলেন।

ভূপেন্দ্র রায়চৌধুরীর ডায়েরিতে, তিনি, রমাপদ, বিধু (৪২) এবং মন্মথ (৪৫) যে-শপথ গ্রহণ করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে। ভূপেন্দ্রের বাড়িতে বহু কার্তুজ, কার্তুজ ভরবার যন্ত্র, বুলেট বানানোর সীসে প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁর ডায়েরিতে রিভলভারেরও উল্লেখ আছে।...শান্তিপদ মুখার্জী এবং সতীশ দাশগুপ্ত—দু'জনেই 'কুখ্যাত' অনুশীলন সমিতির সভ্য।* সুশীলের জবানে দেখা যায়—এঁরা ক'জন একটা নৌকোয় বাস করতেন সমিতির অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে, এবং এই নৌকোয় ক'রেই তাঁরা ডাকাতি করতে আসেন। সরকারের বিশ্বাস, বাহ্রা ডাকাতির পরেই অনুশীলনের এই সভ্য দু'জন রাজসাহী গিয়ে গা-ঢাকা দেন এবং সেখানকার রামপুর-বোয়ালিয়া শান্তি-সমিতির সভ্যদের সঙ্গে মিলেও ডাকাতি করেন।...

শান্তিপদ কিছুদিন নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সন্ন্যাসীর বেশেও ঘুরে বেড়িয়েছেন বলে প্রকাশ।

ছাত্রভাণ্ডার দল—(৫৬) পবিত্র দত্ত, (৫৭) রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫৮) প্রভাসচন্দ্র দে, (৫৯) অন্নদা রায়, (৬০) শরৎচন্দ্র খান। (৫৬ নম্বর) অর্থাৎ পবিত্র দত্ত অত্যন্ত করিৎকর্মা সভ্য এবং ছাত্রভাণ্ডারের সম্পাদক। বৈপ্লবিক প্রচারের কাজে ছাত্রভাণ্ডারের অবদান অসামান্য—এঁদের অনেকেই 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যোগ রাখতেন। মোরহাল মামলার এক আসামী বলেছেন যে উক্ত ডাকাতির প্ররোচক ভোলানাথ (ওরফে নরেন চ্যাটার্জী) ছাত্রভাণ্ডারেরই সভ্য। তারানাথ রায়চৌধুরীর স্বীকারোক্তিতে জানা যায় পবিত্র দত্তই তাঁকে 'ছাত্রভাণ্ডার' থেকে কয়েকটি রিভলভার দেন—৪, রাজা লেনে এগুলো ধরা পড়ে। শহীদ সত্যেন বসুর সঙ্গেও পবিত্র দত্তের সংযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।†

* স্মরণে রাখতে হ'বে, সরকারি রিপোর্টের ভাষা এগুলি॥

† এই সম্পর্কটা পবিত্র দত্তের সঙ্গে শুধুমাত্র নয়; প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রনাথেরই সঙ্গে ছিল।

১৯০৮ সালে, (৫৭) নম্বরের আসামী অন্নদাচরণ রায়ের ২০২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়ি তল্লাসী হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রাদি সেখানে ধরা পড়ে। একটি চিঠিতে কার্ত্তিক দত্ত (বিঘাতি ডাকাতির মামলায় ছ' বছরের কারা-দণ্ডে দণ্ডিত) তাঁকে লিখেছিলেন যে পাবনার কাজ খুব ভালই এগিয়ে চলেছে, একটি "ঠাকুর" (রিভলভার) পঁয়তাল্লিশ টাকায় সংগ্রহ হয়েছে, এবং দরকার হ'লে "যুগান্তর" পত্রিকার জন্যে নতুন একজন প্রিণ্টার সংগ্রহ করা যায়। অন্যান্য চিঠির মধ্যে "কুখ্যাত" মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর* কিছু চিঠিও পাওয়া যায়—তার মধ্যে দুটিতে পলাতক চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর উল্লেখ আছে, এবং একটিতে দেখা যায় অবিনাশবাবু একটি পরিচয়-পত্র দিয়ে জনৈক উকিলকে নারায়ণগঞ্জ থেকে কলকাতা পাঠাচ্ছেন, অন্নদাবাবুকে নির্দেশ দিয়েছেন উকিলটিকে 'নিজেদের লোক' মনে করতে এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিতে। সেইসঙ্গে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর রচনাবলীর একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপিও উদ্ধার করা গিয়েছে। চিঠিগুলোতে অনেক-বারই রহস্যজনক সব উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্নদা রায় ছিলেন 'সাধনা প্রেস' (যুগান্তর)-এর অন্যতম ডাইরেক্টর—অন্য ডাইরেক্টরদের মধ্যে বারীন ঘোষ এবং ইন্দ্রনাথ নন্দীও ছিলেন।

৬০ নম্বর আসামী শরৎচন্দ্র খান ছিলেন 'ছাত্রভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর এবং শেয়ারহোল্ডার। গোড়া থেকেই ইনি 'যুগান্তর' পত্রিকার সহায় ছিলেন।

'যুগান্তর'দল—(৬১) কার্তিকচন্দ্র দত্ত এবং (৬২) তারানাথ রায়চৌধুরী।

বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের মামলা পরিচালনা করতে গেলে প্রথম অপরিহার্য কাজ হ'ল এই 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে অন্য শাখাগুলোর সম্পর্ক আবিষ্কার করা। বিঘাতি মামলায় কার্তিক ইতিপূর্বেই দণ্ডিত (এই ডাকাতির জন্য হাওড়া থেকে কেশব দে তিনজনকে নিয়ে এসেছিলেন)। উকিল ললিত চাটুজ্যো নদীয়াতে রাজদ্রোহ প্রচারের প্রধান কারণ; এবং

পবিত্র দত্ত বলেন: আমি ছিলাম পোস্টাপিস মাত্র; যতীন মুখার্জী, অমর চ্যাটার্জী, নিখিল রায়-মৌলিক, মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অন্নদা রায় (কবিরাজ)—এঁদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের কেন্দ্রস্থল তখন আমার ওখানটা॥

* আমাদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় ইনি; সরকারের কাছে ছিলেন না॥

† ইনিও, রজত রায়ের মতই, যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতেন॥

ললিত চাটুজ্যের সঙ্গে কার্তিক দত্তের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করা যায়। শান্তিপুরের পাদরিকে আক্রমণ করবার অপরাধে কার্তিক যখন ছয় মাস কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করেন, ললিতবাবু কার্তিকের সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। অবিনাশ ভট্টাচার্যকে লেখা ললিতবাবুর একটি চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ এবং বারীনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৬২ নম্বর (তারানাথ) এতদিন পলাতক ছিলেন ; রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তির ফলে এঁকে কাশীতে গ্রেপ্তার করা হয়। 'ছাত্র-ভাণ্ডার' এবং 'যুগান্তর'-এর সঙ্গে এঁর যোগ ছিল।

৬৩ নম্বর—শিশিরকুমার ঘোষ জামালপুরে ইন্দ্র নন্দী প্রভৃতির সঙ্গে ধরা পড়েন। ষড়যন্ত্রের অন্যান্য সবারই সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর—(৬৪) বিহারীলাল রায়, এখনো ধরা পড়েন নি ; ইনি এবং নরেন গাঙ্গুলী ছিলেন এই ছোট্ট শাখার প্রধান কর্মী ; 'আর্য কেমিকাল ওয়ার্কস'-এর সঙ্গে এঁদের যোগ ছিল—নিবারণ মজুমদার (৩৩ নং) এবং সুরেশ মজুমদার (৩৪ নং) প্রভৃতির সঙ্গেও।

(৬৫ নম্বর) হারাধন ব্যানার্জী, শিবপুরের বাসিন্দা, ননীগোপালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খুবই সম্ভব যে কৃষ্ণনগরের কাছে মহারাজপুরের ডাকাতিটা (গেল বছর জুন মাসে) কৃষ্ণনগর সমিতিরই সাহায্যে করা হয়। গণেন (জ্ঞানেন ?) বিশ্বাসকে পুলিশ সন্দেহ করে ; শৈলেন্দ্র দাসের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় ইনিও দলের সভ্য ছিলেন।

(৬৬) নম্বর—জ্ঞানেন্দ্র (?) দাসের নদীয়া ও কলকাতার বাড়ি তল্লাসী করা দরকার।

এইসব তথ্য থেকে আমরা বুঝছি যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, যশোর, খুলনা এবং মিছরিবাবুর* দল ও অনুশীলন সমিতি ছাড়া—বিপ্লবী সংগঠনের অন্যান্য সবকটি প্রধান শাখার ওপরেই মোক্ষম আঘাত দিয়েছে এই মামলাটি।...অনুশীলন সমিতি তো উঠে যাবার মতই ছিল।...আলাদা আলাদা ক'রে যশোর এবং খুলনা জেলায় তল্লাস করতে হ'বে ; ললিতের উক্তিতে জানা যাচ্ছে যে, যশোরের কর্মীরা অন্যান্য আর-সব শাখার সঙ্গে সহযোগ ক'রে চলেছে।...খোঁজ ক'রে দেখতে হ'বে বারাণসীতে এঁদের সত্যিই কোন শাখা আছে কিনা ; হয়তো গা-ঢাকা দেবার আশ্রয় এবং

* মিছরিবাবুর দল বলতে কোনও দল ছিল না ; আগে এ-কথা লিখেছি॥

পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও বৈঠকের স্থান আছে ওখানে।

বাঁকুড়ার রামদাস চক্রবর্তীকে দণ্ডিত করবার স্বপক্ষে আমাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শৈলেন্দ্র দাসের স্বীকারোক্তিতে সবচেয়ে বড় কথা যা পাওয়া যাচ্ছে, সেটা হ'ল—হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ লাইফ্ ইন্শোরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে তার লিখিত অভিযোগ: এ-কোম্পানী বিপ্লব আন্দোলনেরই অংশ মাত্র; বিপ্লবের কাজে যাঁরা নেমেছেন—তাঁদেরই ভরণপোষণের জন্যে এটি একটি কেন্দ্র-বিশেষ।

প্রধান বিচাপতি স্যার লরেন্স জেনকিন্সের রায় থেকে দেখা যায় যে দশম জাঠ রেজিমেণ্টের বিরুদ্ধে সরকারের প্রধান অভিযোগ—উক্ত রেজিমেণ্টের সুর্জন সিং এবং রামগোপাল ভুবন মুখার্জীর শিবপুরের বাড়িতে যেত এবং সেখানেই দীক্ষা নিয়ে দলের সভ্য হয়। দ্বিতীয় অভিযোগ: সুর্জন সিংকে নরেন চ্যাটার্জী একবার এবং ললিত দু'বার টাকা দেন। তৃতীয় অভিযোগ: জাঠ রেজিমেণ্টের এই দু'জন অনবরত নরেন চ্যাটার্জীর সঙ্গে যোগ রাখত এবং শরৎ মিত্রের বাড়িতেও যাতায়াত করত; ননীগোপালের বিরুদ্ধে এমন-কোন প্রমাণ নেই।......জাঠ সাক্ষীদের জবানে বলা হয়েছে ওরা শিবপুর ডাকাতির আগে এবং পরেও ৮৬।১, ডায়মণ্ডহারবার রোড শরৎ মিত্রের ডিস্পেন্সারিতে যাতায়াত করত।...

১৩১৬ সালের ১১ই মাঘে সাপ্তাহিক 'ধর্ম' লিখল, "সেদিন 'ইংলিশম্যান' সংবাদপত্রিকা-স্তম্ভে একটি ভীষণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—ইহপ্রবর লিখিয়াছেন যে আলিপুরে যে ১০ম জাট সৈন্যদল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বিপ্লব-কারিগণ তাহাদের মধ্যে বিপ্লব ও বিদ্রোহের বীজ ছড়াইতে চেষ্টা করিতেছিল।...উক্ত সৈন্যদলের দশজন সৈনিকের গ্রেপ্তার করিয়ে জেলে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে বিশেষ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, শীঘ্রই এ-বিষয়ে অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। সহযোগী আরও লিখিয়াছেন যে, উক্ত সৈন্যদলকে শীঘ্রই কলিকাতা হইতে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হইবে কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে, তাহাদিগকে আরও তিন বৎসর এখানেই রাখা হইবে। সৈনিক-কর্তৃপক্ষগণ নাকি প্রকাশ করিয়াছেন যে, কিছুদিন হইল দেশীয় সৈন্য-দল মাত্রকেই এইরূপ কুপথে চালিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু কোথাও তাহা সফল হয় নাই। বর্তমানক্ষেত্রে কেবল কয়েকজনের ব্যবহার

সন্দেহজনক বোধ হইয়াছিল, তাই তাহাদিগের সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদি চলিতেছে। কর্তৃপক্ষ আরও বলিতেছেন যে, সৈনিকদল যে বিদ্রোহী হইবে এমন কোন আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ দলের সহিত পূর্বে আরও কয়েকজন বাঙালী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়।···অনুসন্ধান এখনও চলিতেছে, ফল শীঘ্রই নাকি প্রকাশিত করা হইবে।"

পরের সপ্তাহে 'ধর্ম' লেখে, ···"সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উক্ত সৈন্যদলকে আর তথায় (আলিপুরে) রাখা হইবে না। এই ব্যাপারের পরেও তাহাদিগের অবস্থিতিকাল যে বেশি করিয়া দেওয়ার কথা শুনা গিয়াছিল তাহা মিথ্যা। এই সৈন্যদলকে ১লা ফেব্রুয়ারী খিদিরপুরে ডক হইতে করাচী লইয়া যাওয়া হইবে। হাইদরাবাদে ইহাদের কার্যভার দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে আলিপুরে যে যুবকটিকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহার সম্পর্কে অনুসন্ধানাদি চলিতেছে।"

পরের সপ্তাহে 'ধর্ম' লিখল, "···সেনাদলের যে দশজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আটজনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু চুণী হাবিলদার ও সুর্জন সিংহাজীর এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ড আদেশ হইয়াছে। উক্ত সৈন্যদলকে আলিপুর হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

"রিচুসিং নামক জনৈক পশ্চিমদেশীয় যুবককে আলিপুরের মেজিস্ট্রেট মিঃ বম্পাসের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে—অভিযোগ এই যে, প্রকাশ্যভাবে জীবনধারণ করিবার কোন উপায় তাহার কর্তৃক প্রদর্শিত হয় নাই। এই যুবকটিই আলিপুরে জাট সৈন্যদলের সন্নিকটে অতি সন্দেহযুক্তভাবে চলাফিরা করিতেছিল। পুলিশের অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই; তাহার হাজত-বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।"

জাঠ-সৈন্যদলের সঙ্গে এবং অন্যান্য দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে বিপ্লবীরা যে যোগস্থাপন করেছিলেন, তার বিবরণ যথাসময়ে উদ্ধৃত করব কলকাতায় তদানীন্তন জার্মান কন্‌সাল কাউন্ট টুর্ন (Thurn) জার্মানীতে কাউন্ট ব্যার্থটোল্‌ড্-এর কাছে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন বাংলা-দেশের বিপ্লব আন্দোলনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে—সেই রিপোর্টটি থেকে।

১৯১০ সালের ৯ই মে তারিখে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-বিভাগের ডিরেক্টার সি আর ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবের মেমো-তে লেখা আছে : (১) পুলিশ যেসব তথ্য পুঞ্জীভূত ক'রে এনেছে, সেগুলো সাজিয়ে বিরাট এক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে

"হাওড়া-শিবপুর মামলা" শুরু হ'য়ে গিয়েছে। (২) এঁদের সবাইকে নির্বাসিত* ক'রে দেবার যে-প্রস্তাব করা হ'য়েছিল তা' নামঞ্জুর হ'য়ে গিয়েছে। গভর্নমেণ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যথাসম্ভব আইনসিদ্ধ উপায়েই মামলা রুজু ক'রে এঁদের অপরাধ প্রমাণ করতে হ'বে। এই মামলার ফলাফল যাই হ'ক—দীর্ঘকাল যাবৎ এতগুলি কিশোর, তরুণ ও যুবককে অবরুদ্ধ রাখার ফলে দেশে প্রকাশ্য আন্দোলনের ঝাঁজ অনেক স্তিমিত হ'য়ে এসেছে।—

সরকারি তরফ থেকে এই সংবাদও কম সান্ত্বনাদায়ক নয়। দেশের "অরাজকতা" তাঁদের সত্যিই চিন্তাকুল ক'রে তুলেছিল। এবং তার পশ্চাতে, ধৃত বিচারাধীন যুবকদের সবাই না-হলেও কিছু যে দায়ী—এ-ধারণাও সরকারের স্পষ্টত দৃঢ়মূল হ'য়ে উঠল॥

॥ ছয় ॥

ভারতবর্ষের কারাগারগুলির শোচনীয় দুর্ব্যবস্থা চরমে পৌঁছেছিল নরেন গোঁসাইকে কারাগারে হত্যা করবার পর। অমানুষিক নৃশংসতা, খাদ্যের নামে মনুষ্যেতর জীবেরও অরুচির খোরাক, মুক্ত আলো-হাওয়ার অভাব—দুর্বিষহ ক'রে তুলল রাজনৈতিক কারণে বিচারাধীন এই বিপ্লবীদের জীবন। শ্রীঅরবিন্দ-বর্ণিত 'কারাকাহিনী' প'ড়ে যাঁরা আঁৎকে ওঠেন কারাজীবনের জঘন্য চিত্র দেখে, তাঁদের পক্ষে অনুমান করা কঠিন হবে না তার পরবর্তী পর্বে—যতীন্দ্রনাথ প্রমুখের কারাজীবনে, কী ভীষণ রূপ পরিগ্রহ ক'রে থাকবেন কারা-কর্তৃপক্ষ।

বাহ্যিক এই অত্যাচার যত প্রবল হ'য়ে উঠল, ততই নিজেকে অন্তর্মুখী ক'রে তুললেন যতীন্দ্রনাথ। সাধক-বিপ্লবীর এই নির্জন-বাস নতুন এক উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

বীরেন দত্তগুপ্তের স্বীকারোক্তির ফলে দিনকতক যতীন্দ্রনাথকে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হ'ল। বীরেনের ফাঁসী হ'য়ে গেলে ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে যতীন্দ্রনাথকে স্থানান্তরিত করা হ'ল। এই জেলেরই

* 'নির্বাসিত' অর্থাৎ "Deportation Under Regulation III of 1818"—সরকারি ভাষায়॥

ক্ষুদ্র একটি সেল্-এ দীর্ঘ চোদ্দটি মাস অম্লানবদনে কাটালেন যতীন্দ্রনাথ।

যতীন্দ্রনাথের ছোটমামা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "যতীন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুত্র সকলকে ছাড়িয়া জেলের এই কঠোরতার মধ্যে বেশ নিশ্চিন্তচিত্তে বাস করিতে পারিতেন ও তাহাই করিয়াছিলেন—কোনওদিন তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ভগবানের উপর তাঁহার অসীম নির্ভর ও বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি তাহা পারিয়াছিলেন।"

নিজের প্রসঙ্গে ললিতবাবু বলেছেন, তাঁহার (যতীন্দ্রনাথের) ছোট-মামার মনে তেমন বল ও নির্ভরতা ছিল না। একদিন রাত্রে তিনি চিন্তায় ও দুঃখে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন এবং নিরূপায়ভাবে সেল্-এর মধ্যে জাগ্রত অবস্থায় বসিয়াছিলেন।" যে-ছয় মাস তিনি কারাগারে ছিলেন অসহ্য ক্লেশজনক এই পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি মানিয়ে নিতে পারেন নি। নিজেই তিনি লিখেছেন যে, জেলে থাকতে তাঁর চোদ্দ সের ওজন কমে গিয়েছিল। জেল-পরিদর্শক মিঃ মেটাকে একদিন জেলের জঘন্য খাওয়া সম্বন্ধে তিনি জানালে প্রত্যুত্তরে মেটা প্রতিকার করা দূরে থাক, জানালেন, "You eat the same food outside !'*

নীরব এই তামস-তপস্যার প্রতিটি মুহূর্তে যতীন্দ্রনাথ অন্তরে অনুভব করেন দিব্য এক প্রেরণার নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি। আনন্দে, উদ্দীপনায় সেই উপস্থিতি সমুজ্জ্বল।

দিনে দিনে যতীন্দ্রনাথের দেহের ওজন যায় বেড়ে।

কারাগারের দরজা একদিন অসময়ে খুলে যায়।

জেলার-সাহেব প্রবেশ করেন। স্মিত অভিবাদনের অভাব নেই। তারপর জেলার-সাহেব তাঁর অভিসন্ধি ব্যক্ত করেন, "মিঃ মুকার্জি, আপনার কোনও ছবি আমাদের রেকর্ডে নেই।"

"কী করতে পারি ?" সকৌতুক প্রশ্ন।

"ওপরওয়ালার নির্দেশ, আপনার একটি ছবি তুলতেই হবে। আপনার আপত্তি নেই আশা করি ?" সবিনয়ে উদ্ভাসিত সাহেবের মুখ।

"আমার ছবি তুলবেন ?" দু-তিন সেকেণ্ড কি ভেবে যতীন্দ্রনাথ জবাব দেন, "বেশ তো, তুলুন না। কখন নেবেন ?"

---

* সম্ভ্রান্ত এই জমিদার-পরিবারের বর্ণনা ললিতবাবুর 'পারিবারিক কথা', 'দুর্গোৎসব' প্রভৃতি গ্রন্থে যাঁরা পড়েছেন, তাদের পক্ষে মেটার এই উক্তিতে ক্রোধ সম্বরণ করা কঠিন হতে পারে॥

তারপর রসসিদ্ধ সহজাত হাসিতে ভাস্বর হ'য়ে ওঠে তাঁর মুখ, "তবে আপনাদের এই মহামূল্য অতিথির পোশাকে নিশ্চয়ই ছবি তুলতে বাধ্য নই আমি? আমার নিজস্ব পোশাক পাই যদি তবেই রাজী।"

"সে তো বটেই, মুকার্জী!" জেলার-সাহেব উৎফুল্লচিত্তে ব'লে ওঠেন। যতীন্দ্রনাথকে রাজী হতে দেখে তিনি যান ফটোগ্রাফারের সন্ধানে।

যথাসময়ে ফটোগ্রাফার আসেন।

যতীন্দ্রনাথের কোট জমা ছিল জেল অফিসে, তা আনা হ'ল আর আনা হ'ল যতীন্দ্রনাথের প্রিয় ডোরাকাটা চাদরটি—পছন্দ ক'রে দার্জিলিঙে কিনে-ছিলেন এটি।

জেলার-সাহেবের অনুরোধে যতীন্দ্রনাথ এসে বসলেন ক্যামেরার সামনে ধ্যানদৃষ্টি মেলে।

ফটোগ্রাফারের বিস্ময়ের সীমা থাকে না—যেন আর-এক জগতের মানুষ এসে বসেছেন তার সামনে, যেন পুঞ্জীভূত শুদ্ধতার আর তেজের মূর্ত এক বিগ্রহ। কোথায় বা ক্যামেরা?...কোথায় ফটোগ্রাফার?...কোথায় জেল? কোথায় জেলার?—উধাও উদাস দৃষ্টিতে যতীন্দ্রনাথ যেন এক হ'য়ে যান দূর আকাশটার সঙ্গে।

দূর আকাশের প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আর-একটা দিনের কথা। সেদিনের তরুণতম বিপ্লবী ভূপেন দত্ত লিখেছিলেন, "আর একদিনের কথা মনে পড়ে। যতীনদা বসেছেন উদার আকাশের নিচে, দৌলৎপুর কলেজ হোস্টেলের দোতলার খোলা বারান্দায়। গভীর রাত। আমি একলা ওঁর দিকে চেয়ে বসে। যতীনদার ঐ মুখখানা, ঐ চোখদুটো, ঐ বুকখানার সঙ্গে ঐ আকাশখানার কোথায় যেন যোগ আছে, কোথায় যেন মিল আছে। আকাশের রবিকে রবীন্দ্রনাথ মিতা ব'লে ডেকেছেন, ঐ আকাশখানাও যেন যতীন্দ্রনাথের মিতা।...চোখ নামিয়ে বললেন, 'প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই—একে একে মরে দেশকে জাগিয়ে গেছে। এখন আর একে একে নয়, আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধ ক'রে মরে দেশকে জাগাব।'...বার বছর বয়সে মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত প'ড়ে রঘুনাথজী হাবিলদারকে করেছিলাম জীবনের আদর্শ।—ভোরের দিকে যতীনদা চলে গেলেন। রাস্তায় তুলে দিয়ে ফিরতে ফিরতে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, রঘুনাথজীর মতোই তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারব তো? যুদ্ধে ম'রে জীবন সার্থক করতে পারব তো?"

এ আরো বছর-চারেক পরের কথা।

দিদি বিনোদবালা দেবীর চিঠি আসে। দিদির মনে বুঝি জাগে উৎকণ্ঠা; একমাত্র ভাইয়ের কারাবাস বুকে বুঝি শেল হ'য়ে বাজে—যে-বীরকে অন্য-কোনও জাতি হ'লে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত ক'রে পূজা করত, স্বদেশেরই কারাগারে তিনি অবরুদ্ধ, বিদেশী শাসকের আদালতে বিচারাধীন!

ঘরে নীরব প্রতীক্ষায় দিন গোণেন সহধর্মিণী ইন্দুবালা। কন্যা আশালতা আর পুত্র তেজেন্দ্রনাথকে দিনের শেষে কোলে তুলে নিয়ে শোনান তাদের বীর পিতার কাহিনী।

যতীন্দ্রনাথের স্মরণে কি উদিত হয় না এঁদের মুখগুলি? যতীন্দ্রনাথের চিত্তে কি বিন্দুমাত্র চিন্তা জাগে না এঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। যতীন্দ্রনাথের কি কর্তব্য নেই এঁদের প্রতি—যতই তিনি বলুন না কেন 'বিশ্বসংসারই আমার সংসার'?

শ্রীঅরবিন্দ একবার লিখেছিলেন, "এমন অনেকে আছেন যাঁরা স্বতঃসিদ্ধ-রূপেই অতিমানব, মহান মহান আত্মা তাঁরা মানবদেহের অন্তরালে। তাঁরা বিশ্বপ্রকৃতিরই অভিব্যক্তি, একটি উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্যে আহূত ঐশীভাবের পরিচালনায় দিব্যশক্তিরই অভিব্যক্তি, সেই ঐশীভাব পরম সর্বশক্তিময়ের প্রতিনিধি, যিনি মানুষের ক্ষমতা ও দুর্বলতা বরণ ক'রে নিয়েও তাদের বাঁধনে ধরা পড়েন না। তাঁরা ন্যায়-অন্যায়ের ঊর্ধ্বে* এবং সচরাচর বিবেক-বিহীন, আপন প্রকৃতিরই নিয়মে চলেন তাঁরা। কারণ তাঁরা তো পশু থেকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্যে নিম্নপ্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে যুঝতে এগিয়ে চলেন না, তাঁরা নিজেদের অন্তরেই সিদ্ধিলাভ ক'রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পুণ্যতম যাঁরা, তাঁরাও সাধারণ রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন এবং সহজেই বিনা অনুতাপে সে সবের পাশ ছিন্ন করেন, যেমন একাধিক ক্ষেত্রে খৃস্ট করেছিলেন—সুরা পান ক'রে, স্যাবাথ্‌ অমান্য ক'রে, সরাইওলা ও গণিকাদের সঙ্গ করে; যেমন করেছিলেন বুদ্ধ—পতির, নাগরিকের এবং পিতার যে স্বেচ্ছায় গৃহীত দায়িত্ব তাঁর ছিল, সেগুলি পরিত্যাগ ক'রে; যেমন শঙ্কর করেছিলেন যখন তিনি পবিত্র ধর্ম অমান্য করেন, মৃতা জননীর তৃপ্তির জন্যে সংস্কার ও আচারের গায়েও

* লোকমান্য তিলকও বলেছিলেন, "Great people are above the principles of common morality."

পদাঘাত করতে তিনি কসুর করেন নি।...”

এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি পাই যতীন্দ্রনাথের অপূর্ব একটি জীবন-চরিতে, “স্বার্থ কখনও যতীন্দ্রনাথের অন্তর স্পর্শও করিতে পারে নাই, অকপট স্বদেশ-প্রেম ও প্রাণে বিশাল উদারতা লইয়া তিনি সর্বজন-হিতসাধনে ব্রতী ছিলেন; বহুল-গুণসম্পন্না স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা সকল ছাড়িয়া স্বদেশের জন্য এককথায় যিনি এমন করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন—তাহাতেই দেখা যায় যতীন্দ্রনাথ কত-বড় আসক্তিশূন্য বীর এবং কর্মী ছিলেন। জগতের মহাপুরুষগণের সহিত তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের তুলনা করিয়া বলিলে ইহা অত্যুক্তি হইবে না যে, যতীন্দ্রনাথ বুদ্ধ চৈতন্যের ন্যায় স্বীয় অন্তরের মন্ত্র-সাধনার জন্য স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মহাসন্ন্যাস লইয়া সংসারের বাহিরে অবাধে যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।”

দিদি বিনোদবালা শুধুমাত্র যতীন্দ্রনাথের সহোদরা অগ্রজই নন। তিনি যতীন্দ্রনাথের জীবনে গুরুসমান শ্রদ্ধাস্পদ, সখাসমান প্রিয়, মাতৃসমান প্রেরণাদাত্রী, তিনি যতীন্দ্রনাথের গুরুভগ্নী, তিনি যতীন্দ্রনাথের অসাধারণ জীবন-পথেরই পথিক, সহযাত্রিণী, যতীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বৈব কর্মধারার সাক্ষী, দেশের কাজেও যতীন্দ্রনাথ তাঁর পরামর্শই শিরোধার্য জ্ঞান ক'রে এসেছেন।

২০শে অগাস্ট। ১৯১০ সাল।

দিদি বিনোদবালাকে চিঠি লিখতে বসলেন যতীন্দ্রনাথ নির্জন কারা-প্রকোষ্ঠের অন্তরালে। সেই পত্রের প্রতিটি বাক্য, প্রত্যেক ছত্র টইটম্বুর হ'য়ে ওঠে মহান সন্ন্যাসীর অন্তরের অনাবিল উৎসাহের বাণীতে, যে-বাণীর উদাত্ত নির্ভরতায় দূর হয়ে যায় সমস্ত অবসাদ, সব নিরাশা। যতীন্দ্রনাথ লিখলেন:

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আপনার স্নেহাশীর্বাদী পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম এবং সকলেই শারীরিক কুশলে আছেন জানিয়া সুখী হইলাম।—খোকাদের লইয়া সর্বদা সাবধানে থাকিবেন। আমি আর সে বিষয়ে আপনাকে কি লিখিব?—আমার জন্য বিশেষ কোন চিন্তা করিবেন না—আমি শারীরিক ভাল আছি। মেজমামাকে* মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিব; তিনিই আপনাদিগকে আমার সংবাদ লিখিবেন। কতদিনে মোকদ্দমা

* শোভাবাজারের বিখ্যাত ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

উঠিবে এখনও জানিতে পারি নাই।—যাহা হউক সেই সর্বমঙ্গলময় পরম পিতার চরণের দিকে চাহিয়া আছি।—তিনি যে বিধান করেন, তাহাই তাঁহার আশীষ বলিয়া গ্রহণ করিব। তিনি আমাদের অমঙ্গলের জন্য কখনই কিছু করেন না। আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয়, তাহারও পশ্চাতে কোন মহদুদ্দেশ্য নিহিত থাকে যাহা ভ্রান্ত আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া প্রাণে বল ধরিয়া সময় প্রতীক্ষা করুন—অবশ্য নির্দোষীকে তিনি বিপন্মুক্ত করিবেন যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম ও আশীষ দিবেন। ইতি—

প্রণত সেবক জ্যোতি।

১৯১১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী।

'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা'য় কোনমতেই যতীন্দ্রনাথকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারল না সরকার-পক্ষ। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও প্রমাণ করা গেল না। তাই—দীর্ঘ বৎসরাধিক কালের দুর্বিষহ কারাবাসের পর যতীন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করলেন।

যতীন্দ্রনাথের শিষ্যেরাও সকলেই ছাড়া পেলেন।

জেল থেকে বেরিয়ে এসে যতীন্দ্রনাথ দেখলেন—দেশের কতক স্থানে আত্মত্যাগের মহান্ আদর্শ-বহ্নি, সেই উদার উচ্চ জীবনাদর্শের তীব্র এষণা নিভে এসেছে, ঝিমিয়ে পড়েছে। তার পরিবর্তে বিপ্লবীদের মধ্যে এসে পড়েছে কিছু যেন দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা, সঙ্কীর্ণতা।

যতীন্দ্রনাথ নতুন ক'রে আমন্ত্রণ জানালেন যখন, সাড়া দিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নেতারা, যাঁরা পূর্ব আদর্শের ধুনি জ্বালিয়ে দিন গুণছিলেন মহানায়কের প্রত্যাবর্তনের।

বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (সতীশ মুখার্জী), ময়মনসিংহের হেমেন্দ্র-কিশোর আচার্যচৌধুরী, ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস, স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী শশিভূষণ রায়চৌধুরীর আদর্শে গড়া খুলনার কয়েকজন কিশোর ও যুবক নেতা, উত্তর-বাংলার নেতা যতীন রায় (বগুড়া) প্রমুখ এগিয়ে এসে মিলিত হলেন যতীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে—তাঁদের নিজ নিজ সংগঠনের সমস্ত শক্তি ও সহ-যোগিতায় বলীয়ান হ'য়ে নতুন আশায় বুক বেঁধে।

আর সাড়া দিলেন চন্দননগরের মতিলাল রায় প্রমুখ বিপ্লবী সংগঠকেরা;

শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় পরিচালিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল এঁদের। রাসবিহারী বসু, শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতি এঁদের অন্যতম।

কণ্টিপদার মণি চক্রবর্তী লিখেছেন, "ইংরেজেরা বলিত, যতীন হিপ্‌নটাইজ করিতে জানে। তাঁহার সহিত একবার যে যুবকের আলাপ হইয়াছে, সে-ই তাঁহার অমিত প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।"—এই সহজাত স্বভাব-মাধুর্য, নির্মল প্রেমের অবিমিশ্র সুধা-স্বাদ তাঁর ব্যক্তিত্বে এমনই প্রবল যে, বশীকরণসুলভ এক মাহাত্ম্যে তিনি মুহূর্তের মধ্যেও দূরের লোককে টেনে আনেন হৃদয়ের অন্তঃপুরে। এবং এই শক্তির আকর্ষণেই আবার নতুন ক'রে দানা বেঁধে উঠল বিপ্লবী দল কলকাতায় এবং দেশের জেলায় জেলায়, গ্রামে, শহরে।

তার আগে, ষোল আনা গুপ্ত-সমিতির কাজে আবার নেমে পড়বার প্রাক্কালে, ইংরেজ সরকারের সমস্ত সন্দেহের আওতা থেকে দূরে থাকবার উদ্দেশ্যেই, যতীন্দ্রনাথ সবিনীত একটি পত্র লিখলেন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে। আপাতদৃষ্টিতে পত্রটি নিছকই চাকরির উমেদারি-রত এক ছাপোষা বাঙালীর আবেদনের মতো ঠেকবে। কিন্তু অনবদ্য ইংরেজির বাঁধুনিতে রাজশক্তির প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন ক'রে, কেন চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হ'ল—তার কৈফিয়ৎ চেয়ে যতীন্দ্রনাথ এই যে পত্র দিলেন, তার প্রতিটি বাক্যে যে শাণিত যুক্তির প্যাঁচ দিয়েছেন তিনি, এর থেকে অনুমান করা যায় দূরদর্শী বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের ভূমিকাতেও তিনি অদ্বিতীয়ই ছিলেন।

মূল ইংরেজিতে এই পত্রটি যতীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরসমেত ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌সে রক্ষিত আছে। তার কিয়দংশ এই সূত্রে উদ্ধার করি।—

১৯১১ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বাংলা সরকারের সেক্রেটারি মিঃ এইচ্ হুইলার কেন্দ্রীয় হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারিকে লিখছেন:

"বাংলার সেক্রেটারিয়েটের প্রাক্তন কর্মচারী শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর একটি পত্র আপনাকে পাঠানোর নির্দেশ পেয়েছি; উক্ত পত্রে, এই বছরের ২৬শে জুন তারিখে স্থানীয় সরকার তাঁকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে মিঃ মুখার্জী আপীল করেছেন।

"উক্ত পত্রলেখক 'হাওড়া মামলা' নামে পরিচিত মোকদ্দমায় অভিযুক্ত

হয়েছিলেন—সে-বিষয়ে…অবগত আছেন।…এ-কথা সত্য যে পত্রলেখক সব অভিযোগ থেকেই খালাস পান।…কিন্তু কিছু প্রমাণ আছে যার সাহায্যে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখার্জীকে সরকারি চাকরিতে আর বহাল করা একান্তই অসম্ভব।

"এক।—রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তী তার জবানে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীকেই ষড়যন্ত্রের নেতা বলে উল্লেখ করেছে।

"দুই।—সাক্ষী রবি ভাদুড়ী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীকে সনাক্ত ক'রে বলেছে যে কুষ্টিয়ার এক আখড়ায় তাঁকে সে দেখেছে 'আলিপুর বোমার মামলা'র আসামী ভবভূষণ মিত্র প্রভৃতি বিপজ্জনক চরিত্রের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে। তাঁর সঙ্গী 'পরাণ' (সুরেশ মজুমদার)—সাক্ষী যার উল্লেখও করেছে, অত্যন্ত সন্দেহজনক চরিত্রের লোক।

"তিন।—সামসুল আলমের হত্যাকারী বীরেন দত্তগুপ্তকে দেখা গিয়েছে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর মামা* কুঞ্জমোহন চক্রবর্তীর অসুখের সময় সেবা শুশ্রূষা করতে (বীরেনের স্বীকারোক্তি, তার দাদা ধীরেনের বিবৃতি, এবং যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর কাছে কুঞ্জমোহনের যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে—এ-সবের সাহায্যে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়)।

"চার।—Exhibit No. 34 (1): যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর ঘরে বৈপ্লবিক কর্মসূচীর একটি খসড়া পাওয়া গিয়েছিল।

"পাঁচ।—সরকার থেকে মুদ্রিত গ্রন্থের ২১৫ পৃষ্ঠায়, অভিযুক্ত শৈলেন দাসের স্বীকারোক্তিতে দেখা যায় ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন, "One who is very strong and works in the Bengal Secretariat"—সরকারের দৃঢ়মূল সন্দেহ এ-উক্তি যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রযোজ্য।

"ছয়।—Exhibit No. 112: বিখ্যাত বিপ্লবী সংবাদপত্র 'যুগান্তর'-এর পরিবেষণে সক্রিয়রূপে উৎসাহী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়† উক্ত পত্রিকার ম্যানেজারের কাছে একটি পত্রে উল্লেখ করেছেন যে প্রয়োজন হলে তাঁর স্বপক্ষে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী জামিন হবেন।

* যতীন্দ্রনাথের মায়ের মামাতো ভাই, পাবনায় চাটমোহরে এ'দের বাড়ি, কলকাতায় ডাঃ হেমন্ত চাটুজ্যের ওখানে ইনি উঠেছিলেন॥

† বিখ্যাত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই; যতীন্দ্রনাথের বহু বিপ্লবী শিষ্য আচার্য রায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনেকেই পরবর্তী জীবনে কৃতী হ'ন॥

"সাত।—মামলার মুদ্রিত বিবরণী গ্রন্থের ৩৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য : Exhibit No. 115 থেকে প্রমাণ হচ্ছে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী নিজে 'যুগান্তর'-এর গ্রাহক ছিলেন।

"আট।—সামস্থল আলমের হত্যাকারী বীরেন দত্তগুপ্ত বলেছিল যে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীই বিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারীদের নেতৃস্থানীয় এবং তিনিই তাকে এই হত্যার কাজে পাঠান (বীরেনের স্বীকারোক্তি এই সঙ্গে পাঠান হ'ল)।

"যেহেতু ললিত চক্রবর্তীর সাক্ষ্য হাইকোর্ট থেকে বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং বীরেন দত্তগুপ্তকে আদালতে জেরা করা হয় নি—তারই ওপর নির্ভর ক'রে পত্রলেখক জোর ক'রে বলছেন, তিনি নির্দোষ যে—এ বিষয়ে অন্যমত যদি থাকেও তা' আইনত প্রমাণিত নয়। যদিও উক্ত ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত ব'লে প্রমাণ করবার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য আদালতে উপস্থিত করা যায় নি যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর বিরুদ্ধে, তবু ছোটলাট-বাহাদুরের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এর থেকেই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিপ্লবাত্মক প্রচারে ব্রতী ছিলেন এবং বৈপ্লবিক মতবাদ পোষণ ক'রে থাকেন। তা'ছাড়া আরো সন্দেহ জাগে যে সরকারের বিরুদ্ধে মারাত্মকতম অপরাধে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লিপ্ত আছেন। এর থেকেই যুক্তিযুক্তভাবে যতীন্দ্রনাথকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা চলে। এবং পাব্লিক সার্ভিসে তাঁকে আর বহাল করা প্রাদেশিক সরকারেরই স্বার্থের প্রতিকূল।

"এইসঙ্গে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, মুদ্রিত গ্রন্থের ভল্যুম-তিনটি ('হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা'র তথ্যাদি সম্বলিত) এবং বীরেন দত্তগুপ্তের সাক্ষ্যের কপিটি যথা-সময়ে যেন আমাদের অফিসে ফেরত পাঠানো হয়।"

এর পর "His Excellency the Right Honourable Charles Baron Hardinge" ইত্যাদি, "Viceroy and Governor General of India"-র কাছে "The humble memorial of Jyotindra Nath Mukerjee* of 275 Upper Chitpur Road, Calcutta" শিরোনামাযুক্ত নাতিদীর্ঘ পত্রটি সংশ্লিষ্ট দেখা যায় এই পত্রে যতীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের উন্নতি কত দ্রুত হয়েছিল এবং সরকারের কতদূর বিশ্বাসভাজন তিনি ছিলেন, স্পষ্ট

* যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই বানানই ব্যবহার করতেন এবং এই বানানেই তাঁর স্বাক্ষর আছে পত্রটির নিচে॥

দেখা যায়। কিছু উদ্ধৃতি দিলাম :

"এক।—পত্রলেখক ১৯০৩ সালের ১১ই আগস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে টাইপিস্টের কাজে বহাল হয়।*

"দুই।—কয়েক মাসের মধ্যে পঞ্চাশ থেকে সত্তর (৫০্—৭০্) টাকা গ্রেডে তাকে উন্নীত করা হয়।

"তিন।—১৯০৪ সালের ১৫ই মে তাকে মাসিক একশ' টাকা বেতনে বাংলা সরকারের ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারির স্টেনোগ্রাফারের পদে নিয়োগ করা হয়।

"চার।—তারপর পত্রলেখককে পুরো একবছরের জন্য বাংলার Gazetter Revision-এর স্পেশ্যাল ডিউটিতে নিয়োগ করা হয় ; মাসিক একশ' আঠাশ টাকা বেতনে এবং মাসিক আশি টাকা ডেপুটেশন এলাওয়েন্স দেওয়া হয়।

"পাঁচ।—বাংলা সরকারের ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারিদের অধীনে পত্রলেখকের কর্মক্ষমতা এতই প্রীতিপদ বিবেচিত হয় যে স্পেশ্যাল ডিউটি থেকে তার প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে ১২৫্—১৫০্ টাকা গ্রেডে নিয়োগ করা হয়।

"ছয়।—১৯১০ সালের ২৭শে জানুয়ারী মাঝরাতের অনতিকাল পরেই পত্রলেখককে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন জনকয়েক পুলিশ অফিসার ; তাঁরা বলেন যে, কলকাতার পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে তাঁরা তল্লাসী পরওয়ানা এনেছেন এবং ২১৫ নং আপার চিৎপুর রোডের বাড়িটি (যেখানে পত্রলেখক ও তার মামা ডাঃ এইচ. কে. চ্যাটার্জী, আর-এম-এস থাকেন) তল্লাস ক'রে দেখতে চান।

"সাত।—পুলিশ অফিসারেরা সারারাত তল্লাসী চালিয়ে যান এবং ভোরবেলা যাবার আগে পত্রলেখককে গ্রেপ্তার ক'রে হাজতে নিয়ে যান।

"আট। পত্রলেখককে বলা হয় যে, স্বর্গত ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী সামসুল আলমকে হত্যার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

"নয়।—পত্রলেখককে গ্রেপ্তার ক'রে দীর্ঘকাল কারাগারে রাখা হয় ; তারপর, ১৯১০ সালের ৩০শে জানুয়ারী, কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে তাকে উপস্থিত করা হয় ; পরে তিনি তাকে হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেন।

সে-যুগের ত্রিশ টাকা আজকের দিনে অনেক টাকার সমান॥

"দশ।—তক্ষুণি পত্রলেখককে আবার অভিযুক্ত করা হয় ভারতীয় পেনাল কোডের ৪০০ ধারা অনুযায়ী যে এক ডাকাতদলের সঙ্গে সে সংশ্লিষ্ট এবং তাকে আবার গ্রেপ্তার ক'রে হাওড়া জেলে রাখা হয়।

"এগারো।—পত্রলেখককে হাওড়া জেলে কিছুদিন রাখা হয়, তারপর ১৯১০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাকে নির্জন একটি সেল্-এ রেখে অজস্র পীড়ন ভোগ করানো হয়।

"বারো।—১৯১০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে থাকাকালীনই পত্রলেখককে জানানো হয় যে, পরদিন তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হবে; সেখানে কে একজন তার বিরুদ্ধে বিবৃতি দেবে।

"তেরো।—তদনুযায়ী পরদিন তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জনৈক বীরেন দত্তগুপ্ত পত্রলেখকের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয়।

"চোদ্দ।—তার কিছু পরেই, কারাগারের মধ্যেই পত্রলেখককে নতুন ক'রে গ্রেপ্তার করা হয় ভারতীয় পেনাল কোডের ১২১, ১২১এ, ১২২, ১২৩ এবং ১২৪নং ধারা অনুযায়ী অপরাধী সন্দেহে।

"পনেরো।—তারপর বহুবার পত্রলেখককে উপস্থিত করা হয় হাওড়ার এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এজলাসে; বহু মাস যাবৎ এই তদন্ত চলতে থাকে।

"ষোল।—১৯১০ সালের ২০শে জুলাই পত্রলেখক এবং অন্যান্য আসামীদের বিচারের ব্যবস্থা হয় হাইকোর্টের স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে।

"সতেরো।—১৯১০ সালের ১লা ডিসেম্বর এই বিচার শুরু হয়; বেঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় চীফ জাস্টিস, মাননীয় জাস্টিস ব্রেট এবং দিগম্বর চ্যাটার্জী।

"আঠারো।—১৯১১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, বিচার শেষ হবার আগেই উক্ত ট্রাইব্যুনাল পত্রলেখককে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন এবং মুক্তি দেন।

"উনিশ।—ছাড়া পেয়ে পত্রলেখক তার অফিসে ফিরে গেলে তাকে বলা হয়, তার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছে।

"কুড়ি।—১৯১১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী, পত্রলেখককে নিম্নোক্ত নোট

পাঠানো হয়, স্বাক্ষরকারী মাননীয় ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারি মিঃ হুইলার :

> ১৯১১ সালের ৭ই মার্চের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী যেন আমাদের কাছে কারণ উপস্থাপিত করেন—সম্রাট বনাম ললিত চক্রবর্তী ও অন্যদের মামলায় সংগৃহীত বিবৃতি ও সরকারি তথ্যের আলোকে—কেন তাঁকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না।...

"একুশ।—কিন্তু পত্রলেখকের কাছে তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত বিবৃতি ও স্বীকারোক্তির কোন কপিই না থাকায় সে ১৯১১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তার কৈফিয়ৎ পেশ করবার জন্যে সময় চায় এবং তা' মঞ্জুর করা হয়।

"বাইশ।—১৯১১ সালের ৩১শে মার্চ দুপুরে পত্রলেখক তার কৈফিয়ৎ পেশ করে—যার কপি এইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হল এবং পত্রলেখকের অনুরোধ যে, এই পত্রেরই অংশ ব'লে তা যেন গণ্য করা হয়।

"তেইশ।—পরদিনই সকালবেলা নিম্নোক্ত নির্দেশ জারি করেন ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারি—বাংলা সরকারের কাছে এবং পত্রলেখকেরও কাছে :

> যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রদত্ত কৈফিয়ৎ (গত ৩০শে তারিখের) আমি পড়েছি এবং লভ্য প্রমাণ থেকে এই আমার ধারণা হয়েছে যে, সরকারি চাকরিতে তাঁকে আর বহাল করা কাম্য নয়। অতএব তাঁকে যেদিন থেকে সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছিল, সেই তারিখ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করবার নির্দেশ বলবৎ করছি।

"চব্বিশ।—উক্ত বরখাস্তের নির্দেশ পেয়ে মর্মাহতচিত্তে পত্রলেখক ১৯১১ সালের ২রা জুন ছোটলাট বাহাদুরের কাছে আপীল করে।

"পঁচিশ।—২৬শে জুন বাংলা সরকার পত্রলেখককে নিম্নোক্ত নির্দেশ পাঠান :

> বাবু যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রেরিত ২রা জুনের মেমোরিয়াল পড়লাম। সিদ্ধান্ত : ছোটলাট পত্রলেখকের পক্ষ সমর্থন করা যায় কিনা বিবেচনা করেছিলেন এবং হস্তক্ষেপ করবেন না, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। নির্দেশ : এই সিদ্ধান্তের এক কপি পত্রলেখককে পাঠানো হ'ক।

"ছাবিশ।—মাননীয় ছোটলাট বাহাদুরের এই নির্দেশে মর্মাহত হয়ে পত্রলেখক অনুমতি প্রার্থনা করছে ইওর এক্সেলেন্সীর কাছে এই আপীল পেশ করবার—মূলত নিম্নোক্ত ক'টি কারণে :—

"ক। বিচারে পত্রলেখক অব্যাহতি পায় ব'লে।

"খ। স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল একবাক্যে রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তীর বিবৃতিকে সর্বতোভাবে অবিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করেন; একমাত্র উক্ত বিবৃতিটিই পত্রলেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল ব'লে।

"গ। স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল বিশেষভাবে পত্রলেখকের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষীর উক্তির অসত্যতা প্রমাণ ক'রে দেখানোর জন্যে উদাহরণস্বরূপ মনি-অর্ডার পাঠানো সংক্রান্ত উক্তিটির উল্লেখ করেছেন ব'লে।

"ঘ। পত্রলেখকের বিরুদ্ধে অপর একটি মাত্র অভিযোগের বিবৃতি দিয়েছিল বীরেন দত্তগুপ্ত এবং সেটি যে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং তার সর্বত্রই অপর কোনও হাতের সাজানো কাহিনী যে বিদ্যমান, সে বিষয় ট্রাইব্যুনালে নিঃসন্দেহ হন, বিবৃতিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ব'লে বিবেচনা করেন ব'লে।

"ঙ। যেহেতু পত্রলেখকের কৌঁসিলীকে উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয় নি বীরেন দত্তগুপ্তকে জেরা করবার—তা' হলেই তার বিবৃতির অসত্যতা যাচাই হয়ে যেত।

"চ। দেশের সর্বোচ্চ ট্রাইব্যুনালের চোখে মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে সন্দিগ্ধ হয়ে সরকারের একজন বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারীকে এইভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে ব'লে।

"ছ। যেহেতু সরকার থেকে কোনও যুক্তি দেখানো হয় নি—কেন পত্রলেখককে সরকারী চাকরিতে বহাল রাখা অবাঞ্ছনীয়।

"জ। যেহেতু পুলিশের হাতে একদম কোনও প্রমাণই ছিল না পত্রলেখকের বিরুদ্ধে এবং তাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও যেহেতু তারা পত্রলেখকের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ খাড়া করতে পারে নি।

"ঝ। যেহেতু দীর্ঘ কারাবাস এবং বিচারের ফলে স্বাস্থ্যের এবং অর্থের দিক থেকে পত্রলেখক সর্বস্বান্ত হ'য়ে গিয়েছে এবং তার জীবনের এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে তার চাকরি যাওয়াটা বিশেষ পীড়াদায়ক ব'লে।

"অতএব, পত্রলেখকের অনুরোধ, ইওর এক্সেলেন্সি যেন তাকে আবার

চাকরিতে বহাল করবার নির্দেশ দেন। ইত্যাদি—

(স্বাঃ) যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী।"*

২-৯-১৯১১

এই পত্রের সঙ্গে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট করেছেন বাংলা সরকারের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি মিঃ হুইলারকে লেখা তাঁর প্রথম পত্রটি। এই পত্রটি থেকে কিছু উদ্ধার করবার আগে স্মরণ রাখা দরকার যে, আজকের রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অর্ধশতাব্দীরও আগেকার রাজনীতিকে বিচার করতে যাওয়া অত্যন্ত ভ্রান্তিজনক হবে। সেদিনকার রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবেই মহানায়ক যতীন্দ্রনাথকে যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে বুদ্ধির মার-প্যাঁচে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল বিদেশী সরকারের জটিল কূট ব্যূহকেন্দ্রে।

প্রেমে এবং সমরে যেমন ন্যায় ও অন্যায়ের সাধারণ বোধগুলি অকেজো থাকা উচিত ব'লে প্রবাদ আছে, তেমনি স্মরণ রাখা প্রয়োজন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের উক্তি, "Great people are above the principles of common morality." (সাধারণ নীতিজ্ঞানের ছকে মহাপুরুষেরা বাঁধা পড়েন না) !

এই সূত্রেই পূর্বে উদ্ধৃত শ্রীঅরবিন্দের উক্তিটির পুনরুল্লেখ আবশ্যক: "...সেই ঐশীভাব পরম সর্বশক্তিময়ের প্রতিনিধি, যিনি মানুষের ক্ষমতা ও দুর্বলতা বরণ ক'রে নিয়েও তাদের বাঁধনে ধরা পড়েন না। তাঁরা ন্যায়-অন্যায়ের ঊর্ধ্বে এবং সচরাচর বিবেকহীন, আপন প্রকৃতিরই নিয়মে চলেন তাঁরা।"

যতীন্দ্রনাথ লিখিত পত্রটি থেকে কিছুটা শোনাই:

"১৯১১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লেখা আপনার মেমো নং ১০৪৯ পত্রে আমায় যে নির্দেশ দিয়েছেন সরকারি চাকরি থেকে কেন আমায় বরখাস্ত করা হবে না প্রমাণ করতে—তার উত্তরে আপনাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা জানাতে চাই।

"প্রথমেই আমি বলতে চাই যে, আপনার পত্র পেয়ে আমি বিশেষ মর্মাহত হই, কারণ আমার ধারণা ছিল যে, এ-দেশের উচ্চতম আদালতে সুদীর্ঘকাল যাবৎ একটানা বিচারের পর অব্যাহতি লাভ ক'রে আমি স্বভাবতই আমার চাকরির ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হব। এমন আশা পর্যন্ত

* মূল ইংরেজি থেকে॥

করেছিলাম যে, অনর্থক বিনা অপরাধে আমায় এতদিন ধ'রে যে বিড়ম্বিত হতে হয়েছিল এবং অজস্র অর্থদণ্ড দিতে হয়েছিল, গভর্নমেণ্ট তা' বিবেচনা করে দেখবেন এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন। যাই হোক, নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় আপনার বিবেচনার জন্যে পাঠাচ্ছি এবং আমার বিশ্বাস যে, এর সাহায্যে আপনি নিঃসন্দেহ হবেন যে, বাস্তবিকই এবং আইনত-ও আমি নির্দোষ—এখনো স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে যে-বিচার চলছে, সেই ষড়যন্ত্রের আংশিক বা সামাজিক কোনও অভিযোগেই আমি লিপ্ত নই।

"আপনার চিঠিতে আপনি দুটি পৃথক বিবৃতির বিরুদ্ধে আমায় আলোক-পাত করতে বলেছেন: প্রথমত, যেসব কথা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যে বলা হয়েছিল এবং, দ্বিতীয়ত, যেসব অভিযোগ বীরেন দত্তগুপ্ত আমার বিরুদ্ধে খাড়া করতে চেয়েছিল।

"প্রথমটি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আমায় অপরাধী সাব্যস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয় যেহেতু তার প্রতিটি অভিযোগ ষোল আনা যাচাই করবার পরে মাননীয় বিচারকেরা রায় দিয়েছেন যে, আমার বিরুদ্ধে কোনও দোষ খাড়া করতেই তা' অক্ষম।

"রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তীর বিবৃতিগুলি সযত্নে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, আমার সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সে যেসব উক্তি করেছিল তা' স্পষ্টতই হয় রাজসাক্ষী একটু একটু ক'রে নিজের কল্পনার সাহায্যে গড়ে তুলেছে, নয়তো অন্য কারও চাপে পড়ে সে ওসব বানিয়ে বলেছে।...

"ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রাজসাক্ষী আমার বিরুদ্ধে প্রধান যে উক্তি করেছিল তা' হল যে, আমি তাকে ছদ্মনামে মনি-অর্ডার ক'রে দশ টাকা পাঠিয়েছিলাম সে দার্জিলিং থাকাকালীন। এ-উক্তি যে মিথ্যা, রাজসাক্ষীর পরবর্তী বিবৃতিগুলি থেকে তা প্রমাণ হয়। স্পেশ্যাল ট্র্যাইব্যুনালে জেরার সময় রাজসাক্ষী বলে যে সে-টাকা তাকে আমি পাঠাই নি, কলকাতা থেকে জনৈক সতীশ সরকার পাঠায়। জেরার সময় তাকে যখন বলা হয় যে, ম্যাজি-স্ট্রেটের সামনে সে আমার নামে বিবৃতি দিয়েছিল, তখন সে দুটো উক্তিই তালগোল পাকিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে একটা চিঠি বের ক'রে বলে যে, সতীশ সরকার তাকে টাকা পাঠানোর সময় এই চিঠিতে লেখে যে, আমিই সতীশকে এই টাকা দিয়েছি রাজসাক্ষীকে পাঠানোর জন্যে। এ-কথাও

যে মিথ্যা তার প্রমাণ, আমি তখন দার্জিলিংয়েই ছিলাম এবং রাজসাক্ষীকে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি তা' অনেক সহজেই তার স্যানাটরিয়ামে পাঠাতে পারতাম—টাকা কলকাতায় পাঠিয়ে সেখান থেকে আবার ছদ্মনামে দার্জিলিং-এ পাঠানোর দরকার হত না।

"আমার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী আর যে বিবৃতিটি ডায়মণ্ডহারবারের এস-ডি-ও সাহেবের কাছে প্রথমে দেয় তা' হল: শ্যামবাজার সমিতির জনৈক যতীনদাদা (তাঁর পুরো নাম তার জানা নেই) এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং তিনিই তার কাছে একটা ছেলেকে পাঠান। আবার মিঃ ড্যুভাল্-এর সামনে সে সর্বপ্রথম বলে যে, এই যতীনদাদা হচ্ছেন মুখার্জী এবং রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরি করেন এবং রাজসাহী, নদীয়া, যশোর ও খুলনার ভার সম্পূর্ণ ওঁর ওপর ছিল। মিঃ ড্যুভাল-এর কাছে রাজসাক্ষী এ-কথাও বলে যে, ননীগোপাল গুপ্তের শিবপুরের বাড়িতে সে প্রায়ই এই যতীনদাদার সঙ্গে দেখা করত। উক্ত যতীনদাদা যে আমি হতে পারি না তা' স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কারণ স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের সামনে বিবৃতি দেবার সময় রাজসাক্ষী আমায় সনাক্ত করবার সময় বলে যে, আমায় ইতিপূর্বে মাত্র একবারই দেখেছিল ডালহৌসি স্কোয়ারে। সে যতীনদাদা আর যেই হোন আমি যে নই তার অন্য প্রমাণ এই যে রাজসাক্ষী তার বিবৃতিতে বলেছিল, বাঁকিপুরের বাবু কেদারনাথ ব্যানার্জীর বাড়িতে যতীনদাদা প্রায়ই যাতায়াত করতেন। অথচ কেদার ব্যানার্জী তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন যে, তাঁর বাড়িতে যতীন নামে কেউ কস্মিনকালে যায় নি; কেদারবাবুর জবানে এ-কথাও তিনি বলেন যে, ইতিপূর্বে আমায় কোনদিন তিনি দেখেন নি, আমায় চেনা তো দূরের কথা।...ডালহৌসি স্কোয়ারে রাজসাক্ষীর সঙ্গে দেখা হওয়া প্রসঙ্গে বলি যে, মিঃ ড্যুভাল-এর কাছে রাজসাক্ষী বিবৃতি দেয় যে, আমি গিয়ে রাজসাহীতে তার থাকবার জন্য পরবর্তী ব্যবস্থার কথা তাকে বলেছিলাম। আবার স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের সামনে সে বলে যে, রাজসাক্ষীর সঙ্গে আমার কোনও কথাই হয় নি, আমি ওর পথপ্রদর্শককে বলেছিলাম যেন ও নদীয়ার বেলিয়াশিশি গ্রামে যায় ও খুব সাবধানে থাকে সেখানে। উক্ত দুটি বিবৃতিই মিথ্যা। ও-দুটির স্বপক্ষে কোনও প্রমাণই নেই। এবং আমি বলতে পারি যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষীকে দেখবার আগে কোনদিন তাকে আমি দেখিই নি।

"আমার বিরুদ্ধে এ-কথাও প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, আলিপুর বোমার কেসের সঙ্গে জড়িত কুষ্টিয়ার কয়েকজন অধিবাসী আমার খুব পরিচিত লোক। কুষ্টিয়ার অত্যন্ত নিকটবর্তী কয়াগ্রামের অধিবাসী আমি এবং কুষ্টিয়া ও আশেপাশের বহু জায়গা থেকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দুর্গাপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে আমার বড়মামা কৃষ্ণনগরের গভর্নমেণ্ট প্লীডার বাবু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়ার বাড়িতে সমবেত হতেন বটে, কিন্তু মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সন্দেহ অনুযায়ী এমন কোনও প্রমাণ নেই যে, আমি "ভবভূষণ মিত্র ও অন্যদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু" ছিলাম। একমাত্র সাক্ষ্য দিয়েছে হেড্ কন্‌স্টেবল রবি ভাদুড়ি: দু-একবার আমি নাকি কুষ্টিয়ার আখড়ায় গিয়েছিলাম। তার থেকে, আমার ধারণা, আখড়াসুদ্ধ লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল প্রমাণিত হয় না। আমি আদৌ কখনো এই ভবভূষণ মিত্রকে দেখি নি। তবে কুঞ্জলাল সাহাকে আমি কুষ্টিয়ায় এবং কয়াতেও দেখেছি, যদিও জানতাম না যে, বোমার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সে বিন্দু-মাত্রও সংশ্লিষ্ট। এ-কথা প্রসঙ্গক্রমে বলব যে, কুঞ্জলাল সাহা আলিপুর বোমার মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ছাড়া পায়। মামলায় আমার বিরুদ্ধে এই ক'টি অভিযোগই নথিভুক্ত হয়েছিল।

"অন্যান্য নথিপত্রের মধ্যে আমায় অপরাধী সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করা হয়েছে exhibit No. 34 (1) থেকে: সংবাদপত্রের ও গুপ্ত ইস্তাহারের জন্যে লিখিত একটি পরিকল্পনা, আমার ঘরে নাকি এটি পাওয়া যায়। আমার মামা ডাঃ হেমন্তকুমার চ্যাটার্জীর বাড়িতে ওই ঘরটিতে আমি রাত্রে শুতাম। সরকারি হস্তাক্ষর-বিশারদের মতে উক্ত ডকুমেণ্টটি আমার লেখা নয়। ওটি যে আমার সম্পত্তি, এমনও প্রমাণিত হয় নি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখানো হয়েছে যে, ওই ঘরে আমার মামাতো ভাইয়েরা দিনের বেলা লেখাপড়া করে এবং তাদের প্রাইভেট টিউটররা ছাড়াও বাইরের বহু লোক নিত্য সেখানে আসে যায়। তাদেরই কারো কাগজপত্র ওখানে পাওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং তার জন্যে আমায় দায়ী করা যায় না। উক্ত ডকুমেণ্টটি পাবার আগে পর্যন্ত ওটি সম্বন্ধে বা ওর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না, আবার বলি।

"বিচারের সময় আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল সেগুলি পরীক্ষা ক'রে মাননীয় বিচারকেরা যে আমায় মুক্তি দেন

তা কোনও আইনগত বা টেকনিকাল মারপ্যাঁচে নয়, কারণ যেহেতু আমায় অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় নি।

"এবার বীরেন দত্তগুপ্তের বিবৃতি প্রসঙ্গে আসি। দুটি পরিস্থিতিতে এই বিবৃতিগুলির সংযোগ যাদের প্রতি আপনার বিশেষ দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করি। প্রথমটি হল: ১৯১০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী মিঃ ডি. সুইনহো সাহেবের সামনে বীরেন দত্তগুপ্ত প্রথম যে বিবৃতি দেয় তাতে সে বলে যে, পুলিশ তাকে বলতে শিখিয়ে দিয়েছে যে, রিভলভারটি সে যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছে। দ্বিতীয়টি (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি): মিঃ সুইনহো-র ধারণা যে, বীরেন দত্তগুপ্তের বিবৃতির সময় তার হাতে একটি লিখিত ডকুমেণ্ট ছিল যা সে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছিল বিবৃতি দিতে দিতে। সে ডকুমেণ্টটি আদালতে দেখানো হয় নি এবং সেটি কার হাতের লেখা জানা যায় নি; কিন্তু প্রথম পরিস্থিতির সঙ্গে এটি যুক্ত করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় যে, বীরেন দত্তগুপ্তের বিবৃতিটি যথার্থ বা স্বেচ্ছাকৃত নয়; বাইরে থেকে কেউ চাপ দিয়ে ওই বিবৃতি দিইয়েছে। বিবৃতিগুলি পাঠ করলেই এ-বিষয়ে সব সন্দেহের নিরসন হয়।

"অন্যান্য কথার মধ্যে তার বিবৃতিতে সে বলেছে যে, ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সে কলকাতায় আমার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে একবার ক'রে আমার সঙ্গে সে দেখা করত। এ কথা মিথ্যা। যেহেতু ১৯০৯ সালের গোটা সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস এবং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ আমি দার্জিলিঙে ছিলাম আপনারই সহকারীরূপে। আমার এ-উক্তি সত্যি কিনা আপনি অফিসের রেকর্ড দেখলেই বুঝবেন। দেখতে পাবেন, আগস্ট মাসের শেষদিকে আমি কলকাতা ছাড়ি এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ ফিরি। কেন যে বীরেন দত্তগুপ্ত এমন বিবৃতি দিল এবং এভাবে কোন্ উদ্দেশ্যে মিছিমিছি আমার নাম এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়ালো, আমার পক্ষে তা অনুমান করা অসম্ভব—আমার কৌঁসুলী তাকে জেরা করবার সুযোগ পেলে হয়তো এর সদুত্তর পেতেন। ১৯১০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি মিঃ সুইনহোর কাছে বীরেন দত্তগুপ্ত যখন এই বিবৃতি দেয় তখন তাকে পুলিশ ব'লে রেখেছিল যে তারা টের পেয়েছে ওর রিভলভারের মূলে আমি আছি এবং আমায় গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, খুব সম্ভব এই কথা শুনেই বীরেন দত্তগুপ্ত আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে

দিয়ে সত্যকার অপরাধী বা অপরাধীদের নাম গোপন করতে চেষ্টা করেছিল।

"আমি আপনাকে এর সাহায্যে দেখতে চেষ্টা করেছি যে নথিভুক্ত এমন কোনও বিবৃতি বা সাক্ষ্য মামলায় সংগৃহীত নেই যার সাহায্যে আমায় সরকারি চাকরির অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা চলে। আমায় কী জন্য যে এই মামলায় জড়িত করা হয়েছিল আমি নিশ্চিত হয়ে তা বলতে পারি না, কিন্তু ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকেই—যখন দুর্ভাগ্যক্রমে শিলিগুড়ি রেল-স্টেশনে ক্যাপ্টেন মার্ফি ও লেফটেনান্ট সামারভিল-এর সঙ্গে আমায় বাধ্য হ'য়ে ঝগড়া করতে হয়—তখন থেকেই পুলিশের চোখে আমি সন্দেহভাজন ও অবিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে উঠি এবং তাদের ধারণা হয়, আমিও বুঝি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ-কথাও আমায় বলতে হচ্ছে যে, আমায় প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে নয়, প্রথম আমায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নরহত্যার অভিযোগে, কিন্তু তার কোনও প্রমাণ না-থাকায় আমি মুক্তি পাই। তারপরে ভারতীয় পেনাল কোডের ৪০০ ধারা অনুযায়ী আবার আমায় গ্রেপ্তার করা হয় হত্যার অভিযোগে, এবং আবার ম্যাজিস্ট্রেট আমায় নির্দোষ ব'লে ছেড়ে দেন। অবশেষে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হ'ল।

"এর থেকেই আপনি দেখছেন কীভাবে আমায় অযথা নাস্তানাবুদ হ'তে হয়েছে। দীর্ঘ তেরো মাস আমি কারাবন্দী ছিলাম যতক্ষণ না স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল আমার মুক্তির আদেশ দেন। গত সাত বছর আমি যে সরকারি চাকরিতে বহাল আছি, বরাবরই আমায় আপনি সরকারের অনুগত এবং অনুরক্ত বলে জেনেছেন, এবং আমার সম্বন্ধে আপনি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, আমার আনুগত্যে চিড় থাবে না কোনদিনই। তবে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমার কথাটা একটু সহৃদয়ভাবে যেন বিবেচনা করেন, এবং, আমার ধারণা, যেহেতু আমার নির্দোষিতা প্রমাণিত হচ্ছে, যেহেতু আমি সব অভিযোগ থেকেই অব্যাহতি পেয়েছি—আপনি নিশ্চয়ই আমায় চাকরিতে ফিরিয়ে নিতে দ্বিধা করবেন না।* পরিশেষে আপনাকে অনুরোধ

* ১৯১১ সালের ২৬শে জুন তারিখেও, দেখা যাচ্ছে, বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারি C. G Stevenson Moore. I. C. S. একটি চিঠিতে ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্ট-এর সেক্রেটারির কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন—কেন যতীন্দ্রনাথকে খালাস ক'রে দেওয়া হ'ল। এই রিপোর্টটিও কম চিত্তাকর্ষক নয়; কিন্তু পরিসরের কথা চিন্তা ক'রে এখানে তার উদ্ধৃতি দিলাম না।

জানাই যে, প্রেরিত প্রমাণাদিতে যদি নতুন ক'রে কোথাও আলোকপাতের প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে আমায় জানালেই আমি তার বিশ্লেষণ ক'রে দেখাব এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে। ইতি—

বশংবদ,

(স্বাঃ) যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী

২৭৫, আপার চিৎপুর রোড
কলকাতা
৩০শে মার্চ, ১৯১১

দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌সের ফাইলে এই পত্রের পরেই গ্রথিত আছে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তী যেসব বিবৃতি দেয় তার কপি।

ডায়মণ্ডহারবারের এস ডি ও সাহেবের কাছে রাজসাক্ষী প্রথম বিবৃতিতে বলে : শ্যামবাজার সমিতির যতীনদাদা একটি ছেলেকে পাঠান, তার নাম সতীশ সরকার, বাড়ি নাটোরে। (মুদ্রিত গ্রন্থের ২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় বিবৃতি : যতীনদাদাকে আমি দেখলে সনাক্ত করতে পারি। তিনি কোথায় থাকেন আমি জানি না। তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁর পুরো নাম আমি জানি না। (ঐ, পৃষ্ঠা ৫)।

তারপর ললিত বলে : আমি তো বলি নি যে মনি-অর্ডারটি সতীশ তার নিজের নামে পাঠিয়েছে।

প্রশ্ন : মনি-অর্ডারটা সতীশ পাঠিয়েছে, বলেছিলে ?

উত্তর : হ্যাঁ, বলেছিলাম।

প্রশ্ন : তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে টাকার কথাটা তুমি এখন সতীশের ঘাড়ে চাপাচ্ছ যেহেতু তুমি জানতে পেরেছ ঐ সময়ে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন দার্জিলিঙে এবং সেখান থেকে ঐ টাকা তিনি পাঠিয়েছেন বললে কথাটা হাস্যকর ঠেকবে ব'লে।

উত্তর : টাকাটা যখন এসে পৌছয় আমি তখন অসুস্থ। আমি তখন জানতাম না যতীনদাদা দার্জিলিঙে ছিলেন কিনা।

প্রশ্ন : অসুস্থ অবস্থায় জানতে না এ-কথা ; কখন তুমি জানতে পারলে যে যতীনদাদা দার্জিলিঙে আছেন ?

উত্তর : সেরে ওঠবার পর মল্-এর দিকে যখন বেড়াতে যেতাম, প্রায়ই ওঁকে দেখতাম।

প্রশ্ন : তাহলে, ওঁকে তুমি একটি-বার মাত্র ডালহৌসি স্কোয়ারে দেখেছিলে যে এ-কথা সত্যি নয় ?

উত্তর : সে-কথাও সত্যি।

হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ডুভাল সাহেবের কাছে ললিত চক্রবর্তী বলে : যতীনদাদা ওরফে মুখার্জী কৃষ্ণনগরের দিকে কোথাও থাকেন, রাইটার্স বিল্ডিংসে কি যেন কাজ করেন আমি ঠিক জানি না। (পৃঃ ১৫)

আবার সে বলে : যতীনদাদার ওপর রাজসাহী, নদীয়া, যশোর ও খুলনার ভার ছিল। (পৃঃ ১৫)

অন্যত্র সে বলে : ননী গুপ্তের বাড়িতে অন্যান্য সকলের সঙ্গে যতীনদাদাকেও প্রায়ই আসতে দেখতাম। (পৃঃ ১৯)

আবার রাজসাক্ষী বলে : ভুবন মুখার্জীর বাড়িতে আমি থাকাকালীন মাদারু (যোগেশ মিত্র) একদিন আমায় লালদীঘিতে (ডালহৌসি স্কোয়ারে) নিয়ে যায়। সেখানে বেলা দুটোয় যতীনদাদার সঙ্গে আমার দেখা হয়। রাইটার্স বিল্ডিংসের দিকের গাছ-ঘেরা একটা বেঞ্চিতে আমি বসেছিলাম। যতীনদাদা এসে বললেন আমার রাজসাহী যাবার ব্যবস্থা তিনি করেছেন, সতীশ সরকার রাতে এসে শিবপুরে দেখা করবে আমার সঙ্গে। সেদিন রাতে শিবপুর শ্মশানঘাটে সতীশের সঙ্গে আমার দেখা হয় ; মাদারু আমায় সেখানে নিয়ে যায় ; এবং সতীশ আমায় ১০।১, মুসলমান-পাড়া লেনের মেস-বাড়িতে নিয়ে যায়। (পৃঃ ৩১)

এই জাতীয় আরো কয়েকটি বিবৃতি উদ্ধার করবার পরে, সরকারি কৌঁসুলী একের পর এক চোখা চোখা প্রশ্নে রাজসাক্ষীর বিভিন্ন বিবৃতির অযৌক্তিকতা কিভাবে উদ্ঘাটিত করে দেখান তার বিশদ বিবরণ এই মেমোরিয়ালে সংশ্লিষ্ট আছে।

অবশেষে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের তরফ থেকে—M. S. D. Butler (Home Dept.—Political) ১৯১১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে সিমলা থেকে বাংলা সরকারের ফিনান্স সেক্রেটারিকে লেখেন যে, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর পক্ষ সমর্থন করে এ-বিষয়ে তাঁরা হস্তক্ষেপ না করাই ভাল মনে করেন।

এইভাবেই এ-প্রসঙ্গে চূড়ান্ত যবনিকা নেমে আসে। শেষ হয় যতীন্দ্র-

নাথের চাকরি-জীবন এবং কারা-জীবনের অবশিষ্ট ঝামেলা ॥

॥ সাত ॥

কলকাতা-কেন্দ্রের ভার যতীন্দ্রনাথ অর্পণ করলেন তাঁর স্নেহভাজন সহকারী অতুল ঘোষের হাতে। শীঘ্রই মহাযুদ্ধ বাধবার আভাস দিয়ে বললেন, ইংরেজ আর জার্মানিরা সাজগোজ শুরু করে দিয়েছে তলায়-তলায়।

অতুল ঘোষকে বললেন, খুন-ডাকাতি রেখে এখন মন দে দল গড়বার কাজে।

বাংলার জেলাগুলি এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত পরিদর্শন ক'রে দেশের বৈপ্লবিক প্রস্তুতির দৌড় কতটা, নতুন ক'রে ঝালিয়ে নিলেন যতীন্দ্রনাথ।

গুরু ভোলানন্দ গিরি মহারাজের দর্শন অভিলাষে হরিদ্বারে যাবার অজুহাতে সমগ্র উত্তর ভারতটাও দেখে এলেন যতীন্দ্রনাথ। বেনারসের কেন্দ্রটিতে দিয়ে এলেন নতুন প্রাণশক্তি।* আর বৃন্দাবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন নিরালম্ব স্বামীর (জে. এন. ব্যানার্জীর) সঙ্গে।

পূর্ব, উত্তর আর পশ্চিম বাংলার ছত্রভঙ্গ দলগুলোকে আবার একত্রিত করবার পর শীঘ্রই কলকাতায় ফিরবেন বলে গেলেন যতীন্দ্রনাথ।

যশোর। পৈতৃক ভিটে রিশখালি গ্রামের কাছেই ঝিনাইদায় যতীন্দ্রনাথ সাময়িকভাবে পত্তন করলেন তার হেডকোয়ার্টার। দিদি বিনোদবালা, সহধর্মিণী ইন্দুবালা, কন্যা আশালতা এবং পুত্র তেজেন্দ্রনাথকে নিয়ে সেখানেই আস্তানা গাড়লেন।

বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দেবার চরম মুহূর্ত সমাগত! গুরুর আদেশে অতুল ঘোষ একাই একশ' জনের বিক্রমে নেমে পড়লেন সংগঠনের কাজে, কলকাতা কেন্দ্র সাজিয়ে তুলতে।

* এই সময়ে বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (সতীশ মুখার্জী) সদলবলে বেনারসে ছিলেন রংপুরের জমিদার সারদা মৈত্র মহাশয়ের বাড়িতে। ইনি তখনকার প্রখ্যাত বিপ্লবীনেতা। আর, মোক্ষদা সামাধ্যায়ী-প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলও তখন বেশ উৎসাহের সঙ্গে এখানে কাজ করছেন। এই সম্মিলিত দলের সঙ্গেই পরে রাসবিহারী বসু যোগাযোগ করেন; এবং আরো পরে ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ শুরু হবারও পরে, শচীন সান্ন্যাল কলকাতা থেকে যতীন্দ্রনাথের শিষ্য অতুল ঘোষের পরিচয়-পত্র নিয়ে ওখানে গেলে পরে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগদানের সুযোগ পান॥

যতীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন এই নেতা সম্বন্ধে বিপ্লবী ভূপেন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "স্বদল বেদলের যে-কেউ তাঁর (অতুলদার) সংস্পর্শে যেদিন আসতেন, মুগ্ধ হয়ে যেতেন—পিছন ফিরেই নিজেরা বলাবলি করতেন, এমন প্রাণ হয় না রে!—তিনিও যেন প্রতি কাজে, প্রতি কথায় যতীনদার কাছে আত্মনিবেদন করতেন, যতীনদারই অনুকরণ করতেন, চিন্তায় অনুভূতিতে অবধি। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ সেকালে ছিল বিপ্লবীদের দীক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এঁদের কয়জনকে দেখেছি, এঁদের আত্মসমর্পণ ছিল —ঐকান্তিক আত্মসমর্পণই ছিল—'দাদা'র কাছে।"

ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে।

অনতিকাল পরে, ১৯১১ সালেই, পারস্য দেশ ভাগাভাগি নিয়ে ভাবী প্রথম মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। উত্তরে রাশিয়া, দক্ষিণে ইংরেজ— হুমকি খেয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়লেন পারস্যের শাহ্।

যতীন্দ্রনাথের বন্ধু লিয়াকৎ হোসেন এক জনসভায় ভবিষ্যদ্বাণী করলেন "ইওরোপমে আগ লগ্ জায়গী!"

আগ লগ্ জায়গী!…কথাটা নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করল যেন। কথাটা বিপ্লবীদের মধ্যে চাউর হয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথ জেল থেকে বেরিয়েই তো এর আভাস দিয়েছিলেন; এত শীঘ্র তা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে দেখে মুগ্ধ আন্তরিকতায় তৎপর হয়ে উঠল দলগুলো।

যতীন্দ্রনাথের অনুগামী বিপ্লবীরা বুঝলেন: মহাযুদ্ধ বাধলে ভারতে ইংরেজের বজ্রমুষ্টি আলগা হতে বাধ্য। তার ওপর, ভারতের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে বিদেশী শক্তিগুলি সাহায্য করতে অগ্রসর হয়, তবে ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন সফল হতে দেরি লাগবে না।

এই রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নে ঝাঁকে ঝাঁকে কিশোর, তরুণ, যুবক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শ্রীঅরবিন্দের আহ্বানে, তাদের অনেকেই হাল ছেড়ে দেয় নি, এগিয়ে চলেছে তারা মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের চুম্বকে আকৃষ্ট হয়ে আরো তরুণ, কিশোর, যুবক উন্মাদ হয়ে ছুটে আসছে জন্মভূমির শৃঙ্খলমোচনের দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে। মুষ্টিমেয় এই জাগ্রত শুভবুদ্ধির আত্মত্যাগের আত্মোৎসর্গেরই পথে সুপ্ত কোটি কোটি প্রাণ জাগবে, জনচেতনায় উৎশিখ হয়ে উঠবে তাদের একমাত্র অভিষ্ট, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

মুষ্টিমেয় এই পাগল আপনভোলাদের কাজে সহানুভূতি নিয়ে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে দেশবাসী যেদিন উঠে দাঁড়াবে, সেদিনই সার্থক হয়ে উঠবে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা।

সেই ব্যাপক জাগরণকে ত্বরান্বিত করবার জন্যেই না মুষ্টিমেয় জাগ্রতদের আমন্ত্রণ জানালেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ সর্বনাশা মহাকালীর তাথৈ নৃত্যের ছন্দে মেতে উঠতে, বললেন, "আমরা মরব, দেশ জাগবে!"

মাণিকতলার বোমার বাগানের কর্মীরা ধরা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি স্থত্র ধরে পুলিশ যখন প্রবল ধর-পাকড়ের জাল পেতে গুপ্ত-সমিতির সংগঠন প্রায় অকেজো করে তোলে—তখন বলেছি, গোষ্ঠী সম্প্রদায় দলের সব বিভেদ ভুলে গিয়ে ভুলিয়ে দিয়ে নারায়ণগঞ্জের প্রাক্তন মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী ঘরে ঘরে গিয়ে ডাক দিতে লাগলেন—"ওরে, দেশে যে এখনো যতীন্দ্রনাথ রয়েছেন ভুলে যাস কেন? এত সহজেই হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরবি? যতীন মুখুজ্যের মতো মহামানব তো হাল ছাড়ে নি! তাকে ঘিরে দাঁড়া তোরা—"

পিতৃদত্ত ষাট হাজার টাকা তিনি নিঃশেষে সঁপে দিয়েছিলেন বিপ্লবের কাজে ব্যবহারের জন্যে। তা' ছাড়া তাঁর উপার্জনেরও প্রতিটি কপর্দকে ছিল বিপ্লবীদেরই একচ্ছত্র অধিকার। ১৯০৬ সালে 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'বন্দে-মাতরম্' 'নবশক্তি' প্রভৃতি বিপ্লবীদের মুখপত্রগুলি পরিচালনার জন্যে যে কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, রাজা সুবোধ মল্লিক প্রভৃতির সঙ্গে অবিনাশ চক্রবর্তীও ছিলেন তার সদস্য।

অবিনাশ চক্রবর্তীর এই সম্মিলনীর উদ্যোগ সেদিন বহু ঘরমুখো বিপ্লব-কর্মীকে দলে টেনে আনে। অক্লান্ত পরিশ্রমে, তিনি বহ্নিদীপ্ত চারণের মতো একতার সৌহার্দ্যের যে বাণী ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তা প্রথম ফলপ্রসূ হয়ে উঠল ১৯১১ সালে, যতীন্দ্রনাথ জেল থেকে বেরিয়ে এলেন যখন নতুন কর্ম-স্থচী নিয়ে। আর মহান ঐক্যের এই যে বীজ বপন করেছিলেন মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী, তার প্রথম ও শেষ সম্যক সার্থক রূপ দেখা গেল ১৯১৪ সালে, যখন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের পতাকাতলে সমস্ত বিপ্লবী দলগুলিই সমবেত হয়ে দৃঢ়সন্নিবদ্ধ ব্যূহের আকার ধারণ করল।

বৃটিশ গোয়েন্দা-বিভাগের কড়া নজর আঠার মতো লেগে রইল যতীন্দ্র-

নাথের পিছু পিছু। তবে, তাদের রিপোর্ট থেকে ভারত সরকার আশ্বস্ত হল যে, সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে এবং বৎসরাধিক কাল জেলের নিপীড়নে নাজেহাল হয়ে যতীন্দ্রনাথ একবার ঝিনাইদা-তে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে গার্হস্থ্য-জীবনে মনোনিবেশ করেছেন। বিপ্লবের নেশা ছুটে গিয়েছে। টাকা রোজগারের ধান্দায় সাইকেল ঠেঙিয়ে নয়তো ঘোড়ায় চেপে সরকারের এবং জেলা-বোর্ডের কন্ট্রাক্টর যতীন মুখুজ্যে সর্বদা আনা-গোনা করছেন যশোর, নদীয়া, খুলনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাগুলোতে। যতীন মুখুজ্যের স্বাধীন কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা বেশ ফেঁপে উঠছে দিনে দিনে। ঝিনাইদা-য় হেড্-অফিস। ব্রাঞ্চ-অফিস একটা যশোর শহরে, অন্যটা মাগুরায়। মাগুরা অফিসের ভার দিয়েছেন নলিনীকান্ত কর নামে এক কর্মচারীর হাতে।*...পুলিশের মতে—অদ্ভুত কর্মবীর যতীন্দ্রনাথ। বড় বড় ব্রিজ আর রাজপথের কন্ট্রাক্ট নিচ্ছেন তিনি। ময়দানবের উদ্যমে কাজ শেষ করে ফেলছেন। ওসব অঞ্চলে অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন কয়েকখানা ব্রিজ আর রাজপথ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে শিল্পী যতীন্দ্রনাথের পরিচালনায়।

কুষ্টিয়া ব্রিজ গড়ে উঠবার মর্মন্তুদ কাহিনী যতীন্দ্রনাথ তাঁর জননী শরৎশশী দেবীর মুখে শুনেছিলেন। সেদিন তাঁর সর্বান্তঃকরণে জ্বলে উঠেছিল একটি-মাত্র ধ্রুব-সঙ্কল্প: বড় হয়ে দেখিয়ে দেব সাঁকো কীভাবে গড়তে হয়! তাঁর প্রাণে বড়ই বেজেছিল নির্দোষ কুলিদের ওপর শাসক সাহেবদের অত্যাচারের করুণ কাহিনী আর এ-দেশের লোক অলস অকর্মা অক্ষম—এইসব মিথ্যা অপবাদ।

ভুলে যান নি যতীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবের সেই প্রতিজ্ঞা। আসা-যাওয়ার পথে আবাল্য কুষ্টিয়ার ব্রিজ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দরিদ্র দেশবাসীকে রক্ষা করার অনুরোধের মতো, স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাঁর সঙ্কল্পের কথা আর তাঁর জননী সমস্ত শিক্ষার মধ্যে প্রমূর্ত জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের কথা।

তাই যতীন্দ্রনাথ অমন অভিনিবেশ নিয়ে গড়ে তুলতে লাগলেন একের পর এক ব্রিজ, নতুন নতুন রাজপথ, দেখিয়ে দিলেন কত কর্মঠ তৎপর আর

* নলিনীকান্ত করের উল্লেখ পূর্বেই করেছি; কুষ্টিয়ার কাছের এৎমামপুর গ্রাম থেকে ইনি এবং অতুল ঘোষ যতীন্দ্রনাথের কাছে অল্প বয়স থেকেই যাতায়াত করতেন এবং বিপ্লবের কাজে যতীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় অনুরক্ত কর্মী হয়ে ওঠেন॥

কুশলী হতে পারে এ-দেশের লোক—ছোটখাটো কাজের মধ্যেও।

যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি বহন করে আজো সেইসব ব্রিজ দাঁড়িয়ে আছে। সেইসব ব্রিজের তলা দিয়ে নৌকোয় যাতায়াতের পথে আজো পথিকেরা পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে প্রণম্য এই মহাপুরুষের অগণিত কীর্তির কাহিনী, প্রাণের ঠাকুরের মতো প্রণাম জানায় তাঁর উদ্দেশ্যে আর বুক ফুলিয়ে তাঁর কথা স্মরণ করে—যেন তাদেরই ঘরের লোক ছিলেন তিনি : এঁরই কোলে-পিঠে চাপবার সৌভাগ্য হয়েছিল হয়তো এদেরই কারো বাপ কিংবা জ্যাঠা নয়তো কাকার!*

শুধুমাত্র ব্রিজ গড়া নয়, কন্‌ট্রাক্টরি করা নয়! ইংরেজ গোয়েন্দা-মহল চমৎকৃত হয়ে যায় : বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ এবার তা হলে পুরো সংসারী হলেন? তিনি জমি কিনছেন, পরিবারের জন্যে ইমারৎ গাঁথাচ্ছেন, কিনছেন ফলের বাগান, ক্ষেত-খামার। পুলকিত হন বিদেশী কর্তৃপক্ষ।

বিদেশী সরকারের মনোভাব শুনে বিপ্লবীরাও হেসে বাঁচেন না। যতীন্দ্র-নাথের কন্‌ট্রাক্টরির আগাগোড়াই যে জেলায় জেলায় ঘুরে গুপ্ত-সমিতির সংগঠনগুলো পোক্ত করে তোলবার অছিলা এ-সন্দেহ গোয়েন্দাদের মাথায় ঢুকল যখন, তখন বড়ই দেরি হয়ে গিয়েছে। সেকথা পরে বলব।

যতীন্দ্রনাথ গভীরে গোপনে কী কাজ করে চলেছেন তার সন্ধান বিদেশী সরকারের গোয়েন্দারা তো দূরে থাক, তাঁর সহকর্মীরাই খুব কম জানতেন। লোকচক্ষুর অগোচরে নীরবে কাজ করে যাবার এই প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে এত প্রবল ছিল বলেই তো আজ আমরা সঙ্কোচে বিহ্বল হয়ে পড়ি নয়তো দ্বিধায় কৃপণ হয়ে উঠি তাঁরই কীর্তিকে তাঁর অবদান বলে আজ স্মরণ করতে, স্বীকৃতি দিতে।

অথচ যতীন্দ্রনাথের গোটা জীবনটির তাৎপর্য কেমন প্রস্ফুট হয়ে উঠেছিল তাঁর জনৈক জীবন-চরিতকারের কলমে : "...এই শক্তিশালী জীবন-প্রবাহ তাহার সমস্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ লইয়া কখনো লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। গভীরতলসঞ্চারী বিরাটকায় তিমির মত, এই জীবন, জাতির গভীর গোপন অন্তরতল আলোড়িত বিক্ষোভিত করিয়াছে, কদাচিৎ দুই-একটি আবর্ত একান্ত অসতর্কভাবে বাহিরের ত্রস্ত শান্তিকে ক্ষণকালের জন্য ক্ষুব্ধ করিয়াছে মাত্র।"†

* গৌরকিশোর ঘোষের 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসেও এই উক্তির ছায়া পাইনি কি?

† বালেশ্বর যুদ্ধের সাত-আট বছর পরে বিপ্লবী নেতারা মিলিতভাবে "বিপ্লবের বলি" নামে যে

আলোচ্য পর্বে যতীন্দ্রনাথ কতদূর কর্মব্যস্ত, বিপ্লবের আয়োজন তলায় তলায় কতদূর তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তার একাধিক বর্ণনা তাঁর বিভিন্ন জীবন-চরিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঘা যতীন' থেকে মাত্র একটি দিনের ঘটনা শোনাই নিজের ভাষায় :

সকালে চুয়াডাঙা থেকে সাইকেলে চলে যতীন্দ্রনাথ রওনা হলেন, এক-ঘণ্টার মধ্যেই এসে পৌছলেন ঝিনাইদায়।—এককাপ চা খেতে খেতে বিপ্লবী সহকর্মী বিভূতি দেবরায়ের সঙ্গে কথা বলে তিনি তখনি রওনা হলেন যশোর। ঝিনাইদা থেকে যশোর আঠাশ মাইল রাস্তা। কবিরাজ বিজন রায় মশাইকে সমিতি-সংক্রান্ত নির্দেশ দিতে পাঁচ-সাত মিনিটকাল যশোরে কেটে গেল। সবচেয়ে বেশি যাকে দরকার সেই সত্যেন সেনকে গিয়ে ধরতে হবে মাগুরায়।* অতএব যতীন্দ্রনাথ তখনি পাড়ি দিলেন মাগুরায়—আরো আঠাশ মাইল পথ। সেখানে পৌঁছে যতীন্দ্রনাথ খবর পেলেন, তিনি আসছেন এই কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সত্যেন একটু আগেই রওনা হয়ে গিয়েছেন ঝিনাইদা, সাইকেল নিয়ে! এ-কথা শোনামাত্র যতীন্দ্রনাথ আবার ছুটলেন ঝিনাইদার দিকে, নক্ষত্রগতিতে। মাগুরা থেকে ঝিনাইদা সতেরো মাইল পথ। সত্যেন সেখানে পৌঁছবার আগেই তাকে ধরে ফেলতে হবে। নইলে তিনি যদি আবার যতীন্দ্রনাথকে খুঁজতে যশোর যান?···

যতীন্দ্রনাথ প্যাড্‌ল্ করে চলেছেন খুব জোরে। কিন্তু সত্যেনকে তো দেখতে পাচ্ছেন না। মধুপুরের হাটতলা পার হয়ে গেলেন—আর মাত্র চার মাইল পথ। কিন্তু সত্যেন গেল কোথায়? আরো জোরে—আরো—আরো জোরে ছুটল সাইকেল। এল ধোপাঘাটার গোল—ঝিনাইদা আর মাত্র দুই মাইল। কিন্তু সত্যেন কই? আরো জোরে···আরো···সাইকেল ভেঙে যাবে না তো?···আর মাত্র মাইল-দেড়েক পথ। রাস্তাটা এখানে খুব ভাল। দু-পাশে বড় বড় ঝাউ। ছায়া-শীতল।···

ওই দূরে—কে একজন সাইকেল চড়ে যাচ্ছে না?—আগের সাইকেলটা

জীবনী গ্রন্থটি রচনা করেন এবং চন্দননগর থেকে প্রকাশ করানোর পিঠপিঠই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়া সেই ইতিহাস-বিখ্যাত "বিপ্লবের বলি" থেকে উদ্ধৃত॥

* দু-এক বছরের মধ্যেই এই সত্যেন সেনকে দলের কাজে যতীন্দ্রনাথ আমেরিকা পাঠালেন। যুদ্ধের সময় ইনি আমেরিকা থেকে জাপান হয়ে যতীন্দ্রনাথের কাছে বিদেশী সাহায্যের চূড়ান্ত সংবাদ নিয়ে আসেন॥

ক্রমেই নিকটতর হয়ে আসছে। আরে—ওই তো, সত্যেন! ব্যাস, আর কোথায় যায়? ঝিনাইদা শহরের একেবারে প্রান্তে, টুইডি স্পোর্টিং গ্রাউণ্ডের কাছে এসে যতীন্দ্রনাথ সত্যেনকে ধরে ফেললেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে বসলেন মাঠের ধারে। ঝাউগাছ-তলায় কথাবার্তা হল। পোস্ট-অফিসের ধারেই চক্রবর্তী মশাইয়ের মিষ্টির দোকান। পেটভরে কাঁচাগোল্লা খেলেন দু'জন। সত্যেনকে নির্দেশমতো পথে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চললেন চুয়াডাঙা। আবার বাইশ মাইল পথ। সেখান থেকে বিকেল পাঁচটার ডাউন চাটগাঁ মেল-ট্রেন চেপে রওনা হলেন তিনি কলকাতা।

অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই একশ' সতেরো মাইল পথ সাইকেলে অতিক্রম করবার মতো অতি-মানব ইংরেজের গোয়েন্দা-বিভাগে ছিল না বোধহয়। তাই, কথাটা যখন সরকার থেকে জানতে বাকি রইল না যে, কন্‌ট্রাক্টরির আড়ালে যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবের বহ্নিই ছড়িয়ে চলেছেন চারধারে, গোয়েন্দা-বিভাগের ওপর আরো তৎপর হবার জরুরি নির্দেশ এল।

ফলে যতীন্দ্রনাথের গতিবিধি অনুধাবনে অক্ষম গোয়েন্দারা অনেকেই তাঁর শরণাপন্ন হল। ছা-পোষা এই গোয়েন্দাদের শাস্তি দিতে বরাবর বেধেছে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের মানবিকতাবোধে। তিনি ওদের বহুবার নিষেধ করেছেন তাঁর পেছু নিতে। কিন্তু তারা যখন জানাল, "দাদা এ-কাজ না করলে আমাদের সংসার যে অচল হয়ে যাবে"—করুণা-পরবশ তখন থেকে যতীন্দ্রনাথ আর তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তারা তাদের সাধ্যমতো যতীন্দ্রনাথের গতিবিধির যতটুকু হদিস পায়, তাই দিয়েই দিনের পর দিন তাঁর নামে রিপোর্ট দাখিল করে চলে।

আবার অনেক দিন একেবারেই যতীন্দ্রনাথের নাগাল সারাদিন না পেয়ে কোন কোন গোয়েন্দা পরদিন গাড়ি ভাড়া ক'রে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে, আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছে, "দাদা, আজ আমার গাড়িতে আপনার না-গেলেই নয়। কাল তো একদম রিপোর্ট পাঠাতে পারি নি—"

"ওঃ, এই কথা। তা' এই নে, এই রিপোর্ট লিখে দিস!" ব'লে কোনদিন যতীন্দ্রনাথ সত্যি সত্যিই তাঁর গতিবিধির হদিস দিয়ে দিয়েছেন, কোনদিন-বা মৃদু হেসে গোয়েন্দার ভাড়া করা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসেছেন। প্রাণের মমতা তিনি করেন না। ভয় তিনি কাউকে করেন না। জীবন্মুক্ত পুরুষের আবার দ্বিধা?

এমনি এক গোয়েন্দা অফিসার একদিন যতীন্দ্রনাথকে পাহারা দিতে দিতে হঠাৎ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তরুণ অফিসারের দুর্গতি দেখে যতীন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে গেলেন সোজা নিজের বাড়িতে। ঘরের ছেলের মতো তাকে রাখলেন, সেবা-যত্ন করলেন, সারিয়ে তুলে তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়েও দিলেন।

এমনি তো কতই ঘটেছে।

১৯১১ সাল। কাশী স্টেশান।

গাড়ি থেকে যতীন্দ্রনাথ নামলেন সপরিবারে। স্টেশানে তাঁর জন্যে অপেক্ষমাণ বিপ্লবী কর্মীরা এগিয়ে এলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে কর্মীরা কাশীর কেন্দ্রগুলিতে যাতায়াত করেছেন, সর্বভারতীয় বিপ্লবীদের মিলন-কেন্দ্রগুলির অন্যতম প্রধান হল কাশী।

এদের কাছে যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং এলেন তাই নতুন আশার বাণী বহন ক'রে।

কাশীর কর্মীদের সঙ্গে স্টেশান থেকে বাইরে এসেই যতীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল—অদূরে তাঁরই পরিচিত দুটি গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে।···কর্মীদের একজন যাচ্ছিলেন কুলি ডাকতে। যতীন্দ্রনাথ তাঁকে নিরস্ত করলেন, "দাঁড়া, কুলির দরকার নেই। একটু মজা দেখাই।"

গোয়েন্দাদুটির দিকে ফিরে দাঁড়ালেন যতীন্দ্রনাথ। হাতছানি দিয়ে তাদের ডাক দিলেন। পরস্পরের মুখে চাওয়া-চাওয়ি করে তারা বুঝল, বেগতিক। অগত্যা, মুখ কাঁচুমাচু করে এগিয়ে এল।

কাছে আসামাত্র যতীন্দ্রনাথ তাদের নির্দেশ দিলেন, মালগুলো ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দিতে।

হুকুম তামিল হল।

বিপ্লবী কর্মীরা গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। অন্যটিতে সপরিবারে যতীন্দ্রনাথ। আর, মন্ত্রাবিষ্টের মতো গোয়েন্দারাও পিছু নিল।

যতীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় গিয়ে গাড়ি থামল। আরোহীরা নামলেন। আবার কুলিগিরি করতে হল গোয়েন্দাদুটিকে।

তারপর, তাদের ডেকে মিষ্টিমুখ করিয়ে যতীন্দ্রনাথ রেহাই দিলেন, "নাও, বাড়ি চেনা হল তো?"

সঙ্গের বিপ্লবী কর্মীরা তো অবাক!

বাংলার ঘরে ঘরে আদৃত সেদিন যতীন্দ্রনাথ।

কারামুক্তির পর থেকে গোটা দেশে তিনি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে—জেলায় জেলায় প্রতিটি ঘরে তখন তাঁর আসন পাতা। মাইলের পর মাইল সাইকেলে অথবা ঘোড়ার পিঠে ক'রে তিনি বিপ্লব সংঘটনের জন্যে ঘুরছেন; দিনের শেষে অনেক রাতে কোনদিন বা আশ্রয় নিয়েছেন সামনেই যে-গৃহস্থ বাড়ি চোখে পড়েছে, সেখানে: দেখেছেন, প্রায় দিনই, তিনি আসবেন এই প্রতীক্ষাতেই বুঝি গৃহকর্ত্রী কিছু মিষ্টি আর এক জামবাটি দুধ অন্তত রেখে দিয়েছেন। দুধ যতীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়।

আন্তরিক অভ্যর্থনার উত্তাপে রাতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র বিশ্রাম নিয়ে আবার ভোর হবার আগেই অন্ধকার থাকতে পাড়ি দিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ, কেউ টের পায় নি। আজ রাতে পাংশা, পরদিন রাতে বগুড়া, তার পরদিন রাত্রে হয়তো বা হরিনারায়ণপুর নয়তো দৌলতপুরে কাটছে যতীন্দ্রনাথের।

এইভাবেই ভারতের মহান বিপ্লবী নেতা মহাবিপ্লবের যজ্ঞ অনলকে উদ্দীপিত ক'রে তুলতে লাগলেন সুপ্ত জাতির জাগরণ-কামনায়

এমনি একদিন—

বাংলার এক পল্লী অঞ্চল দিয়ে যতীন্দ্রনাথ চলেছেন সাইকেলে। সঙ্গে আছেন পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত এক নেতা।

পথের ধারে এক বুড়ি হঠাৎ হাত নেড়ে নেড়ে তাঁদের ডাকছে, যতীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল।

"আয়তো, দেখি, বুড়ি-মা কি বলতে চায়," যতীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে গেলেন বুড়ির কাছে। সাইকেল থেকে নেমে বুড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি: মিষ্টি গলায় প্রশ্ন করলেন, "কি বুড়ি-মা, আমায় ডাকছ কেন?"

"বাবা, তোকে আমি প্রায়ই এ-পথে আসতে-যেতে দেখি," একটু থেমে বুড়ি বলে। "ভারি ভাল লাগে তোকে দেখে। শুনেছি, তুই নাকি আমাদের দুঃখ মিটিয়ে দিবি ব'লে সায়েবদের সঙ্গে মারপিট করেছিস? ওরা তোকে আটকে রেখে দিয়েছিল থানায়, কিন্তু তোকে বেশিদিন ধ'রে রাখতে পারে নি? পারবে কি? আমাদের সবার আশীর্ব্বাদ কি মিথ্যে ক'রে দেবেন তিনি—"

বুড়ির চেহারায় অপূর্ব এক দীপ্তি দেখে বিস্মিত হ'লেন যতীন্দ্রনাথ।

নীরবে তিনি শুনতে থাকেন বুড়ির কথা। একনাগাড়ে বুড়ি ব'কে চলে, "দেখিস বাবা, আমার মন বলছে তুই পারবি, তুই পারবি। তাঁর আশীর্ব্বাদে তোকে কেউ ধ'রে রাখতে পারবে না!"

সঙ্গী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

বুড়ি বলে, "আমার অনেক দিনের সাধ বাবা," কেমন যেন ইতস্তত ক'রে সে থেমে যায়।

"বল না, মা?" যতীন্দ্রনাথ ব'লে ওঠেন।

"আমার অনেক দিনের সাধ তোমায় ডেকে কিছু খেতে দিই। কিন্তু আমি মোচলমান, তার ওপর গরীব। খাবে কি তুমি আমার হাতে—"

"খাব না মানে?" অট্টহাস্যে মুখর হন যতীন্দ্রনাথ, "তুমি আমার জাত মারতে পারবে? আমার যে জাতই নেই! আমি তোমারই ছেলে—"

বিরক্তিতে অবজ্ঞায় কুঞ্চিত সঙ্গীর মুখমণ্ডল দেখে যতীন্দ্রনাথ বুড়িকে পথ দেখাতে ব'লে তার পেছন পেছন চললেন সঙ্গীকে নিয়ে। এবং অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, "কিরে, গরীব, নোংরা, মোছলমান—খুব বুঝি ঘেন্না তোর?"

"না দাদা, দেখছেন না কী নোংরা? ওর হাতে খেতে পারবেন আপনি?" সঙ্গী বাধা দেন।

যতীন্দ্রনাথের চোখে-মুখে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। চাপা গলায় তিনি সঙ্গীকে বললেন সমাহিত শান্তভাবে, "পারব না? এই কি প্রথম এ রকম খাব নাকি? আমাদের এই তো সাধনা রে। জাত-বেজাত নিয়ে কি আমাদের আর বাছ-বিচার রাখা সাজে?...জাতটা কী, ভেবে দেখেছিস? স্বার্থপর মানুষের সুবিধার্থে একটা সঙ্কীর্ণতা ছাড়া তো আর কিছুই নয়!......"

অপ্রতিভ সঙ্গীর পিঠে হাত রাখলেন যতীন্দ্রনাথ। সস্নেহে বললেন, "আমি জাতও মানি না, তোদের ওই সমাজপতিদেরও তোয়াক্কা রাখি না; কুসংস্কারে ছেয়ে গিয়েছে এই সমাজ। নতুন সমাজ গ'ড়ে ওঠবার দিন এসেছে। দিন এসেছে প্রতিটি মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার দিয়ে সাদরে পাশে এনে বসানোর।"

সঙ্গীটি মাথা হেঁট ক'রে চললেন যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

পরম তৃপ্তিভরে বুড়ির কুটিরে ব'সে যতীন্দ্রনাথ, আর তাঁর সঙ্গীও খেলেন দুধ চিঁড়ে গুড় আর পাকা কলা দিয়ে ফলার।

খাওয়া হ'য়ে গেলে পরিতৃপ্ত বুড়ি নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখল, "বাবা, এ-পথে তুই যখুনি আসবি, আমার ঘরে তোর আসা চাই। যা থাকবে খেয়ে যাবি।..."

যাওয়ার পথে বুড়ি এমন মমত্ববোধ নিয়ে যতীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে রইল, দেখে সঙ্গীটি মনে মনে ভাবলেন : এই না হ'লে নেতা ?

আরো একদিন।

অনেক রাত। ঝিনাইদায় ফিরছেন যতীন্দ্রনাথ। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে এক গ্রাম দিয়ে যেতে যেতে তাঁর কানে এল বালক-কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো এক-আধটা কুটির। গ্রামের শেষ প্রান্ত। লোকালয় প্রায় নেই বললেই চলে।

আর্তনাদ লক্ষ্য ক'রে তিনি গিয়ে থামলেন একটি কুটিরের সামনে। দারুণ যন্ত্রণায় একটা ছেলে ককিয়ে কাঁদছে অস্পষ্ট আলোয় যতীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল।

বিনা দ্বিধায় যতীন্দ্রনাথ ভিতরে ঢুকে পড়লেন। ছেলেটা মাটির ওপর কম্বলে শুয়ে ছটফট করছে। আর অসহ্য সেই দৃশ্যের পাশে অসহায় এক প্রৌঢ় নতমস্তকে বসে অশ্রুমোদন করছেন। ছেলেটির বাবা বোধহয়।

যতীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার।

ছেলেটির বাবা তাঁর শোচনীয় দারিদ্র্যের কাহিনী শোনালেন তাঁকে। কিছুদিন যাবৎ ছেলে পেটের যন্ত্রণায় ভুগছে। কিন্তু কোনও চিকিৎসার সঙ্গতি তাঁর নেই। প্রচুর দেনা। কে চিকিৎসা করবে ?

ছেলেটিকে যতীন্দ্রনাথ পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয়। দুঃস্থের সেবা ক'রে সুফলও পান যথেষ্ট।

সারারাত ছেলেটার শুশ্রূষা চলল অক্লান্তভাবে।

ভোর হল। ছেলেটার বাবার অনুমতি নিয়ে যতীন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে গেলেন ঝিনাইদায়, নিজের বাড়িতে। ভাল ডাক্তার ডেকে তার চিকিৎসা করালেন। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ছেলেটা সেরে উঠল।

দিদি বিনোদবালা এবং স্ত্রী ইন্দুবালার ইচ্ছাক্রমে ছেলেটা যতীন্দ্রনাথের কাছেই রইল। ঘরের ছেলের মতো মানুষ হ'তে লাগল। তার বিদ্যাশিক্ষা,

খাওয়া-পরা, সব ভারই যতীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন। কোনও ক্রটি রইল না। পরবর্তীকালে তিনি বিশিষ্ট একজন নাগরিক ব'লে পরিচিত হন।

এমনি তো কত অজানাকেই তিনি দিয়েছেন জীবনে প্রতিষ্ঠার সুযোগ, কত শত অসহায় ছেলেকে নিজের খরচে নিজের তত্ত্বাবধানে স্নেহে ভালবাসায় যত্নে মানুষ ক'রে তুলেছেন। পরকে তিনি যেমন ঘরে টেনে আনতে সক্ষম ছিলেন, তেমনি বিশ্বজন সকলেই তো ছিল তাঁর কুটুম্ব।

যতীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য অনেক ছাত্র-ছাত্রীই আজ কৃতী হ'য়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

কৃতজ্ঞতা-পরবশ অথবা সম্ভ্রম-বশত কেউ হয়তো যতীন্দ্রনাথকে কোনও মূল্যবান উপহার এনে দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বাষ্পাকুল হ'য়ে উঠেছে: হ্যাঁরে, যে-দেশে লোকে অনাহারে অযত্নে লাঞ্ছনায় পীড়িত, মৃতপ্রায়, সে-দেশে কি এই বিলাসিতা আমাদের সাজে? এই পয়সাটা তুই যদি কোনও গরীবকে দিতিস, তবে পয়সাটার সত্যিই সদ্ব্যবহার হয়েছে বুঝতাম।

আতুর, দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ, সকলেরই দুঃখে বিচলিত হয়ে যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে গিয়েছেন তার সাহায্য করতে। দুঃখ-নিরোধের মহান ব্রতে তিনি ছিলেন সর্বদাই কৃতসঙ্কল্প অগ্রণী।

ঝিনাইদায় যতীন্দ্রনাথ তখন সবে এসেছেন।

তাঁর চোখে পড়ল—পথে পথে একটা পাগল ঘুরে বেড়ায় আর তার পেছনে লেগে লোক মজা লোটে। পাগলের দুর্দশায় ব্যাকুল হ'য়ে তিনি রাস্তায় ছুটে যান। পাগলকে ধ'রে নিয়ে আসেন বাড়িতে।

তাকে ভাল ক'রে স্নান করিয়ে খাইয়ে ছোট্ট একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে দিলেন তিনি। নিয়মমতো তার সেবা-যত্নের ব্যবস্থা করলেন নিজে হাতে।

কিছুদিন কেটে গেল এইভাবে।

প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে যতীন্দ্রনাথের প্রথম কাজ হ'ল পাগলটাকে ভাল ক'রে কবিরাজী তেল মাখিয়ে সুগন্ধি সাবান দিয়ে স্নান করানো। ধব্‌-ধবে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে স্বহস্তে ব'সে তাকে খাওয়ানো।

দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই সুফল দর্শালো। বদ্ধ উন্মাদও মেনে নিল যতীন্দ্রনাথের স্নেহের বশ্যতা। দেখা গেল, সে দিব্যি সুস্থ স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে। চলায় বলায় সব বিকারই প্রায় কেটে গিয়েছে।

কাহিনীর সূচনায় কয়াগ্রামের যে পাগল বুদো পালের কথা বলেছি, সেও

ছিল যতীন্দ্রনাথের স্নেহের বশ। তাঁর চেষ্টায় সে বছরের অনেকটা সময় সুস্থ থাকত; কয়েক মাস মাত্র বিকৃতি দেখা যেত।

অবসর সময়ে মাঝে মাঝে যতীন্দ্রনাথ সহকারী বা বন্ধুদের নিয়ে দাবা খেলতে বসেন। দাবা খেলতে তিনি খুবই ভালবাসেন।

কোন কোন শিষ্য রসিকতা ক'রে বলেন: দাদার দাবা খেলা হচ্ছে আসন্ন অভ্যুত্থানের পরিকল্পনারই অঙ্গ। রাজা, মন্ত্রী, নৌকো, ঘোড়া—সবকিছুই দাদার মনে বিশেষ বিশেষ অর্থের প্রতীক।

এমনি একদিন দাবা খেলতে ব'সে অত্যন্ত বেপরোয়া চাল দিচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ একের পর এক। আড়াই চাল চেলে প্রতিপক্ষের ঘোড়া প্রায় মাৎ করল ব'লে—একজন অনুগামী আর থাকতে না-পেরে চেঁচিয়ে উঠল, "দাদা, দেখছেন না আপনি? সর্বনাশ হ'য়ে গেল যে—"

যতীন্দ্রনাথের নির্বিচল আননে স্মিতহাস্য ফুটে উঠল। তা' লক্ষ্য ক'রে শিষ্যটির মন সঙ্কোচে ভ'রে গেল। যতীন্দ্রনাথ যেন নীরব হাস্যে তাকে তিরস্কার করলেন: অত উতলা হ'লে কি চলে রে?

শিষ্যটির মনে পড়ে গেল যতীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টির একটি কাহিনী।*

যতীন্দ্রনাথ তখন কিশোর। ফেরাজ মিঞার কাছে অস্ত্রশিক্ষা করছেন। ...কৃষ্ণনগর অঞ্চলে সে-কালে লাঠিয়ালদের মধ্যে এক কঠিন পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তার নামই ছিল 'ডাকাতে খেলা'। বিশ-পঁচিশ জন দক্ষ লাঠিয়াল ব্যূহ রচনা ক'রে একটা নির্দিষ্ট কোনও জিনিস রক্ষার ভার নেবে, আর ব্যূহ ভেদ ক'রে সেই জিনিসটা শিক্ষার্থী ছিনিয়ে আনবে অতগুলো লাঠি ভেদ ক'রে। শিক্ষার্থীর লাঠির জোর অতখানি যেদিন হ'বে, সেদিনই তাকে অন্যান্য লাঠি-য়ালেরা ওস্তাদের পদযোগ্য ব'লে স্বীকৃতি দেবে।

ওস্তাদ লাঠিয়ালদের একদিন আসর বসেছে।

লাঠিয়ালরা সকলেই ফেরাজকে বেশ খাতির করে গুণী ব'লে। মিঞার সাকরেদ কিশোর যতীন্দ্রনাথ সেই আসরে গোঁ ধরে বসলেন—তিনিও ডাকাতে খেলায় যোগ দেবেন, ব্যূহ ভেদ করে ওস্তাদদের বাজি জিতে আসবেন।

ফেরাজ কিছুতেই রাজী হয় না। বলে: অতগুলো দড় লেঠেলদের সঙ্গে

* পরে এটি 'বিপ্লবের বলি' গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় স্থান পায়॥

তুমি পারবে কেন দোস্ত ? আর একটু বড় হও, তারপর তুমিও খেলবে।

অন্যান্য সর্দার সকলেই সায় দেয় : দাদাবাবু, তুই বামুনের ছেলে ; অস্ত্র হাতে পড়লে আমাদের জ্ঞানগম্যি লোপ পেয়ে যায়—শেষ পর্যন্ত বামুনের রক্ত-পাত ক'রে আমাদের কেন তুই পাপের ভাগী করবি বল্ ? তা' ছাড়া বড়-বাবুর কানে কথাটা গেলে তিনি আমাদের আস্ত রাখবেন ?

বিপদকে যতীন্দ্রনাথ ভয় পান নি কোনদিন। জননীর কাছে তো এই শিক্ষাটিই তিনি সর্বপ্রথম পান।

তাই অভিমানভরে কিশোর যতীন্দ্রনাথ জবাব দেন : তবে সর্দার এতদিন তুমি আমায় শেখালে কী, এটুকু সামর্থ্যই যদি আমার না হয়ে থাকে ?

অবশেষে ফেরাজ রাজী হ'ল।

শিষ্যের পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। ব্যূহ তৈরি। পেশীবহুল নগ্নবক্ষ লাঠি-য়ালেরা মুঠো মুঠো মাটি মেখে রুক্ষ চুল দুলিয়ে রুখে দাঁড়াল লাঠি বাগিয়ে। লৌহমানবের মতো এক-একজনের চেহারা।

ধীর-গম্ভীর কিশোর যতীন্দ্রনাথ মালকোঁচা মেরে লাঠি-হাতে এগিয়ে এলেন। সুঠাম বলিষ্ঠ তেজোময় দেহ। সুপুষ্ট পেশীগুলো আবেগে ঈষৎ চঞ্চল। ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত বক্ষ, সিংহগ্রীবা। সারাদেহে পৌরুষের দৃপ্ত ভঙ্গী, অপরূপ লাবণ্য এবং অজস্র শক্তির যেন গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। প্রশস্ত ললাটখানি ঢেকে প্রলম্বিত চাঁচর কেশ। দুটি ডাগর চোখ রঞ্জিত হয়েছে অশনি-দীপ্তিতে।...*

গর্বে উত্তেজনায় ফেরাজ তার সাকরেদের দিকে চেয়ে থাকে। নির্ভীক পদক্ষেপ। সঙ্কল্প-কঠোর মুখশ্রী। দেখে চমৎকৃত হয় অস্ত্রগুরুর অন্তর। ফেরাজ চেঁচিয়ে ওঠে : সাবাস, সাকরেদ।

ব্যূহমুখে পৌঁছনো-মাত্র দমাদম লাঠি পড়তে থাকে যতীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য ক'রে। কিন্তু, সব চোট ঠেকিয়েই শন্‌শন্ লাঠি ঘুরিয়ে যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে চলেন ব্যূহের কেন্দ্র অভিমুখে।

নির্দিষ্ট বাজির জিনিসটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে চোখের পলকে লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতে অক্ষত দেহে বেরিয়ে এলেন লৌহভীমের মতোই দৃঢ়কায় কিশোর বীর।

বিজয়ী যতীন্দ্রনাথকে বুকে টেনে নিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের

---

* যতীন্দ্রনাথের জীবনীকার, শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনা অবলম্বনে।

সর্দার ফেরাজ মিঞা।

"সাবাস সর্দার!"

মুগ্ধ লাঠিয়ালেরা হুঙ্কার ছাড়ে। লাঠি নামিয়ে কাঁধে তুলে নেয় তারা যতীন্দ্রনাথকে। অকুণ্ঠ প্রশংসায় ঘিরে ধরে তারা ফেরাজ মিঞাকে।...

দাবার চালে কিস্তি মাৎ ক'রে মৃদু হাসলেন যতীন্দ্রনাথ। শিষ্যটির দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "কিরে, হয়েছে?"

সঙ্কোচে আবার আরক্ত হয়ে উঠল শিষ্যের মুখ। যতীন্দ্রনাথ তার পিঠে হাত রেখে আহ্বান জানান, "নে, ব'সে যা তুইও!"

নতুন ক'রে চাল শুরু হয়॥

॥ আট ॥

১৯০৯ সালে বাংলা দেশ থেকে যে-কয়জন বিপ্লবীকে ১৮১৮ খৃস্টাব্দের তিন নম্বর রেগুলেশান অনুযায়ী দেশান্তরী করা হয়েছিল, পুলিন দাস ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

জে. এন. ব্যানার্জী ও বারীন ঘোষের সঙ্গে ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্রের অমিল যখন ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রস্ফুট হ'য়ে ওঠে কলকাতায় একত্রে কাজ করবার প্রচেষ্টায়, শ্রীঅরবিন্দ তখন দ্বিতীয়বার এঁদের মিটমাট ক'রে দিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যবস্থা টিকল না। অথচ আদি অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রে জে. এন. ব্যানার্জী এবং বারীন ঘোষ দু'জনেই তখনও অটল রয়েছেন, যদিও আলাদা-ভাবে দু'জনেই নিজের নিজের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজে হাত দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতি সত্ত্বেও বারীন ও জে. এন. ব্যানার্জীর মনোমালিন্য যখন প্রকট হ'য়ে উঠল, হতাশ হ'য়ে জে. এন. ব্যানার্জী তখন বাংলা দেশ ছেড়ে চ'লে গেলেন। বারীনবাবু আরো কিছুদিন অনুশীলনের বাড়িতে যাতায়াত ক'রে—পরে মাণিকতলা বাগানে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন।

এই পরিস্থিতিতে ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র ১৯০৬ সালে ঢাকায় যান বিপিনচন্দ্র পাল ও তারকনাথ দাসকে নিয়ে; এবং তখনই তিনি ঢাকায় অনুশীলন সমিতির একটা শাখা প্রতিষ্ঠা ক'রে আসেন। পুলিন দাস এই শাখার প্রাণস্বরূপ হ'য়ে ওঠেন। এই শাখায় শরীর চর্চা, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতির ওপর বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়; ফলে শ্রীঅরবিন্দ-প্রবর্তিত চরমপন্থী

বিপ্লবের কর্মসূচী থেকে এঁরা খানিকটা স'রে গেলেন, এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে সকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠলেন।

সকেন্দ্রিক হবার বিশেষ একটি কারণ ছিল। পূর্ব বাংলায় ১৯০৫ সাল থেকে বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি এবং ময়মনসিং-এর সুহৃদ সমিতি ও সাধন-সমাজ সক্রিয় ছিল। লাঠিখেলা প্রভৃতি ছাড়াও স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন সম্পর্কে এই সমিতিগুলির অবদান তখন অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরে ১৯০৮ সালের শেষে সমিতিগুলি বেআইনী হয় যখন, ধরপাকড়ের ধুম প'ড়ে যায়—এই পুরনো সমিতিগুলি তখন গুপ্ত-সমিতির কাজেই বিশেষ জোর দেয়। যখন বরিশালে সতীশ মুখার্জী (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ) এবং ময়মনসিং-এ হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন।

ইতিমধ্যে যখন ওইসব জায়গায় ঢাকা থেকে গিয়ে অনুশীলন সমিতির গুপ্ত শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে, স্বতঃই স্থানীয় এই সমিতিগুলির পক্ষ থেকে অনুশীলনের কর্মীরা বাধাপ্রাপ্ত হ'ন। কলকাতার মূল অনুশীলন বিকেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু ঢাকায় পুলিন দাস গোড়া থেকেই অনুশীলনকে centralised party রূপে গ'ড়ে তুলতে চান। তার ওপরে অন্য সমিতিগুলির সঙ্গে দ্বন্দ্বের চাপে ঢাকা অনুশীলন পুরোপুরিই সকেন্দ্রিক অথবা আত্মকেন্দ্রিক দলের রূপ নেয়।

হেমেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়, আগে বলেছি, স্বদেশী যুগের সূচনাতেই, কুষ্টিয়া এবং কলকাতায়। আর জেল থেকে ছাড়া পেয়েই যতীন্দ্রনাথ যখন কাশী যান ১৯১১ সালে, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এঁদের দলের মধ্যে মেলামেশা শুরু হয় তারও দু-তিন বছর পরে।

চোদ্দমাস অন্তরীণ থাকবার পর পুলিন দাস ১৯১০ সালে ছাড়া পেয়ে আবার ধরা পড়লেন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায়। আর এই সময় নাগাদ ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র সন্ন্যাস রোগে মারা যান।

পুলিনবাবুর নেতৃত্বে সকেন্দ্রিক ঢাকা অনুশীলন সমিতি পূর্ববঙ্গের গুপ্ত-সমিতিগুলির সঙ্গে রেষারেষির ভাব নিয়ে কিছুদিন চলবার পরেই দেখা গেল তাদের প্রতি অনাস্থার ভাব প্রস্ফুট হ'য়ে উঠেছে পূর্ববঙ্গের কর্মীদের মধ্যে। শেষোক্তরা কলকাতায় গিয়ে তলায় তলায় যতীন্দ্রনাথের শিষ্যদের সঙ্গে

বিশেষত যতীন্দ্রনাথের তৎকালীন প্রধান কর্মসচিব অতুলকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে মিশতে থাকেন। এবং দেশে ফিরে গিয়ে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে সংগঠনের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা ক'রে অন্যান্য কর্মীদের মনও তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। এবং যথাসময়ে তাঁরা জানতে পারেন যে, নেতারাও প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে গোপনে সংযোগ রক্ষা ক'রে কাজ করছেন। এইভাবেই ব্যাপক হ'য়ে উঠতে লাগল সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করবার সঙ্কল্প—দেশের সর্বত্রই।

পুলিনবাবুর পরবর্তী নেতাদের মধ্যে ঢাকা অনুশীলনে মাখন সেন ও নরেন সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। মাখনবাবু ১৯১০-১১ সাল নাগাদ কলকাতায় চ'লে আসেন এবং উদ্বোধন অফিসে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (বিপ্লবী দেবব্রত বসু) প্রভৃতির সঙ্গে মিশে ঢাকা অনুশীলন সমিতিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার একটা পরিকল্পনা খাড়া করেন। তাই নিয়ে ঢাকা অনুশীলনের ভিন্নমতাবলম্বী নেতা নরেন সেনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকাল কলহ চলে। এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মী নিয়ে তিনি গুপ্ত রাজনীতির আওতা থেকে বেরিয়ে পড়েন। এমন সময় অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাখন সেনকে শ্রমজীবী সমবায়ে ঢুকিয়ে নিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন মাখনবাবু। বর্ধমানে বন্যার সময় তাঁর সেবাকার্যের ব্যবস্থা দেখে অনেকেই খুব সন্তুষ্ট হয়।

১৯১১ সালে বারাণসীর বিপ্লবকেন্দ্র থেকে তরুণ বিপ্লবী শচীন সান্যাল কলকাতায় এলেন। সে সময়ে কলকাতার ডাণ্ডাস হোস্টেলে বারাণসীর দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (পরে রায়সাহেব) এবং খগেন বসু (পরে দিল্লীর খ্যাতনামা চিকিৎসক) থাকতেন। এঁদের সঙ্গেই থাকতেন স্কটিশ চার্চের ছাত্র ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। কলকাতায় এসে শচীন সান্যাল যখন আক্ষেপ করতে লাগলেন, "কাশীর দলের নেতা সুরেণ মুখার্জী তো অবতার হয়েছে, আমায় তোরা অন্য কোনও দলের সঙ্গে জুড়ে দে। অতুলবাবুরা শুনছি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। যা হোক একটা দলের সঙ্গে আমায় ভিড়িয়ে দে।"

দেবনারায়ণবাবুদের সন্দেহ ছিল—এবং সে-সন্দেহ অমূলক নয় যে, ভূপেন্দ্র দত্ত নিশ্চয়ই কোনও বিপ্লবী দলের সঙ্গে জড়িত। তিনি ছিলেন ফরিদপুর জেলা স্কুলের ছাত্র এবং সেখানে অনুশীলনের সভ্যও হয়েছিলেন।

ফরিদপুরের অমৃত গুপ্ত আর তিনি তখনও ঢাকা অনুশীলনের কলকাতা-কেন্দ্রে যাতায়াত করছেন। দেবনারায়ণবাবুরা ভূপেনবাবুকে বললেন শচীন সান্যালের একটা ব্যবস্থা করতে। ভূপেনবাবু ও অমৃতবাবু তখন মাখন সেনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে শচীনবাবুকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। মাখনবাবু ও শচীনে ঝগড়া বেধে গেল আলোচনার সূত্রে। শচীন রেগেমেগে উঠে পড়লেন; ভূপেনবাবুদেরও অগত্যা উঠতে হ'ল।

ঢাকার শশাঙ্ক ওরফে অমৃত হাজরা মাখনবাবুর কাছেই বসেছিলেন। শচীনবাবুরা চ'লে যাবার পরে তিনি ভূপেনবাবুর হোস্টেলে গিয়ে শচীনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

শশাঙ্ক (অমৃত হাজরা) ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী। ঢাকা অনুশীলনের নেতৃস্থানীয় সকলের সঙ্গেই—নরেন সেন, মাখন সেন, রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, মদন ভৌমিক, রমেশ আচার্য, ত্রৈলোক্য মহারাজ, রমেশ চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ রেখে তিনি চলতেন। তার বাইরেও, বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত কর্মী-সঙ্ঘের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। যেমন ধর্মপ্রবণ (মাখনবাবুর সঙ্গে তাই মিল) তেমনি আবার ডাকাতিতে উৎসাহ। যতীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে অতুল ঘোষের সঙ্গেই শশাঙ্কের খুব মেলামেশা ছিল। ভূপেন্দ্র দত্তের কাছেও তাঁর যাতায়াত ছিল।

শশাঙ্কের অনুরোধে ভূপেনবাবু শচীন সান্যালকে পরদিন নিয়ে গেলেন শশাঙ্কবাবুর বাদুরবাগান লেনের বাসায়। পরে শশাঙ্ক শচীনকে নিয়ে যান নরেন সেনের কাছে। বারাণসী দলের সঙ্গে ঢাকা অনুশীলনের এই প্রথম সংস্পর্শ।

যতীন্দ্রনাথের পরামর্শে, দল নির্বিশেষে অতুল ঘোষ বাংলার বিভিন্ন জেলার এবং বাংলার বাইরের কর্মীদেরও কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছেন ছিদাম মুদী লেনে তাঁদের বিখ্যাত বাড়িতে, নিজেদের অসুবিধা ক'রেও। সে-বাড়িতেও স্থান সঙ্কুলান যখন হত না, অতুলবাবু আট-দশজন ক'রে কর্মী নিয়ে গিয়ে তুলেছেন তাঁর ভগ্নীপতি অধ্যাপক কে. পি. বসুর বাড়িতেও; অতুলবাবুর দিদি মেঘমালা দেবী হাসিমুখে তাঁদের সকলের উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ঢাকা অনুশীলনের সভ্যরাও কোনদিন দ্বিধা করেন নি এই আতিথ্য গ্রহণ করতে।

ঢাকা অনুশীলনের নেতা ত্রৈলোক্য মহারাজ (বিরজা ছদ্মনামে) এবং

প্রতুল গাঙ্গুলী (হিমাংশু ছদ্মনামে) কলকাতায় এসে অতুল ঘোষেরই শরণ নিতেন। তাঁদেরই পীড়াপীড়িতে অতুল ঘোষ, 'শ্রমজীবী সমবায়ে' যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়ে দেন।

এই সাক্ষাৎকালে যতীন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পনার কথা বলেন এবং ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের আভাস এঁদের দেন। আমন্ত্রণ জানান এই প্রচেষ্টায় যোগ দিতে।

অনেকভাবে হতাশ হ'য়েও অতুল ঘোষ যে ঢাকা অনুশীলন দলকে সাহায্য করতেন, তার পিছনেও যতীন্দ্রনাথের উদারনীতির প্রভাব অনুভব হ'ত। কারণ, অতুল ঘোষ সবকথা যখন যতীন্দ্রনাথকে খুলে বলতেন, যতীন্দ্রনাথ হাসতেন। ক্ষমার সুরে বলতেন, "ওসব ভুলে যেতে হয়!"

যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার শেষে অবশ্য প্রতুল গাঙ্গুলী একদিন এসে যতীন্দ্রনাথকে ব'লে যান যে, বর্তমানে অনর্থক তাঁদের দলের শক্তি অপচয় করতে তাঁরা নারাজ।

ঢাকা অনুশীলনের নগেন দত্ত (কুমিল্লায় বাড়ি, গিরিজাবাবু ব'লে দলে পরিচিত) বারাণসী গিয়ে শচীনকে বলেন যে, জার্মান সাহায্য নিয়ে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটা বিপ্লবের আয়োজন চলছে—অথচ ঢাকা দলের নেতারা তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন। শচীন সান্যাল তখন খুবই উত্তেজিত হ'য়ে কলকাতায় এসে যতীন্দ্রনাথের জনৈক শিষ্যকে দুঃখ ক'রে বলেন, "তোমরা এতবড় কাজে হাত দিয়েছ, অথচ আমাদের ডাক নি? আমার সম্পর্ক তো তোমাদেরই সঙ্গে ছিল। কেন অনর্থক ওই বাঙালদের দলে আমায় ভিড়িয়ে দিয়েছ, জানি নে!"

যতীন্দ্রনাথের শিষ্যটির নাম ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী। যাদুবাবু কথাটা গিয়ে অতুল ঘোষকে বলেন। এবং দু'জনে পরামর্শ ক'রে স্থির করেন শচীনকে কাশীতে রাসবিহারী বসুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। সেই থেকে শচীন সান্যাল, নগেন দত্ত (গিরিজা), নলিনী মুখার্জী প্রভৃতি অনুশীলনের নেতৃস্থানীয় কয়জন রাসবিহারীর সঙ্গে কাজ করতে থাকেন যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী।

ইতিপূর্বে চন্দননগরের মণীন্দ্র নায়েক (বোমবিশারদ)-এর কাছে রাস-বিহারী বসু লোক পাঠান অতুল ঘোষকে contact করতে। অতুলবাবু তখন রাসবিহারীর দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন; দূত তাঁকে বলেন যে,

তখনকার পরিস্থিতিতে রাসবিহারীর পক্ষে বাংলা দেশে ফেরা বিশেষ বিপজ্জনক—অথচ উত্তর ভারতের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে রাসবিহারীর আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

সব শুনে যতীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি নিজেই যাবেন। এবং অতুল ঘোষ ও নরেন ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে আবার তিনি বারাণসী গিয়েছিলেন। তখন বাংলা দেশ নিয়ে সমস্ত উত্তর-ভারতের অভ্যুত্থানের একটা পরিকল্পনা তাঁরা আলোচনা করেন যতীন্দ্রনাথের পুরনো বন্ধু রাসবিহারীর সঙ্গে। উত্তর-ভারতের সংগঠন ও সৈন্য-বিভাগের সঙ্গে সংযোগের বিশেষ দায়িত্ব রাসবিহারীর উপরে ন্যস্ত থাকে।

বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় ভারতের সর্বত্র সন্ন্যাসীরা এবং সন্ন্যাসীবেশী বিপ্লবীরা উগ্র বিদ্রোহের ভাবধারা প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন। সরকারি নথিপত্রও এঁদের কার্যাবলীর কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যতীন্দ্রনাথ এবং আরো কেউ কেউ নিয়মিত রামকৃষ্ণ মিশনে যেতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে দেবব্রত বসু (প্রজ্ঞানন্দ) ও অন্যান্য কোন কোন সাধুর সঙ্গে মিশতেন। যার ফলে সরকারি মন্তব্য দেখি একটি ফাইলে :

"Jatin Mukherjee seems to be a confirmed member of the Ramakrishna Misson."

আগেই বলেছি, তারক দাস এবং অধর লস্কর বিদেশে যাবার আগে মাদ্রাজে সন্ন্যাসীর বেশে বিপ্লবের বাণী প্রচার করেন গিয়ে। পাঞ্জাব অঞ্চলে স্বনামধন্য জে. এন. ব্যানার্জী (স্বামী নিরালম্ব) তাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার পরেও যতীন্দ্রনাথের বন্ধু নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক ('যুগান্তর' পত্রিকার অন্যতম কর্মকর্তা ও 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর পরিচালক) স্বামী ভবানন্দ নামে ও-অঞ্চলে গিয়ে বহু কর্মীকে উদ্বুদ্ধ করেন। বোম্বাই ও নাসিক অঞ্চলে ছিলেন যতীন্দ্রনাথের বন্ধু ও অনুগামী ভবভূষণ মিত্র (স্বামী সত্যানন্দ) প্রভৃতি কয়েকজন। বাংলা দেশে এই যুগের বিভিন্ন সময়ে যতীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী সন্ন্যাসীদের অন্যতম ছিলেন যশোরের কালিদাস সন্ন্যাসী এবং সাধক বামাখ্যাপার যোগ্য শিষ্য তারাখ্যাপা। এরা সকলেই কোন না কোনও সময়ে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছেন জাতির মনে।

সর্বোপরি, যতীন্দ্রনাথের গুরু স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের অবদানও এইসূত্রে স্মরণযোগ্য। সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়; তার

প্রয়োজনও নেই। এঁরা সকলেই জাতির জীবনে এনে দিতে সাহায্য করেছেন নতুন আলোর রেশ।

জুন মাস। ১৯১৩ সাল।

প্রায় প্রতি বছরেরই মতো ঢল নামল দামোদরের বুকে। প্রলয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে কত না গ্রাম ভাসিয়ে দিল দামোদর। কত মানুষ, গরু, মোষ, ছাগল ভেসে চলল দারুণ বন্যায়। ভেসে গেল মাঠ মন্দির জনপদ।

বর্ধমান শহরও প্রলয়ের আবর্তে টলটলায়মান। শত সহস্র বাস্তুহারা বিচলিত অসহায় হয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল।

এই বন্যায় দেশের নেতৃস্থানীয় সকলেই ত্রাণের কাজে নামলেন। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম অবধি জলময়। থৈ থৈ করছে চারিধার। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ বাংলা, এমন-কি আসাম থেকেও কর্মীরা এলেন। তা' ছাড়া মারোয়াড়ি, মাদ্রাজী, বিহারীর সংখ্যাও কম নয়।

সমস্ত গুপ্তসমিতি থেকেই স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হল। যতীন্দ্রনাথও সদলবলে অকুস্থলে গিয়ে পৌঁছলেন সাধ্যমতো অর্থ, খাদ্য, বস্ত্রাদির রসদ নিয়ে।

সর্বভারতীয় বিপ্লবী সংগঠনের কর্মীদের এই অবাধ মেলামেশার সুযোগ পুলিশের চোখ এড়াল না। কিন্তু যে অক্লান্ত নিষ্ঠা ও উদ্যম নিয়ে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা আর্তত্রাণের ব্রতে নামলেন, তা' দেখে পুলিশ কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত মুগ্ধ হলেন। খুব ভালই রিপোর্ট পেশ করলেন এঁদের ত্রাণকার্য সম্পর্কে।

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "১৯১৩ খৃস্টাব্দে বর্ধমান ও কাঁথিতে বন্যা হয়। বন্যাপ্লাবিতদের সেবার জন্য তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। যতীন্দ্রনাথও আসেন।...এবার তাঁকে সামনে পেয়ে কর্মীরা খুব খুশি।..."

স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য রাজেন্দ্রলাল আচার্য তাঁর "বাঙালীর বল" গ্রন্থে লিখেছেন, "বন্যায় যে তখন শুধু বারিপ্রবাহ আনয়ন করিয়াছিল তাহা নহে—বঙ্গের প্রাণ সেই প্লাবনে ভাসিয়া বাঙালীর দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছিল—সেই উপপ্লব ভাবিতে বুঝিতে ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে শিখাইয়াছিল : আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ—আমার পিতৃপিতামহের স্বদেশ—আমার সন্তান-সন্ততির স্বদেশ—আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদদাতা স্বদেশ।"

ইংরেজদের মুখপত্র Englishman লিখল যে, ভারতবাসীর সহৃদয়তার পরীক্ষা ইতিপূর্বে যদি কোনদিন হয়েও থাকে, এই বন্যা ও আর্তের রোদন আরেক বার তা' পরখ করে নিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা' অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এঁদের মধ্যে আবার বাঙালী, মারোয়াড়ি ও বিহারী স্বেচ্ছাসেবকেরা এক নবীন আলোকের নতুন প্রভায় সমুদ্ভাসিত হয়েছেন, তাঁদের আত্মোৎসর্গ ও সৎসাহসের দৃষ্টান্ত বহুদিন স্মরণে থাকবে।

দিল্লী থেকে বড়লাট তার ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জানালেন : "বন্যাপীড়িত জেলাগুলির সুদূর গ্রামে পর্যন্ত ত্রাণের কাজে ছাত্ররা যে সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে, তা দেখে মন আমার শ্রদ্ধায় ভ'রে গিয়েছে।"

টাউন হলের জনসভায় বাংলার গভর্নর বললেন, "এঁদের কার্যবিবরণ আমরা সকলেই পড়েছি। এই ব্যাপারে বাঙালী যুবকদের স্বার্থত্যাগ, কার্য-কুশলতা এবং সাহসের কথা সহজে ভুলব না।"

বন্যাপীড়িতদের সেবার আড়ালে সংগঠনের কাজ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ এতদূর এগিয়ে নিয়ে গেলেন যে, বিপ্লবের ইতিহাসেও চির-স্মরণীয় হয়ে রইল ১৯১৩ সালের এই বন্যা।

বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের একটি বিবরণ দিয়েছেন চন্দননগরের মতিলাল রায়। তাঁর জবানেই শোনাই যতীন্দ্রনাথের মর্মগীতি :

"...সে এক গভীর রাত্রিকাল। যখন স্বেচ্ছাসেবকেরা সকলে তন্দ্রাতুর, তখন আমের বনে রামপ্রসাদী সুরে একজনের কণ্ঠে মাতৃবন্দনার ঝঙ্কার উঠিল। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিতেছে। তরুপল্লব জ্যোৎস্নাবিধৌত হইয়া অপরূপ কান্তিতে ঝিকমিক করিয়া বাতাসে দোল খাইতেছে। কিছু-দূরে রেলগাড়ির হুস্-হুস্ শব্দ উদাত্তকণ্ঠে সঙ্গীতের ঝরণা ঝরিতেছিল।..."

অপূর্ব এই পরিবেশে যতীন্দ্রনাথের সাধককণ্ঠের মাতৃবন্দনা সম্বন্ধে এর পর মতিবাবু লিখছেন, "কী আবেগকণ্ঠে হৃদয় দিয়া তিনি গাহিতেছেন, তাহা কান পাতিয়া সেদিন যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।..."

গায়কের দিকে আকৃষ্ট হ'লেন মতিবাবু। তিনি লিখছেন, "রাত্রি

জাগরণের অভ্যাস আমার ছিল। আকাশের চাঁদ দেখিতে দেখিতে আমি বিভোর হইতাম। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর আমায় যেন আহ্বান করিয়া গায়কের কাছে লইয়া চলিল। আমি ধীরে ধীরে গায়কের নিকটস্থ হইতেই কানে গেল—'ভায়া যে!' পরিচয় ছিল।...আজ তাঁহার চক্ষে জলধারা ঝরিতেছে। আমি বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিতেই যতীন্দ্রনাথ আমায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'আমার গাঁজা কি ভিজিবে না?' সে মধুর কণ্ঠ আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। দেশমাতৃকার প্রেমে আনন্দে তাঁহার গাঁজা যে ভিজিয়াছে, সে প্রমাণ তাঁহার জীবনের ইতিহাসে সুবিদিত।..."

মুগ্ধ মতিলালবাবু আরো লিখছেন, "তাহার হৃদয়ের স্পর্শ পাইয়া আমি স্বাধীনতাবহ্নির আস্বাদ অনুভব করিলাম। যতীন্দ্রনাথের সহিত আমার এই অন্তর-মিলনের মধুর দিনটি চিরদিনের জন্য আমার চিত্তপটে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

বাংলার রাজনৈতিক যজ্ঞভূমি থেকে শ্রীঅরবিন্দ যখন বিদায় নিয়ে পণ্ডিচেরী যান ১৯১০ সালে, তখন যতীন্দ্রনাথ কারাগারে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর তখন সাক্ষাৎ হয় নি। তারপর, সামসুল হত্যাকারী বীরেন দত্তগুপ্তের সঙ্গেই হাইকোর্টে গিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথের যে অনুগামী, সেই সতীশ সরকার পণ্ডিচেরী থেকে শ্রীঅরবিন্দের বার্তা নিয়ে কলকাতায় ফেরেন ১৯১১ সালে এবং যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে উত্তর-প্রদেশে গিয়ে সৈন্য-বিভাগের সঙ্গে যোগস্থাপনের কাজে লিপ্ত হন।

ওদিকে চন্দননগরে মতিলালবাবুর বাড়িতে কয়েকদিন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী যাবার প্রাক্কালে মতিলালবাবুকে নির্দেশ দিয়ে যান বিপ্লবের মশালবাহী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের সহযোগিতা করবার। মতিবাবু লিখেছেন:

"...শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সঙ্কেত দিয়া গিয়াছিলেন।...আম্রকাননে বসিয়া দুইজনে কত কথা হইল। শ্রীঅরবিন্দের বিদায়-যুগের বর্ণনা তিনি কান পাতিয়া শুনিলেন।...তাঁহার প্রেম-বিহ্বল আঁখি-দুইটি পুনঃ-পুনঃ জলে ভরিল। তিনি দেশমাতৃকার মুক্তিপথের কথাই শুনাইলেন।..."

১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে গিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ।

সঙ্গে অতুল ঘোষ।

উৎসব শেষে যতীন্দ্রনাথ বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় একটি তরুণ এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে তার মিষ্টি বিনীত হাসি।

"আরে মধু যে!" যতীন্দ্রনাথ তাকে সাদরে জড়িয়ে ধরলেন এক হাতে। অন্য হাত অতুল ঘোষের কাঁধে রেখে কুশল সংবাদ নিতে নিতে এগিয়ে চললেন যতীন্দ্রনাথ।

মধু অর্থাৎ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, মৈমনসিংহের বিপ্লবী নেতা হেমেন্দ্র-কিশোর আচার্যচৌধুরীর চেলা। হেমেনবাবুর নির্দেশে ১৯১২ সালে কলকাতায় আসেন দলের কাজে। তখন অতুল ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয় এবং অতুলবাবু মধুবাবুকে নিয়ে যান মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের কাছে, অতুল-বাবুদের দর্জিপাড়ার বাড়িতে।

মধুবাবু বলছেন, "দেশে ফিরে হেমেন্দ্রবাবুকে বলতে গেলাম যতীনদার কথা। হেমেন্দ্রবাবু হেসে বললেন: তাঁকে তো আমি চিনি।…"

হেমেন্দ্রবাবুর বোনের বিয়ে হয় যতীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ির গ্রাম কুমার-খালিতে, কয়ার কাছেই। হেমেন্দ্রবাবুর ভগিনীপতি গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী ছিলেন কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা মোহিনী চক্রবর্তীর দ্বিতীয় পুত্র।

এই সুবাদে ১৯০৪ সাল থেকেই হেমেন্দ্রবাবু যতীন্দ্রনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন।

কলকাতায় ১৮নং ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের মেসে ময়মনসিংহের কর্মীরা থাকতেন। ১৯১৩ সালে দীনেশ এবং উপেন রায় (বিধু) নামে দু'জন ময়মনসিংহের কর্মী কলকাতায় দুটি গুপ্তচরকে হত্যা করেন। তাঁদের নামে ওয়ারেণ্ট বার হয়।

সুরেন্দ্রমোহন (মধুবাবু) বলছেন, "যতীনদা আমাকে আর অতুলকে নিয়ে বেলুড় মঠ থেকে বার হচ্ছেন, এমন সময় অশ্বিনী চৌধুরী হন্তদন্ত হয়ে এসে দাদাকে বলল: বিধুকে ধরে নিয়ে গেছে উৎসব থেকে!…

"দাদা বললেন, ওদের যে-করেই হোক ছাড়িয়ে আনতে হবে। চাই কি জেল ভাঙতে হবে।…

"আমরা দাদাকে বললাম, আমরা আগে খোঁজ নিয়ে আসছি। তিনি নিজে যাবেন কেন? ওদিকে বিধুকে নিয়ে স্টীমার ছেড়ে দিল। দাদা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

"খবর এল বিধুকে জামিনে খালাস দিয়েছে!"

শোনা যায়, সামান্য একজন কর্মীকে খালাস করে আনবার জন্যে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের এতটা উতলা হয়ে পড়া মধুবাবুর ভাল লাগে নি। তাই দেখে মৃদু হেসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ।

২৬শে আগস্ট, ১৯১৪ সাল। প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষিত হবার বাইশ দিন পরে।

কলকাতার বিখ্যাত বন্দুক ব্যবসায়ী আর. বি. রডা কোম্পানী তখন বিদেশ থেকে প্রচুর অস্ত্র আনাচ্ছেন। বিশেষত জার্মানীর প্রসিদ্ধ মাউজার (Mauser) পিস্তল।

যতীন্দ্রনাথের স্নেহাস্পদ সহকর্মী বিপিন গাঙ্গুলী এবং বিপিনবাবুর সহযোগী গিরীন ব্যানার্জী (দলের পুরনো এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী) ওই অস্ত্রের একাংশ স্বকীয় করে নিতে উদ্যোগী হলেন। গিরীনবাবুর চেলা শ্রীশ মিত্র (বা হাবুল) দলের পরামর্শেই রডা কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। একের পর এক বিরানব্বই বাক্স অস্ত্র তিনি গঙ্গার ঘাটে কাস্টমস থেকে খালাস করিয়ে গরুর গাড়ি করে রডার দোকানে পৌঁছে দেন।

তারপর, নির্দিষ্ট ২৬শে আগস্ট তারিখে, তিনি অবশিষ্ট চল্লিশ-বাক্স অস্ত্রসমেত গরুর গাড়ি থামালেন মলাঙ্গা লেনে এক লোহালক্কড়ের গুদামে: গিরীনবাবুর একান্ত অনুরাগী কর্মী কালিদাস বসু এই অস্ত্র গুদামে তোলার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

কিন্তু গুদামে অস্ত্র বেশি দিন রাখা সম্ভব হল না; বাক্সগুলো তখন অতুল ঘোষের বন্ধু ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (প্রেসিডেন্সী কলেজে এম এস-সি'র ছাত্র) মশায়ের বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হল। সেখান থেকে বরাহনগরের এক মন্দিরে প্রায় সব বাক্সগুলো তোলা হয়। ওদিকে রডা থেকে খবর পেয়ে পুলিশ যখন তৎপর হয়ে উঠল, মন্দিরের পুরোহিত ভয় পেয়ে তাঁর আত্মীয় নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy)-কে বলেন ওগুলো সরিয়ে ফেলতে।

অস্ত্রগুলো তখন আনা হ'ল অতুল ঘোষের ছিদাম মুদী লেনের বাড়িতে। সেগুলি মাদারিপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ঢাকা, উত্তরবঙ্গ, চব্বিশ পরগনা, হুগলি, চন্দননগর প্রভৃতি কেন্দ্রের নেতাদের হাতে ভাগ ক'রে তুলে দেবার

ব্যবস্থা করলেন যতীন্দ্রনাথ। এবং এই মৃত্যুবাণ প্রয়োগের বিধিও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন তিনি।

বড়বাজারের এক গুদামে কিছু কার্তুজ পেয়ে গেল পুলিশ ; সেইসূত্রে মামলা দায়ের হ'ল। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অনুকূল মুখার্জী, গিরীন্দ্র ব্যানার্জী, হরিদাস দত্ত, নরেন ব্যানার্জী, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস প্রভৃতির বিচার হ'ল। বিপিন গাঙ্গুলী ফেরার হ'য়ে কলকাতার বিভিন্ন কেন্দ্রে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন, বিশেষত যতীন্দ্র-নাথ-শিষ্য ফণী চক্রবর্তীদের বাড়িতে—১২, মির্জাফর লেনে (বর্তমান কলেজ রো)—তিনি অনেক সময় থাকতেন।

যতীন্দ্রনাথ তখনও প্রকাশ্যেই এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে যাতায়াত অব্যাহত রেখেছেন। অতুল ও অমর ঘোষদের ছিদাম মুদী লেনের বাসাই তখন তাঁর হেডকোয়ার্টার, আর বেশি যাতায়াত ছিল ফণী চক্রবর্তীদের ওখানে, ইডেন হিন্দু হোস্টেলে, কলেজ স্ট্রীটে জীবনরতন ধরের মেস্-এ, হর্তুকিবাগান লেনের মেস্-এ, কবিরাজ বিজয় রায়ের দোকানে, শিয়ালদার আর্যনিবাস বোর্ডিং এবং অন্যান্য কয়েকটি আস্তানায়।

প্রসঙ্গত বলি, কিংসফোর্ডের হুকুমে বেত্রাহত বিখ্যাত সুশীল সেন উপরোক্ত ইডেন হোস্টেলেই যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করেন। সুশীল সেন আলিপুর মামলায় সাত বছর দ্বীপান্তর পান ; আপীলে বিচারকদের মধ্যে মতভেদ হয় এবং রেফারেন্সে মুক্তিলাভ ক'রে সুশীল যান শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে তিনি বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে পড়াশুনোয় মন দেন। ১৯১৩ সালে সুশীল আই এস-সি পাশ ক'রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ইনি যতীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক কর্মে বহু সহায়তা করেন) ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের (ইনি, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি নিয়মিত যতীন্দ্রনাথের কাছে যাতায়াত করতেন) স্নেহভাজন হন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়নে বি এস-সি পাঠ্যক্রম গ্রহণ ক'রে ইডেন হিন্দু হোস্টেলে উঠে যান।*

সুশীলের দাদা বীরেন্দ্র সেন (ইনি আলিপুর মামলায় দণ্ডিত হ'য়ে

* যতীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য শৈলেন ঘোষ (বিদেশে যান), সতীশ চক্রবর্তী প্রভৃতি এই ইডেন হোস্টেলটিকে পুরোপুরি কনভার্ট ক'রে ফেলেন যতীন্দ্রনাথের বিপ্লব-পন্থায়। মেধাবী ছাত্র-মহলে সে-যুগে যতীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য॥

আন্দামানে যান) বলছেন, "ইডেন হোস্টেলে যতীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব বেশি। এর কিছু পরে দামোদরের বন্যার ত্রাণকার্য উপলক্ষেও সুশীল যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। এই পরিচয়ই আবার তাঁহার জীবনের মোড় ফিরাইয়া দেয়। দামোদরের বন্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েন, কোন্ পথ লইবেন, তাহা লইয়া। পুরোপুরি সাতদিন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি বিপ্লবের পথে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।..."

দলের স্বার্থে আবার যখন যতীন্দ্রনাথ সাময়িকভাবে ডাকাতির অনুমতি দিলেন, তখন নদীয়ার প্রাগপুরে ডাকাতির সময়ে সুশীল সেনের অমূল্য জীবনটি খেসারৎ দিতে হয়। পদ্মা নদীর ধারে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের লড়াই হচ্ছিল; সুশীল সেন গুলীভরা মাউজার পিস্তল নিয়ে পদ্মার পাড়ে দাঁড়িয়ে—এমন সময় নদীর পাড়ের চাপ ধ্বসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতের পিস্তলের গুলীই তাঁর চিবুকের নিচে লেগে মাথার খুলি ভেদ ক'রে যায়। নদীর ভাঙা পাড় সমেত মৃতদেহ নদীতে ভেসে যায়।

ফিরে যাই রডা কোম্পানীর অস্ত্র-প্রসঙ্গে।

পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল এবং ছেচল্লিশ হাজার কার্তুজ সমেত বাক্সগুলি পেয়ে দেশের বিপ্লবীরা যেন নতুন প্রেরণা পেলেন। এই পিস্তলগুলি হালকা কাজেও যেমন ব্যবহার করা চলে তেমনি আবার খাপটাকে বাঁটের মতো লাগিয়ে নিয়ে মারাত্মক দূর-পাল্লার রাইফেলের কাজেও এই অস্ত্র তখন ইওরোপে প্রসিদ্ধ।

রডা কোম্পানীর কর্মচারী শ্রীশ মিত্র (হাবুল) এই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যটি সমাপন ক'রে দিয়ে অন্তর্ধান করেন। অনেকের ধারণা, তাঁকে তিব্বতের পথে চীনের দিকে পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু হিংস্র জন্তুর কবলে তাঁর প্রাণ যায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, শ্রীশবাবু সন্ন্যাসী হ'য়ে যান।

একটি একটি ক'রে এইভাবে নিঃস্বার্থ সমর্পিত জীবন দেশজননীর চরণে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে যাঁরা পথ বেঁধে দিয়ে গেলেন—তাঁদের কথা ইতিহাসের বুকে আজো অলিখিত। অথচ তাঁদের পাঁজরের হাড় নিয়েই তো গ'ড়ে উঠেছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের চরম অস্ত্র—তাঁদের তিল তিল সঙ্কল্পের স্ফুলিঙ্গেই তো জ্বলে উঠল স্বাধীনতার হোমানল। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ

ক'বেই ইতিহাস এগিয়ে চলল নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণার বশবর্তী হ'য়ে।

দেশের সর্বত্র চাপা প্রস্তুতির ভাব। এখন প্রয়োজন অস্ত্রের। এখন চাই অর্থ-সরবরাহকারী পৃষ্ঠপোষক।

হ্যারিসন রোডে—Y. M. C. A.-এর পাশে স্থাপিত হয় 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে স্বদেশী কাপড়চোপড় ও স্বদেশী শিল্পের বড় একটা দোকান। রাম মজুমদার, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী, সুধাময় মুখার্জী প্রভৃতি এই দোকানের স্বত্বাধিকারী। আপাতদৃষ্টিতে এটি ব্যবসায়-কেন্দ্র হ'লেও বিপ্লবীদের প্রচ্ছন্ন একটি আস্তানা এখানে।

'শ্রমজীবী'র অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন ব্যক্তি। মুরারিপুকুর (মাণিকতলা) বোমার বাগানের সঙ্গে এঁর প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারে নি পুলিশ; তাই এঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে নি।

বঙ্গভঙ্গের সময় বিখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী-রূপে অমরেন্দ্রবাবু প্রচারের কাজে নামেন। উত্তরপাড়া থেকে হুগলি অবধি তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। এই সময়েই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পরিচিত হ'ন।

অনুশীলন সমিতির সতীশবাবুর পরামর্শে ইনি উত্তরপাড়ায় Field and Academy নামে একটি সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। ওস্তাদ মূর্তাজাকে নিযুক্ত করা হয় এখানে লাঠি, ছোরা, তলোয়ার প্রভৃতি শেখানোর জন্যে। সব দলের সভ্যরা এখানে মূর্তাজার কাছে তালিম নিতেন।

'শিল্প-সমিতি' নামে এক দোকান, তাঁতের ফ্যাক্টরি ও কামারশালাও ইনি স্থাপন করেন। উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে মুরারিপুকুর বাগানের জন্যে বোমার খোল বানানোর প্রস্তাব করেন।

১৯০৭ সালের শেষ নাগাদ অমরেন্দ্র মাণিকতলা বোমার বাগানের কর্ম-কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার লাভ করলেন। শ্রীঅরবিন্দ এবং যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, একটি পত্রে তিনি কয়েক বছর আগে বিবৃত করেন। এবং সে-সাক্ষাতের কয়েক মাস বাদেই 'শিল্প-সমিতি'র বারো হাজার টাকা মূলধন ক'রে জনকয়েক বন্ধুর সাহায্যে এঁরা কলকাতায় 'শ্রমজীবী সমবায় লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা করলেন।

অমরেন্দ্রবাবুর সহযোগী হ'লেন ধনী ব্যবসায়ী সুধানাথ মুখোপাধ্যায়।

যতীন্দ্রনাথের বন্ধু অন্নদা কবিরাজের পরিচালনায় অমরেন্দ্রবাবুরা নতুন পর্যায় 'যুগান্তর' ছাপতে শুরু করেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহকারী পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীও এঁদের সঙ্গে এসে হাত মেলালেন।

যতীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় 'শ্রমজীবী'* পুরোপুরি বিপ্লব-কেন্দ্র হ'য়ে উঠল। বাংলার বিপ্লবীদের গায়েব জামা পরণের কাপড় অনেকাংশেই এই 'শ্রমজীবী' সরবরাহ করতে লাগল। 'ছাত্রভাণ্ডার' থেকে কেন্দ্র স্থানান্তরিত হ'ল এখানে; নিয়মিত যাতায়াত করতে শুরু করলেন দেশের সমস্ত বিপ্লবীরা। বিশেষত চন্দননগরের মতিলাল রায়, শ্রীশ ঘোষ, মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন, স্বনামধন্য কিরণ মুখার্জী, রাসবিহারী বসু, বিখ্যাত তিন বোমা-প্রস্তুতকারক: সুরেশ দত্ত, অমৃত হাজরা (শশাঙ্ক), এবং চন্দননগরের মণীন্দ্র নায়েক প্রভৃতি। ঢাকার মাখন সেন, সতীশ সেনগুপ্ত, 'আত্মোন্নতি'র বিভিন্ন কর্মী, মন্মথ ও বসন্ত বিশ্বাস প্রভৃতিও ধীরে ধীরে এখানে সমবেত হলেন। যতীন্দ্রনাথের কর্মসূচীর সম্যক আভাস ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ নেবার জন্যে সকলকেই এখানে আসতে-যেতে হয়। দেখা-সাক্ষাৎও হয় পরস্পরের সঙ্গে।

এমনি আরো দোকান ক্রমে ক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গজিয়ে উঠল। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার উদ্দেশ্যে নামে তারা ব্যবসায়ী কেন্দ্র রইল—তলায় তলায় বিপ্লবীদের গোপন যা-কিছু বৈঠক, গূঢ়তম আদান-প্রদান, মাথা গোঁজার অশ্রয়—সবই এই কেন্দ্রগুলিতে হ'ত। বিদেশের সঙ্গে চিঠিপত্র, টাকা-কড়ি আনানো, ভাবধারার লেন-দেনও এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে হ'ত।

'শ্রমজীবী'র মতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে স্থাপিত হ'ল 'Harry and Sons': এই দোকানের বৈশিষ্ট্য, অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ। মালিক যতীন্দ্রনাথের শিষ্য হরিকুমার চক্রবর্তী। যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে এই দোকানটি খোলা হয়। কারবার বেশ জমে ওঠে।†

* ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পণ্ডিচেরী থেকে সুরেশ চক্রবর্তী, সৌরীন বসু ও নলিনীকান্ত গুপ্ত কলকাতা যান। তখন এঁরা 'শ্রমজীবী'তে গিয়ে অমরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। সুরেশ সমাজপতির সঙ্গেও দেখা হয়। সুরেশ চক্রবর্তী ও নলিনীবাবুর স্মৃতি-কথায় আছে সুরেশবাবুদের তিনজনকে তিনখানা গায়ের কাপড় উপহার দিয়ে অমরেন্দ্রবাবু বলেছিলেন, "Payable when able."

† হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy), ভোলানাথ চ্যাটার্জী, প্রভৃতি ৪৯ কর্ম-

ওদিকে, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের চক্রধরপুরে বিজয় চক্রবর্তীকে পাঠানো হ'ল। 'দুর্গাবাবু' ছদ্মনামে তিনি সেখানে কাপড়ের দোকান খুললেন। ভোলানাথ চ্যাটার্জীও এখানে একটা ছোট কারখানা করেন যতীন্দ্রনাথের শিষ্য সুরেশ মজুমদারের চেষ্টায়।

২৪ পরগনা দলের বিখ্যাত শৈলেশ্বর বসু বছর কয়েক বাদে যান বালেশ্বরে। 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' নামে বড় একটা সাইকেলের দোকান আর তারই সঙ্গে একটা ঘড়ির দোকান খুলে তিনি গিয়ে আসর জাঁকিয়ে বসলেন।

সম্বলপুরে এমনি দোকান খুললেন গিয়ে পাঁচু বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এমনি আরো অনেক দোকান ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। কিন্তু তা' একই সঙ্গে হয় নি ; লোকচক্ষুর অন্তরালে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে এই কেন্দ্রগুলি সবই স্থাপিত হ'তে হ'তে বছর চার-পাঁচ লেগে গেল।

॥ নয় ॥

দক্ষিণেশ্বর। রাণী রাসমণির বাগান। পঞ্চবটীতলা।

যতীন্দ্রনাথ পরামর্শ সভা ডেকেছেন। উল্লেখযোগ্য নেতাদের হাতে বিশেষ বিশেষ কর্মভার ন্যস্ত করছেন।

"রাসবিহারী", যতীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, "ফোর্ট উইলিয়ামটা দখল করতে হ'বে। পারবে তুমি ?" মন্ত্রাবিষ্টের মত রাসবিহারী অভিভূত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। পারব।"

আলোচনা শেষ হ'ল। যতীন্দ্রনাথের কাছে বিদায় নিয়ে রাসবিহারী বসু সোজা উপস্থিত হলেন ফোর্ট উইলিয়ামে। কেল্লার শিখ কর্তা মনসা সিং-এর সঙ্গে অল্পকালের মধ্যেই রাসবিহারী আলাপ জমিয়ে ফেললেন। বহুভাষাবিদ তিনি। বিশুদ্ধ পাঞ্জাবী সংলাপ তাঁর আয়ত্তাধীন।

যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী মনসা সিং-এর সঙ্গে কথা পাকা হ'য়ে

ওয়ালিশ স্ট্রীটে থাকতেন। সমিতি বে-আইনী হ'তে ওঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। যতীন্দ্রনাথ বলেন : "তোরা একটা কিছু নিয়ে বস।"—তখন হরি চক্রবর্তী তাঁদের গ্রামের হরিপদ ভট্টাচার্যের (বিশ্বভারতীর ৺চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাই) কাছ থেকে Harry and Sons দোকানটা মাত্র আড়াইশ টাকায় পেয়ে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা শুরু করলেন॥

গেল যে, নির্দেশ পেলেই সসৈন্য মনসা সিং কেল্লায় বিপ্লবীদের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন, প্রবেশ-পথ অবারিত করে দেবেন। বিপ্লবীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হবেন। কেল্লা দখলে আসবে।

গোটা কলকাতা তথা বাংলা দেশেই ইংরেজের বজ্রমুষ্টি অবশ করে দেবার এ-ই সহজতম পন্থা। অজস্র রাক্ষসের প্রাণভোমরা এই কেল্লার মধ্যে নিহিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীরা প্রস্তুত হয়ে আছেন, সহযোগিতা করবেন বলে। তার ওপর বৈদেশিক সাহায্য যদি সময়মতো এসে পড়ে, তা' হলে একীভূত প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা খুব দুরূহ হবার কথা নয়। শ্রীঅরবিন্দের একালের একটি লেখায় তার পূর্ণ সমর্থন আছে।

তারই স্পষ্ট অভিব্যক্তি পাই যতীন্দ্রনাথের সেকালের একটি উক্তিতে, "আমরা যদি অস্ত্রপাতি কিছু কিছু পাই, দেশের বিভিন্ন স্থানে এক-একদল যুদ্ধ করে মরব। তা হ'লে দেশ স্বাধীন করবার পথ জাত চিনবে। শেষ পর্যন্ত দেশের জনসাধারণ না এলে দেশ স্বাধীন হবে না।" চলতি ভাষায় যতীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলেছেন, "ঠ্যালায় ঠ্যালায় দেশ উঠবে।"

যতীন্দ্রনাথের তরুণ অনুগামী বিপ্লবী ভূপেন্দ্র দত্ত মশাই বলেছেন, "১৯২৮-৩০ সালে সাহিত্যিক শরৎবাবু আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। তখন তিনি একটি প্রশ্নকে রূপ দেন—বিপ্লব না বিদ্রোহ? এতসব বুঝবার মত বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা ১৯১৪-১৫ সালে আমাদের ছিল না, কিন্তু দাদা (যতীন্দ্রনাথ) আমার কাছে একদিন একটি কথা বলেন যাতে এই প্রশ্নেরই আভাস ছিল, পরে বুঝেছি।...এর খানিকটা তখন দলের মধ্যেও ফুটে উঠেছিল।... ঐ বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় সে যুগে কতকটা যেন দেখেছি বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ভিতর আর ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরীর ভিতর..."

এই অভ্যুত্থানের যে তরঙ্গমালা, তার পরিণতি কোথায়? প্রথমে, একের পর এক ব্যর্থতার চরম অর্ঘ্য। তারপর, অবশেষে, আসবে স্বাধীনতা। সেই স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের আগমন আকস্মিক বলে যাতে অনুভূত না হয়, তার জন্য যতীন্দ্রনাথ তাঁর অনুগামী ও শিষ্যদের প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন: সরকার, আইন-কানুন, দেশরক্ষা বিভাগ, শিক্ষা উন্নয়ন বিভাগ প্রভৃতির কথা স্মরণ করেই তো তাঁরা প্রথম অগ্নিযুগের কর্মসূচী প্রস্তুত করেন। ১৯০৫ সালে জাতীয় বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বহুমুখী যে শিক্ষার বীজ বপন করা

হয়েছিল শিক্ষার্থীদের মনে, তার সার্থকতার মহালগ্ন বুঝি সমাসন্ন হ'ল। যেখানে রাষ্ট্রনীতির ক্লাস নিয়েছেন বরেণ্য নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ; অর্থনীতির ও ইতিহাসের ক্লাস নিয়েছেন সখারাম গণেশ দেউস্কর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর; সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, নীতি-শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা-শাস্ত্র, দর্শন সবকিছুতেই হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন উনিশ শতকের দিকপাল প্রতিভারা—সেই জাতীয় বিদ্যাপীঠের শিক্ষাবীজ এতদিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে উন্মুখ। আগত দিন। অবিচলিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিপুল জন অভ্যুত্থানের কাজ এগিয়ে নিয়ে চললেন যতীন্দ্রনাথ।

তাঁর সঙ্গে এসে দাঁড়ালেন বিভিন্ন যে-সব নেতৃবৃন্দ, তাঁদের মধ্যে রাস-বিহারী বোসও একজন।

ইতিপূর্বে তাঁর কথা সামান্য আলোচনা করেছি। আর একটু করব। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ২৫শে মে রাসবিহারীর জন্ম। অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর ছয়-সাতের ছোট তিনি। চন্দননগরে এঁর বাবা থাকতেন। সেই সূত্রে চন্দননগরের সঙ্গে ইনি নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন।

চন্দননগরের বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক চারু রায়ের কাছেই রাসবিহারীর বিপ্লবে দীক্ষা, যেমন কানাইলাল দত্ত, মতিলাল রায়, শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতিও। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদের কারও কারও সঙ্গে রাসবিহারীর সামান্য পরিচয় ছিল; যতীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়।

১৯০৮ সালে যখন বারীন ঘোষ ও অন্যান্য বিপ্লবীরা বোমার বাগানে ধরা পড়ে গেলেন, সেই সময়েই মুরারিপুকুর বাগানে রাসবিহারীর দুটো চিঠি পুলিশের হাতে পড়ে।

২৪ পরগনার শশিভূষণ রায়চৌধুরীর সহায়তায় রাসবিহারী আত্মগোপন করলেন গিয়ে দেরাদুনে এবং কিছুদিন রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা করে, দেরাদুনের বন বিভাগে তিনি বড় একটা চাকরি পেলেন।

যতীন্দ্রনাথ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন সংগঠনকে আবার দাঁড় করালেন, তখন বিভিন্ন নেতাদের কাছে নতুন করে অগ্রসর হবার যে আমন্ত্রণ পাঠান, রাসবিহারীও তাঁদের একজন।

স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য রাজেন্দ্রলাল আচার্য তাঁর 'বিপ্লবী বাঙ্গালা' গ্রন্থে লিখেছেন যে যতীন্দ্রনাথের কোনও সঙ্গীর নির্দেশে বসন্তকুমার বিশ্বাস

গিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।* তারপর থেকেই দেখা যায় রাসবিহারী পুনরায় বিপ্লবী দলে প্রত্যক্ষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। রাজেন্দ্রলাল আচার্য আরো লিখেছেন যে, ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র যখন শুরু হয়, তখন চন্দননগরে ও কাশীতে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানাবিধ পরামর্শ করে রাসবিহারী উত্তর-ভারতে গিয়ে দেশী সৈন্যদের দলে টানবার কাজে নামেন এবং পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের নেতারূপে কাজ করতে থাকেন।

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ-রদ হবার পরের বছর, সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লী দরবার বসেছে। বিরাট শোভাযাত্রা নিয়ে হাতীর পিঠে চড়ে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ নতুন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করছেন, এমন সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে রাসবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাস বোমা ফেললেন বড়লাটের ওপর। বোমা ফাটল। বড়লাট আহতও হলেন। রাসবিহারী অন্তর্ধান করলেন।

দেরাদুনে গিয়ে মহা আড়ম্বরে সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তিনি জনসভা আহ্বান ক'রে প্রাণ খুলে আততায়ীদের উদ্দেশে নিন্দা বর্ষণ করলেন। সরকারি চাকুরে তিনি। আনুগত্যে সরকার-তোষণে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে, ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত বিদেশী সরকারের কাঠামোর মধ্যেই গোপনে গড়ে তুলতে হবে স্বাধীন ভারতের জাতীয় রাষ্ট্র—"State within the state!" যতীন্দ্রনাথ তাকেই কার্যকরী করে তুলতে চাইলেন। বিপ্লবীদের অন্তরের মানচিত্রে প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্ফুট করে তুলতে লাগলেন যতীন্দ্রনাথ এই ঈপ্সিত রাষ্ট্র।

স্বাধীন এই স্বরাষ্ট্র বাস্তবের বুকে মূর্ত করে তুলতে হবে বিপ্লবের পর বিপ্লব সংঘটিত করে। তার জন্যে যে অভ্যুত্থান প্রয়োজন তার অপরিহার্য

* এই প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত আরো আলোকপাত করে জানিয়েছেন যে, বসন্তবাবু নিজে বোমা-বিশারদ ছিলেন না: রাসবিহারী বসু বোমা চেয়ে পাঠান অতুল ঘোষের কাছে; অতুলবাবু চন্দননগরের মণীন্দ্র নায়েককে (বোমাবিশারদ) দিয়ে বোমা করিয়ে অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর ওপর ভার দেন সেগুলো রাসবিহারীর কাছে পৌঁছে দেবার।

১৯০৭ সাল থেকেই নদীয়ার পোড়াগাছায় যতীন্দ্রনাথের একটা দল ছিল, জ্ঞান বিশ্বাস তার নেতা। সেই দলের সভ্য বসন্ত ও মন্মথ বিশ্বাস (দুই ভাই) ছিলেন কলকাতায় 'শ্রমজীবী সমবায়'-এর কর্মী। বসন্ত বিশ্বাসের হাত দিয়ে অমরেন্দ্রবাবু বোমাগুলো পাঠালেন রাসবিহারী বসুর কাছে॥

অঙ্গ হচ্ছে অর্থ, অস্ত্র, আর জনগণের সচেতনতা।

স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের সূচনা-প্রত্যাশায় সাময়িকভাবে যতীন্দ্রনাথ অনুমতি দিলেন—ইংরেজ-শাসিত পরাধীন দেশের কোষাগার অস্ত্রে অস্ত্রে উন্মুক্ত করে জনগণের স্বার্থে অর্থ ছিনিয়ে আনতে হবে। সেই অর্থে মুক্তি-সেনানী গঠন করা হবে। সেই সৈন্যবাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে বিদেশ থেকে আনা বিজ্ঞানের অধুনাতম অবদান, সুযোগ্য অস্ত্র। দিতে হবে তাদের সাম্প্রতিক রণনীতির সম্যক শিক্ষা। স্বেচ্ছাসেবক থেকে ষোল আনা সৈন্য গড়ে তোলাই হবে এখন লক্ষ্য।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেছেন, "যুদ্ধ এল। কলকাতার গড়ের মাঠে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প পড়ল। বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিপ্লবীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হল সামরিক কায়দায়ঃ সাঙ্কেতিক পতাকার ব্যবহার, আলোর সংকেত, মিলিটারি প্যারেড, ব্যাণ্ডপার্টি, ঘোড়দৌড়, মোটর চালনা—সবই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হল। Hierarchy ছিল। কিন্তু বালেশ্বর যুদ্ধে যতীনদার দেহাবসানের পর সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। আমরা মফঃস্বলে ছড়িয়ে পড়লাম সবাই আত্মগোপনের তাগিদে।..."

সারা ভারতেই প্রবল উদ্দীপনা। সেই সঙ্গে স্বদেশী ডাকাতির নতুন প্রকোপ। কিন্তু বিদেশী শাসকদের শিক্ষা অনুযায়ী দেশবাসীরাও অধি-কাংশই বিপ্লবীদের 'ডাকাত' নামে অভিহিত করতে লাগল সরকারিমহলে প্রতিপত্তির খাতিরে। আবার অনেকে বিপ্লবীদের সঙ্গে গিয়ে হাতও মেলাল।

বিপ্লবীদের মুখপত্র Administration Report-এ চেষ্টা করা হল দেশ-বাসীর করবার। কেন এই টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে তার কৈফিয়ৎ দেওয়া হল: "যে দেশের সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত, সে সরকার সহজেই খাজনা আদায় করে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠার আগে? লুঠতরাজ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আমাদের দেশীয় সরকার এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। সেজন্যে বলপূর্বক কিছু অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন। এগুলি যুদ্ধকালীন ঋণ বলে গণ্য করা হবে।"*

* 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি': ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যতীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনারই পুরোপুরি পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখি না কি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টায়? এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথের তরুণ সহকর্মী ভূপেন্দ্র দত্ত মশাই লিখেছেন: "কৃষ্ণনগরে এই সময়ে...বন্ধুদের কাছে হেমন্ত সরকার প্রচার করতেন: মুক্তপুরুষ না হলে বিপ্লবের কাজে যোগ দেওয়া উচিত নয়।—মাঝে মাঝে সুভাষ কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে

যশোর অঞ্চল থেকে কর্মব্যস্ত যতীন্দ্রনাথ যখনই কলকাতায় এসেছেন, অধিকাংশ সময় উঠেছেন গিয়ে তাঁর অন্যতম প্রধান আস্তানা—শিয়ালদায়, 'আর্যনিবাস' বোর্ডিং-এ। তাঁর অপর একটি আস্তানা হচ্ছে কবিরাজ বিজয় রায়ের দোকানবাড়ি।

'আর্যনিবাস' প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ করেছি : এঁর মাধ্যমেই যতীন্দ্রনাথ ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে প্রচারকার্য শুরু করান আলিপুর বোমার মামলা যুগে। যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ১৯১০ সালে 'হাওড়া মামলা' যখন শুরু হয়, তখন জাঠ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের উল্লেখও করেছি। এই পাঁচুগোপালবাবু ছিলেন 'আর্যনিবাস' বোর্ডিং-এর পরিচালক।*

হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী প্রমুখ

যেতেন, আমি যেতাম দৌলতপুর থেকে। হেমন্ত হঠাৎ একদিন আমায় জিজ্ঞেস করেন: যতীন মুখার্জী কি মুক্তপুরুষ ? আমি বলি : মুক্তপুরুষ কি তাতো আমি নিজেই জানি না—তবে গীতার আদর্শে গড়ে ওঠা কাউকে যদি জীবন্ত দেখে থাকি তো তাঁকেই দেখেছি।...

"তাঁর (যতীন্দ্রনাথের) বিরাট পৌরুষ যে সুভাষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি যখন বলি, গীতার আদর্শে গড়া ঐ একটি মানুষই আমি দেখেছি, তখন সুভাষের গম্ভীর মুখে যে ছাপ পড়ে তা' আমার চোখ এড়ায়নি।..."

* ফোর্ট উইলিয়মের দশম জাঠ বাহিনীর সঙ্গে দলের তরফ থেকে ১৯০৮-৯ সালে প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন হাওড়া-শিবপুরের নরেন চ্যাটার্জী—'ছাত্রভাণ্ডার'-এর ভোলাদা বলে সে যুগে বিখ্যাত। ইনি হাওড়া মামলায় পলাতক ছিলেন, আগে বলেছি। পুলিশের ধারণা, ইনি তখন কাশীতে ছিলেন।

সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে নরেন চ্যাটার্জী পেশোয়ার থেকে শুরু করে সারা উত্তর ভারতেই ঘোরেন তখন। হাওড়া মামলার পরে এঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই সময় নাগাদ যতীন্দ্রনাথ (অথবা তাঁর কথায় নিখিল রায়মৌলিক) পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে Fort William সৈন্যদের যোগাযোগ করে দেন। নরেন চ্যাটার্জী এই সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন একদিকে শিবপুরের ননীগোপাল সেনগুপ্তদের সঙ্গে, অন্যদিকে খিদিরপুরের শরৎ মিত্রদের সঙ্গে। এঁরা হাওড়া মামলার পরে রাজনীতি থেকে সরে যান। খিদিরপুর দল তখন থেকে শিক্ষক আশু ঘোষ ও দুর্গাচরণ বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এঁদেরই সঙ্গে পাঁচুগোপাল-বাবুর যোগাযোগ। ১৯১৫ সালে ওঁরা যখন ১৮১৮ সালের "রেগুলেশন তিন" অনুযায়ী ধরা পড়েন, পাঁচুগোপালবাবু তখন পলাতক হন।

উক্ত বোর্ডিং-এ যতীন্দ্রনাথের বিশেষ আসা-যাওয়া ছিল যশোরে থাকাকালীন। শিশির ঘোষ, বীরেন ঘোষ, বিজয় রায়, মণি ভট্টাচার্য, সত্যেন সেন, বিভূতি দেবরায় প্রমুখ যশোরের নেতৃস্থানীয়েরা বেশি আসতেন এখানে। উত্তর বাংলা থেকে যতীন রায়ের লোকেরাও॥

যতীন্দ্রনাথের শিষ্য ও আঞ্চলিক নেতারা আসতেন এইখানেই মহানায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, নির্দেশ নিতে।

হরিকুমারের কাছে শোনা যায়—এই সময়, ১৯১৪ সাল নাগাদ, বহুদিন খোলা জানলা দিয়ে 'দাদা'কে তিনি দেখেছেন : গভীর নিশুতি রাতে 'দাদা' একা বসে আছেন, ধ্যানস্থ, চোখে দরবিগলিত ধারা!

এ যেন সেই আকৃতি, যার কথা মতিলাল রায় লিখেছেন : 'আমার গাঁজা কি ভিজবে না?' এই ধ্যানমূর্তির চরম সিদ্ধি, দুর্লভ পরিণতি দেখা যাবে কপ্তিপোদা (বালেশ্বর) অবস্থানকালে যতীন্দ্রনাথের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের যে প্রাণস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন মণি চক্রবর্তী মশাই।

১৯১৫ সাল। জানুয়ারি মাস। কাশী।

যতীন্দ্রনাথ সপরিবারে 'তীর্থ' দর্শনে এসেছেন। তাঁর বাড়িতেই আনাগোনা করছেন উত্তর ভারতের গুপ্ত সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং যতীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন আঞ্চলিক নেতা রাসবিহারী বসু।

যতীন্দ্রনাথের ছোটমামা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "...তাঁহাকে অনুসরণ করা গুপ্তচরদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহারা অবশেষে যতীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার জিনিসপত্র বহিয়া তাঁহার সঙ্গে থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। যতীন্দ্রনাথ কখন তাহাদের দ্বারা সত্য সত্যই মোট বহাইয়া লইতেন, আবার কখন তাহাদের চোখে ধূলা দিয়া এমন অদৃশ্য হইয়া পড়িতেন যে, তাহারা তাঁহার কোন সন্ধানই পাইত না, তাঁহার গতিবিধিও কিছু জানিতে পারিত না। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথ কিছুদিন তাহার ছেলে-মেয়েদের লইয়া দেওঘর ও কাশীতে গিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থানেও পুলিশ তাঁহাকে অনুসরণ করিত। তাহারা সকল সময়ে সকল স্থানে তাঁহার পিছনে না থাকে এ জন্য কাশীতে এক পুলিশের চরকে তিনি বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিয়াছিলেন।

"কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ পুলিশ তাঁহার পিছু লইতে ছাড়ে নাই। একদিন রাত্রিতে কাশীর বাঙ্গালীটোলায় এক গলির মধ্যে যতীন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিলেন। সে নিকটে আসিবামাত্র...তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমাকে বারণ করা সত্ত্বেও কেন তুমি এইরকম জ্বালাতন করিতেছ? এইবার তোমাকে শেষ করিয়া দিই?...' এই বলিতেই সে ভয়ে

কাঁপিতে লাগিল। যতীন্দ্রনাথের বজ্রমুষ্টি ছাড়াইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই।

'অবশেষে যতীন্দ্রনাথ তাহাকে এই বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন, 'তোমার মত নিকৃষ্ট জীবকে মারিয়া আমি হাত কলঙ্কিত করিব না। কিন্তু তুমি সাবধান হইও, আর আমার পিছু লইও না।' সেই হইতে গুপ্তচরটি যতীন্দ্রনাথকে আর সামনাসামনি দেখা দেয় নি।"

উত্তর ভারতের বিপ্লবী নলিনীমোহন মুখার্জীর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে শেঠ দামোদর স্বরূপ, আউধবিহারী, শচীন সান্যাল প্রভৃতি নেতারা আলাদা আলাদাই কাজ করতেন। শচীন সান্যাল কলকাতায় গিয়ে মাখন সেনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন।* এর পর, রাসবিহারীর সংস্পর্শে এসে কাশীর বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা সহস্র গুণে বৃদ্ধি পায়। উত্তর ভারতে কর্মস্থলের সম্প্রসারণ ঘটে। ছাত্র ও যুবকেরা বিশেষ সাড়া দেন।

বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে শচীন সান্যালের আগেও অন্যান্য অনেকের যোগ ছিল, বাংলা দেশ থেকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য যেত উত্তর ভারতের গুপ্তসমিতিতে। ১৯১১-১২ সালে কলকাতার 'শ্রমজীবী সমবায়' থেকে রাসবিহারীর কাছে বসন্ত বিশ্বাসকে বোমা সমেত পাঠানো হয়; ইনিই রাসবিহারীর সঙ্গে এই বোমা নিয়ে যান হার্ডিঞ্জকে হত্যা করতে। তারপর ১৯২৪ সালে মন্মথ বিশ্বাসকে দশটা বোমা সমেত কলকাতা থেকে পাঠানো হয়; সেই বোমা সমেত পিংলে ধরা পড়েন। তখন আউধবিহারী প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে অমানুষিক নৃশংস অত্যাচার করা হয় এবং নামমাত্র বিচারের পরে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। রাসবিহারী গিয়ে কাশীতে আত্মগোপন করেন।

রাসবিহারী উত্তর ভারত সম্বন্ধে যতীন্দ্রনাথকে রিপোর্ট দেন যে দেশী সৈন্যেরা এমন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে যে, আর বোধহয় বেশিদিন অপেক্ষা করা চলবে না। ইতিপূর্বে বিদেশ থেকে অস্ত্র এসে পড়ছে, খবর পৌছেচে। সেই অস্ত্র এলে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিলি-বণ্টন করতে যে-সময় লাগতে পারে, হিসেব করে earliest firm date রূপে ২১শে ফেব্রুয়ারি ধার্য করা হয়: অন্তত সমস্ত উত্তর ভারত, বাংলা এবং মহারাষ্ট্রে একই সঙ্গে অভ্যুত্থান হবে ওইদিন, ঠিক হল। যতীন্দ্রনাথেরও মত ছিল যে অনির্দিষ্ট-কালের জন্যে হাত গুটিয়ে বসে থেকে শক্তির অপচয় করবার বদলে যেখানে যেখানে সম্ভব

* বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের বিবৃতির উল্লেখ আগেই করেছি।

খণ্ডযুদ্ধ করে নিজেদের বেহিসেবী মৃত্যু দিয়ে জাতটাকে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন।—তদনুযায়ী রাসবিহারী কলকাতা থেকে ফিরে গেলেন প্রস্তুতির পরিকল্পনা নিয়ে।

১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে—কলকাতায় ভিড়ল এসে 'সালামিন' জাহাজ। অ্যামেরিকা থেকে 'গদর' দলের একমাত্র বাঙালী নেতা সত্যেন সেন ফিরলেন দেশে। স্মরণে থাকতে পারে, ১৯০৬ সালে যশোরে সীতারাম উৎসব উপলক্ষে যতীন্দ্রনাথ যাঁদের সম্মিলিত করেছিলেন গুপ্ত একটি বৈঠকে, তাঁদের মধ্যে তারকনাথ দাস, অধর লস্কর, শ্রীশ সেন ও সত্যেন সেন ছিলেন অন্যতম; তারপরই তারক দাস বিদেশে যান, এবং পর পর কয়েক বছরের মধ্যে বাকি ক'জনকেও যতীন্দ্রনাথ বিদেশে পাঠান। সত্যেন সেনকে সবশেষ পাঠানো হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা যথাসময়ে করব।

যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী অ্যামেরিকায় তারক দাসের সঙ্গে সত্যেন গিয়ে দেখা করেন এবং কয়েক বছর ওতপ্রোতভাবে সেখানকার শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবীদের মধ্যে কাজ করেন। তারপর জার্মানী থেকে সাহায্য পাবার চূড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়ে তিনি যান জাপানে। সেখানে তখন শক্তি সংহরণ করছেন চীনের বিপ্লবী নেতা ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন।

সান-ইয়াৎ ইতিপূর্বেই ভারতীয় বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর সহযোগিতার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কাছে সত্যেন যতীন্দ্রনাথের বাণী পৌঁছে দেন। অত্যন্ত উৎসাহিত ও আশান্বিত হয়ে সান-ইয়াৎ সেন চীনের ও জাপানের মাধ্যমে ভারতীয় বিপ্লবকে সহায়তা করবার বিভিন্ন পন্থা বাৎলে দেন এবং নিজেও সে-পথে অগ্রসর হন।

'সালামিন' জাহাজ থেকে সত্যেনের সঙ্গে নামলেন 'গদর' দলের মারাঠী বিপ্লবী পিংলে আর বাইশ বছরের যুবক কর্তার সিং; কর্তার সিং অ্যামেরিকা থেকে এরোপ্লেন তৈরির কলকৌশল শিখে এসেছেন। তা ছাড়া সত্যেন সঙ্গে করে এনেছেন কিছু অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র; আর 'গদর' দলের চার হাজার সদস্যও এসেছেন সঙ্গে।

পিংলে ও কর্তার সিংকে নিয়ে সত্যেন সেন উঠলেন গিয়ে যতীন্দ্রনাথের বন্ধু যশোরের কবিরাজ বিজয় রায়ের আস্তানায়। 'গদর' দলের সদস্যদের কয়েক দিন বিশ্রামের পর যতীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দিলেন উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবে, গ্রামে গ্রামে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে কাজ করবার জন্যে। কর্তার

সিং গেলেন তাঁদের সঙ্গে।

পিংলেকে যতীন্দ্রনাথ দূত হিসেবে পাঠালেন কাশীতে, রাসবিহারীর কাছে। সেখানে সর্বভারতীয় নেতাদের একটি বৈঠক ডাকতে হবে, তারই নির্দেশ নিয়ে গেলেন পিংলে। আরো বিশ হাজার 'গদর' সদস্য শীঘ্রই এসে পড়বেন, এ সংবাদও যতীন্দ্রনাথ পাঠালেন রাসবিহারীকে।

সেই নির্দেশ অনুযায়ী রাসবিহারী পিংলে ও শচীন সান্যালকে পাঠালেন পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের কাছে। পরামর্শ সভার আমন্ত্রণ দিয়ে তাঁরা কাশীতে ফিরে এলেন ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে।

কাশীতে, যতীন্দ্রনাথের বাড়িতেই বসল পরামর্শ সভা। উত্তর ভারতের বিপ্লবী নলিনী মুখার্জী লিখেছেন যে ভারতের বিভিন্ন নেতাদের বৈঠক বসল কাশীতে; দিল্লী, কানপুর, অমৃতসর, লাহোর, আজমীর, বাঁকিপুর প্রভৃতি স্থান থেকে নেতারা এলেন। সাময়িক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হল। বাইরে থেকে কয়েক ক্ষেপে জাহাজ ভর্তি অস্ত্র ও অর্থ এসে পড়বে। তার আগে, জার্মান সরকারকে দেখাতে হবে দেশে প্রস্তুতি কতখানি হয়েছে। ১৮৫৭ সালেরই মতো সারা দেশে এবং 'গদর' দলের সহযোগিতায়, ভারতের বাইরের সমস্ত প্রতিবেশী অঞ্চলে—আফগানিস্থান, পারস্য, তুরস্কে, মৌলমীন, সিঙাপুর, ব্যাঙ্কক, বাটাভিয়া, পেনাং, সাংহাইয়ে, সুমাত্রা, জাভা, আন্দামানে বৃটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠবে এই বিদ্রোহের আগুন। সমস্ত অঞ্চল থেকেই দেশী সৈন্যবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়বে বিপ্লবের পথে।

বিপ্লবের প্রথম অভ্যুত্থান-দিবস ধার্য হল: ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ সাল।

যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিলেন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভার। রাসবিহারী ও পিংলে নিলেন পাঞ্জাবের ভার, বিশেষত লাহোরের সৈন্যাবাসের ভার। কর্তার সিং, শচীন সান্যাল প্রভৃতিও রাসবিহারীর সহযোগিতা করবেন। মহারাষ্ট্রের ঘাঁটি আগলে রইলেন কলকাতা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ডাঃ সাভারকর (বিখ্যাত বিনায়ক সাভারকরের ভাই): সেখানে তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার প্রত্যক্ষ প্রভাবে দানা বেঁধে উঠেছে শক্তিশালী দল; তাতে ইন্ধন জুগিয়েছেন যতীন্দ্রনাথের শিষ্য ভবভূষণ মিত্র বা স্বামী সত্যানন্দ। মধ্যপ্রদেশের ভার পেলেন নলিনী মুখার্জী, চলে গেলেন তিনি জব্বলপুরে। দামোদর স্বরূপ গেলেন এলাহাবাদের ভার নিয়ে। চক্রধরপুর ও কুলেঙ্গাতে রইলেন ভোলানাথ চাটুজ্যে, বিজয় চক্রবর্তী প্রভৃতি।

যতীন্দ্রনাথের বাড়িতে রাসবিহারী একদিন বসে গল্প করছেন। কাশীতে। হঠাৎ শিশুকণ্ঠের চিৎকারে তাঁরা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন দোতলার বারাণ্ডা থেকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে যতীন্দ্রনাথের পুত্র তেজেন; আর তাই দেখে তাঁর মেয়ে আশালতা চেঁচাচ্ছে ছোট্ট বীরেনকে কোলে নিয়ে।

একতলার উঠোনে চৌবাচ্চা ভর্তি জল। তারই ওপর তেজেন গিয়ে পড়ল গড়াতে গড়াতে। রাসবিহারী ছুটে তাকে কোলে তুলে নিতেই তেজেনের মুখে প্রথম কথা—"ওই দেখুন কাকা, কী বড় একটা হনুমান!"

ছ'বছরের ছেলে তেজেন। চোখের জল মুছে রাসবিহারীকে বলল—তারা তিন ভাই-বোনে মিলে দোতলার বারান্দায় খেলছিল এমন সময় হনুমানটা এসে তেজেনকে ধাক্কা মারল।

"কীরে তেজেন, কাঁদিসনি তো?" বলে তাকে কোলে নিয়ে হেসে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ।

দিদি বিনোদবালা "কাঁদিসনি তো" কথাটার ইতিহাস বললেন: ঝিনাইদার বাড়িতে, কাউকে কিছু না বলে তেজেন গিয়েছেন তার বাবার ঘোড়ায় চাপতে। কারণ প্রায়ই বাবা তাকে বেল্ট দিয়ে বেঁধে ঘোড়ায় বসিয়ে দেন; সেদিন সে নিজেই তাই পরখ করতে গিয়েছিল। কিন্তু বাহাদুরি করে যেই তেজেন ঘোড়ার লেজে হাত দিয়েছে অমনি প্রতিবাদ-স্বরূপ একটি চাঁট মেরে ঘোড়া তখুনি তেজেনকে ছিটকে ফেলে দেয়। খবর পেয়ে যতীন্দ্রনাথ অচৈতন্য অবস্থায় তেজেনকে তুলে আনেন। তার শুশ্রূষা করতে বসেন। জ্ঞান হতেই বাবাকে দেখে তেজেন বলে ওঠে, "বাবা, আমি কিন্তু কাঁদিনি!"—কারণ কান্নার অপরাধে তাকে একদিন যতীন্দ্রনাথ শাসন করেছিলেন।

কলকাতা। ১৯১৫ সাল।

কর্মব্যস্ত যতীন্দ্রনাথের কাছে সংবাদ আসে: গুরু ভোলানন্দ গিরি মহারাজ কলকাতায় এসেছেন। ব্যাকুল হয়ে যতীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন অতুল ঘোষকে: চল্, তোকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই!

২১১, হ্যারিসন রোড। এ-বাড়িতেই গিরি মহারাজ এসে ওঠেন। এ-বাড়িতেই যতীন্দ্রনাথের গুরুভাই স্বামী রামানন্দ গিরির মুখে শুনেছি, এখানে

এলেই যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে গুরুর প্রসাদ খেয়ে যেতেন। উক্ত গুরু-ভাই বলতেন: একদিন গুরু-দর্শনের শেষে যতীন্দ্রনাথ সিঁড়ি দিয়ে নামছেন; পিছনে রামানন্দ। এমন সময় সিঁড়িতে মুখোমুখি যতীন্দ্রনাথের দেখা হয়ে গেল স্বনামধন্য বিপিনচন্দ্র পাল আর মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে।

বিপিনচন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করে যতীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরলেন: "আরে, যতীন যে, কী খবর?"—সশ্রদ্ধ ঘনিষ্ঠ সুরে যতীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। গুরুভাইয়ের বুঝতে দেরি হল না, এঁদের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের কত গভীর পরিচয়।

আলাপের শেষে যতীন্দ্রনাথ বললেন, "এবার চলি?"

চমৎকৃত হয়ে রামানন্দ শুনলেন বিপিনচন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার যতীন্দ্রনাথকে বলছেন, "তোমার ওপরেই আমরা ভরসা করে আছি যতীন। তোমায় দেখে গর্বে বুক ফুলে ওঠে। তুমি যে আমাদের কুল-দেবতা!"

কুল-দেবতা?……গুরুভাইয়ের খটকা লাগে, ভুল শুনলেন নাকি।…… ততক্ষণে অশ্বিনীকুমার দ্বিতীয়বার বলে উঠলেন—"মিথ্যে বলিনি যতীন, সত্যিই তুমি আমাদের কুল-দেবতা!"

ফিরে আসি এ-দিনের কথায়।

অতুল ঘোষকে নিয়ে গুরু-সন্দর্শনে উপস্থিত হলেন যতীন্দ্রনাথ। ২১১ নম্বর বাড়ির সামনে রাস্তাটা ছেয়ে গিয়েছে গাড়িতে গাড়িতে। গুরু ভোলানন্দ গিরি মহারাজের অগণিত শিষ্য আছেন কলকাতার সর্বশ্রেণীর মধ্যে। অনবরত দর্শনার্থীরা আসছেন-যাচ্ছেন।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে অতুল ঘোষকে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ গেলেন ওপরে। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়েই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গুরুর মুখ। "আ-রে মেরা বাহাদুর! য়ে শূরবীর আ!"

দুই বাহু প্রসারিত করে গুরু উল্লসিত হয়ে উঠেন।

জুতো খুলে, কোট-সুট পরেই যতীন্দ্রনাথ সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন গুরুর শ্রীচরণে।

মিনিটের পর মিনিট অতিক্রান্ত হয়। অতুল ঘোষ বলছেন, "আমি দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। দাদার প্রণাম আর শেষ হয় না। গুরুরও হুঁস নেই। শিষ্যও তেমনি। খানিক বাদে সাদরে দাদার মাথায় আর পিঠে চাপড় দেন গুরু: উঠ্‌ বেটা……"

যতীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ান। নীরব হাস্যে গুরুর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। গুরুও হাসিমুখে একদৃষ্টে শিষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আস্তে আস্তে ভাব-বিভোল স্বপ্নাতুর যতীন্দ্রনাথ চলে আসেন, সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন, যেন আরেক জগতের লোক।

রাস্তায় পৌঁছে হঠাৎ থমকে দাঁড়ান।

"এই রে! দাঁড়া অতুল!" বলে ইতস্তত করছেন দেখে অতুল ঘোষ বলেন, "কি হল?"

"আবার ওপরে যেতে হবে দেখছি!" বলে বাড়িতে ঢুকতে যাবেন, পথ আগলে দাঁড়িয়ে হেসে উঠলেন অতুল ঘোষ, "কেন দাদা? ওপরে কি হবে?"

"বলিস কেন? জুতোজোড়া ফেলে এসেছি!"

"নাও। আর ওপরে যেতে হবে না," বলে অতুল ঘোষ বগল-দাবা থেকে যতীন্দ্রনাথের জুতোজোড়া নামিয়ে দিলেন।

জুতো পরতে পরতে অপ্রতিভ হাসি হেসে যতীন্দ্রনাথ বললেন, "জানিস অতুল, গুরু কি বললেন?"

"গুরু?" অতুল অবাক হন, "কই, তোমাদের দুজনকে তো টুঁশব্দটি করতে দেখলাম না? কথা আবার কী হল?"

"গুরুদেব বললেন আমায়: সামনে যখন এগিয়ে যাবি, পিছন-পানে আর ফিরিস্‌নে!"

এর কয়েক দিন আগেই, ঝিনাইদার বাড়িতে গিয়ে যতীন্দ্রনাথ শেষ দেখা দেখে এসেছেন দিদিকে, সহধর্মিণীকে, নাবালিকা কন্যা আশালতাকে, নাবালক পুত্র তেজেন্দ্রনাথকে, আর শিশুপুত্র বীরেন্দ্রনাথকে। আর কন্ট্রাক্টরির ব্যবসায়ে সহকারী নলিনীকান্ত করকে বলে এসেছেন, "আমি চললাম। তোর শিগ্‌গির ডাক পড়বে। তৈরি থাকিস্‌!"

অতুলের কাঁধে হাত রেখে যতীন্দ্রনাথ ২১১ নম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বললেন, "বড় বড় মাছ ধরতে গিয়ে লোকে যখন সুতো খেলাতে থাকে, সুতো ছিঁড়ে মাছ অনেক সময় পালিয়ে যায়। বঁড়শিটা কিন্তু গলায় তার বিঁধেই থাকে। উঠতে-বসতে অষ্ট-প্রহর তাকে সইতে হয় সেই শোচনীয় বিড়ম্বনা।..."

অতুল ঘোষ তাকান যতীন্দ্রনাথের দিকে।

"আমারো গলায় বঁড়শি গেঁথে ছিল," যতীন্দ্রনাথ বলে চলেন, "সংসার ছেড়ে পুত্র-পরিবারের বাঁধন অবহেলায় আলগা করে এই যে আমি অবলীলাক্রমে ঘুরে বেড়াই—তবু কাঁটার মতো আমায় বিঁধত একটা দায়িত্ব-বোধ। জানি, তোরা আছিস, ওদের কোনদিন অসুবিধে হবে না।"

মাথা নীচু করে অতুল ঘোষ চলতে থাকেন যতীন্দ্রনাথের পাশে পাশে।

"আজ গুরুদেব আমার গলা থেকে সেই কাঁটাটুকু তুলে নিয়ে স্বাধীন করে দিলেন, বুঝলি? মনে করিয়ে দিলেন: যিনি ওদের ইহলোকে পাঠিয়েছেন তিনিই তো আমার সবচেয়ে বড় ভরসা। তিনিই তো তাদের ভরণপোষণের মালিক। আমি কে? পিছন-পানে তাই ফিরতে গুরুদেব মানা করে দিলেন আজ।"

সম্ভবত এ-ই যতীন্দ্রনাথের শেষবারের মতো গুরুদর্শন।

জীবনে কোনদিনই তিনি পিছন-পানে ফিরে তাকান নি। গুরুর এই নির্দেশ পাবার বহু আগেই তো অন্তর থেকে পরম দেবতা তাঁকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন সম্মুখের চিরন্তন পথে, নিঃশেষ করে নিজেকে বিলিয়ে দেবার অমন নিটোল ভূমিকায়। ত্যাগের আদর্শেই যতীন্দ্রনাথ শিখিয়ে গেলেন জয়ের পন্থা।

যতীন্দ্রনাথের গুরুভক্তি প্রসঙ্গে মনে পড়ল একটি কথা। তাঁর জনৈক তরুণ অনুগামী একদিন কথায় কথায় তাঁকে বলে ওঠেন, "দেখুন, দাদা, ওসব ধম্ম-টম্ম আমার ভাল লাগে না। কী আপনি সব গুরুগিরির মহিমা-কীর্তন করেন? ওর কি কিছু প্রয়োজন আছে?"

প্রাণখুলে যতীন্দ্রনাথ হেসে ওঠেন। তারপর তরুণটিকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, "হ্যাঁরে, তোকে কি কখনও আমি গুরু পূজতে বলেছি, না ধর্ম অনুষ্ঠান করতে বলেছি? তোর যা পথ তার নির্দেশ তো তোর অন্তর থেকেই আসবে!..."

তারপর বুঝি-বা খাদে নেমে গেল যতীন্দ্রনাথের মধুর কণ্ঠস্বর, "আচ্ছা বল্‌তো তুই আমার কাছেই বা আসিস কেন? কেনই বা—লোকে যাকে বিপদের পথ বলে, সেই পথে চল্‌বার আদেশ চাস? আত্মীয়স্বজনের স্নেহ-ভালবাসায় কেন তোর মন ভরে না? কেন তুই অন্য পাঁচজনের মতো অর্থ, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সন্ধান ছেড়ে মরণের পথে এগিয়ে যাস?..."

অন্তর্মুখী এক উদাস দৃষ্টি ঘনিয়ে আসে যতীন্দ্রনাথের নয়নে; তিনি বলেন, "আমি গুরুর নাম করে হনুমানের মতো তেজ পাই। রামায়ণে যেমন বলেছে,

জয় রাম বলিয়া বীর
ছাড়িল হুঙ্কার
মুহূর্তে যোজন শত
হইলেন পার—

ঠিক সেই রকম, 'জয় গুরু' বলে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করবার দুঃসাহস পাই। জানিস—

যব্ গুরু গোবিন্জীকা নাম সুনায়ুঁ।
সওয়া লাখ্ পর্ এক্ চঢ়ায়ুঁ ॥

গুরুভক্তি এমনই দুর্নিবার স্পর্ধা সামান্য মানুষের বুকে জাগিয়ে দিতে পারে। বুঝলি?"*

॥ দশ ॥

"দেশের জনসাধারণ দেশের জন্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁহাদের সেই ত্যাগ-বরণের ইচ্ছাকে কি করিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত করিয়া দেশকে বড় করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহা নেতৃবৃন্দ বড় বেশী চিন্তা করেন নাই। দেশের যুবশক্তিকে আজ সেই ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

"যতীনদার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃত কাজ করিয়া যাইতে হইবে। যতীনদা জেলায় জেলায় সংগঠন তৈরী করিয়াছিলেন। তেমনি করিয়া দেশের যুবশক্তিকেও সারা দেশে সংগঠন তৈরী করিতে হবে। তাহা না হইলে বাঙ্গালা ও ভারত বড় হইতে পারিবে না।...

"যতীনদার কাজ করিবার প্রণালীতে ছিল সামরিক নিয়মশৃঙ্খলা। তাঁহার কর্মপদ্ধতিতে আংশিক শৃঙ্খলা বলিতে কিছু ছিল না। পূর্ণ অনাবিল শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠাই যতীনদার কর্মপ্রণালীতে দৃষ্ট হয়। সেইভাবেই জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা না হইলে যে জাতি আজ অনাহারে মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে বাঁচান যাইবে না। আজ ভারতের যে স্বাধীনতা আসিয়াছে দেশবাসী যদি যতীনদার আদর্শ অনুসরণ করিয়া শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার পথে কাজ না করে তাহা হইলে তাহারা সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না।

* ভূপতি মজুমদারের লেখা থেকে॥

"আপনারা যতীনদার মতো দেশের যুবক ও ছাত্রগণের মধ্যে সংগঠন করিতে প্রস্তুত আছেন কি ?

"যতীনদা বাঙ্গালাদেশ তথা সারা ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে গুপ্ত এক গভর্নমেণ্ট তৈরী করিতে চাহিয়াছিলেন। আজ সেই বাঙ্গালা কেবল চীৎকার করিতে জানে।...সারা দেশে যতীনদার আদর্শে সামরিক সংগঠনের মতো সুশৃঙ্খল এক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবেই যতীনদার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে।..."*

বিপ্লবী সংগঠক এবং যতীন্দ্রনাথের প্রিয় সহকর্মী ডাঃ তারকনাথ দাস দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর বাদে কয়েক মাসের জন্য জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে প্রকাশ্য জনসভায় যতীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার সময় উপরোক্ত ভাষণে স্পষ্টই জোর দেন সামরিক সংগঠনের মতো যে শৃঙ্খলার সাহায্যে যতীন্দ্রনাথ দেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন, সেই মহান কর্মপদ্ধতির ওপর।

এবং দেখা যায় যে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে জাপান হয়ে অ্যামেরিকা গিয়ে ১৯০৭ সালেই ডাঃ তারকনাথ দাস পূর্ব অ্যামেরিকার একটি মিলিটারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেছেন—সামরিক শিক্ষায় বাংলার তথা ভারতের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার কর্মসূচীর অংশ হিসেবেই!

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে প্রভৃতি বিপ্লবীর রচনা থেকে এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায় যে, তারকনাথ দাস, অধর লস্কর, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে প্রমুখ ভারতীয় ছাত্রেরা ১৯০৭ সালেই ক্যালিফোর্নিয়াতে একটি India Committee স্থাপন করে সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে, বিশেষত শিখদের মধ্যে বিপ্লব প্রচারের কাজ শুরু করেন।

সামরিক শিক্ষালাভের জন্য তারকনাথ দাস যান ভারমণ্ট্ মিলিটারি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করতে। এবং অধর লস্কর আর পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজেকে পাঠান মাউণ্ট কামালপাইস মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে।

এঁদের প্রচারকার্যের অঙ্গস্বরূপ যেসব প্যাম্ফ্লেট ছাপতেন, তার কিছু কিছু তাঁরা ভারতেও পাঠাতেন। সেইসব পুস্তিকার একটি তাড়া কয়েকজন শিখের হাতে ওঁরা পাঠান রাওয়ালপিণ্ডির বিপ্লবী লালা পিণ্ডিদাসের

* 'আনন্দবাজার পত্রিকা': ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫২। যতীন্দ্রনাথের ৩৭তম স্মৃতি-বার্ষিকীতে শৃঙ্খলাপ্রিয় ডাঃ তারকনাথ দাস এই উক্তি করেন।

কাছে। সেগুলি ১৯০৭ সালেই ধরা পড়ে ভারতে। ফলে পিণ্ডিদাসের নামে মামলা শুরু হয় এবং তাঁর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১৯০৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সাক্রামেন্টোতে এবং অরিগন স্টেটের পোর্টল্যাণ্ডে-ও এঁরা শক্তিশালী কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেইসঙ্গে ওয়াশিংটনে এবং কানাডার বৃটিশ কলাম্বিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারকার্য সম্প্রসারিত করেন।

১৯১০ সালের গোড়ার দিকে, তারক দাস যে মিলিটারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতেন, ইংরেজ সরকারের বিশেষ অনুরোধে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তারক দাসকে বিতাড়িত করেন। তাতে ভারতীয় বিপ্লবের কাজ অ্যামেরিকাতে খানিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তারকনাথ দাস নতুন উৎসাহে কাজ চালিয়ে যান। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নিউইয়র্ক থেকে তারক দাসকে বলেন আরো সতর্ক হয়ে কাজ করতে, নইলে লোক জানাজানি হতে পারে।

এই ঘটনার পিঠ-পিঠ তারকনাথ দাস চলে যান অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে, সিয়াটেল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনো করতে, এবং ব্যাপকভাবে প্রচারের কাজ চালাতে চালাতেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯১৪ সালের মধ্যে বি-এ এবং এম-এ পাশ করেন যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে।

সিয়াটেল থেকে পোর্ট্ল্যাণ্ড মাত্র শ'দুয়েক মাইলের ব্যবধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে, ওইসব অঞ্চলে তখন "কয়েক সহস্র ভারতীয়ের বাস; তাঁদের অধিকাংশই আগে পল্টনে ছিলেন। এঁদের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য প্রচার করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।"—লিখেছেন বিপ্লবী পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে। তারকনাথ দাস কেন যে ওই অঞ্চলে পড়াশুনো করতে গেলেন, তা যথেষ্ট প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে এর থেকে। এবং তিনি সিয়াটেল যাবার পরেই—১৯১০ সালে, অ্যামেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে উঠল পোর্ট্ল্যাণ্ড। ধনী কণ্ট্রাক্টর কাশীরামকে তারক দাসই বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন, এবং কাশীরাম হয়ে ওঠেন পোর্ট্ল্যাণ্ড কেন্দ্রের মধ্যমণি। কাশীরাম তাঁর ধনসম্পত্তি যা-কিছু ছিল সর্বস্ব ঢেলে দেন এই বিপ্লব প্রচেষ্টায়। মোহন সিং গ্রন্থীল এসে যোগ দেন তাঁর সঙ্গে, এবং ১৯১১ সালে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এই সংগঠন। এঁদের কার্যাবলীর অন্যতম ছিল সাইক্লোস্টাইল করে পুস্তিকাদি ছাপিয়ে সর্বত্র চাউর করে দিয়ে দলবৃদ্ধি করা।

১৯১২ সালে যতীন্দ্রনাথের অনুজপ্রতিম কর্মী সত্যেন সেন (যশোর) এসে পৌঁছলেন পশ্চিম অ্যামেরিকায় এবং তারকনাথ দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে তারক দাস ডাঃ ভূপেন দত্তকে লেখেন যে, দেশ থেকে সত্যেন সেন এসেছেন ; তিনি খবর এনেছেন—দেশে খুবই ভাল কাজ চলেছে।* ভূপেন দত্ত তখনো নিউ ইয়র্কে। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুযায়ী এবং তারক দাসের পরামর্শে যতীন্দ্রনাথের দূত সত্যেন সেন পোর্ট-ল্যাণ্ডের বৈপ্লবিক কেন্দ্রে যোগদান ক'রে কাশীরামের নেতৃত্বে কাজ শুরু করেন। তারক দাস নিজেকে সর্বদা প্রচ্ছন্ন রেখে সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রকাশ্যে তাই সত্যেন সেনই এই দলের প্রথম বাঙালী সভ্য।

সত্যেন সেন এসে পৌঁছনোর কয়েক মাসের মধ্যেই যতীন্দ্রনাথের অপর দূত জিতেন লাহিড়ি এসে সাক্ষাৎ করলেন তারক দাসের সঙ্গে। তিনি ডাঃ ভূপেন দত্তের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। তিনি অ্যামেরিকায় গিয়ে খবর দিলেন যে, দলের পুরনো কর্মী ও নেতারা সকলেই সমবেতভাবে যতীন্দ্র-নাথের নেতৃত্বে কাজে নেমেছেন। গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে। বেশি কথা ও হুজুগের পরিবর্তে বাঙালী মুখ বুজে বুক বেঁধে কাজে নেমেছে। দলাদলি ভুলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে।

১৯১৩ সালে পোর্টল্যাণ্ডের বিপ্লবী কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হলেন লালা হরদয়াল। স্মরণীয় একটি ঘটনা। কারণ যেমন এঁর সংগঠনের ক্ষমতা, তেমনি বিচিত্র এঁর উগ্র বৈপ্লবিক মতবাদ। ১৯০৫ সালে ইনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ডে পড়তে যান। মেধাবী ছাত্র। হঠাৎ বৃত্তির প্রতি কেন বিতৃষ্ণা জাগল সঠিক জানা যায় না। ১৯০৮ সালে বৃত্তি ত্যাগ ক'রে দেশে ফিরে এলেন। সে এক বহ্নিময় যুগ-সন্ধিক্ষণের ভারতবর্ষ! এর কয়েক বছর আগেই, শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী ও প্রথম বিপ্লব-শিষ্য জে. এন. ব্যানার্জী সন্ন্যাসী হ'য়ে স্বামী নিরালম্ব নাম নিয়ে পাঞ্জাবে আসেন। যোগেন বিদ্যা-ভূষণের কলকাতার বাড়িতে জে. এন. ব্যানার্জীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। ব্যানার্জী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখেন। ব্যানার্জী সন্ন্যাসী হ'য়ে পাঞ্জাবে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী মতবাদ প্রচার করতে থাকেন।

* ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম': পৃঃ ৮৩।

এই উপলক্ষে লালা লাজপৎ রায়, সর্দার অজিত সিং, তাঁর ভাই কিষেণ সিং (শহীদ ভগৎ সিং-এর পিতা), সুফী অম্বাপরসাদ, ডাঃ হরিচরণ মুখার্জী, হৃষীকেশ লাট্টা প্রভৃতি পাঞ্জাবের প্রাতঃস্মরণীয় বিপ্লবী নেতারা সমবেত হন স্বামী নিরালম্বের চতুর্দিকে : স্বামীজীর নিষ্ঠা ও উদাহরণ, শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারা ও প্রেরণা, যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবাত্মক কর্মযোগ ধীরে ধীরে আগুন ধরিয়ে দিল স্বাধীনতাপ্রেমিক পাঞ্জাবী যুবকদের মনে—যেখানে লালা লাজপৎ রায় ইতিপূর্বেই উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত রেখেছিলেন।

১৯০৮ সালে বিলেত থেকে ফিরে হরদয়াল লেলিহান হ'য়ে উঠলেন এই বহ্নির স্পর্শে। দেশের তরুণ ও যুবকদের হৃদয় নিংড়ে তিনি প্রবাহিত ক'রে দিলেন স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমের শতদ্রু! প্রকাশ্য সভায় তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন : অপূর্ব তাঁর বাক্‌শক্তি!

দিল্লীতে স্বামী নিরালম্বের প্রথম শিষ্য ও কর্মীদের অন্যতম ছিলেন আমীরচাঁদ। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হবার আগে থেকেই তিনি শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করতেন। হরদয়ালও ১৯০৮ সালে আমীরচাঁদের সাহচর্যে আসেন। হরদয়াল আবার বিদেশ যাবার সময় এঁর ওপরেই ন্যস্ত হ'ল দলের ভার। চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাসবিহারী যখন দলের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন, তখন তিনি দেরাদুনে তাঁর পূর্ব-পরিচিত জে. এন. চ্যাটার্জীর কাছে হরদয়ালের সহযোগীদের খোঁজ করলে চ্যাটার্জী দীননাথকে বলেন রাসবিহারীকে আমীরচাঁদের কাছে নিয়ে যেতে। এইভাবে আমীরচাঁদেব সঙ্গে রাসবিহারীর পরিচয়। বসন্ত বিশ্বাস তখন রাসবিহারীর সঙ্গেই থাকতেন। দিল্লীর বিপ্লবী আউধবিহারী রাসবিহারীর অনুরোধে বসন্তকে একটা ওষুধের দোকানে কম্পাউণ্ডারের কাজ জুটিয়ে দেন।

ওদিকে কলকাতার রাজাবাজারে যখন অমৃত হাজরা (ওরফে শশাঙ্ক) ধরা প'ড়ে গেলেন, তাঁর একটি খাতায় বহু বিপ্লবীর নাম-ঠিকানা পেয়ে যায় পুলিশ : যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের হদিসও এইভাবেই সম্ভবত পায় পুলিশ।* বেগতিক দেখে রাসবিহারী ও আর-কয়েকজন বিপ্লবী চন্দননগরে

* বিপ্লবের এই পর্বে বোমার ওস্তাদ বলতে চন্দননগরের মণীন্দ্র নায়েককেই বোঝাত। তিনি ছিলেন মতিলাল রায়ের সহকারী, কিন্তু মতিবাবুর অগোচরেই অতুল ঘোষের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। অমৃত হাজরা (শশাঙ্ক) বোমা তৈরি করা শিখতে চান এবং অতুল ঘোষকে বিশেষ

গা ঢাকা দিলেন। আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, আউধবিহারী, দীননাথ প্রমুখ বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা হয়। এঁরা সবাই সমস্ত নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করেন এবং ফাঁসীর মঞ্চে ওঠেন—দীননাথ ছাড়া: তিনি রাজসাক্ষী হলেন। তিনি এবং জে. এন. চ্যাটার্জী লালা লাজপৎ রায়ের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন হরদয়ালের সঙ্গে।

ফিরে যাই হরদয়াল প্রসঙ্গে। স্যানফ্রান্সিস্কোতে গিয়ে তিনি যুক্ত হলেন তারকনাথ দাস প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলের সঙ্গে এবং নিজে 'যুগান্তর আশ্রম' ও 'গদর' নামে একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই থেকে দলের নামও হল 'গদর'—অর্থাৎ বিদ্রোহ বা যুগান্তর: শ্রীঅরবিন্দ-প্রবর্তিত বিপ্লবেরই প্রতীক। 'যুগান্তর আশ্রম' পরিচালনায় সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন পোর্টল্যাণ্ড কেন্দ্রের কাশীরাম।

এ-ই হল 'গদর' দলের জন্ম-কাহিনী। দলের দুটো বিভাগ খোলা হল: (ক) প্রচার বিভাগ—হরদয়াল স্বয়ং তার কর্মসচিব; আর (খ) সামরিক বিভাগ—যার কর্মসচিব পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে (ইনি খোদ তারকনাথ দাসের লোক)।

'গদর' দলের মুখপত্র 'গদর' পত্রিকা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং অনিয়মিতভাবে ইংরেজিতে প্রকাশিত হ'তে থাকল। আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও ভারতবর্ষ, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়, শ্যাম—যেখানে যেখানে ভারতীয় বা ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বিপ্লবীদের কার্যকলাপ আছে,

অনুরোধ ক'রে অবশেষে তাঁর মাধ্যমে মণীন্দ্র নায়েকের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু মতিবাবুর অজ্ঞাতে বারবার মণীন্দ্রবাবুর কাছে যাওয়া অশোভন মনে ক'রে অতুলবাবু শশাঙ্ককে চন্দননগরে নিয়ে গেলেই মতিবাবুর সঙ্গেও দেখা করতেন। শশাঙ্ক মানুষকে পায়ের ধুলো নিয়ে আপন ক'রে ফেলতেন এবং এইভাবেই মতিবাবুর বিশেষ স্নেহভাজন হ'য়ে ওঠেন। এ-সুবাদে তিনি মতিবাবুর মাধ্যমে অল্প দামে বহু রিভলভার সংগ্রহ ক'রে ফেলেন।

সে-সময়ে উত্তর ভারত থেকে রাসবিহারী বসু যেসব বিপ্লবীদের পাঠাতেন, তাঁরা মণীন্দ্র নায়েকের মাধ্যমেই অতুল ঘোষের নাগাল পেতেন এবং যোগাযোগ রাখতেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গে দেখা ক'রে শশাঙ্ক বহু ঠিকানা সংগ্রহ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সেই খাতা পুলিশ হস্তগত করে। তিনি ভাল মেকানিক ছিলেন: মণীন্দ্রবাবুর পদ্ধতিতে শেখা বোমার ওপর তিনি সিগারেটের খোল লাগিয়ে ট্রিগার পরাচ্ছিলেন—সেসব সমেতই ধরা প'ড়ে যান। উত্তর ভারত ও পাঞ্জাবেরও বহু বিপ্লবীর নাম এইসুত্রেই ফাঁস হ'য়ে পড়ে।

সর্বত্রই 'গদর' পত্রিকা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠল। 'গদর'-এর আহ্বানে তরুণ-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সকলেই অনুপ্রেরিত হ'য়ে উঠল। 'গদর' প্রচার-বিভাগে হরদয়ালের সহকারী হলেন পণ্ডিত রামচন্দ্র পেশোয়ারি, ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি।

দলে একজন মুসলমান প্রচার-সচিবের প্রয়োজন এল। টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষায় সুপণ্ডিত অধ্যাপক বরকতুল্লাকে আমেরিকা যেতে আহ্বান জানানো হয়। তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে ১৯১৪ সালে এসে 'গদর' দলে যোগ দেন হরদয়ালের সহকারীরূপে।

ওদিকে 'গদর' দলের সামরিক-বিভাগের কর্মসচিব পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজের নামে চিঠি নিয়ে মহারাষ্ট্রের গুপ্ত-সমিতি থেকে এই সময়েই উপস্থিত হলেন আগাশে নামে তরুণ বিপ্লবী।

গদরেব একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হল এই ঘোষণা: "চাই বীর সৈন্য—ভারতে বিপ্লবের কাজের জন্য। বেতন—মৃত্যু। পুরস্কার—মৃত্যুঞ্জয়িত্ব। পেনসন—স্বাধীনতা। যুদ্ধক্ষেত্র—ভারতবর্ষ।" তা ছাড়া বাংলার তথা সর্ব-ভারতের মহান শহীদদের কীর্তি-কাহিনী ফলাও ক'রে 'গদর' পত্রিকায় ছেপে পাঠকদের মনে এঁরা প্রেরণা জোগাতে লাগলেন। পাঞ্জাবী, হিন্দী, উর্দু, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষায় বৈপ্লবিক গান রচনা ও প্রচার করাও এঁদের কর্মসূচীর অন্তর্গত হল। 'গদর কা গুঞ্জ' নামে একটি গীত-সঙ্কলনও এঁরা প্রকাশ করেন।

সামরিক বিভাগের প্রধান কাজ ছিল নানা রকমের কুচকাওয়াজ, বোমা প্রস্তুত, পিস্তল ছোড়া, রাইফেল ড্রিল, সামরিক শিক্ষার তথ্যাদি প্রভৃতি সম্বন্ধে সদস্যদের শিক্ষিত ক'রে তোলা। বোমা প্রস্তুতের সময় হরনাম সিং নামে একজন কর্মীর একটা হাত কনুই পর্যন্ত উড়ে যায়—যেমন ঘটেছিল বাংলা দেশে, যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী ইন্দ্রনাথ নন্দীর ক্ষেত্রে।

আমেরিকায় প্রস্তুতির ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দিলাম। এবার আসি ইউরোপের কথায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে ব'সে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, ১৯০৯ সাল নাগাদ ইনি (জার্মানীর মহামান্য সম্রাট কাইজার) ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করেন এবং

বার্লিনেই ইনি একটি ভারতীয় মজলিস প্রতিষ্ঠা করান, যাতে ক'রে ভারতবর্ষে বিদ্রোহ সম্ভব ক'রে তোলা যায়। জার্মান যুবরাজও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। তিনি যখন ভারতবর্ষ পরিদর্শনে গেলেন, তাঁর সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের দহরম-মহরম অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।*

মাণিকতলা বোমার মামলার সময়েই যেসব ভারতীয় বিপ্লবী জার্মানীতে সক্রিয় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন অধ্যাপক শ্রীশ সেন। ১৯০৩ সাল নাগাদ ইনি পরিচিত হন ভগিনী নিবেদিতা, জে. এন. ব্যানার্জী (নিরালম্ব স্বামী), যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে, এবং দলের একদম প্রথম অবস্থা থেকেই ইনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত ছিলেন। ১৯১৫ সাল পর্যন্ত মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থাকে। শ্রীশবাবু জার্মানীর একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে Philosophy with special reference to Vedic Philology বিষয়ে পড়াশুনো ও গবেষণা করেন কৃতিত্বের সঙ্গে এবং একই সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকাতেও অক্লান্ত সংগঠকরূপে কাজ ক'রে যান। তার মধ্যে, জার্মানীর শাসকশ্রেণীর মধ্যে ভারতবর্ষ ও তার স্বাধীনতার সংকল্প সম্বন্ধে চেতনা সঞ্চার করা এবং তাঁদের আগ্রহান্বিত ক'রে তোলা ছিল তাঁরই কাজ। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ সেন এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য জার্মান সরকারের বিশেষ উচ্চপদস্থ ব্যারন ওপেন্‌হাইমের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে Deutscher Verein der Freunde Indien (ভারত-বন্ধু জার্মান সমিতি) নামে সমিতি স্থাপন করেন এবং তার কাজ চালু ক'রে দিয়ে—অত্যন্ত জরুরি তথ্যাদি সমেত তিনি ডক্টরেটের মায়া ত্যাগ ক'রে দেশে ফিরে আসেন।

উক্ত সমিতিতে উচ্চপদস্থ বহু জার্মান এবং বেশ কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী ছিলেন। অধ্যাপক শ্রীশ সেন, ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য, বীরেন চট্টোপাধ্যায় (Chatto), অধ্যাপক সতীশ রায়, ধীরেন সরকার প্রভৃতি বাঙালী সদস্যদের নাম উল্লেখযোগ্য। তা' ছাড়া ছিলেন বোম্বাই অঞ্চলের অনেক অধ্যাপকও।

কিছুদিনের মধ্যেই আর যাঁরা এসে বার্লিনের এই বিপ্লব-সমিতিতে যোগ দিলেন—তাঁদের মধ্যে ডাঃ জ্ঞান দাশগুপ্ত, চম্পকরমণ পিল্লাই, রহমান, দাদা চানজী কেরসাস্প, অধ্যাপক গোপাল পরাঞ্জপে, নারায়ণস্বামী মারাঠে,

* World War I—Edited by H. W. Wilson, Vol. 10, page. 387 দ্রষ্টব্য।

ডাঃ সুক্তাঙ্কর, ডাঃ যোশী, সদাশিব রাও, সিদ্দিকি (পরে হায়দ্রাবাদ ওস্‌মানিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল), করাণ্ডকর, ডাঃ মনসুর আহমেদ প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয়।

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা থেকে এলেন অদ্ভুত করিৎকর্মা সংগঠক তারকনাথ দাস। বার্লিন সমিতির সঙ্গে আমেরিকার সংগঠনের প্রথম মিলন-সূত্র সুদৃঢ় ক'রে আমেরিকায় ফিরে যান তিনি।

বার্লিন কমিটির জার্মান সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ব্যারন সাক্স ফ্রাইহার ফন্ ওপেন্‌হাইম, খোদ কাইজারের অকৃত্রিম বন্ধু আলবেয়ার্ট বালন্ (হামবুর্গ-আ্যামেরিকা স্টীমার কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী), চীনাভাষাবিদ ডাঃ ম্যুলের্ ৎসিম্যারমান্, ভেসেন্‌ডঙ্ক্, হেলমুট্ ফন্ গ্লাজেনাপ (কিছুদিন পরে শেষোক্ত দু'জন যোগ দেন) প্রভৃতি।

উপরোক্তদের মধ্যে সুইৎজারল্যাণ্ডের জুরিখ থেকে চম্পকরমণ পিল্লাই এবং বাসেল থেকে ডাঃ জ্ঞান দাশগুপ্ত আগে থেকেই পৃথক পৃথক সংগঠনের সাহায্যে ভারতবর্ষের বিপ্লবের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন এবং মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কাইজারের কাছে গিয়ে আবেদন জানান: বার্লিনে এঁরা বৃটিশ-বিরোধী কার্যকলাপের কেন্দ্র খুলতে চান।

কাইজার স্বয়ং জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের মাধ্যমে এঁদের অনুরোধ করলেন শ্রীশ সেন, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে যোগস্থাপন করতে। এইভাবে সংগঠন দানা বেঁধে উঠল।

বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। ইনি, ডাঃ তারক দাস, অধ্যাপক শ্রীশ সেন, ডাঃ ভূপেন দত্ত, পিল্লাই, বরকতুল্লা, সুফী অম্বাপরসাদ প্রভৃতি ভারতীয় নেতারা যে অতুলনীয় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন ইওরোপ ও অ্যামেরিকায় কর্মরত বিপ্লবী সহকর্মীদের—সেই মহান ইতিহাস যেদিন পূর্ণাঙ্গরূপে লেখা হবে, সেদিন স্বতঃই দেশবাসীর অন্তর ছাপিয়ে জেগে উঠবে অবিমিশ্র শ্রদ্ধার আর সম্ভ্রমের ভাব। অমর অবিস্মরণীয় এঁরা।

১৯০৯ সালের ১লা জুলাই তারিখে, লণ্ডনের ভারতীয় বিপ্লবপন্থীদের তরফ থেকে এই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহকর্মী মদনলাল ধিংড়া প্রতি-বাদ জানালেন ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের উপর যে দমননীতি অবলম্বন করেছে ইংরেজ সরকার—তারই বিরুদ্ধে! উপরোক্ত তারিখে লণ্ডনের প্রকাশ্য এক

সভায় তরুণ মদনলাল ধিংড়া হত্যা করলেন ভারতসচিব লর্ড মর্লি-র এডি-ক্যাম্প অত্যাচারী স্যার কার্জন ওয়াইলি-কে। মদনলাল ধরা পড়লেন। তাঁর পকেটে একটা চিরকুটে আগুনজ্বালানো ভাষায় লেখা: 'নির্মম শাসনের অজুহাতে ভারতবর্ষে যেভাবে তরুণদের ফাঁসি ও দ্বীপান্তরের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তারই সামান্য প্রতিফল দিলাম!'

ভারতবর্ষের শহীদদের নামের তালিকা বৃদ্ধি করে গেলেন মদনলাল ধিংড়া।

ধিংড়া থাকতেন বীরেন চাটুজ্যেরই সঙ্গে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার India House-এ, এবং বীরেন চাটুজ্যে ছাড়াও, মাদাম কামা, বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্রভৃতির সঙ্গে মিশতেন।

এর আগে এঁরা চতুর্ভুজ নামে এক কর্মীর হাতে কুড়িটি পিস্তল দেশে পাঠিয়েছিলেন; তারই একটি পিস্তল দিয়ে ১৯০৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর জ্যাকসন নামে এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা হত্যা করেন। সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনজনের ফাঁসি। তিনজনের দ্বীপান্তর। হত্যার সহায়ক বলে সাভারকরকে বিলেত থেকে গ্রেপ্তার করে ভারতে আনবার সময়ে জাহাজ থেকে তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন—সে কাহিনী আজ সুবিদিত। ফরাসী উপকূল থেকে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে দেশে এনে 'নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হল: সাভারকর চলে গেলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে!

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও সাভারকরের ব্যারিস্টার উপাধি খোয়া গেল। বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের আর ব্যারিস্টার হতে প্রবৃত্তিই গেল না।

ইওরোপের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বীরেন চট্টোপাধ্যায় গরম গরম প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। মূল সুর: মদনলাল প্রভৃতি শহীদদের কর্ম সমর্থন করা। বীরেনের বোন কবি সরোজিনী নাইডু কাগজে কাগজে ইস্তাহার ছেপে দিলেন যে বীরেনের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সকলে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, কারণ বীরেন বিপথগামী!

অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'জাপান: এশিয়ার শত্রু' প্রবন্ধটি জার্মান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং ভারতবর্ষের বিপ্লব কাজে সেই সুবাদে জার্মান সরকারের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি আদায়ের তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তাদের একজন। পরে তাঁর

অন্যান্য রচনা পড়ে রুশ-বিপ্লবের কর্ণধার লেনিন-ও চমৎকৃত হয়েছিলেন।

ওদিকে ১৯১৪ সালের ২৬ই মার্চ অ্যামেরিকাতে মার্কিন সরকার লালা হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করে নৈরাজ্যবাদের (anarchism-এর) অভিযোগে। জামিনে খালাস হয়ে হরদয়াল কনস্তান্তিনোপ্‌লে পালিয়ে গেলেন।* জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর মারফৎ সেই সংবাদ পেয়ে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ই হরদয়ালকে সেপ্টেম্বর (১৯১৪) নাগাদ জার্মানীতে নিয়ে এসে দলে টানবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বার্লিন কমিটির সহ-সভাপতি বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ব্যারন মাক্স ফ্রাইহার ফন্ ওপেনহাইম-এর সঙ্গে প্রথমেই ঠক্কর লাগে হরদয়ালের। বহু কষ্টে বরকতুল্লা হরদয়ালকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আবার কাজে নামান।

বীরেন চট্টোপাধ্যায়, তারক দাস, হরদয়াল এবং বার্লিন কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অ্যামেরিকার 'গদর' দলের কর্মীরাও বার্লিন কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করলেন। অ্যামেরিকায় বার্লিন কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে গেলেন হেরম্ব গুপ্ত। মাসে মাসে অ্যামেরিকার কাজের জন্যে বার্লিন কমিটি থেকে মোটা টাকা অ্যামেরিকায় পাঠানো হতে লাগল। তারক দাস ফিরে গেলেন অ্যামেরিকায়।

জার্মান মিলিটারি আতাশে বিখ্যাত ফ্রান্‌ৎস্ ফন্ পাপেন্ এবং তাঁর সহকর্মী কাউণ্ট ব্যার্নস্টর্ক মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে অ্যামেরিকাস্থ ভারতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতা করতে লাগলেন।

আন্তর্জাতিক শাখাসম্বলিত ভারতীয় বিপ্লবীদের বৈদেশিক প্রচেষ্টার প্রধান কেন্দ্র বার্লিন কমিটি যেসব পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামেন, তার সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় এখানে দিই।†

"এক।—ভারতবর্ষে বিশেষত সমাজের উচ্চস্তরসমূহে ইংরেজ অধীনতার বিরুদ্ধে দারুণ অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে: ফলে বিভিন্ন প্রদেশেই

---

* কনস্তান্তিনোপলে যাবার আগে সুইৎজারল্যাণ্ডে (জুরিখে) বড় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে যুগান্তর আশ্রম ও গদর পত্রিকা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছিলেন; হঠাৎ মত পরিবর্তন করে কনস্তান্তিনোপলে চলে যান। সম্ভবত anarchism-এর প্রতি তাঁর তখন আস্থা থাকায় 'যুগান্তর' বা 'গদর'-এর কাজ করা অনুচিত মনে করেন—যার জন্যে প্রথমে বীরেন চাটুজ্যের আহ্বানেও সাড়া দেন নি তিনি এবং বার্লিন যান নি॥

† দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌সে রক্ষিত জার্মান গভর্নমেন্টের সরকারী নথিপত্রের মাইক্রোফিল্ম (মূল জার্মান ভাষা) অবলম্বনে এই চুম্বকটি রচনা করছি। দ্রষ্টব্য: Microfilm of Records of the German Foreign Office : Roll No. 397."

বহু গুপ্ত-সমিতি গ'ড়ে উঠেছে বৈপ্লবিক স্বদেশপ্রেমের ভিত্তিতে। ইংরেজ শাসকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও এদের উচ্ছেদ করতে অকৃতকার্য হয়েছে। এই গুপ্ত-সমিতিগুলিই ভারতবর্ষে বিপ্লবের প্রধান সহায়। বিদ্রোহের সময়ে ভারতের শিক্ষিত জনগণও এতে যোগ দিতে প্রস্তুত। ইংল্যাণ্ডের এই যুদ্ধকালীন শোচনীয় দুরবস্থার মুহূর্তে ভারতের কোন কোনও নেতারা চান ইংরেজ সরকারকে ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত ক'রে ফেলতে।

"ওদিকে 'ধর্মযুদ্ধ' (Holy War) বেধে যাবার ফলে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান একত্রিত হবারও বিরাট এক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে; অবশেষে ভারতবাসী তাদের জাতধর্মের কোঁদল ভুলে এক হ'তে চলেছে। এই সুবাদে আমাদের কমিটি থেকে বারোজন সদস্যকে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। সদস্যরা সকলেই হাতে-কলমে বোমা প্রভৃতি প্রস্তুত করবার পদ্ধতি শিখে গিয়েছেন এবং সম্যকরূপে তার সদ্ব্যবহারও করবেন।*

"আমাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী আফগানিস্থানের আমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যদি ঘোষণা করেন, ভারতের বিপ্লবী নেতাদের সহায়তায় তা হলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীগুলিকে সীমান্তদেশে বিদ্রোহের কাজে মোতায়েন করা যাবে, সর্বত্র বৃটিশদের চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলো সব দখল করে ফেলতে হবে। জনসাধারণ্যে ছাপা ইস্তাহার বিলি ক'রে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা অর্জন করা চাই। শরৎকালে হিন্দুদের উৎসবের সময়েই তাদের মধ্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করা সবচেয়ে সহজ হবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, শিল্পমেলা, শিক্ষা পরিষদ, মুসলিম লীগ প্রভৃতির বার্ষিক সম্মেলনও ওই সময় নাগাদ হয়। সেখানেও ইংল্যাণ্ডের বর্তমান সঙ্কটের সঠিক সংবাদ পৌঁছে দেবেন আমাদের সদস্যরা।

"দুই।—ইওরোপ, আফ্রিকা এবং বিশেষত আমেরিকায় যেসব ভারতবাসী

---

* ডাঃ ভূপেন দত্ত লিখেছেন, "সে এক সময় গিয়েছে!...ভারতের সর্বদিকে বিশিষ্ট লোকেদের নিকট লোক পাঠান হইয়াছিল।...পাঞ্জাব ও বঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে কিন্তু বৈপ্লবিকদের তেমন সাড়া পাওয়া যায় নাই।...বঙ্গে বার্লিন কমিটি সংস্থাপনের ও জার্মান সাহায্যের বার্তা ইওরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রেরিত হয়। অর্থও লোক দ্বারা প্রেরিত হয় ও নিরাপদে পৌঁছায়।

..."বিভিন্ন দল একত্রিত হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বার্লিন হইতে প্ল্যান ঠিক ছিল যে বালেশ্বরে অস্ত্রাদি গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য বাংলার বিপ্লবীরা তথায়...'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' নামক কারবার খোলেন।"

আছেন, তাঁদের মধ্যেও প্রকাশ্য বৃটিশ-বিদ্বেষ লক্ষ্য করা গিয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডায়* ভারতীয়রা যে দুর্ব্যবহার পাচ্ছে, তা' নিয়ে ভারতের জনমনেও যথেষ্ট অসন্তোষ ও উষ্মা জমেছে।...কানাডা-প্রবাসী ভারতীয়েরা এতদূর বিচলিত হয়েছে যে তাদের মধ্যে অনেকেই ধন-সম্পত্তি পর্যন্ত ফেলে রেখে দলে দলে দেশে ফিরতে শুরু করেছে—ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে গিয়ে বিদ্রোহ করবে বলে। অ্যামেরিকায় এবং কানাডায় যেসব প্রাক্তন পল্টন আছে (বিশেষত শিখ ও পাঠান), সাহস ও সঙ্কল্পে তারা কম নয়। ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে আনুমানিক চার হাজার ভারতীয় অ্যামেরিকা থেকে ফিরেছে ; জনমনে এবং ভারতের সৈন্য-বাহিনীর ওপর এদের প্রভাব সামান্য নয়। তা' ছাড়া বিশেষত অ্যামেরিকায় হাজার হাজার ছাত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতবাসী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এইসব সঙ্ঘের মধ্যে 'গদর' দল এবং 'হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এঁরা ভারতীয়দের মনে মারাত্মক-রকম বৃটিশ-বিরোধী পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছেন।

"আমাদের কমিটির যে-দুজন কর্মী† আজ আট সপ্তাহ হল অ্যামেরিকা গিয়েছেন, সেখানে খুব উঁচুদরের ভারতীয় কর্মীদের সংস্রবে এসেছেন তাঁরা, এবং অনেককেই বার্লিনে পাঠাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই নেতৃস্থানীয় পাঁচজন ভারতীয় এসে পড়েছেন, এবং শীঘ্রই টেলিগ্রাফের মারফৎ আরো ডজন-খানেক নেতাকে ডেকে আনা হবে।...আমাদের পরিকল্পনা আছে যে, অ্যামেরিকা মারফৎ অন্তত পঁচিশজন এমনি নেতাকে ভারতে পাঠাতে হবে অসংখ্য কর্মী সমভিব্যাহারে। এর জন্য অ্যামেরিকায় তাঁদের হাতে কমপক্ষে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জার্মান মার্ক দিতে হবে।

"তিন।—যে-দুজন অ্যামেরিকায় গিয়েছেন এখান থেকে, তাঁদের হাতে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকবে। তাঁদের মধ্যে একজন অ্যামেরিকা থেকে অপর একজন ভারতীয়কে নিয়ে শাংহাই ও টোকিও হ'য়ে ভারতে ফিরবেন।**

"উক্ত দুটি কাজের প্রথমটি হ'ল : শাংহাই-এ একটি বৈপ্লবিক কেন্দ্র গ'ড়ে

* 'কামাগাতামারু' ১৯১৪ সালে এই উষ্মায় ইন্ধন জোগান।

† নারায়ণস্বামী মারাঠে এবং ধীরেন সরকার (কমিটির প্রধান সম্পাদক)। ধীরেনের বদলে ডাঃ মুলের্ কমিটির প্রধান সম্পাদক হন।

** ধীরেন সরকার এবং মারাঠের ওপর এই কাজের ভার পড়ে। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁরা অবিলম্বে নির্দিষ্ট পথ অনুযায়ী অগ্রসর হন এবং যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন টোকিও পৌঁছে।

তোলা—যেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের সঠিক সংবাদ নিয়ে গোপনে বিপ্লবীরা ভারতবর্ষে আনাগোনা করবেন। ভারতে বিপ্লবের কাজে অস্ত্রের গুরুত্ব যে সর্বোপরি, সে-কথা স্মরণ রাখতে হবে। আমরা সেদিকে যথেষ্ট মন দিচ্ছি।

"অপর কাজটি হল : অনুরূপ একটি ঘাঁটি জাভায় (ব্যাটাভিয়াতে) গ'ড়ে তোলা। আমাদের উপরোক্ত কর্মীটি শাংহাই হয়ে ব্যাটাভিয়া যাবেন ঠিক হয়েছে। ব্যাটাভিয়া ও ভারতের মধ্যে হামেশাই চিনির ব্যবসায়ীরা নৌকোয় ও জাহাজে আনাগোনা করেন।* ব্যাটাভিয়ায় কয়েক সহস্র ভারতীয়ের বাস ; অধিকাংশ শ্রমিক ও ব্যবসায়ী এঁরা।

"চার।—ভারতের বিপ্লবীরা অধিকাংশই অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ-বিধি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হলেও ভারতবর্ষে অস্ত্রের সংখ্যা এতই নগণ্য যে অবিলম্বে বিদেশ থেকে অস্ত্র সরবরাহ না করলেই নয়। আমাদের যে বিপ্লবী সদস্য অ্যামেরিকা হয়ে বর্তমানে টোকিও গিয়েছেন, তাঁর হাতে আমরা টোকিও-স্থ চৈনিক বিপ্লবী নেতাদের নামে চিঠিপত্র দিয়েছি** ডাঃ সান্-ইয়াৎ সেন-এর প্রভাব সেখানে খুবই বেশি এবং টোকিও থেকে আমরা প্রায় ষাট হাজার অস্ত্র কিনতে পারবো।† এই মর্মে বার্লিনে একটি টেলিগ্রাম এসেছে।··· তা ছাড়া অ্যামেরিকা থেকে অস্ত্র প্রতি একশ কার্তুজ সমেত কুড়ি হাজার অস্ত্র কেনার সম্ভাবনা দেখা গেছে। সেখানে ভারতীয় বিপ্লবীরা ও জার্মান সরকারের লোকেরা আন্দাজ চল্লিশ হাজার অস্ত্রের জোগাড় করেছেন আলাদাভাবে। এ-বিষয়ে বিশদ বিবরণ শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

"এখন প্রশ্ন : ভারতের কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ নেতা এই অস্ত্র খালাস করে নেবেন ? তা নির্ধারণ করবার জন্যে আমাদের দুজন সদস্যকে ভারতবর্ষে পাঠান হয়েছে। তাঁরা বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। কথা পাকা করে নিয়ে তাঁরা দূত পাঠাবেন ব্যাটাভিয়াতে এবং শাংহাই-এ ;

* সুধাময় মুখার্জী চুন, চিনি ইত্যাদির ব্যবসার ছলে এই পথে "মাল" (অস্ত্রাদি) আমদানী করবার কাজে নিযুক্ত হন কলকাতার বিপ্লবীদের তরফ থেকে ॥

** বিপ্লবীদের তরফ থেকে প্রথম সত্যেন সেন এবং তারপর ভগবান সিং-এর নাম পাওয়া যায়, যাঁরা দুজন টোকিওতে গিয়ে সান-ইয়াৎ সেন ও অন্যান্য চৈনিক বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও যথেষ্ট সাড়া পান ॥

† বলা বাহুল্য, অস্ত্র বলতে এখানে আগ্নেয়াস্ত্রের কথা বলা হয়েছে ॥

এই দূতেরা মৌখিকভাবে আমাদের ঘাঁটিতে এসে জানিয়ে দেবেন অস্ত্র নামানোর স্থান ও পাত্র সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত; সেইমতো ব্যবস্থা করা হবে।*

"পাঁচ।—মক্কায় বিপ্লবীদের প্রচার চালানো খুবই সোজা হবে কারণ প্রতি বছর হাজার-হাজার তীর্থযাত্রী ওখানে যান এবং ইংরেজদের তরফ থেকে কোনও পাহারার ব্যবস্থাই থাকে না। গত ৭ই অগাস্ট (১৯১৪) আমরা দুজন ভারতীয় মুসলমান সদস্যকে মক্কায় কাজের জন্যে পাঠাতে মনস্থ করি। এখনো তা স্থিরীকৃত হয়নি।

"ছয়।—দক্ষিণ পারস্যে, বসোরায় ও পারস্য সাগরের উপকূলে পনেরো হাজার ভারতীয় সৈন্য (মুখ্যত মারাঠী, পাঞ্জাবী ও কর্ণাটী) মোতায়েন রাখা হয়েছে—বিশ্বস্ত সূত্রের সংবাদ। এই সৈন্যদের দলে টানা এবং বিপ্লবী কাজে উদ্বুদ্ধ করা খুবই সহজ হবে; সম্ভব হলে ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করে পারস্য থেকে এই সুবাদে ইংরেজদের উৎখাত করা যাবে। ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে পারস্য সাগর দিয়ে অবাধে আনাগোনার পথ এইভাবে সুগম করে নিতে পারলে ভারতে সৈন্য ও অস্ত্রাদি সরবরাহ করা সহজ হয়ে যাবে। এইভাবে বেলুচিস্তান-এর ভেতর দিয়ে সৈন্যসমেত আমাদের লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বিদ্রোহে সাহায্য করতে পারে।

"সাত।—আফগানিস্থানে ইংরেজের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বহু ভারতীয় আছেন। সেখান থেকে পাহাড় ও গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে হরদম ব্যবসায়ীরা ও অন্যান্য যাত্রীরা আনাগোনা করেন উত্তর ভারতে। তাই আফগানিস্থানের ভারতীয়দের সাহায্যে নিয়মিতভাবে সংবাদ, অস্ত্রশস্ত্র, টাকাকড়ি, প্রচার-পত্র প্রভৃতি অনায়াসে পাঞ্জাবে পাঠানো যেতে পারে।...

"আট।—গ্রেটব্রিটেনে, বিশেষত লণ্ডনে, এখনো কয়েক সহস্র ভারতীয় আছেন যাঁরা ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক দুরবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষের আসন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে আদৌ ওয়াকিবহাল নন। তাঁদের যদি

* ডাঃ ভূপেন দত্ত লিখেছেন যে, বার্লিন থেকেই নির্ধারণ করা হয়েছিল উড়িষ্যার উপকূলে বালেশ্বরে অস্ত্র-বোঝাই জার্মান জাহাজ এসে থামবে। সেই ব্যবস্থার প্রস্তাব নিয়েই বিদেশ থেকে সত্যেন সেন (নভেম্বর ১৯১৪) এবং জিতেন লাহিড়ি (মার্চ ১৯১৫) দেশে ফিরে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং বালেশ্বর যান। দূতরূপে যতীন্দ্র-নাথের শিষ্য নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy) ও ফণী চক্রবর্তী ব্যাটাভিয়া যান।

দলে টানা যায় এবং এই সময়ে কাজের ভার দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, ভারতবর্ষের বিপ্লবী নেতারা তা হলে বহুগুণে বলীয়ান হয়ে উঠবেন। একজন উঁচুদরের ভারতীয় বিপ্লবী এখনও লণ্ডনে রয়ে গেছেন ; ঘুর-পথে তাঁর কাছে টেলিগ্রাম করে তাঁকে বার্লিনে আনতে হবে। তিনিই তখন লণ্ডনে ফিরে গিয়ে এ-কাজে মন দিতে পারবেন।

"নয়।—ফ্রান্সের ফ্রণ্টে যে-সব ভারতীয় সৈন্যদল লড়াই করছে তাদের মধ্যেও ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করা সহজ হবে। আমাদের কয়েকজন সদস্য এই কাজের জন্যে শীঘ্রই রওনা হবেন এবং নীরবে তাঁরা এই সৈন্যদের কিছু কিছু করে জার্মান সীমানায় পাঠিয়ে দেবেন।

"কয়েক সপ্তাহ হল আমরা জেনারেল স্টাফ (জার্মান সরকারের কেন্দ্রীয় বিভাগ) থেকে কোনও চিঠি পাই নি। কয়েকটা কাজে হাত দেবার জন্যে তাঁদের সহযোগিতার পথ চেয়ে আমরা আকুল হয়ে আছি।"*

জার্মান সরকার যে নিছক মুখের কথা দিয়ে ভারতবাসীদের প্রবোধ দেন নি, ভারতীয় বিপ্লবের জন্যে সত্যিই যে তাঁরা আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছেন তার দু-একটা নমুনা এখানে দেওয়া দরকার। তার আগে স্মরণ রাখতে হবে যে লিখিতভাবে জার্মান সরকারের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীরা যে চুক্তি করেছিলেন তাতে স্পষ্টই উল্লেখ ছিল : জার্মানীর কাছ থেকে যে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে তা ভারতবর্ষের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার পরে বিপ্লবীরা "জাতীয় ঋণ" হিসেবে ফেরত দেবেন ; কিন্তু—সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যগত স্বার্থ ছাড়া ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতায় জার্মানীর অন্য-কোনও রকম স্বার্থ থাকবে না বা ভারতবর্ষ জার্মানীর কাছে কোনও রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করবে না।—এই মর্মেই অকপটভাবে উচ্চপদস্থ জার্মান অফিসার, মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট জার্মান ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে গোপনে যে-সব চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে এ-দিক থেকে কোনও রকম কপট মনোভাব সেদিন জার্মান সরকার পোষণ করেন নি।

১৯১৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর অ্যামেরিকা থেকে জার্মান মিলিটারি

* জার্মান সরকারের নথিপত্র থেকে মূল জার্মান ভাষায় প্রাপ্ত বার্লিন কমিটির সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা এইখানে শেষ হল। কেন্দ্রীয় বিভাগ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এঁদের প্রতি কাজে যেমন সহায়তা করতে কসুর করেন নি, এঁরাও তেমনি, বেশির ভাগই নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে জার্মানের কাছে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন॥

আতাশে ফন্ পাপেন্-এর পক্ষ থেকে ব্যার্নস্টর্ফ ও লুৎসিয়াস টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন বার্লিনে : "…ভারতবর্ষের জন্যে এগারো হাজার রাইফেল, চল্লিশ লক্ষ কার্তুজ, আড়াই শ' মাউজার (mauser) পিস্তল এবং গুলীসমেত পাঁচ শ' রিভলভার কিনে ফেলেছি।…দক্ষিণ আমেরিকা থেকে টার্কির জন্যে রাইফেল কেনবার চেষ্টায় আছি।"

১৯১৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বার্লিন থেকে জার্মান সরকার টেলিগ্রাম করে ওয়াশিংটনে (পাপেন্-এর কাছে) খবর দিচ্ছেন : "ভারতবর্ষের জন্যে কেনা অস্ত্রশস্ত্র পত্রপাঠ জাহাজে করে চীন অভিমুখে পাঠিয়ে দিন। এবং তদনুযায়ী শাংহাই-এর কন্সাল জেনারেল যেন মারার্ঠে-কে খবর দেন।…"

১৯১৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর ইম্পিরিয়াল জার্মান দূত ভিয়েনা থেকে জানাচ্ছেন যে উক্ত মাসের পাঁচ তারিখে, কলকাতা থেকে আগত জার্মান কন্সাল জেনারেল কাউণ্ট টুর্ন যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে বিশদ রিপোর্ট দিয়েছেন, তা পাঠানো হল।

উক্ত সুদীর্ঘ রিপোর্টে কাউণ্ট টুর্ন এক জায়গায় রাসবিহারী বোসের হার্ডিঞ্জ হত্যার চেষ্টার পরেই দেরাদুন গিয়ে ইংরেজের রাজত্ব সম্বন্ধে আনুগত্যে-ভরা বক্তৃতাটির উল্লেখ করে বলছেন : "…এর থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে ভারতবাসীরা তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা আজ গোপন রেখে মুখে কেমন রাজভক্তি দেখিয়ে চলেছেন প্রকাশ্যে।…

"এই সমস্ত ঘটনাগুলি থেকেই দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় সৈন্যদলের আনুগত্যের পশ্চাতেও আদৌ কোন আন্তরিকতা নেই, ইংরেজরা তাদের কাগজে যতই ফলাও করে ছাপুক না কেন ভারতবাসীদের রাজভক্তির কথা। বাঙালী চরমপন্থী নেতারা যেভাবে শিখদের মধ্যে—বিশেষ করে জাঠদের মধ্যে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর অসন্তোষ প্রচার করে আসছেন, তার সাহায্যেই সৈন্যবাহিনীর বর্তমান মনোভাব ও ব্যবহারের কারণ আঁচ করা যায়।

"ভারত সরকার এ-বিষয়ে ষোল আনা সচেতন বলেই মুক্তিকামী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত উত্তর ভারতের গুপ্ত সমিতিগুলির বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অস্ত্র প্রয়োগ করতে কসুর করে নি। এই বছরের শুরু থেকে ধরলেও কমপক্ষে পাঁচটা ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হয়েছে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ; তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা'।…হিন্দু-মুসল-

মানের মিলন সাধনের জন্যে বিপ্লবীরা ধর্মযুদ্ধের প্ররোচনা দিচ্ছেন।

"দিল্লী পুলিশের কপালে এমন শিকে দৈবাৎ দু-একটা ছিঁড়লেও দুর্ভাগ্য বলতে হবে কলকাতা পুলিশের ; নাজেহাল হয়ে গেছে তারা বাংলায় কর্মরত বিপ্লবীদের সন্ধান করে করে। হালে কলকাতায় একটা বোমার কারখানা তারা আবিষ্কার করে থাকলেও নেতাদের ত্রিসীমানায় তারা পৌঁছতে পারে নি। এবং সর্বভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র আজ বাংলা-দেশই—সেখান থেকে দেশের সর্বত্র নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ।

"এখন প্রশ্ন : ইওরোপের মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে গণবিপ্লব আনা এখন সম্ভব কিনা ? এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই আমি বিপ্লবীদের শক্তির সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বর্তমান সামর্থ্যের তুলনা করব।...

"ভারতবর্ষে আজ কম করেও আড়াই শ' সক্রিয় গুপ্ত-সমিতি আছে, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনার কথা প্রচার করছে ; এদের সকলেরই হাতে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র যে আছে তার প্রমাণ—সঙ্গের এই সংবাদপত্রের কাটিং।* কলকাতায় চাপা গুজব যে দমদমের বিখ্যাত অ্যামুনিশন ফ্যাক্টরি থেকে প্রচুর গোলা-বারুদ আজকাল উধাও হয়ে যাচ্ছে, বিশেষত যুদ্ধ বাধবার পর থেকে।...দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী বলে যে দশ হাজার তরুণ বিপ্লবীকে সামরিক শিক্ষা দেবার এক পরিকল্পনা রাসবিহারীর মাথায় আছে এবং তার জন্যে উপযুক্ত অস্ত্রপাতিও তাঁদের হাতে রয়েছে।

"এ-কথা সুবিদিত যে গত দু'বছরে কলকাতা থেকে অসংখ্য তরুণ উধাও হয়ে গিয়েছে ; তাদের বাড়ির লোক বা পুলিশ থেকে তাদের কোনও হদিস পায় নি। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে কলকাতার সর্বত্র, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে দেয়ালে দেয়ালে এ-জাতীয় বহু প্রচার-পত্র ঝুলতে দেখা গিয়েছে : 'ওঠ, ভাই, ইংরেজের শেকল ভেঙে ফেল। বিশ হাজার সশস্ত্র তরুণ যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে স্বাধীনতার জন্যে লড়বে বলে।'—এমন বহু রকমেই এঁরা প্রচার করে চলেছেন আসন্ন অভ্যুত্থানের কথা।...

"...কোমা-গাতা-মারু ব্যাপারে যেমন, তেমনি প্রচণ্ড উল্লাস ভারত-বাসীদের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল ভারত সাগরে পরাক্রমশালী 'এমডেন' গিয়ে পৌঁছলে : তাদের খুবই আশা ছিল আন্দামান থেকে বিপ্লবীদের মুক্ত

* কলকাতার কাগজের উক্ত কাটিং-এ রডা কোম্পানীর অস্ত্র লুঠের একটি বিবরণ আছে ; সেইসূত্রে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁদের নামও আছে॥

করে এমডেন তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনবে।…

"ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক আন্দোলন যদি সফল করে তুলতে চান জার্মানীর তরফ থেকে, তবে ভারতীয় বিপ্লবীদের পূর্ণ স্বরাজের প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে।…

"এই বিপ্লবে সঠিক ইন্ধন যদি জোগানো যায়, তবে ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।…এর জন্যে বাইরে থেকে ভারতবর্ষকে সাহায্য করা নিতান্তই প্রয়োজন, এবং সেইজন্যে আমি বিনীতভাবে প্রস্তাব করছি জার্মানী ও টার্কি সমবেতভাবে এ-বিষয়ে অগ্রসর হলেই ভাল। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা ভারতবর্ষকে সাহায্য যদি না করতে পারি তবে ভবিষ্যতে ভারতবাসীদের কাছে আমরা উপহাসের পাত্র থেকে যাব—সময়ের কাজ সময়ে করতে জানি না বলে!"

১৯১৫ সালের ৯ই জানুয়ারি ব্যারন ওপেনহাইম্ বার্লিন থেকে লিখছেন: "পারস্যদেশী পাসপোর্ট নিয়ে অ্যামেরিকা থেকে প্রফেসর বরকতুল্লা সবে এসে পৌঁছেচেন। ভারতবর্ষে অস্ত্র পাঠানো ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তিনি বললেন। নিউইয়র্কে তিনি 'বার্লিন্যার লোকালান্ৎসাইগ্যার' পত্রিকার প্রতিনিধি গেয়র্গ ফন্ স্কালের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন; আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা ক্রীম্যানের মাধ্যমে তাঁদের আলাপ। ফন্ স্কাল্-এর সঙ্গে আলোচনা করে জানা গিয়েছে যে ত্রিশ হাজার রাইফেল, পাঁচ হাজার অটোমেটিক পিস্তল এবং তদনুযায়ী গুলী সংগৃহীত হয়ে গেছে। ভারতের প্রতিবেশী কোনও বন্দরে এগুলি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে; সেখান থেকে সেগুলি ভারতবর্ষে পাচার করা হবে।

"গত ২১শে অক্টোবর (১৯১৪) শিখ পুরোহিত ভগ্ওয়ান সিং 'গদর' দলের প্রতিনিধি হয়ে সানফ্রান্সিস্কো থেকে জাপান রওনা হয়েছেন; সেখান থেকে তিনি চীন, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে যাচ্ছেন। ইনি মূলত অস্ত্র কোথায় কোথায় নামানো যায়, সেইসব জায়গা পরিদর্শন করবেন। ভগ্ওয়ান সিং টোকিওতে গিয়ে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে দেখা করেছেন। সান-ফ্রান্সিস্কোর কন্সালের মাধ্যমে তিনি পিকিং-এর জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।

"শ্রীমারাঠের প্রস্তাব অনুযায়ী টোকিওতে অস্ত্রাদি কেনা কিভাবে সম্ভব, তার নির্দেশ দিয়েছেন প্রফেসর বরকতুল্লা; ইনি তিন-বছরের বেশি টোকিও

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। প্রফেসর বলছেন যে, একমাত্র চৈনিক বিপ্লবীরাই জাপানে অস্ত্র কেনা বিষয়ে সহায় হতে পারে তাদের জাপানী বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা নিয়ে। তাই ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের কাছে ভগওয়ান সিংকে এবং তাঁর পিঠপিঠই মারাঠেকে পাঠানো হয়েছে। ডাঃ সান এখন বিখ্যাত জাপানী রাজনীতিবিদ তোয়াশার অতিথি; জাপানী রাজ্যসভার সদস্য ডাঃ তেরাও-এর সহযোগিতায় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এঁরা ভারতবর্ষে যে পাঠাতে পারবেন, এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।"

সুপণ্ডিত এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নমস্য নেতা প্রফেসর বরকতুল্লা জাপান থেকে আমেরিকায় যান 'গদর' দলের কাজে—এ-কথা আগেই বলেছি। সেখান থেকে শীঘ্রই আবার জার্মানীর বার্লিন কমিটির তরফ থেকে লালা হরদয়াল বরকতুল্লাকে ইওরোপে যাবার নিমন্ত্রণ জানান। এ-নিমন্ত্রণ প্রথমে বরকতুল্লা রক্ষা করতে পারেন নি। নিম্নোক্ত চিঠিতে তার কারণ তিনি দেখিয়েছেন। অবশ্য কয়েক মাস বাদেই তিনি ইওরোপে যান এবং বার্লিন কমিটির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভগওয়ান সিংকে তিনিই সম্ভবত নির্দেশ পাঠান জাপানের ও চীনের কাজে সদ্য ভারত থেকে জাপানে আগত রাসবিহারী বসুকে দলে টানতে। হরদয়ালকে লেখা বরকতুল্লার চিঠিটা পুরো-ই শোনাই। এটি ১৯১৪ সালের ২৪শে নভেম্বর লেখা।

"আপনি আমায় কনস্তান্তিনোপলে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এতদিন তা দুটি কারণে সম্ভব হয় নি। প্রথমত আমাদের শত্রুপক্ষ থেকে সমস্ত পথই সযত্নে আগলে রাখা হয়েছে; থানগোজে, বিষেণ সিং প্রমুখ আমাদের বেশ ক'জন বন্ধু গত সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই টার্কি রওনা হয়েছিলেন কিন্তু আজ অবধি তাঁদের কোনও সংবাদ আমরা পাই নি।

"দ্বিতীয়ত, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি—ক্যালিফোর্নিয়াতে তখন আমার না-থাকলেই নয় অবস্থা। গত কয়মাস একটু দম ফেলার ফুর্সৎ ছিল না। পণ্ডিত রামচন্দ্র, ভাই ভগওয়ান সিং আর আমি সিয়াটেল* থেকে মেক্সিকোর সীমান্ত পর্যন্ত একটার পর একটা সভায় অনবরত বক্তৃতা দিয়েছি—ওসব জায়গাতেই আমাদের লোক কর্মরত। ওদের মধ্যে থেকে আমরা যোদ্ধা বেছে নিচ্ছি ভারতে ও ব্রহ্মদেশে পাঠাব ব'লে। যুক্তরাষ্ট্রে এবং ক্যানাডায় আমাদের

* ডাঃ তারক দাস প্রথম যেখানে কেন্দ্র খোলেন: অত্যন্ত সক্রিয় কেন্দ্র এটি। ডাঃ দাসও ইতিমধ্যে বার্লিন যাবার আমন্ত্রণ পান॥

দেশবাসী যে অভূতপূর্ব উন্মাদনার সঙ্গে সাড়া দিয়েছে আশা করি তা' আপনাদের অগোচর নেই। অর্থ দিয়ে প্রাণ দিয়ে এরা দেশকে স্বাধীন করতে প্রস্তুত। এদের অনেকেই ভারতে গিয়েছে গণবিপ্লবের যোদ্ধা হিসেবে; নিজেদের টাকায় দেশে ছুটে গিয়েছে দেশের ডাকে—এক পয়সা আমাদের থেকে নেয় নি। অবশ্যই, 'গদর' দল থেকেও টাকা দিয়ে যোদ্ধা পাঠানো হয়েছে। যাদের ইতিমধ্যে পাঠিয়েছি, যে-কোন দেশই তাদের মতো রত্নের জন্মভূমি ব'লে শ্লাঘা বোধ করবে, গৌরবান্বিত হবে। এমন এখনও অজস্র আছে যাদের টাকার অভাবে আমরা পাঠাতে পারি নি। এদের আমরা দুইভাগে বিভক্ত করে পাঠিয়েছি: একদল ভারতবর্ষের মধ্যেই কাজ করবে, অন্যদল ব্রহ্মদেশ থেকে শুরু ক'রে হংকং শাংহাই পর্যন্ত। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রথমে ভারতের মধ্যেই কাজ শুরু ক'রে ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী অঞ্চল-সমূহে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে যেন। ভাই ভগ্‌ওয়ান সিং একদলকে শ্যামদেশে গিয়ে ঘাঁটি গাড়তে পাঠিয়েছেন—যারা সেখান থেকে শাংহাই-এর দিকে অগ্রসর হ'বে। আপনার বোধহয় জানা আছে যে ব্রহ্মদেশ থেকে শাংহাই পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলই বলতে গেলে আমাদের দেশবাসীর হাতে।

"ইওরোপের সংগ্রামের সঙ্গে তাল রেখে ভারতবর্ষে এবং ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোতে বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে গেলে আমাদের এখানে টাকা-কড়ি আরো দরকার হবে। বার্লিন কমিটির কোন কোন মার্কিন বন্ধু আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন মার্কিন ক্যাপিটালিস্টদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে। তার আগে, ওঁরা বলছেন, আমরা যেন একটা অস্থায়ী সরকার এখানে গ'ড়ে তুলি। এই সঙ্গে তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু কিছু প্রস্তাব আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। কিন্তু এভাবে ঋণ করবার পরিবর্তে আমাদের জার্মান বন্ধুদের কাছেই হাত পাতা ভাল, আমার মনে হয়। আপনারাই বার্লিন থেকে এ-বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন বোধহয়। গত মাসে শ্রীমারাঠে আপনাদের নির্দেশ নিয়ে এখানে এসেছিলেন; তিনি জানান যে, বার্লিনে আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে জার্মান সরকারের একটা বন্দোবস্ত পাকা হ'য়ে গিয়েছে।

"...ভেবেছিলাম এবার বুঝি আপনার কথামতো আমি কনস্তান্তিনোপলে যেতে পারব; তা' হলে আপনার সঙ্গে দেখাও হ'ত এবং একত্রেই আমরা

কাবুল যাত্রা করতে পারতাম পারস্য হ'য়ে। কিন্তু আপনি বার্লিনে ফিরেছেন খবর পেলাম এবং এদিকেও পথের ঝুঁকি বেড়েছে দেখে নিউ নিয়র্কের বন্ধুরা আমায় যেতে দিতে নারাজ। তাঁদের ধারণা এখানকার কাজ জোরালো ক'রে দিতে সমর্থ হব আমি কিছুদিন যদি থাকি নিউ ইয়র্কে। এখানে ব'সে আমি নিরিবিলিতে সত্যিই অনেক কাজ করতে পারব এবং মাঝে মাঝে আপনাদের কাছেও তার বিবরণ পাঠাব। শুনেছি লালা লাজপৎ রায় গত শনিবার ডাঃ বোসের* সঙ্গে নিউ ইয়র্ক এসেছেন; শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। ওঁদের সঙ্গে কিভাবে মেলামেশা করা আমার উচিত হবে, আপনার মনে হয়?

"আপনার চিঠি শীঘ্রই পাব আশা করি। বন্দেমাতরম্॥

—(স্বাঃ) বরকতুল্লা

(কেয়ার অব জর্জ ফ্রীম্যান, নিউ ইয়র্ক সিটি)"

জার্মান সরকারের তরফ থেকে নিম্নোক্ত চিঠিটি (বার্লিন: ৭-৯-১৯১৪) তিনটি ব্যাঙ্কের কাছে পাঠানো হয়। ব্যাঙ্ক তিনটির নাম:

(১) জার্মান-এশিয়ান ব্যাঙ্কের হেড অফিস, বার্লিন,

(২) হংকং-শাংহাই ব্যাঙ্ক, হামবুর্গ

(৩) এড্‌মণ্ড হাগেডর্ন এণ্ড কোং (স্বত্বাধিকারী: হিন্‌ৎসে, হামবুর্গ)।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, "যথাসম্ভব বিশদভাবে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির জবাব যদি দেন, কৃতজ্ঞ থাকব:

"এক।—নিকট এবং দূরপ্রাচ্যের কোথায় কোথায়, আপনাদের শাখা আছে?

"দুই।—সেইসব শাখার মধ্যে কোন্‌গুলি এখনো তাদের লেনদেন চালু রাখতে পেরেছে?

"তিন।—আপনাদের বৈদেশিক শাখাগুলির সঙ্গে কি রকম সম্পর্ক বজায় আছে? বিশেষত নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে?"—ইত্যাদি।

১৯১৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ব্যারন ওপেন্‌হাইম নিম্নোক্ত চিঠি দেন হের্ ভেসেনডঙ্ক-কে:

"এক।—হের্ নয়েনহোফ্যার নিম্নোক্ত পত্রটি হামবুর্গ-এর ফির্মা এডমণ্ড

* ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ বসু (?)

হ্যাগেডর্ন কোম্পানীকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করছেন :

"আপনাদের পক্ষে কি বৃটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের কোনখানে আগামী অক্টোবর-নভেম্বর বা নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে তিন-চারটি কিস্তিতে আড়াই লক্ষ জার্মান মার্ক ভারতীয় মুদ্রায় ভাঙিয়ে দেয়া সম্ভব হবে বৃটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের এক বা একাধিক নাগরিকের হাতে ?...এ বিষয়ে যাবতীয় অনুসন্ধান আপনারা টেলিগ্রাফেই যদি করেন ভাল হয়, এবং তজ্জনিত খরচ আমরা বহন করব।

"দুই।—ওঁর প্রস্তাব : হল্যাণ্ডে যে জার্মান দূতাবাস আছে, সেখান থেকে কেউ যেন বিশ্বস্ত কোনও ব্যবসায়ীর মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি জাভায় শাখা আছে এমন কোনও ব্যাঙ্ক-এর কর্তৃপক্ষকে করেন :

"(ক) দুই লক্ষ জার্মান মার্ক-এর মতো টাকা কি তাঁরা চিঠি বা টেলিগ্রাফের মাধ্যমে জাভায় পৌছে দিতে পারেন, যদি আমরা হল্যাণ্ডের কোনও ব্যাঙ্কে সেই টাকা জমা দিই ?

"(খ) ওঁদের জাভাস্থ শাখার পক্ষে কি উক্ত অর্থ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তিন-চার কিস্তিতে (চিঠি বা টেলিগ্রাফের সাহায্যে) বৃটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে পাঠানো সম্ভব ? উক্ত অর্থ কি বৃটিশ-ভারতের, বিশেষত বোম্বাই বা কলকাতার কোনও বৃটিশ-ভারতীয় নাগরিকের (অথবা নাগরিকদের) নামে আমরা এখানে জমা দিতে পারি ?

"দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে যদি হল্যাণ্ড এবং জাভা, বা জাভা এবং বৃটিশ-ভারতের মধ্যে কোনও চুক্তির অপেক্ষা রাখে তা' হ'লে সে-চুক্তি যেন টেলিগ্রাফের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয় ; তার দরুণ খরচ আমরা বহন করব।"

১৯১৪ সালের ১৭ই অক্টোবর অ্যামেরিকা থেকে গ্রাফ্ (কাউণ্ট) ফন্ ব্যার্নস্টর্ফ টেলিগ্রাম করছেন :

"একজন ভারতীয় নেতা জেনারেল-কন্সুলেটে এসে খবর দিয়েছেন যে, বিখ্যাত একটি অ্যামেরিকান কোম্পানী অন্ততপক্ষে ষাট হাজার ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র তাঁদের নিজেদের দায়িত্বে জাহাজে ক'রে পৌছে দিতে রাজী হয়েছেন।..."

এর উত্তরে জার্মানী থেকে ওপেন্‌হাইম ২৮-১০-১৯১৪ তারিখে লিখছেন :

"ভারতীয় বিপ্লবের কাজে ষাট হাজার ডলার সংগ্রহ করবার একটি পরিকল্পনা পাঠাচ্ছি। হের্ ফন্ গেফিন্‌নেয়ার-এর পরামর্শ অনুযায়ী বাণিজ্য-মন্ত্রী

হারমান্, জার্মান ব্যাঙ্কের জনৈক সদস্য এবং আমাদের বিশ্বস্ত কর্মী দাশগুপ্ত এ-বিষয়ে আলোচনা ক'রে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।..."

২০-১১-১৯১৪ তারিখে ব্যার্নস্টর্ফ' আর লুৎসিয়িস যৌথ টেলিগ্রামে জানাচ্ছেন ঃ

"বার্লিন থেকে ভারতবর্ষে যাবার পথে টোকিও থেকে ভারতীয় বিপ্লবী-দলের সভ্য নারায়ণভাই (মারাঠে) চিঠি লিখেছেন—জার্মান পররাষ্ট্রদপ্তরের সঙ্গে কথামত তিনি ওখান থেকে গুলীবারুদ সমেত ষাট হাজার রাইফেল কিনছেন, তদ্দরুণ টাকার প্রয়োজন। আমার কাছে কোন নির্দেশ না থাকায়, নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।"

২৪-১১-১৯১৪ তারিখে জার্মান সরকারী রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে :

"ওয়াশিংটন থেকে আমাদের মিলিটারী আতাশে অস্ত্রশস্ত্র কিভাবে কিনবেন, সে-বিষয়ে জেনারেল-স্টাফের হাউপ্টমান (ক্যাপ্টেন) নাদল্নি'র সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। নাদল্নি'র ধারণা আগ্নেয়াস্ত্রই উদ্দেশ্য সাধনের প্রশস্ত মাধ্যম এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে অস্ত্র-প্রতি পাঁচ ডলার খরচ করবার সামর্থ্য আমাদের আছে। মিলিটারী আতাশে অন্তত বিশ হাজার রাইফেল কিনতে পারেন। প্রেরিত নমুনায় খুব ভালই কাজ চলবে। সেইসঙ্গে যদি দু'-তিনশ' অটোমেটিক পিস্তলও কেনা হয়, ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা তা' হলে সেখানকার ইংরেজদের প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলবেন সহজেই।

"সেইজন্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ডলারের প্রয়োজন। অনুমোদন প্রার্থনীয়।

"জাহাজের কথা মিলিটারী আতাশে যদি ফিলাডেলফিয়ার আইরিশ বাসিন্দা মিস্টার গ্যারিটি'র সঙ্গে আলোচনা করেন, ভাল হয়।"

২৯-১০-১৯১৪ তারিখে ব্যাংকক থেকে নিম্নোক্ত তারবার্তা পাঠান ইম্পি-রিয়াল শার্জ দ্য আফের, রেমী :

"চিঠি লেখবার ও টেলিগ্রাফ পাঠানোর জন্যে বার্লিন থেকে ব্যাংককের নিশ্চিত ঠিকানা এইসঙ্গে পাঠালাম :

"চিঠির ঠিকানা :

"এক।—ম্যাকলেলাম অ্যাণ্ড থার্সবি, ব্যাংকক

"দুই।—ভাইহাম অ্যাণ্ড কর্‌বিট, ঐ

"তিন।—হেউড্ অ্যাণ্ড আর্ল, ঐ

"চার।—হাগিন্স অ্যাণ্ড ক্রস্লি, ঐ
"টেলিগ্রাফ: ম্যাকলেলাম্বার্সবি, ঐ।

॥ বারো ॥

গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম প্রচেষ্টার তারিখ—২১শে ফেব্রুয়ারি, সমাসন্ন। অথচ বিদেশ থেকে প্রতিশ্রুত সাহায্য এখনো এল না। যতীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়েই অনুমতি দিলেন রাজনৈতিক ডাকাতির সাহায্যে এক মাসের মধ্যে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করবার।

১৯১৫ সাল। ১২ই জানুয়ারি।

কলকাতার গার্ডেন রীচ অঞ্চলে যতীন্দ্রনাথের শিষ্যেরা গিয়ে বার্ড কোম্পানী থেকে দিন-দুপুরে আঠারো হাজার টাকা লুঠ ক'রে আনলেন। এবং পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী টাকাটা কয়েক ভাগে বিভক্ত ক'রে নিয়ে অনুষ্ঠান-কারীরা উধাও হ'য়ে গেলেন। এই ডাকাতির পরিচালনার ভার ছিল নরেন ভট্টাচার্যের ওপর এবং কথা ছিল, যতীন্দ্রনাথকে তিনিই গিয়ে খবর দেবেন যে, কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১২নং মীর্জাফর লেন: এখন কলেজ রো। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মীয়—'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাড়ি এখানে। এঁর নাতিরা সকলেই যতীন্দ্রনাথের অনুগামী। এঁদের মধ্যে ফণী চক্রবর্তী ছিলেন যতীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ শিষ্য এবং বিশিষ্ট কর্মী। এ-বাড়িটায় যতীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে আসেন। তাঁর টানে ফেরারী বিপিন গাঙ্গুলী, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য, যাদুগোপাল মুখার্জী প্রভৃতি সকলকেই এখানে আসতে হয়।

এ-বাড়িতেই যতীন্দ্রনাথ এসে নরেনের জন্যে অপেক্ষা করবেন কথা ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পরেও নরেন ভট্টাচার্য ফিরছেন না দেখে যতীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। এমন সময় বিপিন গাঙ্গুলী এলেন। বললেন, নরেন একটু ঘুর-পথে আসছেন। এই এল ব'লে!

খানিক বাদে খবর এল: কাঁটাপুকুর লেন পার হবার সময় নরেন ভট্টাচার্য অতর্কিতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জী এর জন্য দায়ী।

নরেনকে তখন ভারত-জার্মান সম্পর্কের প্রধান সংযোগকারীদের অন্যতম ব'লে নিযুক্ত করা হয়েছে। এমন সঙ্কটজনকভাবে তাকে তো এ-সময় হাজতে পচতে দেওয়া যায় না।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের ডেকে পাঠালেন। বললেন: "ও রে, এখন যে আমার নরেনকে চাই-ই! আজ সন্ধ্যেয় ওকে যখন আলিপুর থেকে লালবাজারে নিয়ে যাবে, তখন গাড়ি ভেঙে নরেনকে তোরা বার ক'রে আন। এর জন্যে দাম দিতে হবে অনেক—কিন্তু সে মাশুল আমি দেব!"

কয়েকখানা মোটরে লালবাজার-বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ওখান থেকে ডালহৌসী স্কোয়ারের কাছ পর্যন্ত কয়েকজন বিপ্লবী যুবক অপেক্ষা ক'রে রইলেন যতীন্দ্র-নাথের নির্দেশ।

জনৈক বিপ্লবী লিখেছেন: "সেদিন দাদার আদেশে জেলভ্যান আক্রমণ ক'রে নরেনকে বার ক'রে আনবার পণ নিয়েই আমরা বেরিয়েছিলাম; সকলেরই মনে একটা প্রচণ্ড উৎসাহ, পুলিশের শক্তির সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্যে সকলে প্রস্তুত—কোন্‌খান দিয়ে যে সময় বয়ে যেতে লাগল খেয়াল ছিল না; এমন সময় জেলখানার ভ্যানের সঙ্গে অনুসরণকারী আমাদের ছেলে যারা ছিল, তারা এসে বললে—আমাদের দুর্ভাগ্য, নরেনকে আজ লাল-বাজারে আনলে না। তাকে সোজা জেলে নিয়ে গেল।"

উপরোক্ত কর্মীটি আরো লিখেছেন, "ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে ফিরলাম। দাদা আমাদের আশীর্বাদ করলেন। বললেন—যাই হোক, তোরা যে ঠিক এগিয়ে গিয়েছিলি, এইটুকুই আমার সান্ত্বনা।..."

এর কিছুদিন পরেই চেষ্টা ক'রে নরেন ভট্টাচার্যকে জামিনে খালাস করানো সম্ভব হ'ল।

নরেন ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার ক'রে দেশের কাজের যে-ক্ষতি করলেন ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জী, তার দরুণ তিনি চিহ্নিত হয়ে রইলেন বিপ্লবীদের খাতায়। তার ওপর আবার কলকাতার রাজনৈতিক ডাকাতিগুলোর তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি যখন উঠে-প'ড়ে লাগলেন বিপ্লব-প্রচেষ্টা দমনের সহায়তায়, যতীন্দ্রনাথ বললেন সুরেশবাবুকে সরিয়ে ফেলতে।

এই আদেশ-ক্রমে বিপ্লবীরা ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে পর পর কয়েকদিন ঘুরে এলেন সুরেশবাবুর নাগাল না পেয়ে—যতীন্দ্রনাথ বললেন: যতক্ষণ সুরেশ

মুখার্জী বেঁচে আছে, আমি জলস্পর্শ করব না।

সাংঘাতিক কথা!...অতুল ঘোষ ভেবে ফন্দী ঠাউরালেন। সুরেশবাবুর বাতিক আছে, তিনি ব'লে উঠলেন, পলাতক বিপ্লবী দেখলেই এগিয়ে যাওয়া (নরেনকে এইভাবেই তিনি ধরেন কাঁটাপুকুর লেনে আই-বি ব্যারাকের সামনে); পলাতক চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীকে হেদোর মোড়ে দাঁড় করিয়ে তৈরি থাকলেই সুরেশবাবুকে মাৎ করা যাবে।

তথাস্তু!...

এলাহাবাদের PIONEER পত্রিকায় ১৯১৫ সালের ২রা মার্চ তারিখে সুরেশ মুখার্জী হত্যার নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশিত হল:

"Calcutta, 28th February:—Police Inspector Suresh Chandra Mukerjee, who has been engaged in connection with the recent taxi-dacoities here, was shot dead while on duty in Cornwallis Square (Hedua) early this morning, by four young men with revolvers. His orderly was also wounded. The assassins escaped.

"From further details it appears that owing to the coming Convocation of Calcutta University on Saturday next, over which the Viceroy is to preside, there was a police rehearsal at College Square this morning. The police officers who were to take part were leaving from various places to attend the rehearsal. About 6-45 a. m. Babu Suresh Mukerjee,...was waiting at the corner of Cornwallis Square to catch the Shambazar car for College Square. Just as the car was approaching, another C. I. D. officer pointed out three Bengalee youths on the western footpath and told him the men were moving about suspiciously. Suresh began to watch the men. Shortly after he saw another Bengalee youth believed to be Chittapriya Roy*

* পলাতক চিত্তপ্রিয়ের নামে তখন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়ে গিয়েছে। তাঁদের ওইভাবে হেদোর মোড়ে পাঠিয়ে দিয়ে অতুল ঘোষও কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে মাণিকতলায় বেড়াচ্ছিলেন; আর বিপ্লবী কিরণ মুখার্জী যাচ্ছিলেন মাণিকতলার অপর দিক দিয়ে॥

on the eastern footpath. Recognising the man as wanted for the recent motor bandit raids he sent his orderly to catch the man. The orderly went and caught him by the hand and brought him to the Sub-Inspector. "You are Chittapriya Roy!" Said the Sub-Inspector. It is stated that the man said he was. A struggle followed whereupon the man took out a Mauser Pistol from his waist and fired point blank at the officer. Suresh fell and the other three men first observed came up and all four fired at the officer as he lay on the road. The orderly Sew Prasad Kahar was also fired at and had to be removed to the Medical College Hospital, severely wounded···The assailants all ran away. It is stated that the deceased officer was shortly before warned by letter.

"The outrage caused quite a panic among the shopkeepers in the vicinity and passersby, none of whom dared approach or arrest the armed gang who, finding themselves masters of the situation, fired a volley in the air and brandishing their revolvers as a warning against interference coolly walked away and disappeared.

"Sir Frederick Halliday, who was at the time supervising the rehearsal of the police parade for the Viceroy's arrival and other officers were on the spot and the posse of European reserve police sergeants (armed) were despatched to the scene. On arrival they were directed to search the throughfares for suspects concerned in the tragedy, all of whom were described to be attired in the Indian way covered over with heavy alwans or shawls. Armed police sergeants were also posted at various outlets of Calcutta, each being furnished with a description and dress of the armed gang.

"...A searching Police investigation is proceeding, but so

far there have been no arrests. It is stated, the deceased officer was armed with a loaded revolver, but he had no time to use the weapon.

"...Good hopes are entertained of catching the murderers who appear to have been Bengalee students of the Bhadralog class.

"In connection with the murder...the Calcutta Police and C. I. D. have been engaged in searching a number of houses particularly in the neighbourhood of Sukia Street and Wellesly Street. No arrests are reported, but it is stated that some important papers throwing light on this and other recent cases were found at the search of a house in Wellesley Street.

"The police orderly wounded in the outrage is still alive and seems likely to recover. The bullets extracted show that the weapons used were Mauser pistols."

শোনা যায়, একের পর এক সুরেশ মুখার্জী যেভাবে বিপ্লবীদের অনিষ্ট ক'রে চলেছিলেন তাতে উক্ত ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে যতীন্দ্রনাথের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আগেই বলেছি, তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন, "আজ সূর্যাস্তের আগে ও-লোকটাকে তোরা যদি সরিয়ে না দিতে পারিস, আমি তবে আর জলগ্রহণ করব না!"—তাই সাত-সকালেই চিত্তপ্রিয় প্রমুখ বিপ্লবীরা বার হয়েছিলেন নেতার পণরক্ষা করতে, দেশদ্রোহীর রক্তে দেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞের ইন্ধন জোগাতে।

তিন নম্বর মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে, উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত বিপ্লবী যোগেন দে-সরকারের বাড়িতে সেদিন যতীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছিলেন। যতীন্দ্রনাথের বন্ধু বগুড়ার নেতা যতীন রায়ের শিষ্য যোগেনবাবু।

চিত্তপ্রিয় প্রমুখ বিপ্লবীরা যখন এসে যতীন্দ্রনাথকে সংবাদ দিলেন—তাঁরা সফলকাম হয়ে ফিরে এসেছেন, যতীন্দ্রনাথ তাঁদের জানালেন প্রসন্ন আশীর্বাদ।

সেদিনই রাতে, যতীন্দ্রনাথের প্রিয় আস্তানা বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের মেস-এ গিয়ে মহানায়ক উঠলেন; সঙ্গে তাঁর চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি কর্মীরা।

ভোর রাতে—গুপ্ত-সমিতির সংবাদ বহন করে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী গিয়েছেন যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। শীতকাল। যাদুগোপাল ঘরে ঢুকে দেখেন, আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সকলেই ঘুমুচ্ছেন।

"তার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি দাদা, জানব কি করে?"...লিখলেন ডাঃ যাদুগোপাল। সেইজন্য আন্দাজে একজনের মুখের ঢাকা যেই খুলেছি, অমনি ব্যাঘ্র-ঝম্পনে লাফিয়ে উঠে সেই ব্যক্তি আমার ওপর রিভলভার তাক্ ক'রে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে, ফিসফিসের চিৎকার যত জোরে হয় তাই করে বললাম: আমি, আমি—আমি যাদুযোপাল!...তাতেই রক্ষা।...সে-ব্যক্তি আর কেউ নয়—স্বয়ং চিত্তপ্রিয়।..."[১]

সরকারী বাঁধন উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠল। এবং কিছুকালের মধ্যেই কলকাতার পথে-ঘাটে সর্বত্র সুরক্ষিত গাড়িতে ক'রে সশস্ত্র প্রহরী টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল; সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হ'ল অলিতে-গলিতে। বড় রাস্তাগুলোয় লোহার পাল্লা বসল—ঠিক যেভাবে রেললাইন বন্ধ করা হয়, তেমনি। থানায় থানায় বসল সাইরেন। সামান্য বিপদের আভাস পেলেই গোটা নগরীকে যাতে সচকিত ক'রে তোলা যায়।

উত্তর আর পূর্ব কলকাতার খাল পার হবার যত পোল আছে—চিৎপুর, টালা, বেলগাছিয়া, মাণিকতলা, নারকেলডাঙা ও হাওড়ার পোলে সশস্ত্র প্রহরী রইল! প্রত্যেক পথচারীকেই এবং প্রতিটি গাড়িই তল্লাস করবার হুকুম জারি হ'ল।

যতীন্দ্রনাথকে ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে: দিকে দিকে ইংরেজ সরকার তা' ভালভাবেই রাষ্ট্র ক'রে দিলেন। তবু যতীন্দ্রনাথ ধরা পড়লেন না। রহস্যজনকভাবে তিনি ঘোরাফেরা করতে লাগলেন এক কেন্দ্র থেকে অপর কেন্দ্রে—যেন ভোজবাজী জানেন।

দেহের প্রত্যেক মাংসপেশীর ওপর তাঁর এতদূর দখল যে, শোনা যায়, মুখের চেহারা পর্যন্ত তিনি অনেকখানি বদলে ফেলতে সক্ষম। তা' ছাড়া, অনেক সময়েই পুলিশের লোকে তাঁকে সনাক্ত করতে পেরেও কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে—অনেকে এ-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন। পুলিশ তাঁকে দেখেও সাহস ক'রে এগিয়ে যায় নি। গ্রেপ্তার করে নি তাঁকে। আবার, শুনেছি যে ভালবেসে শ্রদ্ধাভরেও দেশী পুলিশেরা কত সময়ে না-

[১] ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়: 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' পৃঃ

দেখবার ভাণ ক'রে স'রে দাঁড়িয়েছে—দূর থেকে সম্ভ্রমভরে দেখেছে তাঁর গমনাগমনের দৃশ্য, যুক্তকরে প্রণাম জানিয়েছে তাঁর উদ্দেশে।*

এমনি অজস্র ঘটনা, অসংখ্য জনশ্রুতি আজও কিম্বদন্তীর মতো ছড়িয়ে রয়েছে দেশের নানা স্থানে।

যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা নিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ যখন সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, তেমনি সঙ্কটময় এক দিনে নির্বিকার যতীন্দ্রনাথ হঠাৎ তাঁর এক শিষ্যকে ডেকে পাঠালেন জনবহুল প্রকাশ্য একটি স্থানে। শিষ্যটি এলেন। যতীন্দ্রনাথ তাঁকে জরুরি কিছু কাজের ভার দিলেন। আদেশ শিরোধার্য করলেন শিষ্যটি।

কিন্তু, বিদায় নেবার সময় শিষ্যটি প্রতিবাদ জানালেন: দাদা, এই নিদারুণ সঙ্কটের দিনে এমন জানা জায়গায় এমন বেপরোয়াভাবে আপনার ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত অনুচিত।

"হ্যাঁ রে, সব-সময় যদি লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবারই চেষ্টা করি," যতীন্দ্রনাথ দৃঢ়স্বরে বললেন, "তা' হ'লে যে-উদ্দেশ্যে তোদের সকলকে নিয়ে দেশের মাটি বাঙালীর রক্তে উর্বর করবার উন্মাদনা নিয়ে ছুটেছি, সে-পথে চলতে পারব কেন? জেনে রাখিস, মরণের সঙ্গে যে কোলাকুলি করতে প্রস্তুত থাকে, তার মরণের কিছু বিলম্ব হয়—আমাদের সব [illegible] তো মরণ হ'য়ে গেছে, তাই, যে-ক'টা দিন আছি, সে-ক'টা দিন বিপদকে এড়িয়ে চলা চলবে না।......"†

কলকাতা। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের মেরুদণ্ড।

যতীন্দ্রনাথ সঙ্গীদের বললেন—এই মহানগরী [illegible] বৃটিশের শাসনব্যবস্থাকে টলিয়ে দেওয়া যায়, অকিঞ্চিৎকর ক'রে [illegible] যায় তার নিয়ম-কানুনকে, তবে তা' অনেক গুণেই দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস ও আস্থা বাড়িয়ে তুলবে, অর্ধ-শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনগণের চোখ থেকে উপড়ে ফেলতে হ'বে সাদা চামড়ার প্রতি মোহ, ভয়, হীনমন্যতা।

---

* অশ্বিনী গুহ নামে পুলিশের এক ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible]। পূর্ণ দাসের ভক্ত ছিলেন তিনি। পরে হ'ন অতুল ঘোষের ভক্ত। অনেক [illegible] আগে থেকে তিনি দিয়ে বিপ্লবীদের বহু সময়ে বাঁচিয়েছেন বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মীর মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়ে।

† ভূপতি মজুমদারের রচনা থেকে।

গার্ডেন রীচে দিনে-দুপুরে ট্যাক্সি চ'ড়ে টাকা লুঠ ক'রে আনবার পর বিপ্লবীরা তেমনি অসমসাহসিকতার সঙ্গেই এবার হানা দিলেন বেলেঘাটার এক আড়তে। টাকায় সেখানে ছাতা পড়ছে। দেশের কাজে সেখান থেকে মাত্র বিশ হাজার টাকা তাঁরা নিয়ে এলেন।

এরই পিঠপিঠ—১৯১৫ সালের শেষ পর্যন্ত আরো কয়েকটি জায়গায় বিপ্লবীরা এমনি চমকপ্রদভাবে 'রাজস্ব' আদায় করলেন।...হিমসিম খেয়ে গেল বৃটিশের শান্তি-রক্ষক কোটাল আর নগরপালের প্রহরীরা।

গুরুর আদেশমত অর্থ সংগৃহীত করে দলের কাজে যতক্ষণ না তা' ব্যবহার করা যাচ্ছে, ততক্ষণ ক্ষান্ত হবেন না অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, নরেন্ ভট্টাচার্য, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতির দল।

পুলিশ মরিয়া হয়ে তাঁদের সন্ধান করে চলল।

অবশেষে এসে পড়ল ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ সাল।

ব্যাপক অভ্যুত্থানের জন্য নির্দিষ্ট এই দিনটির কিছুকাল আগে হঠাৎ নেতাদের সন্দেহ হল, সরকার হয়তো টের পেয়ে গিয়েছে বিদ্রোহের তারিখ।

তাই একুশের পরিবর্তে উনিশে ফেব্রুয়ারি ধার্য হল। পরিকল্পনা রইল : বিদ্রোহ সফল যদি হয়, তবে ওদিন পাঞ্জাব মেল কলকাতায় আসতে দেবেন না বিপ্লবীরা—সেটাই হবে নিশানা, কোনও বাধা-বিপত্তি ঘটে নি জানিয়ে দেবে তা'। এবং প্রত্যুত্তরস্বরূপ বাংলার বিপ্লবীরা পূর্বনির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসারে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করবেন।

সেইমত সর্বত্র প্রস্তুত রইলেন বিপ্লবীরা।

কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল এই প্রচেষ্টাও।

মীর্জাফরের দেশে এবার এসে দেখা দিল কৃপাল সিং নামে এক বিশ্বাস-ঘাতক। শত্রুপক্ষের কাছে সে-ই সব কথা ফাঁস করে দিল। বিশেষত পিংলে, রাসবিহারী ও কর্তার সিংকে সে ধরিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করল।

কর্তার সিং ধরা পড়ে গেলেন তাঁর অধীনস্থ কর্মীদল সমেত। শুরু হল 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'। বিচারের প্রহসন-শেষে অমর শহীদ কর্তার সিং-এর কিশোর প্রাণটায় ছেদ পড়ল ফাঁসীর মঞ্চে। তিনি অ্যামেরিকা থেকে বিমান তৈরির কৌশল শিখে এসেছিলেন দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে।

তাঁর সে বিদ্যা কাজে লাগবার আগেই চলে গেলেন তিনি বীরোচিত স্বর্গলোকে।

আরো কত বীর শহীদ হলেন ফাঁসীকাঠে, দ্বীপান্তরে, কারাগারের নিরন্ধ্র প্রকোষ্ঠে—একটি মাত্র কৃপাল সিং-এর স্বার্থপরতায়।

প্রতিকূল ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ টললেন না। তবে রাসবিহারী মনে মনে খানিক চোট খেলেন। পিংলেকে নিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন কাশীতে—স্বভাবতই, ছদ্মবেশে।

শুধু ইওরোপ অ্যামেরিকাতেই একের পর এক কর্মীরা গিয়ে ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে ব্যাপক করে তুলেছেন, ক্ষেত্র প্রস্তুতও করেছেন—এমন নয়। এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গেও তাঁরা সংযোগ স্থাপন করে রেখেছিলেন পূর্বাহ্নেই। ভারতবর্ষ থেকে বর্মা, চীন, শ্যাম, মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন গমনাগমনের পথ স্থলে এবং জলে প্রস্তুত রেখেছিলেন বিপ্লবীরা এবং প্রত্যেক জায়গাতেই শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করে স্থানীয় ভারতবাসী ও ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের মনে বিদ্রোহের প্রস্তুতিই উদ্দীপিত করেন নি, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পর্যন্ত বিদ্রোহের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন তাঁরা।

যুদ্ধ বাধবার আগেই বর্মা থেকে শ্যাম পর্যন্ত একটি রেল লাইন স্থাপনের কাজে বহু জার্মান ইঞ্জিনীয়ার ও অঞ্চলে কাজ করতে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন অনেক পাঞ্জাবী এবং স্থানীয় সহযোগী। ১৯১৩ সালে কলকাতা থেকে বিপ্লবীরা পাঠান ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও ননী ঘোসকে বর্মায় ও শ্যামে প্রচারের জন্য।

সাধুর ছদ্মবেশী ননী ঘোস 'ননী মহারাজ' নামে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন ধর্মভীরু পাঞ্জাবীদের মধ্যে। সেই সুযোগে চমৎকার আদান-প্রদান শুরু হয়ে গেল বৈপ্লবিক ভাবধারার। আশাতীত সাড়াও পাওয়া গেল।

ইঞ্জিনীয়ার অমর সিং, রেল কর্মচারী নারায়ণ সিং, বাঙালী উকিল কুমুদ মুখার্জী প্রভৃতি শ্যামের উৎসাহী কর্মীদের অন্যতম ছিলেন।

মহানায়ক যতীন্দ্রনাথকে বহুবার বলতে শোনা যায় যে, শ্যামদেশেই হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি। তিনি বলতেন, "শ্যামদেশ হবে আমাদের সুইৎজারল্যাণ্ড!"*

* এই সময় দেখা যায় অ্যামেরিকা থেকে ব্যার্নস্টর্ফ রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন ব্যাংককের কার্যাবলী

যতীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জনৈক বিপ্লবী দার্শনিক লিখেছেন, "তিনি সৃষ্টি করেছেন, কথা বলেন নি। তাই তাঁর কাজ ও সহযোগী-গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়াও শক্ত হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর কাজকর্মের যা পরিচয় সরকারী কাগজপত্রে পাওয়া যায় তা থেকে তাঁর যোগাযোগগুলোও অনেক অনুমান করে নিতে হয়।...ধর, ন্যাশনাল আর্কাইভসের ফাইলে পড়েছি, বউবাজারে এক শিখের গ্যারেজ থেকে একখানি মোটর সাইকেল নিয়ে এক বাঙ্গালী বেরিয়ে পড়তেন বিপ্লবের কাজের ধান্দায়। আমরা জানি, এক যতীন মুখুজ্যে ছাড়া ও যুগে বাঙ্গালী বিপ্লবী কেউ মোটর সাইকেল চড়ার কল্পনাও করে নি।..." এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, শিখের উক্ত গ্যারেজটির সঙ্গে একদিকে যেমন পাঞ্জাবের বিভিন্ন বিপ্লবী কেন্দ্র সংযুক্ত, তেমনি তার যোগাযোগ প্রসারিত সুদূর ব্যাংককের বৈপ্লবিক ঘাঁটি পর্যন্ত!

শ্যামদেশের প্রতি যতীন্দ্রনাথের অনুরাগের এই আরেকটি প্রমাণ।

ফিরে আসি ২১শে ফেব্রুয়ারীর বিদ্রোহ প্রসঙ্গে। বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দিন গুণছিল বর্মার পনেরো হাজার মিলিটারি পুলিশ। অভ্যুত্থানের কয়েকদিন আগে একদল বালুচ সৈন্য বোম্বাই থেকে রেঙ্গুন পৌঁছয়। সেখানকার বিপ্লবী মুসলমানদের প্ররোচনায় বালুচ সৈন্যরাও বিদ্রোহে যোগ দিতে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্রোহ সম্ভব হবার আগেই বর্মার কর্তৃপক্ষ খবর পেয়ে যান এবং নৃশংস দমননীতির শরণ নেন।

বিদ্রোহ একমাত্র সফল হল সিঙ্গাপুরে। মালয় স্টেটস গাইড আর ফিফথ্ লাইট ইনফ্যান্ট্রি বিদ্রোহে যোগ দেবে, প্রতিশ্রুত ছিল। সর্ব-সাকুল্যে হাজারখানেক শিখ ও মুসলমান সৈন্য দিন গুণছিল বিদ্রোহে যোগ দেবে বলে।—পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে তারা গিয়ে স্থানীয়

সম্বন্ধে: "শ্যামদেশে বিপ্লবীদের জন্যে বোমা প্রস্তুত করা হচ্ছে। বর্মার প্রস্তুতি সম্পন্ন। ভারতে বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা আক্রমণ করবে।...ভারতবর্ষ থেকে খবর এসেছে যে কলকাতা, পাঞ্জাব ও সিঙ্গাপুরে ইংরেজরা ডুটো করে এরোপ্লেন আনিয়েছে।...এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ হংকং থেকে ৪০ শিখ রেজিমেণ্টকে ইংল্যাণ্ড নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের বদলে আসবে ২৫নং শিখ রেজিমেণ্ট। হংকং-এ এখন ৩২৭ জন জার্মান বন্দী; কলম্বোয় ৩৭৫ জন।

"রেঙ্গুনে দেড় হাজার ভলান্টিয়ার আছে।...গোটা বর্মাই বিদ্রোহের আগুনে তেতে উঠেছে। এখান থেকে আমরা মাদ্রাজে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছি।

ওয়াশিংটন, ৯-৪-১৯১৫ ॥

—ব্যার্নস্টর্ফ।"

কেল্লা আক্রমণ করল। সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্ত করে দিল! জার্মান রাজ-বন্দীও সেখানে অনেক ছিল; কিন্তু তাদের কাছে ইতিপূর্বে বিদ্রোহের সংবাদ বা তাৎপর্য পৌছয় নি বলে বিদ্রোহীদের স্বপক্ষে তারা অস্ত্র ধারণ করল না। তবু বিদ্রোহীরা জয়ী হল। সার্থক হল অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা।*

পুরো সাতদিন কৃতিত্বের সঙ্গে সিঙ্গাপুর অবরোধ করে বিদ্রোহীরা অপেক্ষা করতে লাগলেন—কলকাতা কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পাবার জন্যে।

কোনও নির্দেশ, কোনও সাহায্যই পৌছল না!

অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন ইংরেজের কাছে। বিদ্রোহের অপরাধে চরম শাস্তি তাঁদের মাথা পেতে নিতে হল। নির্যাতন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, মৃত্যু!...

সিঙ্গাপুরের নামকরা এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর ফাঁসী হয়ে গেল: বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্যে তিনি রেঙ্গুনের তুর্কী কন্‌সালের কাছে জাহাজ এবং সৈন্য চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন—সেই অপরাধে!

পিংলে গেলেন মীরাটে। সৈন্যবাহিনী তখনও আশা ছাড়ে নি। গোপনে তিনি সৈন্যাবাসে প্রবেশ করে রাত কাটালেন সেখানে। ভোর হলেই সৈন্যাবাস অবরোধ করবেন—এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

মাঝরাতে হঠাৎ এক ইংরেজ অফিসারের কানে এ খবর পৌছল। পিংলেকে চুপি চুপি সনাক্ত করে নিয়ে তিনি ব্যারাক ঘেরাও করিয়ে ফেললেন। অস্ত্রাগার এবং ফটকের চাবি লুকিয়ে রাখা হল।

ভোরবেলা সমস্ত দেশী সৈন্য সমেত পিংলে ধরা পড়ে গেলেন।

পিংলের ফাঁসী হয়ে গেল। ইনিও অনেক স্বপ্ন অনেক আশা নিয়ে অ্যামেরিকা থেকে ফিরেছিলেন দেশকে স্বাধীন করবেন বলে।

উত্তর ভারতের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী নলিনী মুখার্জী লিখেছেন, "পিংলে জাতিতে মারাঠী ব্রাহ্মণ। দেহ ছিল দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। বয়স পঁচিশ বৎসর। পাঠানদের মত পোশাক ও মাথায় তুর্কি ক্যাপ।...লাহোর ক্যান্টনমেন্টে তিনি যেরূপ দক্ষতা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহিত বিপ্লবের আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, তাহাতে সত্যিই ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিপ্লবের অমর বীর নানা-সাহেবের প্রেরণাদায়ক বীরত্বের স্মৃতি জাগ্রত করে।"

এবার রাসবিহারীর পালা। তিনি গা-ঢাকা দিয়ে চলে গেলেন

* বিস্তারিত বিবরণের জন্যে H. W. Wilson-এর World War I দ্রষ্টব্য।

চন্দননগরে। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে নেতারা গিয়ে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে জার্মানীর ও অন্যান্য এশীয় দেশের বিপ্লবীদের সাহায্যে জাপান থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের যে কাজ চলছে, তাকেই রাসবিহারী গিয়ে ত্বরান্বিত করবেন।

'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স'-এর হরিকুমার চক্রবর্তীকে যতীন্দ্রনাথ ভার দিয়েছিলেন বিদেশ থেকে সংবাদ আদান-প্রদান চালানোর। আর, 'শ্রমজীবী সমবায়'-এর তরফ থেকে উত্তরপাড়ার বিপ্লবী কর্মী সুধানাথ (সুধাময়) মুখার্জী চুন, চিনি প্রভৃতির ব্যবসার অজুহাতে শ্যাম, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে জলপথে সংযোগ রাখেন। কিছু টাকা এবং অস্ত্র ইতিমধ্যেই এ পথে এসে পড়েছিল।

রাসবিহারীর বিদেশ যাবার অর্থ সংগৃহীত হল। ততদিন তিনি নবদ্বীপে গিয়ে আত্মগোপন করে রইলেন। ১৯১৫ সালের ১২ই মে তিনি পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানী জাহাজ 'শানকিমারা' করে চলে গেলেন জাপানে।

এগিয়ে চললেন তার পরিকল্পিত বিপ্লবের পথে। এই বিপ্লবের হোমানলই তো ভারতবাসীর সর্বনাশা সুপ্তি দীর্ণ করে তাকে দীক্ষিত করবে সনাতন ভারতের শাশ্বত আদর্শে॥

অজ্ঞাতবাস

॥ এক ॥

১৯১৫ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিক। তটস্থ কলকাতা। যতীন্দ্র-নাথের নামে মোটা টাকার পুরস্কার। তাঁর অনেক শিষ্যের নামেও। এঁদের যদি কেউ ধরিয়ে দিতে পারে, তবে—সাত পুরুষ তাকে রাজার হালে রাখবে বিদেশী সরকার।

সুরেশ মুখার্জী হত্যার মাত্র কয়েক দিন পরের ঘটনা। পাথুরিয়াঘাটায় গোপনে মিলিত হয়েছেন অতুল ঘোষ এবং অন্যান্য নেতারা, যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছু পরামর্শের জন্যে।

জানলা দিয়ে একটা ছায়া এসে পড়ল। অষ্টপ্রহর সতর্ক চিত্তপ্রিয়ের দৃষ্টি তখুনি শানিয়ে উঠল। রিভলভার তুলে নিলেন তিনি। ছায়ার গতিক দেখে অনুমান করতে দেরি হল না কায়ার অবস্থান কোথায়।

রিভলভার গর্জে উঠল।

সবাই চিত্তর দিকে তাকালেন। দু-একজন ছুটে বাইরে গিয়ে দেখেন—বারান্দায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে গোয়েন্দা নীরদ হালদার। অনর্গল রক্তে ভেসে যাচ্ছে বারান্দা।

"আর এখানে নয়", যতীন্দ্রনাথ বললেন, "পুলিশ এল বলে। সবাই চলে যা!"

নীরদ কিন্তু মরে নি তখনো। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। গুলীর আওয়াজ শুনে পুলিশ, লোকজন সবাই ছুটে এল। কেউ কোথাও নেই তখন। নীরদ শুধু রক্তাক্ত কলেবরে পড়ে আছে।

তখুনি নীরদকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জ্ঞান হলে নীরদ জবান দিল: যতীন মুখার্জী আমায় গুলী করেছেন। আমার মৃত্যুর জন্যে তিনি দায়ী!

এটুকু বলবার অপেক্ষাতেই বোধহয় সে বেঁচে ছিল। শেষ নিশ্বাস ফেলে সে দেশদ্রোহীর বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

আবার যতীন্দ্রনাথ?…কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়ল।…সাজ সাজ রব।

ঝিনাইদার কাছেই—সিঙ্গে স্টেশন।

যতীন্দ্রনাথের কণ্ট্রাক্টরি ব্যবসার মাগুরা শাখা থেকে নলিনীকান্ত কর সিঙ্গেয় এসেছেন কয়লা কিনতে। আপাতদৃষ্টিতে ইনি যতীন্দ্রনাথের কর্মচারী হলেও বিপ্লবী সংগঠনের তিনি বিশেষ উঁচুদরের কর্মী।

দশ সালে সামসুল হত্যার পরই নলিনীবাবু অন্তর্ধান করে উড়িষ্যার ঘন জঙ্গলে, বালেশ্বরের কাছে আত্মগোপন করেছিলেন এক বছর। ১৯১১ সালে যতীন্দ্রনাথ ছাড়া পেলে ইনি কলকাতায় ফিরে কিছুদিন অতুল ঘোষের বাড়িতে থেকে, যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে চলে যান পাবনা শহরে—অনুন্নত অনালোকপ্রাপ্ত অস্পৃশ্যদের মধ্যে 'মাস্টারি' করতে। ইতিমধ্যেই যতীন্দ্র-নাথ সেখানে পাঠিয়েছিলেন কুষ্টিয়ার ক্ষিতীশ সান্যালকে ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে। ওখানে যতীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন কর্মী গোপেন রায়েরও বাড়ি। বি এস-সি পাশ করে গোপেনবাবু নতুন করে সংগঠনের কাজে নামেন। এবং যতীন্দ্রনাথ কণ্ট্রাক্টরির অজুহাতে ঘনঘন এখানে এসে কেন্দ্রগুলিকে দানা বাঁধতে ত্বরান্বিত করেন—বিশেষত যখন ষাঁড়া ব্রিজের কণ্ট্রাক্ট তিনি নিলেন। স্থানীয় বহু তরুণ ও যুবককে তখন তিনি "চাকরি" দেন। সরকারি ট্রেজারার জগদীশ লাহিড়ী বহু অর্থ দিয়ে এঁদের সাহায্য করেন।

১৯১২ সালে এই কেন্দ্র থেকে নলিনী করকে সরিয়ে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁকে মাগুরায় বসান।

কয়লা কিনে নৌকোয় তুলিয়ে, নলিনী কর স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে বসে সিঙ্গে স্টেশনে গল্প করছেন। হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এল: "যতীন মুখার্জী নীরদ হালদারকে গুলী করে মেরেছেন। ওদিকে যান কিনা, সজাগ দৃষ্টি রেখ।"

১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে, দিদি আর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে যশোরে (ঝিনেদায়) শেষবারের মত দেখে যান যতীন্দ্রনাথ। সেই সময়েই নলিনী করকে বলে যান: "ওরে, সময় এসেছে। শীগগির তোর ডাক পড়বে। তৈরি থাকিস।"

সরল মনে স্টেশন মাস্টার টেলিগ্রামটি নলিনীবাবুকে পড়ে শোনাতেই নলিনীবাবুর বুঝতে বাকি রইল না: এই ডাক পড়বার সঙ্কেত। তবে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না যে, স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ হত্যা করতে যাবেন ছাপোষা একটা সরকারি চাকুরেকে। নলিনী কর লিখেছেন: "দাদা

নিজে হাতে Shoot করেছেন এ কথা বিশ্বাস করতে মন চাইল না। বহুদিন তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তাঁকে যেটুকু বুঝেছিলাম, তাতে তাঁর দ্বারা ও কাজ সম্ভব নয়। আর তিনি হলেন অধিনায়ক—এই সব কাজ তিনি করবেনই বা কেন ?”

এই কথারই পিঠপিঠ লিখেছেন নলিনী কর, “যাঁরা বই লিখেছেন তাঁরা দাদার বাইরের বাহুবলটাকেই বড় করে দেখেছেন এবং দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বিরাট অন্তর-শক্তি অতি সামান্য অভিব্যক্তি মাত্র হচ্ছে তাঁর ওই বাইরের শক্তি। তিনি একাধারে বুদ্ধের প্রাণ, চৈতন্যের প্রেম, শঙ্করের জ্ঞান, নেপোলিয়নের শৌর্য ও দুর্জয় সাহস নিয়ে জন্মেছিলেন।… এই ৭২ বৎসর বয়সে কত মানুষ দেখলাম।* তেমনটি আর চোখে পড়ল না। তিনি ছিলেন পরশমণি। তাঁর ছোঁয়া লাগলেই লোহা সোনা হয়ে যেত।…”

যতীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনীকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলে রেখেছেন, “…তবে তাঁর হাতে বন্দুক রিভলবার দিয়ে তাঁকে বীর সাজে সাজিও না। তাঁর সান্নিধ্যে না এলে তিনি যে কী রতন অন্য কেউ জানতে পারে না। তাঁকে জানা তো খুবই কঠিন, তার চেয়েও সুকঠিন তাঁকে লেখনীতে প্রকাশ করা।…”

সিঙ্গে স্টেশন থেকেই নলিনী কর স্থির করে ফেললেন তাঁর কর্তব্য। তদনুযায়ী, যথাসম্ভব নির্বিকারভাবে বিদায় নিয়ে এলেন তিনি স্টেশন-মাস্টারের কাছ থেকে—রওনা হলেন নিজের পথে।

অজ্ঞাতবাসে যতীন্দ্রনাথ।…

কলকাতার বুকে এই তাঁকে চকিতে দেখা গেল অমুক অঞ্চলে ; খবর পেয়ে পুলিশ ছুটল তাঁর সন্ধানে। ততক্ষণে কিন্তু সাড়া পড়ে গিয়েছে মহানগরীর অপর প্রান্তে: যতীন মুখার্জীকে সেখানেও নাকি দেখা গিয়েছে ?

অর্থাৎ কোথাও হদিস নেই যতীন্দ্রনাথের। কলকাতার সর্বত্রই তিনি বিচরণ করছেন। এবং বিপ্লবীদের কাজ অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে তার পরিণতির দিকে। সুষ্ঠুরূপে বহাল আছে তার কর্মধারা। দুষ্টের দমনও

* গ্রন্থাকারে এ-রচনা প্রকাশ-কালে নলিনীকান্ত করের বয়স ৮৫'র কাছাকাছি॥

যেমন চলছে, তেমনি বহাল আছে দুর্গতের সেবা, আর্তের ত্রাণ।

বিপ্লব প্রচেষ্টার গোটা দেহযন্ত্র অমন সুস্থ সুন্দর দেখেই না বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল জনগণ আশ্বস্ত হন যে হৃদয়-মস্তিষ্কও অক্ষতই আছে।

এমনি একদিন—হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ হাসিমুখে উপস্থিত হলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন এক আত্মীয়ের বাড়িতে। দীর্ঘকালের মধ্যে এই প্রথম আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাবার অবসর পেয়েছেন।

অমন আচমকা যতীন্দ্রনাথকে আসতে দেখে ফ্যাকাসে হয়ে যায় আত্মীয়টির মুখ : মনস্তত্ত্বের বিচিত্র বহুমুখী প্রতিক্রিয়ায়—ভয়ে, আনন্দে, তিনি চিত্রার্পিতের মত বসে রইলেন।

স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা অট্টহাসিতে বৈঠকখানা মুখরিত করে যতীন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করতে গিয়ে হঠাৎ আত্মীয়টির ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। বিহ্বল সেই চেহারা দেখে তার কাঁধে হাত রেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন :

"কিরে, আমি এসেছি বলে তুই বুঝি খুব ঘাবড়ে গেছিস? বেশ, আমি চললাম।..." বলে আত্মীয়টির পিঠে সস্নেহে একটি চাপড় দিয়ে যতীন্দ্রনাথ পথে পা বাড়ালেন।

বহুদিনের অভুক্ত ক্লান্ত দেশনায়ককে সেদিন আশ্রয় দেবার মতো বুকের পাটা ক'টা লোকেরই বা ছিল পরাধীন এই দেশে? জাতির অন্তরে যতই প্রতিষ্ঠিত অধিষ্ঠিত থাকুন না পরম স্মরণীয় চির বরণীয় সাধক-বিপ্লবী—বাহির দুয়ার থেকে তাঁকেই সেদিন আমরা কি ফিরিয়ে দিই নি স্বার্থপরের মতো ব্যর্থ নমস্কার জানিয়ে? তবু তিনি আমাদের ক্ষমা করে গেলেন, তাঁর আশীর্বাদের মুদ্রায় জানিয়ে গেলেন তিনি আমাদের মতো আত্মসর্বস্ব ক্ষুদ্রাশয় জাতিকে ভালবেসে আমাদের কল্যাণ কামনাতেই পথকে করে তুলেছেন ঘর, দূরকে করেছেন নিকট, পরকে ভাই।

সে বেদনা বুঝি বাঙময় হয়ে রক্তগোলাপের অর্ঘ্যের মত ফুটে উঠল আমাদের জনপ্রিয় কথাশিল্পীর লেখনীতে :

"তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও,—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাইত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা* পার হইতে হয়; তাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়;—কোন্ বিস্মৃত অতীতে

* স্মরণ থাকতে পারে, কয়াগ্রামের গোড়াই নদী পদ্মারই মেয়ে॥

তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল,—সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবার সাধ্য কার? এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার!"

অ্যামেরিকা থেকে ব্যার্নস্টর্ফ খবর দিচ্ছেন বার্লিন কমিটিকে যে চীনের জার্মান রাষ্ট্রদূত হিন্‌ৎসে তাঁকে টেলিগ্রামে জানিয়েছেন—৩-২-১৯১৫ তারিখে: "ভারতবর্ষে এবং ব্রহ্মদেশে ঠিক সময়েই বিদ্রোহ শুরু হচ্ছে।... শাংহাই-এর কন্সাল জেনারেলের তত্ত্বাবধানে আমি কেন্দ্রীয় একটি আস্তানা গঠন করেছি সেখানে, যাতে করে কলকাতা, পেনাং, ব্যাংকক প্রভৃতি স্থান থেকে নিরাপদে বিপ্লবীরা ওখানে যাতায়াত করতে পারেন।

"আমার এক লক্ষ দশ হাজার জার্মান মার্ক চাই পরবর্তী ছয় মাসের জন্যে; কিছু অস্ত্রও। শাংহাই-এ হের্ ফরেচ্ (Vorezsch) আমাদের সহযোগিতা করছেন। ব্যাংককের দূতাবাসকে আমাদের শাংহাই-এর পরিকল্পনা জানিয়ে সহযোগিতার নির্দেশ পাঠান টেলিগ্রামে।...

"...ভারতের জন্যে অস্ত্র কি পাঠানো হয়েছে? কবে নাগাদ সেগুলো পৌছবে মনে হয়?"

নিউ ইয়র্ক থেকে মিলিটারি আতাশে ফন্ পাপেন্ ১২-২-১৯১৫ সালে জানাচ্ছেন:

"অ্যানি লার্সেন জাহাজে করে স্যান ডিয়েগো থেকে মেক্সিকোর টপোলো বাম্পোতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে ওগুলো ইয়েবসেন কোম্পানীর স্টীমার লেওনোর্-এ তুলে নেওয়া হবে এবং মেক্সিকোর নিশান উড়িয়ে ওগুলো ব্যাংককে পৌছে দেওয়া হবে। সেখান থেকে খোঁজ নেওয়া হবে শান্ স্টেটের মধ্যে দিয়ে স্থলপথে ভারতবর্ষে অস্ত্রগুলো যদি নিয়ে যাওয়া সুবিধে হয়, ভালই। নইলে সোজা জাহাজে করে ভারতে ওগুলো খালাস করাতে হবে! পিকিং-এ খবর দেওয়া হয়েছে।...এ জাহাজে পাঁচজন ভারতীয় থাকবেন।..."

২৫-৩-১৯১৫ তারিখে স্যান ফ্রান্সিস্কো থেকে ব্যার্নস্টর্ফ এবং লুসিয়াস টেলিগ্রামে জানাচ্ছেন :

"গুপ্ত (হেরম্বলাল) জানতে চান যে সুয়েজ খাল যদি তুর্কিরা অবরোধ করে থাকেন তা হলে এখন প্রচারের জন্যে তো জার্মানী থেকে ভারতীয়েরা আফগানিস্তানে যেতে পারেন ; আরো আট হাজার রাইফেল, দু হাজার রিভলবার এবং কয়েকটি মেশিনগান তাঁরা বাংলার জন্যে চান।

"অস্ত্রশস্ত্র আমরা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারি। অনুমতি পেলে আমরা এখান থেকেই টাকা খরচ করে কেনার কাজে হাত দিতে পারি।"

২৪-৩-১৯১৫ তারিখে ফন্ পাপেন্ নিউ ইয়র্ক থেকে খবর দিচ্ছেন :

...ভারতবর্ষে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়া আমাদের পক্ষে একমাত্র সম্ভব নিজেদেরই জাহাজে করে। নিয়মিত মালবাহী জাহাজে বড় জোর আমরা মেরেকেটে ব্যাংকক অবধি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে পারতাম মিথ্যে কাগজপত্র দেখিয়ে। তারপর আমাদের মালের স্বরূপ ধরা পড়তে বাধ্য, যদি ভাড়াটে জাহাজ নেওয়া হয়। অতএব তা অসম্ভব। পিকিং, শাংহাই এবং স্যান ফ্রান্সিস্কোর দূতাবাসের সঙ্গে বহু পরামর্শ করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 'মাভেরিক' জাহাজটা কিনে নিয়ে তাতে ক'রেই ছয়মাস যাবৎ যেসব অস্ত্রশস্ত্র কিনে মজুদ রেখেছি আমরা সেসব ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেব।

"স্যান ফ্রান্সিস্কোর নৌ-বিশেষজ্ঞের পরামর্শে আমরা গত ২০শে মার্চ এক লক্ষ ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে দুশ' টন সামর্থ্যের স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল স্টীমারটি কিনেছি।...

"আর সব কারণের চেয়েও বড় কারণ এই যে অস্ত্রশস্ত্র অনেকখানি আমরা চার সপ্তাহের ওপর হ'ল ইয়েব্সেন কোম্পানীর জাহাজ 'অ্যানি লার্সেন্'-এ চাপিয়ে দিয়েছি এবং শুল্ক বিভাগ থেকেও তা ছাড়পত্র পেয়ে মেক্সিকো রওনা হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু 'অ্যানি লার্সেন' ভারতবর্ষ অবধি যেতে অনেককাল লেগে যাবে ; খুব ছোটও জাহাজটা। আমার ধারণা "মাভেরিক" জাহাজ কিনে আমরা খুবই বড় দাঁও মেরেছি ; মার্কিন পতাকা উড়িয়ে এই জাহাজটা ব্যাংকক গিয়ে পৌঁছবে আন্দাজ মে মাসের শেষে। সেখান থেকে আমাদের লোক খবর দেবে তারপর কোন পথে যেতে হ'বে। উক্ত অস্ত্রগুলি পৌঁছে দেবার পর সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল থেকে ভারতে চোরাই অস্ত্র নিয়ে যাবার কাজে "মাভেরিক" নিযুক্ত হবে। এখান থেকে সুমাত্রা অবধি অস্ত্র পৌঁছে

নিয়ে যাওয়া অবশ্য খুব সহজ হবে না তখন ; চেষ্টা করছি আমরা।…তা' ছাড়া নতুন আন্তর্জাতিক আইন পাশ হবার পর জাহাজের গন্তব্য স্থান পরীক্ষা না ক'রে শুল্ক বিভাগ তখন অস্ত্র ছাড়তে রাজী হবে কিনা তাও সন্দেহ।…

"ভারতীয় বিপ্লব প্রসঙ্গে আমি আবার জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে গুপ্ত (হেরম্বলাল) চান—আফগানিস্থান অভিযান শুরু হবার আগে ভারতবর্ষে অবশ্যই যেন বিদ্রোহের প্রথম ঢেউ দেখা দেয়।…গুপ্ত ভারতবর্ষের জন্যে আরো আট হাজার রাইফেল, দু'হাজার রিভলভার এবং কয়েকটি মেশিনগান চাইছেন। এ বিষয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। বুয়েনোস্ আয়েরেস্-এ কেনা হচ্‌কিন্‌স্ মেশিনগানগুলো এই কাজে ব্যবহার করব কি?…"

এর আগের একটি টেলিগ্রামে (চীন থেকে ৩-২-১৯১৫ তারিখে পাঠানো) আমরা হের্ ফরেচ্-এর নাম পেয়েছি। চীনের ক্যাণ্টন থেকে পাঠানো পিকিং-এর একটি ফরাসী পত্রিকার কাটিং-ও মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ ক'রে শোনাচ্ছি। এটি প্রকাশিত হয় ১৫. ১০. ১৯১৪ তারিখে :

"দক্ষিণ চীনে একটি বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলছে—ইন্দোচীন ও চীনের সরকারের বিরুদ্ধে—বিশেষত এই তিনটি প্রদেশে : কোয়াংটং, কোয়ন্‌সি এবং ইয়ুনান-এ।

"উক্ত প্রদেশ তিনটিতে সমাগত আনামিৎ বিপ্লবীদের এবং চীনে বিপ্লবীদের মধ্যে নিবিড় সখ্য স্থাপিত হয়েছে বিশেষত প্রেসিডেণ্ট ইউয়ান্-এর সরকারের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার উদ্দেশ্যে। সম্ভবত এদের নেতা হলেন হোয়াং-ৎসোং মাও, যিনি এখন কোয়ান্‌সিতে আছেন। এই বিদ্রোহের কাজে দক্ষিণ চীনের জার্মানদের পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতার প্রকাশ্য বহর দেখা যাচ্ছে। মহাযুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় জার্মানরা চেষ্টা করছে ইন্দোচীনের ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করতে, যাতে ক'রে ফরাসীদের বাধ্য হ'য়ে জাপানী এবং ইংরেজদের শরণ নিতে হয়।

"মঁসিয়্য ব্রাগার, জার্মান ভাইস-কন্সাল, ইন্দোচীনে গ্রেপ্তার হয়েছেন একেবারে হাতেনাতে। এঁর বিরুদ্ধে মামলাটা খুবই চিত্তাকর্ষক হবে।

"হংকং-এর জার্মান কন্সাল হের্ ফরেচ্ তো খোলাখুলিভাবে আনামিৎ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। বাধ্য হ'য়ে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছে ; ফরেচ্ এখন হংকং-এর চেয়ে কম্ গরম কোনও জায়গায়

তাঁর বাধ্যতামূলক 'ছুটি' কাটাবেন ব'লে ব্যাংকক গিয়েছেন এবং সেখানেই আছেন।* সেখানে বিপ্লবের সহায়তা করবার জন্যে একটি ব্যাঙ্কে তিনি এক লক্ষ ডলার জমা দিয়েছেন।

"ইওরোপে মহাযুদ্ধের অবস্থা অনুকূল দেখলেই বিপ্লবীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামবেন ব'লে তৈরি হচ্ছেন সর্বত্র।"

এই রিপোর্টেরই আরো বিশদ বিবরণ এর পরে মূল জার্মান ভাষায় জার্মান গভর্নমেণ্টের নথিপত্রে স্থান পেয়েছে।

সুমাত্রায় ঘাঁটি স্থাপন ক'রে সেখান থেকে ভারতবর্ষে অস্ত্রশস্ত্রাদি পাঠানোর পরিকল্পনা বার্লিন কমিটিও কিভাবে করেছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিই। এটিও জার্মান সরকারের নথিপত্রের অন্তর্ভুক্ত—বিখ্যাত বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তাক্ষরে লেখা। পরিকল্পনাটির শিরোনাম, "বৃটিশ-বিরোধী কার্যাবলীর ঘাঁটি : সুমাত্রা"!

চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, "ডাচ্ ইণ্ডিসের প্রশস্ততম কর্মকেন্দ্র জাভায় নয়, সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে ; এখানেই আমাদের আস্তানা হ'তে পারে। অসংখ্য ভারতীয়ের বাস এখানে। ভারতের খুব কাছে। সংযোগের ব্যবস্থা ভাল।

"জনগণ মোটের ওপর সাহেব-বিরোধী, এবং চেষ্টা করলে বৃটিশ-বিরোধী ক'রে তোলা যায়, ডাচ্ সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টি না-ক'রেই। ছোটখাট বহু ব্যবসায়ে (যেমন বেকারি প্রভৃতি) ভারতীয়রা সক্রিয় ; বৃটিশ ইণ্ডিয়ার বহু অধিবাসী এখানে। মালয় দেশের অনেক রাজবংশীয় মুসলমানও আছেন—আকণ্ঠ ঋণে ডুবে তাঁরা সারাদিন আলস্যেই কাটান। হাজীদের সাহায্যে কাজের প্রচার ভাল হ'বে। তুর্কি সুলতানের চিঠি নিয়ে যদি ওখানে কাজ করতে যাওয়া হয়, চমৎকার ফল দেবে। দুটি মালয়-ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা আছে। 'শারিকাৎ-ই-ইসলাম' প্রেস থেকে আমাদের প্রচারপত্রাদি অনায়াসে ছাপা চলবে।

"পূর্ব উপকূলের সবটাই বাদা আর জলা জমি, আর ছোটখাট জনহীন দ্বীপে ভরা ; অস্ত্র, গোলা-বারুদ এনে এইসব দ্বীপে মজুদ রাখা যায়। সুমাত্রা থেকে বাংলার উপকূলে হামেশাই জেলেনৌকো আনাগোনা ক'রে থাকে। গোটা একটা দ্বীপ আমরা লীজ নিতে পারি ; অত্যন্ত কম দামে এবং সহজে

এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছেন॥

লীজ পাওয়া যায়। নারকেলের ব্যবসার অছিলায় তুর্কি সরকারের মধ্যস্থতায় দ্বীপ আয়ত্তে আনতে হ'বে।

"দোআঁশলা অধিবাসী সেজে ভারতীয়রা নির্বিবাদে এই উপকূল থেকে আনাগোনা করতে পারবে। বাটাভিয়ার দোআঁশলা অধিবাসীদের কাছ থেকে এন্তার পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজ-পত্র কিনে আনা যায়। জার্মান কন্সালের হাতে এ-কাজের ভার দেওয়া চলে। মাডেন্-এ ভাইস কন্সাল হচ্ছেন হের্ সাণ্ডেল্; তাঁর ওখানেই তো আড়াই শ' প্রায় জার্মান আছেন—পূর্ব উপকূলের ওই জেলাতে। আরো কয়েকশ' প্রায় জার্মান আছেন জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে। প্রকাশ্য বিদ্রোহ যখন ভারতবর্ষে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, অস্ত্র নিয়ে এঁরাও তখন স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন ক'রে বিদ্রোহীদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারবেন।"

উত্তর ফ্রান্সের লীল্ থেকে ১২. ৪. ১৯১৫ তারিখে জার্মান সরকারের কাছে ভিন্সেন্ৎস্ ক্রাফ্‌ট (Kraft) নামে একজন জার্মান ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্টের সদস্য চিঠি লিখছেন:

"সিঙাপুরের বিদ্রোহের পটভূমিকায় আমি নিম্নোক্ত কয়েকটি মন্তব্য পেশ করছি:

"মালাক্কা (পেনাং) উপদ্বীপের মুখোমুখিই যে ডাচ্ পূর্ব-উপকূল, সেখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য ডাচ্ উপনিবেশের চেয়ে বহুগুণে পৃথক। এখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ থেকে দশ হাজারের ওপর ভারতীয় বাস করেন। তা' ছাড়া অনবরত ভারতবর্ষ থেকে ফেরিওলা ও বাজিকর এখানে যাতায়াত করেন।

"আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, এই অধিবাসীরা বেশির ভাগ বৃটিশ-বিদ্বেষী। গেল বছরের অগাস্ট মাসে আমি যখন সিঙাপুর, সাবাং এবং কলম্বো যাই, তখন নিজে চোখে দেখেছি স্থানীয় লোকেরা কী প্রকাশ্যে অবিশ্বাসের চোখে দেখে বৃটিশদের পাঠানো যুদ্ধবিবরণী প্রভৃতি। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, এমডেন্ প্রভৃতির আবির্ভাব, সিঙাপুরের বিদ্রোহে জাপানীদের হস্তক্ষেপ ইত্যাদির ফলে সেই প্রকাশ্য অবিশ্বাস কত প্রখর হ'য়ে থাকবে, সহজেই অনুমেয়।

"এখান থেকে প্রচার-পুস্তিকাদি সবকিছুই ভারতে নিয়ে যাওয়া সহজ—চীনে জাহাজ, মালয়দেশীয় হাজী এবং স্থানীয় ভারতীয়দের সহায়তায়;

বিশেষত মেডা-এর (মাডেন্-এর ?) 'শারিকাৎ-ই-ইসলাম' প্রেস থেকে ডাচ্ সরকারের অগোচরেই যাবতীয় পুস্তিকাদি ছেপে নেওয়া যাবে।

"ডাচ্ উপনিবেশ বাটাভিয়ায় আমার জন্ম। যুদ্ধের আগের পাঁচ বছর আমি সেখানে চাষ-আবাদ করতাম আমার জমিজমায়। যুদ্ধ বাধলে আমি ডাচ্ পাসপোর্ট নিয়ে জার্মানী যাই এবং স্বেচ্ছাসেবক-রূপে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিই। আমার এখন সাতাশ বছর বয়স। মালয়ের ভাষা বলতে পারি। পূর্ব উপকূল সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট, কারণ সেখানে আমি দেড় বছর ছিলাম। আমায় যদি ভারতীয় বিপ্লবের সাহায্যার্থে ওখানে পাঠানো হয়, আমি বিশেষ কৃতকার্য হ'ব আমার বিশ্বাস।...

"আমার প্রশিক্ষণ সৈন্য-বাহিনীতে শেষ হ'য়ে এসেছে। মিলিটারি সর্বাধিনায়কের মারফৎ এই চিঠি আমি তাই সরকার বাহাদুরকে পাঠাচ্ছি।"

বার্লিন কমিটি থেকে এই পত্র পাঠ ক'রে ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মান সরকারকে ২৮. ৪. ১৯১৫ তারিখে লিখলেন :

"জেনারেল-স্টাফের কর্তৃপক্ষকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি, ক্রাফ্‌ট্-কে মিলিটারি সার্ভিস থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমাদের সহায়তার জন্য পাঠানো হোক!"

তখন ক্রাফ্‌টের নামে জার্মান সরকার নিম্নোক্ত আদেশ পাশ করলেন :

(ক) "...চতুর্থত তাঁর প্রধান কাজ হবে : বৃটিশ এবং ফরাসী অধিকৃত ভারতবর্ষের সঙ্গে পাকাপাকি-রকম সংবাদ লেনদেনের কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা ; বিশেষত আমাদের যুদ্ধকালীন বিবরণী ইত্যাদি ভারতীয় এলাকায় চাউর করা।—(খ) ভারতীয় বিপ্লবীদের সর্ববিধ কাজে সহযোগিতা করা এবং বিদ্রোহ ত্বরান্বিত করতে উৎসাহ দেওয়া ; বিশেষত অস্ত্রশস্ত্রাদি সুষ্ঠুরূপে বিভিন্ন ভারতীয় কেন্দ্রে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা।

"এর দরুণ, তাঁর জাভা ও সুমাত্রা যাত্রার রাহা-খরচ হিসেবে তাঁকে এককালীন এক হাজার তিনশ' আশী জার্মান মার্ক দেওয়া হ'বে। এবং ১৫ই মে থেকে তাঁর বার্লিন প্রত্যাবর্তন অবধি 'মাসিক তিনশ' চল্লিশ মার্ক... দেওয়া হবে।..."

॥ দুই ॥

স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো…শাংহাই…ব্যাঙ্কক…সিঙ্গাপুর…সুমাত্রা…কলকাতা—

ভারতীয় বিপ্লবীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে লোক অনবরত আনাগোনা করছে এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে, এক কেন্দ্রের সংবাদ সংগ্রহ করে পৌঁছে দিচ্ছে অন্য কেন্দ্রে, পৌঁছে দিচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র, বিদ্রোহের পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া, অর্থ ইত্যাদি।

দলের সভ্য আত্মারাম চীন হয়ে ১৯১৫ সালের গোড়ার দিকে পৌঁছলেন গিয়ে ব্যাঙ্কক। ব্যাঙ্ককের জার্মান কন্‌সাল রেমী লিখেছেন, "আমি তখন আত্মা সিংকে ভারতবর্ষে পাঠালাম সঠিক কয়েকটি সংবাদের জন্যে। আত্মা সিং অত্যন্ত কর্মক্ষম লোক।—ইংরেজ চরদের চোখ এড়ানোর জন্যে তিনি সর্বদাই খুব গরীবের মতো পোশাক-আশাক ব্যবহার করতেন। আমি ওঁকে বলে দিই, যে-ক'রে হোক বাংলার বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা যেন করেন।…"

আত্মা সিং কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। যতীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের মধ্যে 'গদর'দলের নেতা সত্যেন সেনের সঙ্গেই বোধহয় তাঁর প্রথম যোগ হয়—বহু অন্বেষণের পর! তাঁর কাছে অন্যান্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক সংবাদ সব পাওয়া গেল। এবং দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্বন্ধে আত্মা সিংকে নির্দেশ দিয়ে তাঁকে ফেরৎ পাঠানো হল ব্যাঙ্ককের কন্‌সালের কাছে; এবং সেখানকার অন্যতম সংগঠক উকিল কুমুদ মুখার্জীর সঙ্গে যোগস্থাপনের নির্দেশও দেওয়া হ'ল।

ব্যাঙ্ককের কন্‌সাল রেমী লিখেছেন, "মাস-দুই বাদে অবশেষে আত্মা সিং ফিরে এলেন আশাপ্রদ প্রচুর সংবাদ নিয়ে। কলকাতা, মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবের কয়েক জায়গায় ইতিমধ্যে বিদ্রোহ লেগে গিয়েছে; ইংরেজ সরকারের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অনেক ইংরেজের জীবনও নাশ হয়েছে।

"বেলুচিস্তান থেকে ষাট হাজার মুক্তিসৈন্য যদি ভারতে এখন প্রবেশ করে, তা'হলেই ইংরেজ সরকার নাস্তানাবুদ হবে।*

* আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে মুক্তিসৈন্য ভারতে আনা প্রসঙ্গে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' দ্রষ্টব্য। জার্মান সরকারের নথিপত্রেও প্রচুর তথ্য আছে; এখানে সেগুলির অবতারণা ঘটিয়ে সূত্রগুলি আর জটিল করলাম না॥

"আত্মা সিং বলেন যে, বহু মেহনৎ ক'রে তবে তিনি বাংলার নেতৃবৃন্দের আস্থাভাজন হ'তে পারেন; প্রথমে তাঁকে কেউ বিশ্বাস করে নি তেমন। অবশেষে জার্মান কন্‌সালের সীলমোহর দেখান তিনি। তাঁর মারফৎ বাংলায় কিছু টাকা পাঠানো গিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার বিপ্লবীরা সর্বতোভাবে বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের হাতে এখনো বাঞ্ছিত অস্ত্র ও অর্থ পৌঁছল না। এখনো অস্ত্র ও অর্থ যদি পৌঁছয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অভ্যুত্থান শুরু করতে পারেন।...

"ভারতীয় বিপ্লবীদের দুটি মাত্র ঘাঁটি এখানে আছে। একটা, ব্যাঙ্ককের তাপান্ ড্যাম (কালো সাঁকো) অঞ্চলে, জনৈক ভারতীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীর বাড়িতে। অন্যটি, শ্যামদেশের উত্তরে নর্দার্ন রেলওয়ের প্যাথো স্টেশনের কাছে। সন্তোখ সিং (নেহাল্)-এর বদলে এখানের নেতা এখন কাপুর সিং।*

ব্যাঙ্ককের কন্‌সালের তরফ থেকে এবার কলকাতায় এলেন সেখানকার উকিল কুমুদ মুখার্জী।

১৯১৫ সালের মার্চ মাস।

অ্যামেরিকার সংগঠনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং ইওরোপের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন ক'রে দেশে ফিরলেন জিতেন লাহিড়ী। তিনি পাকা খবর নিয়ে এলেন যে বাইশে এপ্রিল স্যানফ্রান্সিস্কো থেকে 'মাভেরিক' জাহাজ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে রওনা হচ্ছে। পথে 'অ্যানি লার্সেন' তার রসদও তুলে দেবে 'মাভেরিক' জাহাজে। তৃতীয় একটি জাহাজ 'হেন্‌রি এস্' আসবে কয়েক দিন পরে। সঙ্গে থাকবেন ভেডে (Wehde) এবং জর্জ পল্ ব্যোম্ (Boehm) নামে দুইজন জার্মান বিশেষজ্ঞ।

ভেডে প্রসঙ্গে ওয়াশিংটন থেকে সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামে ব্যার্নস্টর্ফ জানাচ্ছেন (৯ই এপ্রিল, ১৯১৫): "গুপ্ত (হেরম্বলাল) বলছেন, আরো দশ হাজার রাইফেল ও কিছু মেশিনগানের প্রয়োজন। তার জন্যে আরো একটা স্টীমার কেনা দরকার। তিন লক্ষ ডলারের মধ্যেই এ-কাজ সেরে ফেলতে

* ডাঃ ভূপেন দত্ত লিখেছেন, "আত্মারাম ও কাপুর সিং চীন থেকে পদব্রজে ব্যাঙ্কক যান; সেখান থেকে শ্যামের ইঞ্জিনীয়ার অমর সিংকে কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামের জার্মানরা মৌলমেনের পথে বর্মা আক্রমণ করবেন ঠিক হয়। চীনের জার্মানরা দুই ভাগে (একদল, শ্যামের দলের সঙ্গে; অন্যদল, বর্মার রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে সামনে রেখে ভামো-র পথে উত্তর বর্মা দিয়ে) আক্রমণ করবেন।"

পারব। তা' ছাড়া গুপ্ত বলছেন যে শিকাগোর-র বিখ্যাত পণ্ডিত এবং পুরাতত্ত্ববিশারদ ভেডে-কে যদি অবিলম্বে ম্যানিলা এবং ব্যাঙ্কক হ'য়ে ভারতবর্ষে পাঠানো যায়—খুব ভাল হয়, কারণ ভারতে টাকার অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন এখন। মার্কিন ব্যাঙ্ক থেকে ভারতীয় কোনও ব্যাঙ্ক মারফৎ ভেডে-র নামে দুই লক্ষ জার্মান মার্ক আমরা ভাঙিয়ে দিতে পারি—তিনি শিকাগো মিউজিয়ামের জন্যে প্রাচীন শিল্প নিদর্শন কিনতে ভারতে যাচ্ছেন, এই অজুহাতে। ভেডে স্বয়ং মার্কিন নাগরিক। সত্বর অনুমতি চাই এবং আমার হাতে যদি মোটা কিছু টাকা এখন দেওয়া হয় তা হলে বার বার আপনাদের অনুমতির পথ চেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয় না, ভারতীয় বিপ্লবের জরুরী এই পরিস্থিতিতে।”

ওদিকে আমেরিকা থেকে গদর দলের সভ্য ভগবান সিং জাপান ও চীনে গিয়ে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছেন। বাংলা থেকে রাসবিহারী বসু গিয়ে তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন। কাজ ভালই চলছিল। রাসবিহারীর সহযোগিতার জন্যে যতীন্দ্রনাথের দলের সভ্য অবনী মুখার্জীকে জাপানে পাঠানো হল।

জাপানে রাসবিহারী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অবনী বহু কাজের সুযোগ পেলেন দলপতির পত্র নিয়ে যাবার সুবাদে। এবং বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ ক'রে দেশে ফেরবার পথে তিনি রাসবিহারীর সঙ্গে শাংহাই যান। সে প্রসঙ্গে পরে আসব।

সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগ চারিদিকে সতর্ক জাল পেতে মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। উড়িষ্যা ও বিহারের সরকারী রিপোর্ট লিখছে, “১৯১৫ সালের ২৪—২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গোয়েন্দা নীরদ হালদারকে হত্যা করবার অপরাধে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নামে একাদিক্রমে বহু মাস যাবৎ কলকাতার প্রধান প্রধান পথে-ঘাটে বাংলা ও ইংরেজী প্ল্যাকার্ড এবং পোস্টার টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল—মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে যদি তাঁকে কেউ ধরিয়ে দিতে পারে। ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের ৮৭ ধারা অনুযায়ী তাঁর নামে এই পরোয়ানা বার করা হয়। এবং সাব-ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখুজ্যেকে হত্যার অপরাধে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর নামেও পরোয়ানা বার করা হয়। দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের অন্তত তা' দৃষ্টি আকর্ষণ করে।…”

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার গডফ্রে চার্লস ডেনহ্যাম,

সি-আ-ই বিশেষভাবে নিযুক্ত হলেন যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করবার উদ্দেশ্যে। ইংল্যাণ্ডের Dictionary of National Biogarphy-তে চার্লস টেগার্টের জীবনীচুম্বকে বাংলাদেশের বিপ্লব-আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছে,

"State of affairs, after 1914, was worsening beyond control. The unrest in India had attracted the attention of Germany, whose officials and nationals in the United States joined with certain Indians in a plot to ship weapons to India for the use of revolutionaries,..."

এর পরবর্তী বাক্যটির ইংরেজসুলভ গাম্ভীর্য ভেদ ক'রে যে গভীর শঙ্কার স্বর ধ্বনিত হয়েছে, তা' লক্ষণীয় :

"The scheme had serious possibilities but was fortunately soon discovered..., an important base of operations being unearthed in Calcutta...."

ছায়ার মতো সর্বত্র গোয়েন্দারা ঘুরছে যতীন্দ্রনাথের অবস্থিতি অনুমান ক'রে। কিন্তু তাঁর নাগাল পেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না ; পরে ডেনহ্যাম বড়-লাটের কাছে লেখেন,

"Jatin Mukherjee, perhaps the boldest and the most actively dangerous of all Bengal revolutionaries."

আর, তাই বুঝি বালেশ্বর যুদ্ধের খবর পেয়ে বড়লাট হার্ডিঞ্জ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মন্তব্য করেন,

"Nothing can be more praiseworthy than the action of Kilby* and Sergeant Rutherford !"

সে-প্রসঙ্গও এখন থাক।

কঠোর এই পরিস্থিতির মধ্যে যতীন্দ্রনাথের সহকর্মীদের মনে কাঁটার মতো একটি প্রশ্নই বিঁধতে থাকে : এমন মারাত্মক পরিবেশের মধ্যে মহা-নায়ক যতীন্দ্রনাথ এখনো কেন সংগঠনের কাজে ঘোরাঘুরি ক'রে বেড়াচ্ছেন ! এতবড় বিপ্লব-সংস্থার মস্তিষ্ক আর হৃদয় একাধারে তিনি। অভ্যুত্থানের সমস্ত প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে যদি তাঁর কিছু ঘটে দৈবাৎ। আরো কত যুগের

* বালেশ্বরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট।

জন্য স্থগিত থাকবে ভারতের আসন্ন স্বাধীনতা—কে জানে ?

সবার সামনেই এই সমস্যা: কী ক'রে 'দাদা'কে নিরাপদ কোনও আশ্রয়ে রাখা যায়—অন্তত সাময়িকভাবে, কিছুদিনের জন্য, যতদিন না জার্মানীর সাহায্য এসে পৌঁছচ্ছে ?

ঝিনাইদা থেকে মাগুরায় না ফিরে, যতীন্দ্রনাথের সহকারী নলিনী কর সোজা উপস্থিত হলেন কলকাতায়। তিনি লিখছেন, "আমার অনুমানই ঠিক। দাদা নন, নীরদকে গুলী করে মেরেছে চিত্তপ্রিয়।...আমাকে দেখেই অতুল (ঘোষ) বলে উঠল: তোকে বিশেষ প্রয়োজন!..."

প্রয়োজন বলেই তো প্রস্তুত হ'য়ে এসেছেন নলিনীকান্ত।

অতুল ঘোষ বললেন: "বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে, দাদাকে নিরাপদ কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া।...দাদাকে সবাই লুকিয়ে থাকতে বলছেন। তিনি তাতে রাজী হচ্ছেন না। তাঁর কথা হচ্ছে, লুকিয়ে থাকলেও তো একদিন ধরা পড়তেই হবে।..."

আগেই বলেছি যে, ১৯১০ সালে সামসুল হত্যার পর নলিনীকান্ত ও দেবীপ্রসাদ রায় (খুড়ো) ছ-মাসের জন্যে ময়ূরভঞ্জের কপ্তিপদায় মহুলডিহা গ্রামে গিয়ে মণীন্দ্র চক্রবর্তীর আশ্রমে আত্মগোপন করেছিলেন।* দেবী-

* এই আশ্রয়স্থলের পরিকল্পনার পূর্বাভাস কিছু ইতিপূর্বেই দিয়েছি। ১৯০৮—০৯ সালে যখন জাস্টিস সারদাচরণ মিত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সভাপতিত্বে কলকাতার মূল অনুশীলন সমিতির তরফ থেকে Bengal Youngmen's Zamindari Cooperative Society প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তার প্রথম কেন্দ্রে গোসাবায় খুলে কিছু জমি সংগ্রহ করা হয় এবং মাগুরার শিক্ষক হীরালাল রায়কে সেখানে পাঠানো হয়, তখন ব্রজেন্দ্রকিশোর ও অম্বিকা উকিলের সঙ্গে সুরেন ঠাকুর পরামর্শ করেন: একটা network of shelters দেশে কি ভাবে গ'ড়ে তোলা যায়?—সুরেন ঠাকুরের আরও একটি প্রশ্ন ছিল: কি ক'রে ঘরছাড়া বিপ্লবী কর্মীদের ঘোরাফেরা ও জীবিকার একটা ব্যবস্থা করা যায়?—তখন ময়ূরভঞ্জের দেওয়ান ছিলেন মাগুরার দেবেন্দ্রনাথ সিংহ। ইনি ব্রজেন্দ্রকিশোরের পরিচিত। ব্রজেন্দ্রকিশোরই সুরেন ঠাকুরের সঙ্গে দেবেনবাবুর পরিচয় করিয়ে দেন। মণীন্দ্র চক্রবর্তীর বাবাও তখন কপ্তিপদায়; চাকরি করতে করতে তিনি সেখানে বেশ কিছু সম্পত্তি করেন—তার মধ্যে পারিতোষিকস্বরূপ কিছু জমিজমাও পান। সুরেন ঠাকুরের পরিচয়ে দেবীপ্রসাদ রায় প্রথমে দেবেনবাবুর সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে জানতে পারেন যে তাঁর দাদার বন্ধু মণিবাবুর কাছেই তাঁকে যেতে হবে আশ্রয়ের জন্যে।

সুরেন ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান দেন অম্বিকা উকিল: দু'জনে মিলে Hindusthan Cooperative Insurance-এর পরিকল্পনা করেন।

ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌সে রক্ষিত বেঙ্গল পুলিশ রিপোর্টে এই ইনস্যুরেন্স কোম্পানীকে বার বার revolutionary organisation বলে উল্লেখও করেছে॥

প্রসাদ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ এবং সুরেন ঠাকুর, অম্বিকা উকিল, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতির মধ্যে যোগসূত্র; যতীন্দ্রনাথের পরামর্শ নিয়ে এঁদের কাছে যাতায়াতের কাজ ছিল তাঁর। আর দেবীপ্রসাদের দাদার বাল্যবন্ধু মণীন্দ্র চক্রবর্তীদের দেশও নদীয়া—যতীন্দ্রনাথের প্রধান কর্মকেন্দ্রের অন্যতম। বিপ্লবী সংগঠনের সভ্য না হয়েও বিপ্লবের সহায়তা যাঁরা করেছেন, জীবনের সর্বস্ব পণ ক'রে বিপ্লবীদের কাজ ত্বরান্বিত করেছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয়দের প্রথম একটি নাম মণীন্দ্র চক্রবর্তী : খাঁটি সোনায় তৈরি তাঁর অন্তর, পরকে বুকে টেনে নেওয়া তাঁর ধর্ম।

নলিনীকান্ত তাই অতুল ঘোষকে বললেন : "১৯১০ সালে আমি যেখানে লুকিয়ে ছিলাম দাদাকে সেখানেই রাখা যায় কিনা, তোমাদের কেউ একজন এসে দেখে যাও। তারপর দাদাকে সেখানে যেতে অনুরোধ করলেই হবে।"

তদনুযায়ী যতীন্দ্রনাথের অপর অন্তরঙ্গ সহকর্মী নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy) গেলেন নলিনীকান্তের সঙ্গে। কপ্তিপদার আশ্রয়স্থল দেখে নরেন পরিতুষ্ট হ'য়ে ফিরে এসে অতুল ঘোষ প্রভৃতিকে বললেন—চমৎকার আশ্রয় হবে এটি, এবং কাছেই, উড়িষ্যার উপকূলে বালেশ্বরে জার্মান জাহাজ থেকে অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে এখানে মজুদ রাখাও সহজ হবে।

জাহাজ আসবার চূড়ান্ত সংবাদ পাবার পর অবশেষে যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরের নিকটবর্তী এই কপ্তিপদায় যেতে রাজী হলেন। অর্থাৎ যতদিন না জাহাজ আসছে, ততদিন আসন্ন অভ্যুত্থানের হেডকোয়ার্টার হবে কপ্তিপদা।

ঠিক হ'ল—একটি জাহাজ আসবে নোয়াখালি কিংবা হাতিয়ায়। পূর্ব-বঙ্গের তরফ থেকে বরিশালের বিপ্লবী অধিনায়ক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের শিষ্য নরেন ঘোষচৌধুরী, মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি এই রসদ খালাস ক'রে নেবেন। যতীন্দ্রনাথের কন্‌ফেডারেসী-র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দল এই বরিশালের গ্রুপ।

দ্বিতীয় জাহাজটি আসবে সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে। যতীন্দ্রনাথের অনুরক্ত বন্ধু—বীর প্রতাপাদিত্যের বংশধর, নূরনগরের রাজা যতীন রায় তাঁর লোক-জন মাঝি-মাল্লা নৌকো প্রভৃতি প্রস্তুত রাখলেন এই জাহাজের রসদ নামিয়ে নেবার জন্যে। হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের বিখ্যাত হরিকুমার চক্রবর্তী এইদিকের

দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ; তাঁর সহযোগী রইলেন নরেন ভট্টাচার্য, যাদুগোপাল মুখার্জী, অশ্বিনী রায় প্রভৃতি। আর প্রস্তুত রইলেন বসিরহাটের মহৎপ্রাণ ডাঃ যতীন ঘোষাল।* এঁরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ ক'রে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রের সহযোগিতায় প্রেসিডেন্সী বিভাগে প্রবেশ করলে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে অপেক্ষমাণ দেশী সৈন্যরা কথা দেয় অন্যদেরও তারা দলে টেনে নেবে ; ফোর্টে উড়িয়ে দেবে স্বাধীন ভারতের পতাকা। সারা দেশের সৈন্যশিবির, অস্ত্রাগার, অস্ত্রের দোকান, সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অবরোধ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম মহানগর কলকাতা দখল করবেন বিপ্লবীরা। ফণী চক্রবর্তী, ব্রজেন দত্ত (জগা) প্রভৃতি ডিনামাইট ইত্যাদি প্রস্তুত রাখলেন। দেশী সৈন্যরা বিদ্রোহ ক'রে পেশোয়ার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।†

বিদেশী সরকারের সৈন্য ও প্রহরীদের যাতায়াত বন্ধ করবার জন্যে এবং তাদের রসদ সরবরাহ অচল করবার জন্যে প্রধান রেলপথগুলো উড়িয়ে দেওয়া হবে। বাংলা-মাদ্রাজ রেলপথ উড়িষ্যা থেকে অচল ক'রে দেবেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথের পার্শ্বচরেরা। B. N. Rly. উড়িয়ে দেবেন ভোলানাথ চাটুজ্যে। আর সতীশ চক্রবর্তী উড়িয়ে দেবেন অজয়ের পুল ও ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

তৃতীয় এবং চতুর্থ জাহাজে থাকবে সবচেয়ে বেশি মাল। এই জাহাজটি উড়িষ্যার উপকূলে বালেশ্বরে নামিয়ে দেবে তাদের মাল। মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ এই জাহাজটির ভার নিলেন।

বালেশ্বরের চাঁদপুর গ্রামটি বঙ্গোপসাগরের ওপরেই। ১৯০৫ সালে কামানের গোলা পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে সমুদ্রতীরে একটি সরকারী

---

* ১৯৬৫ সালে এই রচনা ধারাবাহিক প্রকাশের সময়ও জীবিত।

† ওদিকে তারকনাথ দাস, অজিত সিং, হৃষীকেশ লাট্টা, শ্রীনায়ক, কেদারনাথ, আমীন শর্মা, দাদাজী কেরসাস্প, সুফী অম্বা পেরশাদ, বসন্ত সিং, চৈত সিং, মীর্জা আব্বাস, বরকতুল্লা, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, আগাশে, প্রমথনাথ দত্ত (দাউদ আলী) প্রভৃতি ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মানীর সহযোগিতায় চেষ্টা করছেন তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তান পার হ'য়ে ভারতবর্ষে মুক্তিসৈন্য-বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করতে। ও-সব অঞ্চলের দেশী সৈন্যরা সে-সময়ে বলে, "বাবুজী, পাঁচ হাজার লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিন আমাদের : কোয়েটা থেকে কলকাতা কুচ্ ক'রে যাব : পথে পাঁচ হাজার লোক পঞ্চাশ হাজারে পরিণত করব !"

সৈন্যাবাস এখানে স্থাপিত হয়। প্রয়োজন হ'লে অতর্কিতে এই ঘাঁটি দখল করবার ভারও নিলেন যতীন্দ্রনাথ।

জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে উড়িষ্যার পথ পরিষ্কার ক'রে সদলবলে সিংভূম হ'য়ে মেদিনীপুর দিয়ে কলকাতায় গিয়ে পৌছবেন যতীন্দ্রনাথ। পথে অন্যান্য ঘাঁটি থেকে বিপ্লবীরা সমবেত হতে থাকবেন। এবং মিলিত হবেন গিয়ে কলকাতায়।

ওদিকে, সুয়েজ হ'য়ে একাধিক জাহাজ আসবে ঠিক রইল পশ্চিম ভারতের কয়েকটি কেন্দ্রে। ডাঃ খানচাঁদ বর্মা পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এক-জাহাজ অস্ত্র খালাস ক'রে ডেরাস্মাইলখাঁয়ে তাঁর বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু, জাহাজ করাচীতে পৌছনো-মাত্র ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এবং গোকর্ণী অঞ্চলেও বিশেষত বিপ্লবীদের শক্তিশালী ঘাঁটি সক্রিয় ছিল। পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এঁদের সংযোগ।* পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতের ঢেউ একই সময়ে পাঞ্জাবে পৌছে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে সর্বভারতীয় বিপ্লবের কেন্দ্রগুলি। মাত্র বারো হাজার ইংরেজ সৈন্য ছিল তখন আসমুদ্র হিমাচলেঃ সাধ্য কি, তারা রোধ করে এই সুমহান বিপ্লবের তরঙ্গ?

"একটি অস্থায়ী ভারত-সরকার স্থাপন করবার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল," লিখেছেন যাদুগোপাল মুখার্জী। স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের পরিচালনার কথাও চিন্তা ক'রে রেখেছিলেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ। চাকরি-জীবনে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনযন্ত্রটি সযত্নে অধ্যয়ন ক'রে নেবার সুবিধা পেয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিপুঞ্জের শাসন-পদ্ধতিও তাঁর নখদর্পণে।

তাই বুঝি ভূপতি মজুমদার লিখেছেন, "...ইংরেজের বহু বিরোধী শক্তির সঙ্গে সেদিনের নাম-যশ বিরাগী এই মনীষী সাধারণভাবেই জীবনযাপন করিতেন," অথচ "এই লোকটির মস্তিষ্ক থেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল।"

* ডাঃ সাভারকরের ভাই শ্রী এন. ডি. সাভারকর কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে পাঠকালীন বাংলার শীর্ষস্থানীয় কিছু বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং মহারাষ্ট্র ও বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের ইনিই ছিলেন তখন যোগসূত্র। এঁর কাছ থেকে পরিচিতি-পত্র নিয়ে ভোলানাথ চাটুজ্যে ও বিনয় দত্ত গিয়েছিলেন গোয়া-য়। গোকর্ণীতে (বা "গোকর্ন"তে) অস্ত্র নামালে পর তা বিলি করে দেবার ভার ছিল মহারাষ্ট্রের উক্ত বিপ্লবী দলের উপর অন্যান্য গ্রুপের সঙ্গেও এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথের শিষ্যেরা এক সাইকেল ও ঘড়ির দোকান এর আগেই খুলেছেন: নাম তার 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম'। কলকাতার 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স'-এর শাখা এটি। চালাচ্ছেন শৈলেশ্বর বসু, নিমাই (তারাপদ) চক্রবর্তী প্রভৃতি।

যতীন্দ্রনাথ স্থির করলেন, বালেশ্বরে যাবার আগে কিছুদিন তিনি বাগনানে তাঁর বিপ্লবী বন্ধু, হেডমাষ্টার অতুলচন্দ্র সেনের বাড়িতে কাটাবেন।* সেখান থেকে মেদিনীপুরের কুমার-আড়া গ্রামেও দলের সভ্য এবং বাগনান স্কুলের হেডপণ্ডিত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে অল্প সময় কাটিয়ে রওনা হবেন বালেশ্বরের দিকে।

॥ তিন ॥

১৯১৫ সালের গ্রীষ্মকাল। বোধহয় চৈত্রমাস।

যতীন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে রওনা হচ্ছেন। বাংলাদেশ ছেড়ে অনিশ্চিতের পথেই তিনি পা বাড়াচ্ছেন নতুন ক'রে।

যতীন্দ্রনাথের এদিনের কর্মসূচীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বিপ্লবী বন্ধু অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অমরেন্দ্রবাবুর সহযোগিতা করেন মাখন সেন ও রামচন্দ্র মজুমদার।

স্থির হ'ল, নৌকোয় ক'রে গঙ্গা পার হয়ে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে যতীন্দ্রনাথ রামরাজাতলা অবধি যাবেন। এবং সেখানে তিনি ট্রেন ধ'রে রওনা হবেন বাগনান অভিমুখে; সঙ্গে থাকবেন মাখন সেন, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ও চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী।

এরই ঠিক পাঁচ বছর আগে, এমনি সময়েই শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশ ত্যাগ ক'রে চলে যান—চিরদিনের জন্যে। সেদিন যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের সেই ঐতিহাসিক প্রয়াণের সাক্ষী ছিলেন, রামচন্দ্র মজুমদার ছিলেন তাঁদের একজন। আর যতীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ ত্যাগ ক'রে যাবার প্রাক্কালেও

---

* প্রথম যুগের বিপ্লবী কর্মী, অ্যামেরিকা-প্রত্যাগত শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র দাস (ক্যালকাটা কেমিক্যাল) লিখেছেন, "অতুলবাবুর বাড়িতে (যতীন্দ্রনাথ) যাতায়াত করিতেন। অতুলবাবু মাঝে মাঝে মোটা টাকা আমাদের নিকট জমা রাখিতেন এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে তাঁহারা লঙ্কার কারবার করেন এবং সেই বাবদ টাকা..."

উপস্থিত রইলেন রামচন্দ্র মজুমদার। শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ, উভয়েরই স্নেহভাজন ছিলেন রামবাবু।

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে রামচন্দ্র মজুমদার সেদিন মাখন সেনকে বলেন, "বাংলার প্রাণ আজ আপনার হাতে দেওয়া হল। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। নিজের দায়িত্ব বুঝে নেবেন।"*

ভ্রাতৃতুল্য প্রাণোপম শিষ্য বন্ধু সহকারীদের যাঁরা যতীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন সেদিন গোপনে, নয়নে তাঁদের দীপ্ত সঙ্কল্প—মহানায়কের নির্দেশ অনুযায়ী যে যাঁর নিজের কেন্দ্রে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকবেন। প্রতীক্ষা করবেন যতীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ—যতীন্দ্রনাথের পরবর্তী-নেতা: যতীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে কলকাতার কেন্দ্রগুলি তথা দেশের সমস্ত বিপ্লবী সংস্থাগুলিরই পরিচালনা করবেন তিনি বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। তাঁর সঙ্গে থাকবেন নরেন ভট্টাচার্য, হরিকুমার চক্রবর্তী, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। অতুল ঘোষের সমস্তা সত্তাই যতীন্দ্রনাথের স্নেহ ও প্রেমের প্রভাবে এমন টইটম্বুর যে, যতীন্দ্রনাথকে এইভাবে অনিশ্চিতের পথে যেতে দিতে সারা মন তাঁর শিশুর মতো অসহায় বোধ করেছে সেই ক্ষণে।

বাগনান।

হেডমাস্টার অতুল সেনের বাড়িতে অল্প কয়েকদিন কাটিয়ে বাগনান স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সশিষ্য যতীন্দ্রনাথ গেলেন হেমবাবুর গ্রামে—মহিষাদলের নিকটবর্তী কুমার-আড়ায়।

ইতিমধ্যে নলিনী কর ও নরেন ভট্টাচার্য দেখতে গেলেন কপ্তিপদার নতুন আটচালা কেমন উঠল। নলিনীকান্ত লিখেছেন, "...আমি আর নরেনদা (M. N. Roy) মহুলডিহা (কপ্তিপদা) যাবার দিন বিকালে দাদার সঙ্গে দেখা করতে বাগনানে গিয়েছিলাম। সেখানে শ্রীযুত অতুল সেন দাদাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। দাদার সঙ্গে তখন চিত্তপ্রিয় ও বিপিন গাঙ্গুলীকে দেখেছিলাম।"

কুমার-আড়া গ্রাম থেকে বিপিনবাবু দু-তিন দিন বাদে কলকাতা ফিরে,

*ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর 'বিপ্লবীজীবনের স্মৃতি' দ্রষ্টব্য।

যান। যতীন্দ্রনাথ আরো কয়েকদিন রইলেন সেখানে। তারপর মহুলডিহার তদারকের দায়িত্ব নলিনীকান্তের ওপর ন্যস্ত করে নরেন ভট্টাচার্য কুমার-আড়া ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আরো কয়েকজন অনুচরও এলেন। সকলকে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ রওনা হলেন বালেশ্বরে।

বালেশ্বর শহর। সমুদ্র থেকে মাত্র আট মাইল দূরে।

শৈলেশ্বর বসু ও তাঁর সহকর্মীরা স্টেশন থেকে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহগামী কর্মীদের নিয়ে গেলেন 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম'-এ। সেখানে আগে থেকেই অধিষ্ঠিত ছিলেন শৈলেশ্বর বসু : আবগারি বিভাগের কিছু কর্মচারীকে ইতিমধ্যে তিনি দলে টেনেছেন।

মহুলডিহা থেকে নলিনীকান্ত কর ও মণীন্দ্র চক্রবর্তী এসে যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে গেলেন কপ্তিপদায়—মহুলডিহার আস্তানায়। যাবার পথে একটু ঘুরে দেশীয় রাজ্য নীলগিরি হয়ে তাঁরা পৌছলেন গিয়ে গন্তব্য-স্থলে, যাতে করে ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে কোথায় তাঁরা গেলেন।

কপ্তিপদা।

মণীন্দ্র চক্রবর্তীর আতিথ্য গ্রহণ করলেন যতীন্দ্রনাথ। মহুলডিহা মৌজায় মণীন্দ্রবাবু থাকেন। সেখান থেকে আধ-মাইল আন্দাজ দূরে গোপালডিহায় একখানা আটচালা বাঁধিয়েছেন তিনি আস্তানারূপে।

কে এই মহাপ্রাণ দেশভক্ত—যিনি জেনেশুনেও যতীন্দ্রনাথ-হেন অগ্নি-হোতাকে সশিষ্য সাদরে বরণ করে নিলেন জাতির ইতিহাসের দুর্যোগপূর্ণ এক দিন-বদলের সন্ধিক্ষণে?

মণীন্দ্রবাবুর পিতা ৺কেদারনাথ চক্রবর্তী ছিলেন ময়ূরভঞ্জের পুলিশ ইন্স-পেক্টর। বহু ডাকাত তিনি দমন করেছিলেন। তাই, অতিবড় দুঃসাহসী ডাকাতও কেদার চক্রবর্তীকে সমীহ করে চলত।

কেদারবাবু যখন অবসর গ্রহণ করেন, তার পিঠপিঠই ময়ূরভঞ্জ রাজত্বের ক্ষুদ্র রাজ্য কপ্তিপদায় দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। কেদারবাবু কপ্তিপদার দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অবস্থা আয়ত্তাধীন আনলেন। এই কৃতকার্যতার জন্যে তিনি পারিতোষিক পেলেন এই মহুলডিহা মৌজা।

মণীন্দ্র চক্রবর্তী কেদারবাবুর একমাত্র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। যেখানে

যতীন্দ্রনাথের জন্যে আটচালা পড়ল, সেটা মণীন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে মাত্র আধ-মাইল দূরে ; জায়গাটার নাম হয়েছিল গোপালডিহা—যখন ১৯১০ সালে যতীন্দ্রনাথের শিষ্য দেবীপ্রসাদ রায় ও নলিনীকান্ত কর এখানে এসে আত্মগোপন করেন, সেই সময়ে নলিনীবাবুর ছদ্মনাম হয় গোপাল রায় এবং সেই নামেই উক্ত জায়গাটি তিনি বিপ্লবীদের জন্যে সংগ্রহ করে নেন আইনত।*

মণীন্দ্র চক্রবর্তীর জবানেই বলি, "মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জ-দেও বিপ্লবীদের কাজের সমর্থন করতেন।...সেই সময়ে (১৯১০ সালে) তিনি একবার কপ্তিপদায় এলেন থানা পরিদর্শনে। মহুলডিহার পরপারেই থানা। দেবী-প্রসাদ নদী পার হয়ে মহারাজের সঙ্গে দু-ঘণ্টাধিক আলোচনার শেষে তাঁর কাছে একটা জঙ্গল লীজ চান। মহারাজা সম্মত হন। এবং পছন্দমতো জঙ্গল বেছে নিতে বলেন। সেইসূত্রে দেবীপ্রসাদের সঙ্গে আমরা (নলিনী কর ও মণীন্দ্র) পোডাডিহা জঙ্গল দেখতে গিয়েছিলাম। ময়ূরভঞ্জের মেঘাসন পর্বত-শ্রেণীর পাদদেশ অবধি বিস্তৃত এই জঙ্গল আজ বন্যপশু রক্ষার জন্যে উড়িষ্যা সরকার সুরক্ষিত করলেও, সে-যুগের মতো হিংস্র জন্তুজানোয়ারের প্রাচুর্য এখন আর নেই। এই জঙ্গলটি নলিনীকান্তের পছন্দ হল। তাঁরা এটি রেজিস্ট্রি করে নেন গোপাল রায়ের নামে। ফলে এর নাম হয় গোপালডিহা।"

কপ্তিপদায় পৌঁছে, যতীন্দ্রনাথ একদিন এই অরণ্যের দুর্গমতম কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলেন। সঙ্গে রইলেন নরেন ভট্টাচার্য, চিত্তপ্রিয় প্রভৃতি পনেরো-ষোল জন শিষ্য। প্রয়োজন হলে যাতে করে একত্রে বহু বিপ্লবী-সৈন্য সঙ্কট-কালে এসে আশ্রয় নিতে পারেন এবং ট্রেঞ্চ ফাইট দেবার জন্যে সম্মুখ যুদ্ধেও যাতে অবতীর্ণ হওয়া যায়, এমন একটি জায়গায় সন্ধান করছিলেন যতীন্দ্রনাথ।

মেঘাসন পর্বত-মালার দুরারোহ একটি শৃঙ্গ যতীন্দ্রনাথের পছন্দ হল। শৃঙ্গটির নাম ডুভিগড। ডুভিগড়ের পাশেই পঁচিশ-ত্রিশ হাত ব্যবধানে তেমনি আর-একটি শৃঙ্গ। দুটি শৃঙ্গের মাঝে ফাঁকটুকু কে যেন মাটি ও পাথরে ভরে

* এখানে যতীন্দ্রনাথ পরিচিত হলেন সাধুবাবা নামে। চিত্তপ্রিয় হলেন কালিদাস ; নীরেন—শম্ভু ; মনোরঞ্জন হলেন যোগানন্দ ; আর জ্যোতীশ পাল—প্রমথ।

গোপন একটি পথ বানিয়ে রেখেছে। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস : শিবাজীর আমলে মারাঠারাই বানিয়েছে এই পথ।

দুই পাহাড়ের মাঝের পথটিতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অস্ত্রধারী বিপ্লবী বা একটিমাত্র মেশিনগান গোপনে খাড়া করে দেওয়া যায়, তবে অতিবড় শত্রু-বাহিনীরও সাধ্য নেই পাহাড়দুটির ত্রিসীমানায় পৌঁছতে পারে।

ডুভিগড় পাহাড়ের চূড়ায় এক সমতল জমি : অনায়াসে সেখানে পাঁচ-ছয় হাজার বিপ্লবীর মতো ছাউনি পড়তে পারে। দুটি পুকুরও আছে, তাতে প্রচুর জল। জলের ধারে টালির আকারে পাতলা পাতলা ইঁট ছড়ানো।

মণীন্দ্র চক্রবর্তী আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন—উত্তরকালে কারো যদি এই বর্ণনাগুলি অবিশ্বাস্য মনে হয়, স্বচক্ষে গিয়ে ডুভিগড় পাহাড় যেন পরিদর্শন করে আসেন।

ডুভিগড় পাহাড়ের চারদিকেই গভীর খাত। পাহাড়ের গা অত্যন্ত খাড়া, দেয়ালের মতো, দুর্লঙ্ঘ্য। আবার শৃঙ্গের ওপরেও সমতল জমিটি বেষ্টন করে থাকে-থাকে পাঁচিলের মতো পাথর সাজানো।

পাশের পাহাড় ভরতি বাঁশের ঝাড়। একমাত্র বুনো হাতী সেখানে উঠতে পারে। তার প্রমাণ—হাতীতে এসে বাঁশঝাড় মুড়িয়ে যাবার ছাপ সর্বত্র ছড়ানো। কচি বাঁশ হাতীর প্রিয় খাদ্য।

চমৎকার এই প্রাকৃতিক কেল্লাটি ছাড়াও বনের মধ্যে বহু টিলা দেখা গেল, যেখানে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে বোমা প্রস্তুতের কাজ চলতে পারে।

গোপালডিহা থেকে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ নিয়ে নরেন ভট্টাচার্য কলকাতায় ফিরে গেলেন। দ্রুতগতিতে ওদিকের উদ্‌যোগ-আয়োজন চালু রাখবার জন্যে কলকাতা থেকে বালেশ্বর, বালেশ্বর থেকে কপ্তিপদার এই গোপন আশ্রয়স্থল গোপালডিহা, গোপালডিহা থেকে কলকাতা—নিয়মিত সংবাদ আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেল। তা ছাড়া দেশের বিশদ সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মণীন্দ্রবাবুর নামে নিয়মিতভাবে যতীন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পত্রিকার বাংলা সংস্করণটি আনাতে লাগলেন—পাছে স্বনামে বা বেনামে আনাতে গেলে পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

গোপালডিহার সাধুবাবা—যতীন্দ্রনাথ। ছদ্মবেশের খাতিরে তিনি গৈরিক ধারণ করলেন। সাধুবাবার পাঠশালায় নিরক্ষর গ্রামবাসীরা আসতে লাগল : স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ তাদের লেখা-পড়া শেখাতে শুরু করলেন।

আর, ক্ষেত্র-বিশেষে বপন করতে লাগলেন অভীষ্ট বীজ।

সাধুবাবার সংস্পর্শে যারা আসে, তাঁর উদার প্রেমের বশবর্তী না হয়ে পারে না। এদের শ্রদ্ধা আর অকুণ্ঠ প্রেম ভাষা পায় যতীন্দ্রনাথের 'স্বামীজী-রাজা' নামকরণে।

আপদে-বিপদে সুখে-দুঃখে 'স্বামীজী-রাজা'র কথাই এদের প্রথম মনে জাগে, ছুটে আসে তাঁর কাছে। দক্ষতার সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক এবং প্রয়োজনে কিছু অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাও করেন যতীন্দ্রনাথ। দুঃস্থ গ্রাম-বাসীদের অসুখ-বিসুখে ডাক্তার আসে না। দিন নেই, রাত নেই, যখনি স্বামীজী-রাজা খবর পান, সাগ্রহে তার সেবা-শুশ্রূষা চিকিৎসা করেন। খুব অসহায় যে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন তাকে। ওষুধ-পথ্য দেন। সারিয়ে তোলেন।

অভাব অনটনে জর্জর দরিদ্র গ্রামবাসীদের দেখে মমতায় ভরে ওঠে যতীন্দ্রনাথের অন্তর। একটা মুদিখানা খুলে দিলেন তিনি এদের সুবিধার্থে : নামমাত্র মূল্যে বা অধিকাংশ সময়েই বিনামূল্যে তাঁর দোকান থেকে গ্রাম-বাসীরা নিয়ে যায় চাল, ডাল, গুড়, তেল, নুন, মশলা ; অসুখের সময়ে সাবুদানা, চিঁড়ে।

কলকাতা এবং অন্যান্য কেন্দ্রের নেতারা নিয়মিত যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে ফিরে যান যে যার কর্মস্থলে। নলিনী কর বহাল রইলেন খাস দূতের পদে। তা ছাড়া নরেন ভট্টাচার্য, ডাঃ যাদুগোপাল প্রভৃতি সহকর্মীরাও যাতায়াত করতে থাকেন।

কিন্তু সরাসরি যতীন্দ্রনাথের কাছে যাবার অধিকার ও উপায় কারোই নেই। সাক্ষাৎপ্রার্থী কেউ এলেই, প্রথমে তাঁকে যেতে হয় বালেশ্বর শহরে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের দোকানে। সেখানে থেকে ভারপ্রাপ্ত কর্মী শৈলেশ্বর বসু ছাড়পত্র ও পথপ্রদর্শক দিলে তবেই মহানায়কের বাসস্থান কপ্তিপদায় যাওয়া চলে।

অ্যামেরিকার শিকাগো থেকে, জার্মান পুরাতত্ত্ব-বিশারদ ভেডে (Wehede) জর্জ পল ব্যোম, স্টীনেক (ওরফে স্তাল্‌ৎস) এবং জনৈক ভারতীয় বিপ্লবী প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ম্যানিলায় পৌঁছলেন ১৯১৫ সালের জুন মাসে।*

ইতিমধ্যে জার্মানী থেকে জার্মান সরকার ও ভারতীয় বিপ্লবীদের বার্লিন

* জার্মান সরকারের রিপোর্ট অবলম্বনে।

কমিটি যুক্তভাবে তাঁদের প্রতিনিধি ভিন্‌সেন্‌ৎস্ ক্রাফ্‌ট্‌কে ব্যাটাভিয়া পাঠালেন সেখানে সক্রিয় ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্যে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সমেত।

ডাঃ ভূপেন দত্ত লিখছেন, "১৯১৫ সালের গ্রীষ্মকালে অ্যামেরিকা থেকে বার্লিনে খবর আসিল যে, ভারতে অস্ত্র পাঠান হইয়াছে: তিনটি জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া পূর্ব ভারতে আর দুটি সুয়েজ দিয়া করাচী যাইতেছে।...একজন আমেরিকান জার্মান ভারতে যাইতেছেন antiquities কিনিবার নামে বিপ্লবীদের অর্থ দিবার জন্য।..."

যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির হল যে, সংগঠনের পক্ষ থেকে, জার্মানী ও অ্যামেরিকা থেকে আগত দূতদের সঠিক সংবাদ দেবার জন্যে, এবং অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত পাকা করবার জন্যে নরেন ভট্টাচার্য (M. N. Roy)-কে ব্যাটাভিয়া যেতে হবে।

চার্ল্‌স্ মার্টিন ছদ্মনামে নরেনকে যতীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দিলেন। কপ্তিপদা থেকে গুরুর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, নরেন ভট্টাচার্য রওনা হলেন বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ মেলে। নলিনী কর তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলেন।

ব্যাটাভিয়া থেকে জার্মান প্রতিনিধি ভিল্ডেল্‌স্ লিখছেন, "সুমাত্রা উপকূলে বিপ্লবীদের ঘাঁটি বানানো যায় কিনা সে বিষয়ে ভিন্‌সেন্‌ৎস্ ক্রাফ্‌ট্ খোঁজ-খবর নিতে...শাংহাই গিয়েছিলেন জরুরি বৈঠকের কাজে। সেখান থেকে তিনি খুব আশাপ্রদ সংবাদ নিয়ে এসেছেন যে...আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চমৎকার ঘাঁটি স্থাপন করা যাবে।...

"ভারতের এই কাজের জন্যে সাবাং-এ একটা বা দুটো জার্মান জাহাজের প্রয়োজন হবে। শাংহাইয়ের সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করছি আমি।..."

জার্মান সরকারের চার পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ একটি রিপোর্টের এক জায়গায় লেখা আছে, মার্টিন (নরেন ভট্টাচার্য) প্রসঙ্গে, "...বয়স পঁচিশের মতো; কলকাতার কেন্দ্রীয় বিপ্লবসংস্থা থেকে ব্যাটাভিয়া আসেন দূতরূপে—প্রথমে ১৯১৫ সালের মে মাসে এসে ৪ঠা জুন কলকাতায় ফিরে যান তথ্যাদি নিয়ে। তারপর ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আবার দূতরূপে তিনি প্রেরিত হন। সেখান থেকে তিনি শাংহাই চলে যান।..."

ব্যাটাভিয়ায় গিয়ে নরেন ভট্টাচার্য তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন। তারপর ক্রাফ্‌ট্ সেখানে এসে পৌঁছলে তাঁর সঙ্গে নরেনেরই প্রথম

দেখা হয়। ডাঃ ভূপেন দত্ত (তখন বার্লিন কমিটির ইনি কর্তৃপক্ষের একজন) লিখেছেন, "...ওখানে একটি ভারতীয় আড্ডা গড়িয়া উঠে : যতীন্দ্রনাথের লোকেরা Kraft-এর সঙ্গে সেখানে মিলিত হন।"

ডাঃ ভূপেন দত্ত লিখেছেন, "(নরেন) ভট্টাচার্য বলেন : যতীন্দ্রনাথ জার্মানদিগের নিকট ইহতে অস্ত্র সংগ্রহার্থে তাঁহাকে ব্যাটাভিয়া পাঠান। (বার্লিন) কমিটির প্ল্যান অনুযায়ীই এই আয়োজন হয়।..."

জুন মাসের মাঝামাঝি। ১৯১৫ সাল।

একদিন সকালবেলা কপ্তিপদায় এসে আবির্ভূত হলেন নরেন ভট্টাচার্য ; ব্যাটাভিয়ার জার্মান বাণিজ্যদূত ফন্ হেল্‌ফেরিষ্-এর সঙ্গে এবং অন্যান্য জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মাসাধিক কাল পরে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন।

যতীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে, নাটকীয়ভাবে নরেন গুরুর চরণতলে ঢেলে দিলেন একথলে গিনি-সোনা। জানালেন যে অভ্যুত্থানের রসদ দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই জার্মান জাহাজ এসে পৌঁছচ্ছে। ভারতের অন্ধিসন্ধি বার্লিন কমিটির মাধ্যমে তারা জেনে রেখেছে। কোথায় কী ভাবে অস্ত্রাদি নামবে, নরেন তাঁদের বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন।

নলিনী কর লিখেছেন, "প্রমাণস্বরূপ আমাদের একটা কাগজ দেখালেন নরেনদা। দেখতে একটুকরা সাদা লেখবার কাগজের মত। তাতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতেই, একখানা পোড়া কাগজ, তাতে রায়মঙ্গলের navigable স্থানটার একটা চিহ্ন দেখলাম।...

"তারপর নরেনদা ফিরে গেলেন কলকাতায়, জাহাজ এলেই যাতে অস্ত্রগুলি নিয়ে rise করা যায় তার ব্যবস্থা করতে। আমাদের মধ্যেও একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাড়া পড়ে গেল।

"কিন্তু দাদার কোনও পরিবর্তন দেখলাম না।

"কলকাতায় সমস্ত বন্দোবস্ত করে নরেনদা আর যাদুদা (যাদুগোপাল) এলেন মহলডিহাতে দাদার পরামর্শ নিতে—কোথায় এবং কেমন করে অকস্মাৎ আঘাত হানাতে হবে।

"দাদা বলে উঠলেন : প্রথমেই ফোর্ট উইলিয়ম attack করা হোক।..."

প্রায় আড়াই হাজার নতুন সভ্য এই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে recruit

করা হয়েছিল। নতুন নতুন শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁরা সামরিক শিক্ষা নিতে লাগলেন। গড়ের মাঠে বিপ্লবীদের ট্রেনিং ক্যাম্প পড়ল—বলেছেন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ : নতুন করে সামরিক কায়দায় আলোক-সঙ্কেত, নিশান-সঙ্কেত (somaphore), ঘোড়দৌড়, মোটর চালানো, শেখানো হতে লাগল।

দেশের সর্বত্রই বিপ্লবীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনার ঢেউ বয়ে চলল।

॥ চার ॥

এরই মধ্যে শৈলেশ্বর বসুর সঙ্গে এসে পৌছলেন পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী মাদারীপুর গ্রুপের অন্য দুই বন্ধু : নীরেন দাসগুপ্ত আর মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। কলকাতাতে এঁরা দুজনও যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে মহানায়কের স্নেহের আস্বাদে ধন্য। এঁদের দু'জনের আগমনে উৎফুল্ল হলেন চিত্তপ্রিয়।

তারও কিছুদিন বাদে এলেন জ্যোতিষ পাল।

চিত্তপ্রিয়ের বাড়ি মাদারীপুর মহকুমার খালিয়া গ্রামে. বিখ্যাত জমিদার-পরিবারে। ১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম। পিতার নাম ৺পঞ্চানন রায়চৌধুরী। চার ভাইয়ের মধ্যে চিত্তপ্রিয় তৃতীয়।

হাইস্কুলে তিনি যখন সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র, তখনই তাঁর ছোট্ট বুকে বিরাট অগ্নিশিখা নিভৃতে জ্বলে উঠেছিল ; সেই অগ্নিশিখার সংক্রামক শক্তি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন গ্রামের অভিভাবকস্থানীয়েরা।

চিত্ত যখন প্রথম শ্রেণীতে উঠলেন, একদি। স্কুলের হেডমাস্টার মশাই কয়েকটি ছাত্রের নাম ক'রে স্কুলের অন্য ছাত্রদের আদেশ করলেন পূর্বোক্তদের সঙ্গে না মিশতে। তাদের অপরাধ—তারা 'দেশদ্রোহী', অর্থাৎ তারা দেশের (ইংরেজ) শাসকদের বিরুদ্ধে কাজ করছে।—এই নিষেধাজ্ঞা শুনে চিত্তপ্রিয়ের মন বিদ্রোহ ঘোষণা করল, তিনি তখুনি প্রতিবাদ জানালেন, "স্যার, আমি যে জানি, যাদের নাম আপনি করলেন, তারা সকলেই চরিত্রবান এবং সৎ। কাজেই তাদের মতো খাঁটি ছেলের সঙ্গ যারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত, আমি তাদের দলে নেই!"

ক'দিনের মধ্যেই হেডমাস্টার আদেশ জারি করলেন, "আমার নিষেধ সত্ত্বেও চিত্তপ্রিয় যখন অবাঞ্ছিতদের সঙ্গ ত্যাগ করে নি, তখন তার পক্ষে এই

স্কুল ছেড়ে দেওয়া বিধেয়।"

চিত্তপ্রিয় অম্লান বদনে সে-স্কুল ছেড়ে দিলেন। কিন্তু অন্য-কোনও স্কুলের কর্তৃপক্ষই এই ঘটনার পরে তাঁকে আর ভর্তি করতে চাইল না।...অবশেষে কোনক্রমে তিনি গোয়ালন্দ স্কুলে প্রবেশাধিকার পেলেন।

সিদ্ধ এক তান্ত্রিকের বংশে চিত্তপ্রিয়ের জন্ম। শৈশব থেকে মন তাঁর অন্তর্মুখী। কতদিন গভীর রাতে দেখা গিয়েছে ভাবে বিভোর চিত্তপ্রিয় গিয়ে ব'সে আছেন মাঠে, নদীর ধারে, শ্মশানে, কালীবাড়িতে। সাধনার এক অজানা দ্বার খুলে গিয়েছিল তাঁর অন্তরে, আর তারই রসে একাকার হয়ে গিয়েছিল তাঁর অন্তর আর বাহির।

তাই বুঝি, ১৯১৪ সালে প্রথম যখন কলকাতায় তিনি মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎলাভে ধন্য হন, যতীন্দ্রনাথকে তিনি প্রশ্ন ক'রে বসেন, "আচ্ছা, দেশের কাজ ক'রে কি মাকে পাওয়া যায়?"

হীরক-স্ফূর্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল যতীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল। দৃঢ় দৃপ্ত তন্ময় স্বরে মহানায়ক জবাব দিয়েছিলেন চিত্তপ্রিয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে, "তা যদি না পাওয়া যেত, আমায় অন্তত এ-পথে দেখতিস না!"

সেই অভ্রান্ত দিঙ্‌নির্দেশে, সেই বৈদ্যুতিক স্পর্শে, সেই দৃষ্টির অতল আত্মবিশ্বাসের ক্ষুরধারে দীর্ণ হয়ে যায় বীর চিত্তপ্রিয়ের সমস্ত সংশয়, দেশজননী আর জগজ্জননী যে অবিচ্ছেদ্য—সেই প্রত্যয় দৃঢ়মূল হ'য়ে যায় তাঁর হৃদয়ে।

ফিরে যাই চিত্তপ্রিয়ের ইতিকথায়। গোয়ালন্দ স্কুলে পাঠকালেই তিনি রাজরোষের প্রত্যেক্ষ আওতায় প'ড়ে গেলেন। ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে 'Emperor Vs. Purnachandra Das & others' নামে এক রাজনৈতিক মামলার অজুহাতে বহু যুবককে গ্রেপ্তার করা হল। চিত্তপ্রিয়ও তাঁদের সঙ্গে আটমাস জেল খেটে এলেন।

জেলে, একদিন একটি সোডার বোতল খুলতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটালেন তিনি। বোমার মতো ফেটে গিয়ে বোতলের বেশ কয়েকটি টুকরো কাঁচ চিত্তপ্রিয়ের মাংস ফুঁড়ে সারা দেহে ঢুকে যায়। হেসে চিত্তপ্রিয় তখন ব'লে ওঠেন, "বাবা, একি অঘটন!"...ডাক্তার এসে অপারেশন করে সেইসব কাঁচের টুকরো যখন বার করতে থাকেন, চিত্তপ্রিয় তখন ডাক্তারকে ব'লে চলেছেন, "ডাক্তারবাবু, এখানটা আর একটু সেলাই ক'রে দিন না।...দেখুন তো, এখানে আরো একটুকরো ছোট কাঁচ আছে না?...একটু বেশি ক'রে

কাটুন না।…”

ডাক্তার আগাগোড়া চিত্তপ্রিয়কে লক্ষ্য করছিলেন। যাবার সময় মন্তব্য ক’রে গেলেন, “এ-রকম ছেলে যে থাকতে পারে, একে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।”

মামলা থেকে খালাস পেয়ে আবার পড়াশুনোর চেষ্টায় বহু ঘোরাঘুরি করলেন চিত্তপ্রিয়। কিন্তু তাঁর নাম শোনামাত্র কর্তৃপক্ষ বিমুখ হন সর্বত্র। শেষ পর্যন্ত কলকাতার কেশব একাডেমিতে তিনি ভর্তি হলেন। আর কলকাতার সক্রিয় নেতা মহাপ্রাণ অতুল ঘোষের মাধ্যমে তিনি এবং মাদারীপুরের অন্যান্য চার-পাঁচজন বন্ধু লাভ করলেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য।

তারপর নরেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গার্ডেনরীচ ডাকাতির পর, নরেন ধরা প’ড়ে গেলে চিত্তপ্রিয়ের নামেও পরোয়ানা বার হয়। তারও পরে, সুরেশ মুখার্জীকে হত্যার ব্যাপার তো আগেই বলেছি।

অন্তরে যখনই চিত্তপ্রিয় দুর্বল বোধ করেছেন, শান্ত মনে ভগবানের কাছে তাঁকে প্রার্থনা করতে দেখা গিয়েছে। বাড়ির লোক একবার তাঁকে বিশেষ যখন উত্যক্ত করেন সংসারে মন দেবার জন্যে, গোপনে তখন চিত্তপ্রিয় ঠাকুরঘরে ঢুকে শিবলিঙ্গের গলা জড়িয়ে প্রার্থনা করতে থাকেন. “ঠাকুর, বল দাও, আমায় বল দাও,”—বলতে বলতে অজ্ঞান হ’য়ে পড়েন।

শোনা যায় চিত্তপ্রিয়ের করতল ছিল আশ্চর্য: একটিও কররেখা তাঁর ছিল না। আর মুষ্টির জোর সহপাঠীদের এবং সমবয়সীদের কারোই অবিদিত ছিল না। সবাই তাঁকে সম্ভ্রম ক’রে চলত তাঁর অলৌকিক শারীরিক শক্তির জন্যে।

নীরেনের পিতা ললিতমোহন দাশগুপ্ত ছিলেন মাদারীপুরের একজন শ্রেষ্ঠ কবিরাজ। তাঁদের বাড়ি খৈয়ারভাঙা গ্রামে। একান্নবর্তী পরিবারে ইনি মানুষ। পাশের বাড়িতে থাকতেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। নীরেন আর মনোরঞ্জন আশৈশব বন্ধু। এক বিদ্যালয়ে দু’জনে পড়েছেন। রাজনীতি শিখেছেন এক গুরুর কাছে। আর একই মহানায়কের সঙ্গে জীবনপণ ক’রে ব্রতী হয়েছেন দেশজননীর বন্ধন মোচনে।

সরলচিত্ত, খেলাধুলোয় অদ্বিতীয় নীরেন। রাশভারি অথচ সবার প্রিয়।

প্রথম দেখলে তাঁকে ভালবাসতে ইচ্ছে যায়। সব পরিবেশের সঙ্গে সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পটু। দেহে অমানুষিক শক্তি। এই শক্তি ও অটুট স্বাস্থ্য পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

প্রবল মাতৃভক্তি তাঁর। শৈশবের সেই মাতৃভক্তিই রূপান্তরিত হ'ল কৈশোরে দেশভক্তিতে। ১৯১২ সালে নীরেন যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়েন, তখনই স্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনিও কাজে নেমে পড়েন। আর-দশজনের জন্যে যেসব কাজ কষ্টসাধ্য, হাসিমুখে তা তিনি করতে যেতেন। এ-ই তাঁর স্বভাব।

একবার, শিবচরের কাছে একটা গ্রামে আগুন লাগে। লোকে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে আগুন নেভাতে গিয়ে। একটা বাড়ি প্রায় ধ্বসে পড়েছে, এমন সময় তার ভিতর থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠের আর্ত কান্না।

নীরেন তখুনি গিয়ে পৌঁছেছেন মাত্র। সবাই ইতস্তত করছে। নীরেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন নারীর কান্না লক্ষ্য ক'রে, আগুনের বুক চিরে। ফিরে এলেন ডান কাঁধে এক মহিলা আর বাঁ কাঁধে অচৈতন্য একটি শিশুকে নিয়ে। ক্রুদ্ধ লেলিহান শিখা কিন্তু নীরেনের পায়ে পিঠে সর্বত্র এঁকে দিল তার পরশ-চিহ্ন; বীরের পুরস্কার সেই দাগ আমরণ বহন করতে হয় নীরেনকে।

নীরেন কোনদিন ভয় বলতে কিছু জানেন নি। অত্যন্ত বেপরোয়া স্বভাবের ছেলে। ছাদের কার্নিশের ওপর দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়তে তিনি ভালবাসতেন। একতলার ছাদ থেকে দু হাতে দুটি ছাতি নিয়ে কখনো বা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

মাদারীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিনি খালাস পাবার পর কলকাতায় গিয়ে বন্দী হন অতুল ঘোষের স্নেহের বাঁধনে; সেই থেকে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ত্যাগ করেন নি তিনিও। বেলেঘাটার আড়ৎ থেকে টাকা লুঠ করে আনবার পর তাঁর নামে হুলিয়া বার হয়। নীরেনের অজ্ঞাতবাসের পর্ব শুরু হয়।

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। এঁদের তিনজনের সর্বকনিষ্ঠ। সার্থক তাঁর নাম। সদা হাস্যমণ্ডিত নম্র উজ্জ্বল চেহারা। অত্যন্ত সুশ্রী। চওড়া হাড়। দীর্ঘ গৌরবর্ণ বপু। কোনদিন কেউ তাঁকে মুখভার ক'রে থাকতে দেখে নি। বিরাট আনন্দের উৎস অবারিত ছিল তাঁর হৃদয়ে। দারুণ বিপদেও তাঁর

মুখের হাসি অম্লান দেখা গিয়েছে। সামান্য যেন লাজুক প্রকৃতি। আবেগ-প্রবণ। সরল।

পিতার নাম ৺হলধর সেনগুপ্ত। খৈয়ারভাঙা গ্রামে ১৮৯৬ সালে মনোরঞ্জনের জন্ম। চার ভাইয়ের মধ্যে ইনি দ্বিতীয়। সমসাময়িক অনেকে বলেন, "মানুষ চিনতে চিনতে বুড়ো হলাম, কিন্তু মনো-কে চিনতে পারি নি। তার অমন সরল চেহারার আড়ালে অতবড় সর্বনেশে বস্তু লুকনো থাকতে পারে, কেউ ধারণাই করতে পারি নি।"

১৯১২ সালে মাদারীপুর হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠকালেই তিনি বিপ্লবের কাজে নামেন। পরের বছর মাদারীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা প'ড়ে আট মাসের কারবাস নেহাৎ লক্ষ্মী ছেলেটির মতো মেনে নেন নি। জেলের রিপোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে ত্রিশ-চল্লিশটি অভিযোগ। জেলের আইন নিত্য-নতুন অত্যাচারে তিনি টলিয়ে দিয়েছিলেন। এবং রীতিমতো ভীতির সঞ্চার করেছিলেন কর্তৃপক্ষের মনে।

কষ্টসহিষ্ণুও ছিলেন তেমনি। মাত্র চার পয়সার খাবার খেয়ে গোটা দিনে সত্তর-বাহাত্তর মাইল পথ একবার তিনি হেঁটে অতিক্রম করেন।

জেল থেকে বেরিয়ে কলকাতার New Indian School-এ ভর্তি হন। কিন্তু দেশের ডাক হৃদয়ে তখন এত প্রবল যে মা সরস্বতীর কাছে বিদায় নিয়ে তিনিও কায়মনোবাক্যে যতীন্দ্রনাথের হাতে তুলে ধরলেন নিজেকে। গার্ডেন রীচের মোটর ডাকাতির পর থেকেই তাঁর অজ্ঞাতবাস শুরু।

যুক্তিতর্কের ধার তিনি ধারেন নি। কেউ একদিন তর্কের খাতিরে তাঁকে প্রশ্ন করেন, "হ্যাঁরে, এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে কি ইংরেজের মতো এতবড় শক্তিমান সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা বুদ্ধিমানের কাজ?"—উত্তরে মনো-রঞ্জন সাফ বললেন, "আমি বাপু অত-শত বুঝি না। খেতে এসেছি, আমি খেয়ে যাব। যার ইচ্ছা সে পাতা গুনতে পারে—আমি জানি শুধু দাদা আর গদা।"*

"কলকাতায় গোপনচারী হয়ে মাসের পর মাস থাকবার পরে একেবারে বাধাহীন শঙ্কাবিহীন জায়গায় (কপ্তিপদায়) এসেই তাঁদের বাঁধনহারা প্রাণ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো," নলিনী কর লিখেছেন, "আর আগুন নিয়ে খেলা শুরু হ'য়ে গেল।"

* যতীন্দ্রনাথের দুষ্প্রাপ্য জীবনী 'বিপ্লবের বলি' থেকে।

আগুন নিয়ে খেলাই বটে। একদিন একটা মাউজার পিস্তল হাতে নিয়ে মনোরঞ্জন নীরেনকে ভয় দেখাচ্ছেন, "মারি? মারি?" ব'লে, আর ধাওয়া করছেন তাঁর পিছু পিছু। হঠাৎ পিস্তলের ঘোড়ায় কি ক'রে আঙুল পড়ে গেল। অমনি একটা গুলী ছিট্‌কে বেরিয়ে এল। এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল নীরেনের জানু। ভাগ্যক্রমে পায়ের হাড় বাঁচিয়ে গুলীটা বেরিয়ে গেল।

"যাঁরা জীবন-মৃত্যু সত্যিই পায়ের ভৃত্য ক'রে নিঃশেষে প্রাণ উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছেন দেশমাতৃকার বেদীমূলে—মরণ-বীণায় যাদের সুর বেজে উঠেছে, তাদের কাছে জীবন-মরণের খেলাও ছেলেখেলাই মন হয়," লিখেছেন নলিনীকান্ত কর, সেই দৃশ্যের একমাত্র জীবিত প্রত্যক্ষদর্শী।

"এ ঘটনার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। সঙ্গে তেমন-কোনও ওষুধ-পত্রও নেই। মণীন্দ্রবাবু তো কিংকং, কোন ওষুধ-পত্রের ধার ধারেন নাই"—নলিনীবাবু লিখেছেন।

কুইনিনের বড়ি যা ছিল, তাই গুঁড়ো করে পরনের কাপড় ছিঁড়ে যতীন্দ্রনাথ তখুনি ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। আর শৈলেশ্বর বসুকে বালেশ্বরে খবর পাঠাতেই তিনি টেলিগ্রাম ক'রে কলকাতা থেকে দলের ডাক্তার আশু দাসকে ডেকে পাঠালেন।

ব্যাণ্ডেজ খুলে আশুবাবু দেখলেন, ভয়ের কিছু নেই। ড্রেস করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। লোশন, ব্যাণ্ডেজ, মলম সবকিছু রেখে গেলেন আশু দাস ড্রেস করবার পর কলকাতা ফিরবার সময়। ঘা মাসখানেকের মধ্যে ভাল হ'য়ে গেল, কিন্তু নীরেনের পা একটু কমজোরী হ'য়ে রইল।...

এরই মধ্যে কাটা হল কুস্তির আখড়া।

স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানসম্মত দাঁও-প্যাঁচ শেখাতে লাগলেন শিষ্যদের। ছাত্রাবস্থায় কলকাতার বিখ্যাত অম্বু গুহ আর ক্ষেত্র গুহের আখড়ায় তিনি কুস্তি শেখেন। বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গে সেখানেই তাঁর সেযুগে আলাপ হয়েছিল।

যতীন্দ্রনাথের সাকরেদি করতে করতে শিষ্যরাও বেশ পটু হ'য়ে উঠলেন। নীরেনের পা তখনো ভাল হয় নি। তিনি তাই আখড়ায় ব'সে প্রথম প্রথম প্যাঁচগুলো লক্ষ্য করতে থাকলেন। পা ভাল হল। তিনিও

আখড়ায় নেমে পড়লেন। অল্পদিনের মধ্যে অন্যদের সমকক্ষ হয়ে উঠলেন।

নিয়মিত যতীন্দ্রনাথ গীতার ক্লাস নেন। গীতা তাঁর আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ। গীতা তাঁর প্রাণ। গীতার আদর্শ পুরুষ তো যতীন্দ্রনাথই। দিনের পর দিন গীতার অপূর্ব ভাষ্য শোনেন শিষ্যেরা যতীন্দ্রনাথের উপলব্ধির আলোকে।

তা ছাড়া শিষ্যদের নানা রকমের লেখার মধ্যে দিয়ে চিন্তাশক্তির প্রসার বৃদ্ধির জন্যে এবং অন্তরের ভাব গভীরতর উচ্চতর ক'রে তোলবার জন্যে যতীন্দ্রনাথ উৎসাহিত করতে লাগলেন।

তিনি স্বয়ং কয়েকটি রচনার দিকে তখন মনোনিবেশ করেছেন, সরকারি রিপোর্টে তার উল্লেখ দেখি।* সেগুলি ঘটনাচক্রে সরকারের উচ্চ-মহলে গিয়ে পৌঁছয়। এবং সেখানে গুঞ্জন ওঠে, "এত অসাধারণ যাঁর মেধা, এমন উচ্চ যাঁর ভাবধারা—তিনি তো সমগ্র বিশ্বের চিন্তানায়কদের অগ্রগণ্য হবার অধিকারী!"

সে-প্রসঙ্গ এখন থাক।

কাছেই নদী। নদীর ধারে চাঁদমারী খাটানো হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কৌশল শেখান যতীন্দ্রনাথ। প্রথম ক'দিন শিষ্যদের কেউ-ই পরপর চেষ্টা করেও লক্ষ্যভেদ করতে পারছেন না। তার ক'দিন আগে চিত্তপ্রিয় কলেরায় আক্রান্ত হন; অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রথম ক'দিন চাঁদমারিতে তাই তিনি অবতীর্ণ হন নি। কিন্তু সঙ্গীদের অক্ষমতা দেখে তিনি তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্যে চাঁদমারিতে পদার্পণ করলেন। ধীরে ধীরে গুরুর চরণধূলি মাথায় নিলেন। আগ্নেয়াস্ত্র

* বালেশ্বর যুদ্ধের মামলার সময় এই রচনাগুলির উল্লেখ ক'রে বিচারক বললেন:

"The papers consist of two pencil drafts and the fair copy of an extremely inflamatory political article inciting to action towards the overthrow of British rule in India by taking advantage of the entanglement of Britain in the Great European War. and the fair copy is entitled, The Children of the Mother India : The Voice of A Devotee. One of the drafts is found in a note-book in which the writer also corrected English compositions of another person whose writing seems to resemble that of Manoranjan though he denies that it is his.

(Judgemeut of the case between king Emperor Vs. Niren Dasgupta, Manoranjan Sengupta and Jyotish Pal. Balasore, October 16, 1915).

হাতে উঠে দাঁড়ালেন।

নিশানা ঠিক ক'রে নিয়ে গুলী চালানো মাত্র—লক্ষ্যভেদ! অব্যর্থ।

"আমরা তো আশ্চর্য!" নলিনীকান্ত লিখছেন, "আমরা ক'দিন চেষ্টা করেও টারগেটের আশেপাশে ছাড়া টিপ লাগাতে পারি নি। আর চিত্তপ্রিয় প্রথম গুলীই টারগেটে লাগিয়ে দিল।"

সবকাজেই চিত্তপ্রিয় এমনি তৎপর।

রাঁধেন তিনি চমৎকার এবং প্রায়ই রাঁধতে বসেন অজ্ঞাতবাসের এই পর্বে। কালো একহারা চেহারা; অত্যন্ত শক্ত, বিশিষ্ট ধরণের হাতদুটো, যাকে বলে বজ্রহস্ত। দৃঢ় মাংসপেশী। গোল চিবুক। টিকলো নাক। মুখমণ্ডলীতে সঙ্কল্পের কঠোরতা। স্বল্পভাষী। আশ্চর্য ধাতুতে গড়া। প্রকৃত যোদ্ধা যাকে বলে। কোনও কিছুতেই পিছিয়ে পড়তে নারাজ তিনি। নলিনীকান্ত লিখছেন, "চেহারা খুব রোগা হলেও তাকে কুস্তিতে আটকে রাখা দায় হত।...ডিসিপ্লিন যেমন সে মেনে চলত, তেমনি অন্য কেউ যদি এতটুকু ডিসিপ্লিন ভেঙেছে দেখলে তাকে সে ক্ষমা করতে জানত না..."

বাংলা দেশ ত্যাগ করবার আগে চিত্তপ্রিয় গ্রামে গিয়েছিলেন তাঁর গর্ভধারিণীকে প্রণাম করতে। সেই সময়েই তিনি ব'লে আসেন:

"মৃত্যু আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তাতে ভয় করি না।... আবার জন্ম নিয়ে কার্যক্ষম হ'য়ে আসব।...শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন এবং গীতাতেও আছে যে আত্মা অবিনশ্বর, আত্মার মৃত্যু নেই। পুনঃ পুনঃ নব কলেবর ধারণ করাই আত্মার কাজ।..."

নীরেন প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত যা লিখেছেন তার থেকে কিছু অংশ পূর্বে ব্যবহার করেছি। তা ছাড়া তিনি লিখছেন, "নীরেন ধীর প্রকৃতির ছেলে। কথা খুব কম কইত।...তিনজনের মধ্যে সে-ই বোধ হয় Matriculation পাশ ছিল।..."

তিনজনের অপর জন, মনোরঞ্জন প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত লিখেছেন, "সবচেয়ে ছোট ছিল মনোরঞ্জন।...সে সব সময়ে দাদার সঙ্গে ছায়ার মতো থাকত। দাদারও নিজস্ব কাজ যেটুকু ছিল তিনি মনোরঞ্জনকে দিয়েই করাতেন। তাতে সে নিজেকে ধন্য মনে করত। দাদার নিজস্ব কাজ কেবল মনোরঞ্জনই করে, চিত্তপ্রিয় না করতে পেয়ে একটু ক্ষুন্ন হত ব'লে মনে হত। নীরেন নির্বিকার থাকত।..."

"কিছুদিন মনোরঞ্জনকে কুস্তি লড়াবার পর তার শক্তি এবং দম এত বেড়ে গেল," নলিনীকান্ত লিখছেন : "তার দম ফুরোবার আগেই আমার দম ফুরিয়ে যেত। তার চেহারা দেখতে হয়েছিল যেন পাঞ্জাবী পালোয়ান।"

যতীন্দ্রনাথের ছোট্ট একটি চিত্র এঁকেছেন নলিনীকান্ত, "দাদা গেরুয়া প'রে থাকতেন। দেখতে পাঞ্জাবী সন্ন্যাসীর মতো। গলায় একটা রুদ্রাক্ষ বাঁধা ছিল। ওটা স্বামী ভোলানন্দ গিরির শিষ্যদের সবাইকে পরতে হয়। তিনিও স্বামী ভোলাগিরির শিষ্য। গোপালডিহা যেন একটা আশ্রমে পরিণত হয়েছিল। এই আশ্রমের স্বামীজী ছিলেন দাদা, আর আমরা তাঁর কাছে মন্ত্র নিতাম কাজের যোগ্য হবার জন্য!..."

কপ্তিপদায় যতীন্দ্রনাথের আশ্রয়দাতা মণীন্দ্র চক্রবর্তী জীবিত ছিলেন এই রচনা ১৯৬৫ সালে প্রকাশের সময়ে। নব্বুইয়ের কাছাকাছি বয়সে (যতীন্দ্রনাথের জীবনী রচিত হচ্ছে এই সংবাদ পেয়ে) দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত এই বৃদ্ধ দেশপ্রেমিক তাঁর বিশাল হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য দিয়ে তিনটি খাতা ভ'রে কাঁপা হাতে লিখে পাঠিয়েছেন মহানায়কের উড়িষ্যা-প্রবাসের টুকরো টুকরো চিত্র—যা অন্যান্য বিপ্লবীর বিবৃতির সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এবং এই স্মৃতিচিত্রণে নির্ভরযোগ্য অনেক নতুন তথ্যও পাওয়া যায়।

মণীন্দ্রবাবুকে যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্নেহ ও শ্রদ্ধাভরে দাদা বলে অভিহিত করেন। তিনিও যতীন্দ্রনাথকে দাদা-ই বলতেন। মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন :

"আজ শুভদিন। মহাশক্তিরূপিণী বিশ্বময়ী মা আজ বিশ্বরূপের বিরাট রূপকে মানবের মানসলোক প্রভাবিত করিয়া পরম স্নেহময়ী মা হইয়া তাঁহার ব্যাপ্ত রূপকে মানবের মরচক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত করিয়াছেন। আজ মহাসপ্তমী, ১৩৬৬ সাল।

"জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব। কিন্তু পূর্ণ মানব ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবে যাঁহারা কালোপযোগী পূর্ণ সত্তা লইয়া জন্মিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বীয় প্রতিভায় মানুষকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন; এরূপ মহামানবের সাক্ষাৎ আমরা সাধারণে কখন কখন পাইয়া থাকি।

"যখন ভারতের ভগ্ন-মেরুদণ্ড মানুষ অচল হইতে বসিয়াছিল সেই দুর্দিনে পরাধীনতা-পীড়িত ভারতবাসীকে শক্তি সঞ্চারের জন্যই যেন যতীন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় স্ব পরিষদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজশক্তিধারী ইংরেজ তখন প্রবল হইয়া পরাধীন ভারতবাসীকে দাস-জীবন বহন করিতে বাধ্য করিতেছিল।...

"দেশের এই অস্বস্তিকর মুহূর্তে অনেক যুবক ও কিশোর প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্য সঙ্কল্প লইয়াছিলেন। এই গতিবেগ ইংরেজ রোধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কৈ, তাহা তো পারে নাই। একবার কিছু স্তিমিত হইলে আবার দ্বিগুণ বেগে এই আগুন জ্বলিয়া উঠে। এই সময়ে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ নিজের কর্মক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইলেন। ভারতের নানা স্থানে তাঁহার কর্মকুশলতার পরিচয় প্রচারিত হইতে লাগিল।...তিনি কর্তব্য-কার্যে পশ্চাদপদ হইতেন না, তাহা যতই ভয়ঙ্কর হউক না। তাঁহার এইসব কীর্তির কথা দেশবাসীর প্রাণে বীরত্বের প্রেরণা জাগাইত। তাঁহাকে শান্ত করিবার আশায় বড় বড় সরকারী চাকুরীর প্রলোভন দেখান হইয়াছিল—এমন কি তাঁহাকে উড়িষ্যার লাটসাহেবের নিকট একটি বড় চাকরীও দেওয়ার প্রস্তাব হয়। সহৃদয় লাট তাঁহাকে বহু সদুপদেশ দিয়াছিলেন।.. তাহাকে ইংরেজ বন্দী করিয়াছিল। বন্দী মানব-সিংহকে দেখিবার জন্য কত শত সাহেব আসিত।...যখন তাঁহাকে জামিনে ছাড়িবার কথা হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন: আমি অন্য লোককে জামিন দিব না, আমিই আমার জামিন হইব। তাঁহার এই আত্মপ্রত্যয় কত যে বড় ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।...ক্রমে যতীনের নাম ভারতের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল। পৃথিবীর প্রায় অধীশ্বর বৃটিশসিংহ বিদ্রোহী দলকে চূর্ণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, যতীনের কাজকে বিশেষ অপ্রীতিকর ভাবিয়া তাঁহাকে ধরিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নদী-প্রবাহের বারি যেমন রোধ করা যায় না, ইংরেজের অবস্থাও তাহাই হইল।...ইংরেজরা বলিত: যতীন হিপ্‌নটাইজ করিতে জানেন।..."

যতীন্দ্রনাথের উড়িষ্যা-প্রবাস সম্বন্ধে মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, "দুই কি চারিদিন অন্তর অন্তর দুই, তিন, চার হইতে দশ-পনেরো জন লোকও কোন কোন দিন আসিতেন এবং যতীনবাবুর সহিত তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া দুই-চারিদিন থাকিয়া ফিরিয়া যাইতেন।

"কোন কোনদিন দেখিয়াছি কাগজের উপর ঢালা রহিয়াছে আধহাত তিন-পোয়া উচ্চ সভ্‌রেনের স্তূপ। কখনো কখনো নোটের গাদা। যতীন-

বাবু আমাকে বলিতেন: দাদা, ওই সভ্রেন হইতে তুমি এক কি দুই আজলা লইয়া যাও।—আমি বলিতাম: ভাই, দেশের রক্ত দেশের কাযেই ব্যয়িত হউক।…"

মণীন্দ্রবাবু রোজই যতীন্দ্রনাথ ও অন্যদের সঙ্গে এসে প্রাতরাশ সেরে নিতেন। তিনি লিখেছেন যে, প্রাতরাশের পর, যাঁরা সাইকেল চড়া জানেন না তাঁদের সাইকেল চড়া শেখানো হ'ত। আর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা। তারপর, স্নানের আগে নিয়মিত খানিকক্ষণ কুস্তি করা হ'ত। লালমাটি মেখে কুস্তির শেষে আখড়ায় খানিক জিরিয়ে, স্থানীয় নদীতে গিয়ে বহুক্ষণ সাঁতার কেটে তাঁরা আশ্রমে ফিরতেন।

একদিন কুস্তির শেষে যতীন্দ্রনাথ তাঁর ডান পা সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন: তোরা ওঠা দেখি আমার পা।

মণীন্দ্রবাবু লিখছেন, "আমরা দলে সেদিন ছয়জন ছিলাম। সকলেই গায়ের জোরে তাঁহার পায়ের কোন না কোনও অংশ ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমাদের মিলিত যুবশক্তি পরাজিত হইল।"

আর একদিনের ছবি দিয়েছেন মণীন্দ্রবাবু: সাইকেল শিখবার রাস্তায় একটা বড় গাছ বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করছে শিক্ষার্থীদের। তাই, স্থির হ'ল, গাছটা কেটে ফেলা হবে। কাটতে বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু গোড়াকাটা অবস্থায় স্থানান্তরিত করা হল সমস্যা। বহু চেষ্টাতেও কেউ কিছু করতে পারছেন না। একচুলও নড়ল না গাছ।

তখন যতীন্দ্রনাথ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত। দূর থেকে এই ব্যাপার দেখছিলেন তিনি। এগিয়ে এসে তিনি সবাইকে একপাশে স'রে দাঁড়াতে বললেন। তারপর, অবলীলাক্রমে গাছটাকে ঠেলে ফেলে দিলেন রাস্তার চৌহদ্দি পার ক'রে—দূরে।

১৯১৫ সালের প্রখর গ্রীষ্মের শেষ ভাগ। অনাবৃষ্টি। খাঁ খাঁ করছে চারিধার। এমন সময় কপ্তিপদায় দুর্ভিক্ষ লাগল। গ্রামে গ্রামে দারুণ অন্নকষ্ট। একবেলা ভাত জোটা দায়।

এমনি একদিন। দুপুরবেলা। একটা খাসী কিনে আনা হয়েছে। চিত্তপ্রিয় মাংস রাঁধছেন। বেলা একটা বাজে। সকলেই ক্ষুধার্ত। অবশেষে মাংস নামল।

সবাই খেতে বসলেন। পাতে পাতে মহাসমারোহে গরম ভাত আর মাংস পরিবেশন করলেন যতীন্দ্রনাথ। সেদিন সবসুদ্ধ প্রায় আঠারোজন উপস্থিত।

কেউ ভাত মাখছেন। কেউ-বা মুখে গ্রাস তুলেছেন। কেউ-বা সবে আস্বাদ তারিফ করছেন। সকলেই প্রায় যুবক। পেটে প্রচুর খিদে। এমন সময়—একদল আদিবাসী ছেলেমেয়ে স্ত্রী-পুরুষ কোথা থেকে জুটল এসে। চিৎকারের ভঙ্গীতে তারা বলতে লাগল, "বাবুমানে, কিছি খাইবাকু দিয়ো! কিছি খাইবাকু, বাবুমানে—"

তাদের আর্ত এই মিনতি শুনে, তাদের শীর্ণ-মলিন দেহ আর বেশভূষা দেখে কারো মুখেই আর ভাত উঠল না।

মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, "কাহারও মুখের অন্ন গলাধঃকরণ করা অসাধ্য হইল। যতীন বলিলেন: "আজ মহা সৌভাগ্যের দিন রে! আজ বুভুক্ষিতের মুখে আমাদের এই অন্ন প্রদান করি!"

সকলেই আসন ত্যাগ করিলেন। এবং এই অন্ন-ব্যঞ্জন দলপতির দৃষ্টান্ত অনুযায়ী তাহাদের সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন।"

পরম পরিতৃপ্তিভরে সেই গরম মাংস আর ভাত খেয়ে আদিবাসীরা চ'লে গেল।

"এই কার্যের সময় দলের কাহাকেও ম্রিয়মাণ বা অসুখী বোধ করিতে দেখিলাম না," মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন।

দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ছে দেখে মরিয়া হ'য়ে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ। গ্রামবাসীর দুরবস্থায় বিচলিত হ'য়ে তিনি দুর্ভিক্ষ ঠেকানোর জন্যে সশিষ্য চাষ-বাসের কাজে নামলেন। উদয়াস্ত ক্ষেতের কাজ শুরু হ'ল।

যথেষ্ট ফসলও ফলল। দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে নিজেদের সঞ্চিত সামান্য যা-কিছু ছিল, তা-ও বিলিয়ে দিলেন বিপ্লবীরা। সাময়িক সুফল দর্শাল।

"কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না," মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, "আদিবাসী প্রভৃতি জাতিরা, এমনকি উড়িয়ারাও অভাবে পাহাড়ে আলু, তুন্দাচের প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া অর্ধাহারে দিন যাপন করিত। কথিত সময়টি এইরূপ বড় অসময় ছিল।

"সেইদিন হইতে, যতীন্দ্রনাথ এইরূপ অতিথিদের দিবার জন্য সাধ্যমতো

ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।...”

ঘরে ঘরে লাগল কলেরা। মৃত্যুর তাণ্ডব।

সশিষ্য যতীন্দ্রনাথ প্রতিটি পর্ণকুটিরে গিয়ে ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ব্যাধিভারাক্রান্ত রোগীদের মন থেকে জীবনের আশা লোপ পেয়ে যাচ্ছে: দারুণ শঙ্কা চারিদিকে: সারারাত রোগীর পাশে ব'সে কাটাচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ উৎসাহের দেদীপ্যমান শিখার মতো—ক্লান্তিবিহীন সংগ্রামরত যোদ্ধার মতো—ফিরিয়ে আনছেন রোগীদের মনে বাঁচবার সঙ্কল্প। দূরবর্তী গ্রামের রোগীদের এনে নিজের আটচালায় রেখে শুশ্রূষা করছেন সকলে মিলে।

মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, “নানা প্রকার বন্য আলু ও শাক ভোজনের জন্য অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। মৃত্যু-সংখ্যাও কম ছিল না।”

এমন দুর্দিনে, চিত্তপ্রিয়ের পেটে অখাদ্য কুখাদ্যের নিপীড়ন আর সহ্য হল না। তিনিও আক্রান্ত হ'লেন এই মারাত্মক রোগে। অনবরত অসাড়ে ভেদ হচ্ছে। নিঝুম অচৈতন্য দেহ। তাঁর চিকিৎসা, তাঁর শুশ্রূষা সবই যতীন্দ্রনাথ স্বহস্তে করছেন। দেশের ডাকে সর্বস্ব পণ ক'রে যে-মহামানবের পতাকাতলে তাঁরা সমবেত হয়েছেন, সুখে-দুঃখে তিনিই তো তাদের কাণ্ডারী: পরম নির্ভরতার সঙ্গে পূর্ববাংলার এক সম্পত্তিপন্ন জমিদারের তনয় চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী শায়িত আছেন দেশবরেণ্য বিপ্লবী সাধক যতীন্দ্রনাথের কোলে মাথা রেখে।

মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, “তাহার সেই বাহ্য ও বমি দুইহাতে অঞ্জলি করিয়া পরিষ্কার করিতেছিলেন যতীন্দ্রনাথ নিজে।...”

বন্ধুরা শঙ্কাকুলচিত্তে বসে আছেন প্রিয় বন্ধুকে ঘিরে। এখন-তখন অবস্থা। অল্পক্ষণের জন্যে জ্ঞান ফিরল চিত্তপ্রিয়ের। যতীন্দ্রনাথের কোলে মাথা রেখে ম্লান হেসে তিনি বন্ধুদের বললেন, “ও রে, মিছামিছি তোরা ভাবছিস। রোগ-যন্ত্রণায় ভুগে মরব ব'লে জন্মেছি নাকি? রক্তে নেয়ে সামনা-সামনি যুদ্ধ ক'রে মরণের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে যাব।”

অলক্ষ্যে বিধাতা বুঝি বললেন, “তথাস্তু।”

ফাঁড়া কেটে গেল। ধীরে ধীরে ভালর দিকে ফিরল চিত্তপ্রিয়ের অবস্থা।

যতীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী লিখেছেন,

"তাঁর চরিত্র লোকোত্তর বলা যেতে পারে। অতুল ঘোষ ঠিকই বলেন : 'শিবাজীর মতো রণকুশলী দেশপ্রেমিক ও চৈতন্যের মতো হৃদয়বান একাধারে পেলে আমরা পাই যতীন্দ্রনাথকে।'

"তার মধ্যে বিপরীত গুণের অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছিল। একাধারে হনন ও প্রেম; নির্দয়তা ও দয়া: বধকর্তা ও বধ্য যেন একাধারে বিজড়িত। মায়ের মতো স্নেহ-কোমল হৃদয় ভালবাসায় ভরা! সে অবস্থায় যে তাঁকে দেখেছে তার মনে হ'বে না যে ইনি আবার কুলিশ-কঠোর হ'তে পারেন কর্তব্যের তাগিদে। যে লোক বৃদ্ধা রমণীর ঘাসের বোঝা স্বয়ং মাথায় ক'রে নিয়ে গিয়ে তার কুটীরে পৌঁছে দিয়ে আসেন, যে ব্যক্তি ওলাউঠা রোগীর মলমূত্র অঞ্জলি ভরে সাফ করেন, যে ব্যক্তি মাসের সমস্ত বেতন অকাতরে অপরকে দান ক'রে তারই কাছ থেকে পাঁচটি পয়সা ধার নিয় ট্রামে বাড়ি ফেরেন, যে ব্যক্তি শ্রান্ত অনুচরকে পাখার বাতাস ও শুশ্রূষা দিয়ে ঘুম পাড়ান*, সেই ব্যক্তিই নির্মম, নিরঙ্কুশচিত্ত—যমের মুখে এগিয়ে যাবার হুকুম দিচ্ছেন অবলীলাক্রমে—অদ্ভুত এ-সমবেশ। আর তাঁকে দেখছি—মূর্তি পরিগ্রহকারী গীতা। এর ওপর আর কথা নেই। বলেইছি তো ভয় জিনিসটি কী তা তিনি জানতেন না।···ভয়ের কথা কি আর বলব? তিনি কোনদিন চমকেছেন ব'লে মনে হয় না।"†

মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, "অল্পদিনের মধ্যেই কত হিতকর কার্য না করিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে সাধুবাবা নাম দিয়াছিল, সেই নামে তাঁহার এখানে পরিচয় হইয়াছিল। হৃদয় যেন নবনীত কোমল। আবার দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে পাষাণতুল্য কঠোর। আশ্চর্য সমাবেশ। সঙ্গীরাও দেখিয়াছি সকলে তাই। কর্তব্যনিষ্ঠ দেবভাবাপন্ন মানুষ ইহারা।···"

॥ পাঁচ ॥

মাতৃসমা সহোদরা বিনোদবালা দেবীর চিঠি এসে পৌঁছয় সহোদরতুল্য শিষ্যদের মারফৎ; কপ্তিপদার অরণ্যে বসে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের মানস-পটে জেগে ওঠে দিদির স্নেহসুন্দর মুখ, জেগে ওঠে সহধর্মিণী ইন্দুবালা আর

* যাদুগোপালবাবু স্বয়ং এই স্নেহের অধিকারী হ'য়েছিলেন ব'লে তাঁর একটি পত্রে উল্লেখ করেছেন॥

† 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' (পৃঃ ৪১১)॥

তাঁর আদরের তিন সন্তান আশালতা, তেজেন আর বীরেনের কথা। সকাল-সন্ধ্যে আকুল প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন ওঁরা গৃহকোণে—বিজয়ী বীরের প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে।

শিষ্যেরা, সহকর্মীরা সকলেই দিদি বিনোদবালাকে মাতৃতুল্য শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন, জানেন সকলেই—যতীন্দ্রনাথের ধর্ম ও কর্মজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেরণা হচ্ছেন দিদি। দিদির কাছে তাঁরা তেমনি স্নেহও পান। অনেক সময়েই যতীন্দ্রনাথকে সামনে না পেয়ে দিদির কাছে তাঁরা ছুটে গিয়েছেন কত সময়ে পরামর্শের জন্যে। দিদি বিনোদবালা, বৌদি ইন্দুবালা—এঁদের দুজনের কাছে যতীন্দ্রনাথের শিষ্যেরা ঘরের ছেলের মতোই সমাদর পান। ঘরের ছেলের মতোই এঁরা সকলে এসে দিদি আর বৌদির কাছে পৌঁছে দিয়ে যান যতীন্দ্রনাথের কুশল আর তাঁর অজ্ঞাতবাসের বিবরণ। সাধ্যমতো চেষ্টা করেন সংসারের দেখাশুনো করতে।

দিদি ইতিপূর্বে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, "দেখিস, যতি, যেন শুনতে না হয় যে সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ!"—অর্থাৎ যে মহৎ কর্মের অভিপ্রায়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন মহানায়ক, তা আরব্ধ হবার আগে কোনমতেই যেন যতীন্দ্রনাথের কেশাগ্রও স্পর্শ না করতে পারে বিদেশী শাসকেরা।

দিদিকে যতীন্দ্রনাথ চিঠি লিখতে বসলেন:

ওঁ

৩রা জ্যৈষ্ঠ

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আমি বেশ ভাল স্থানে সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছি। আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। কর্মের নিমিত্ত বাহির হইয়াছি, ভবিষ্যতে সাক্ষাতাদি কর্মের উপরই নির্ভর করিতেছে। শীঘ্রও হইতে পারে, কিছু বিলম্বও হইতে পারে। তবে নিরাশ হইবার বা ভয়ের কোন কারণ দেখি না। সর্বদা স্মরণ রাখিবেন "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"। —মার আশীর্বাদে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি—তিনি সমস্ত কর্মে সর্বদা যেমন সাহায্য করিয়াছেন, এ বর্তমান অবস্থায়ও তেমনি সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই—তাঁহারই প্রেরণায় এ কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়াছি, তিনিই কূলে লইবেন। আপনি যে মা'র সন্তান তাঁহার হৃদয়ের কথা স্মরণ করিয়া আপন হৃদয়ে বল রাখিয়া যে সকল রত্নগুলি

আপনার নিকট আছে তাহাদের যাহাতে উদ্দেশ্যানুযায়ী কর্মের উপযোগী করিয়া ভবিষ্যতে মায়ের পূজায় অর্পণ করিতে পারেন, সেই চেষ্টা করিবেন। আপনি ব্যস্ত হইলে ইন্দুদের নিকট কি আশা করেন? আপনি ব্যস্ত হইবেন না। সমস্তই বুঝেন। সংসারে সমস্তই যে কত অস্থায়ী তাহা আপনি অনেক প্রকারে দেখিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন। এই অস্থায়ী সংসারে অস্থায়ী জীবন যে ধর্মার্থে বিসর্জন করিতে অবকাশ পায় সে ত ভাগ্যবান এবং তাহার সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়স্বজন বিশেষত তাহার মাতৃস্থানীয়া সহোদরা যদি স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন তাহা হইলে নিজেদের বংশের সৌভাগ্যের কথা বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং ধর্মার্থে বহির্গত ব্যক্তির সাধনায় সিদ্ধির পূর্বে তাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন কখনই বাঞ্ছনীয় মনে করেন না, বরং তাঁহার মন্ত্রের সাধন পথের সহায়তার নিমিত্ত তাঁহার অবর্তমানে গৃহে বুক বাঁধিয়া ভগবানে নির্ভরতা সহকারে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ ও শান্তিদান করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় এবং এই শ্রেণীর ব্যক্তিরাই জগতে ধন্য এবং সার্থক মাতৃস্তন্য পান করিয়াছেন। হা-হুতাশ ত' সকলেই করিয়া থাকে, আপনি আমিও যদি তাহাই করি তবে আমরা আমাদের স্বর্গীয়া মাতৃদেবী শরৎশশীর গর্ভে জন্মিয়াছিলাম কেন? আমরা ত সাধারণের ন্যায় দুর্বলহৃদয় অবিশ্বাসী সামান্য মায়ের সন্তান নই—আমাদের মা জীবন ভরিয়া কি সকল ব্যাপার হাসিতে হাসিতে সহ্য করিয়া গিয়াছেন একবার ভাবিয়া দেখুন ত আর আজ তিনি জীবিত থাকিলে তিনি স্বয়ং আমাকে আমার কর্মে বরণ করিয়া লইতেন সন্দেহ নাই। তাঁহার অবর্তমানে যাঁহার হাতে আমাকে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমার সেই মাতৃ-স্বরূপিণী সহোদরা ও গুরু ভগ্নীর কি করা কর্তব্য একটু ভাবিয়া দেখিবেন। আপনি ইতিপূর্বে একসময়ে কোন বিপদের সময় আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের অপেক্ষা যিনি তোমাকে বেশি ভালবাসেন তিনিই সর্বদা তোমার কথা ভাবিতেছেন, আমরা তোমার নিমিত্ত চিন্তা করিয়া কি করিব!"—আপনার অবস্থা এতদিনে আরও উন্নত হওয়ার কথা। হৃদয়ের বল এখন আরও অধিক হইয়াছে আশা করা যায়। আপনি অনুগ্রহ করিয়া মন শান্ত করিয়া সসন্তান ইন্দুকে* রক্ষা করিবেন। সন্তানগুলি যাহাতে মানুষ হয় তাহার চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না হয়। কখন কোন বিষয়ের প্রয়োজন

* যতীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী ইন্দুবালা দেবী।

হইলে ভাইদের* কাহাকেও স্মরণ করিবেন এবং আমার মত জ্ঞান করিয়া প্রয়োজন জানাইবেন, অভাব থাকিবে না। কোথায় আছি জানিয়া প্রয়োজন নাই—পত্র পাইলেন তাহাও কাহাকে বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রেরিত লোকের নিকট বক্তব্য যদি কিছু থাকে জানাবেন। সমস্ত গুরুজনদিগকে প্রণাম ও আশীর্বাদভাজনগণকে স্নেহাশীষ দিবেন। স্মরণ রাখিবেন বিপদের সময় ধৈর্য সহকারে বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করাই বিধেয়। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের চরণে সদা মতি রাখিবেন। তাঁহাকে পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি

প্রণতঃ সেবক—

যতীন্দ্রনাথের দিদি বিনোদবালা দেবী খুবই শিক্ষিতা ছিলেন। ভাইয়ের অজ্ঞাতবাসকালে তিনি ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের ভরণ-পোষণের জন্যে শিক্ষকতা শুরু করেন। আত্মীয়-স্বজনদের উপর পাছে সরকারী রোষ আরোপিত হয়, সেই ভয়ে বিনোদবালা দেবী বা ইন্দুবালা দেবী তাঁদের সঙ্গে এ সময় কমই মিশতে চান।

যতীন্দ্রনাথের সন্তানদের কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি করা চলে না। এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় নতুন নতুন জায়গায় কিছুদিন পড়তে না পড়তে সরকারের হুমকি আসে বিদ্যালয়ের পরিচালকদের ওপর : বিদেশী সরকার অন্তত যতীন্দ্রনাথের সন্তানদের শিক্ষার কোন সুযোগ দিতে আগ্রহী নয়।

ওদিকে সংসারও প্রায় অচল। বিরাট বহরের মানুষ যতীন্দ্রনাথ। বিরাট বহরের মানুষ তাঁর দিদি বিনোদবালা দেবী। আকস্মিক পরিস্থিতিতে কি দিদি বিনোদবালা সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর সহজাত ধৈর্য? অটল তাঁর ধর্মবিশ্বাস কি টলে উঠেছিল মুহূর্তের জন্যে? কেন যতীন্দ্রনাথ উদ্ধার করলেন গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি?

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : শ্রদ্ধার সঙ্গে একবার যিনি যোগের পথে পা বাড়িয়েছেন, তাঁর তো কোনও বিনাশ নেই। সমস্ত ত্রুটি, সমস্ত বিচ্যুতি, সব অসাফল্য থেকে অভিজ্ঞতা ও শক্তি সংগ্রহ ক'রে প্রতি পদবিক্ষেপে তিনি সিদ্ধিরই পথে

* যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী ও শিষ্যদের কথা বলছেন।

অগ্রসর হন।...

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির উৎসে ছিল অর্জুনের সাময়িক সংশয়। বাসনা-কামনার পরবশ হয়ে শুভাশুভ বিচার ক'রে মনবুদ্ধি পরিচালিত অর্জুন তাঁর পথে ব্রতী হয়েছিলেন। তাই তাঁর মনে জেগেছিল সংশয়: এই যে যোগের শিক্ষা নিয়েছেন তিনি, তার স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি ক'রে তাঁর ভয় হ'ল— এই যোগে প্রবৃত্ত হয়েও দৈবাৎ যদি যত্নের শৈথিল্য আসে, অকৃতকার্য হন তিনি? তখন তাঁর কী গতি হবে?

দিদি বিনোদবালার মনে তখন হয়তো এমনি কোনও সংশয়: কী গতি হবে যতীন্দ্রনাথের নাবালক তিনটি সন্তানের? কী গতি হবে তাঁর সহধর্মিণীর? কী গতি হবে এই সোনার সংসারের?

তাই কি যতীন্দ্রনাথ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সমাধানের কথা? আর জানিয়ে দিলেন যে তাঁর অবর্তমানে তাঁরই বিপ্লবী ভাইয়েরা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন তাঁর পুত্র-পরিবারের, আর তাঁর মাতৃসমানা সহোদরার।

অবশ্য যতীন্দ্রনাথের শেষোক্ত আশা যে ষোল আনা সফল হয় নি, তার প্রধান কারণ ইংরেজ সরকারের কঠোর নির্মম নিষেধাজ্ঞা, যার ফলে যতীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা রাজদ্রোহের পর্যায়ভুক্ত হ'ল। দ্বিতীয় কারণ, যতীন্দ্রনাথের অনেক শিষ্যই আক্ষেপ করেন যে মহানায়কের অন্তরের স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে তাঁদের প্রবৃত্তিগত প্রকৃতির লোহা সবটাই প্রায় সোনা যেমন হয়ে উঠতে দেরি লাগে নি, অতি ভীরুও হ'য়ে উঠেছিলেন বীর, তাঁদের অনেকেই বিদ্যুৎস্পর্শরহিত চুম্বকের মতো পুনর্মূষিকরূপ ধারণ করলেন যতীন্দ্রনাথের অবর্তমানে। অনেকে মেনে নিলেন গতানুগতিক জীবনের টাকা-আনা-পাই হিসেবের ক্লান্তিকর বিড়ম্বনা। আর-কোনও দিকে নজর দেবার অবসর পেলেন না তাঁরা।

আমাদের মনে স্বতই প্রশ্ন ওঠে: এ-চিঠি লেখবার সময়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্মিণী ইন্দুবালাকেও কি দু-ছত্র চিঠি লিখতে পারলেন না?

নীরবে বিনা দ্বিধায় হাসিমুখেই যে ইন্দুবালা মেনে নিয়েছিলেন তাঁর বীর স্বামীর সাধন-মার্গের এই চরম পরিণতি, প্রাচীনকালের রাজপুত রমণীদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করে যিনি পরম ভরসায় যতীন্দ্রনাথকে যেতে দিয়েছেন

তাঁর অন্তরের স্বধর্ম অনুযায়ী স্বদেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞের হোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্যে—সেই ইন্দুবালা দেবীকে যতীন্দ্রনাথ লিখলেন:

পরমকল্যাণবরাসু—

ইন্দু, আমার স্নেহাশীষ লও। তোমাকে আর পৃথক কি লিখিব, দিদিকে যে পত্র আমি লিখিলাম উহা পড় ও মর্ম অবগত হও। ভগবদিচ্ছায় আজ ১৫।১৬ বৎসর আমার সহিত মিলিত হইয়াছ। এই দীর্ঘকাল যখন সময় পাইয়াছি তখনই বহুপ্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি প্রকৃত মনুষ্যত্ব কোথায়। অদ্য যে অবস্থা আসিয়াছে এ অবস্থা যে এক সময় আসিবেই এ সম্বন্ধে নানাপ্রকারে তোমাকে বুঝাইয়াছি এবং প্রস্তুত থাকিতেও বলিয়াছি। আশা করি তোমার মত ক্ষেত্রে আমার সে সকল শিক্ষার বীজ আশানুরূপ ফল প্রসব করিয়াছে। বহু বহু সহস্রের মধ্যে একজনের নিকট যেরূপ শক্তি, ধৈর্য ও কর্তব্যজ্ঞানের বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তোমার নিকট প্রকৃতই তাহাই আশা করি। সন্তানগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে মানুষের সন্তান বলিয়া পরিচিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিও না। ক্ষণিক দুর্বলতা সকলেরই আসিতে পারে; সেরূপ অবস্থায় দিদিকে সাহায্য করিও ও তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিও। সর্বদা মনে রাখিও যে প্রকৃতি লইয়াই পুরুষ পূর্ণ—যত দূরেই থাকি না কেন, তোমার প্রসন্নতা ও শুভেচ্ছা-রূপ শক্তির সাহায্য যেন সদা পাই। সর্বদা শ্রীগুরুদেব ও ভগবৎ চরণে তোমার স্বামীর সিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা করিও এবং হৃদয়ে বল রাখিও।

ইতি—

কপ্তিদার ঘন জঙ্গল। অনেক রাত। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের রহস্য-অতল গভীরে অন্তরের শিখাটি জ্বেলে নিয়ে নব-বেদান্তের পুরোহিত যতীন্দ্রনাথ ধ্যানে বসেছেন।…

বিপ্লবী সাধক যতীন্দ্রনাথ ভারতের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার মুখ চেয়েই সঙ্কল্প নিয়েছিলেন দেশের রাজনৈতিক মুক্তি সাধনের। সেই সাধনার চরম মাহেন্দ্রলগ্নে সত্তার গভীর তন্ত্রীতে বুঝি শুনছেন তিনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বরাভয়-মন্ত্র, যে-মন্ত্রের প্রতিটি চরণ প্রতিধ্বনিত অনুরণিত হ'য়ে উঠেছে যতীন্দ্রনাথের চেতনার সর্বত্র—অন্তরে, বাইরে, পাদদেশে, শিখরে। সেই চেতনার প্রখর আলোকপাথারে মৃণ্ময়ী দেশের চিণ্ময়ী স্বরূপ ওতপ্রোতভাবে একাত্ম হ'য়ে রয়েছে হিরণ্ময়ী বিশ্বজননীর বিশ্বাতীত বিমূর্ত জ্যোতিপুঞ্জে!

কর্মের তীব্রতম জটিলতার কেন্দ্রেও সমতার প্রতীক যতীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন পরমেশ্বরের নিঃসীম অভীষ্ট, তাঁর নির্বিকল্প রূপও। শরীরে মনে প্রাণে, আধারের অণুতে পরমাণুতে আস্বাদ পেয়েছেন তিনি মানসোত্তর এক জ্ঞান আর আনন্দের।...

এ উপলব্ধি তাঁর সহজাত। এই উপলব্ধির বর্তিকা বুকে নিয়েই তো নেমে এসেছিলেন তিনি। অন্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কারলিপ্ত দেশের বিবেকে তিনি জাগাতে চেয়েছেন সত্ত্বগুণদীপ্ত রাজসিকতার ছন্দ। জননী ভারতবর্ষ যে মহাকালীরই দেহবিশেষ, তিনি যে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাও, সেই সংবিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি দেশের প্রতিটি ব্যক্তিকে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা, শ্রীঅরবিন্দের সাধনা, বিপ্লবের নতুন ভাষ্যকার যতীন্দ্রনাথের দুর্গম যাত্রা—সবই তো মহান এক অধ্যাত্মবিপ্লবের প্রস্তুতি মাত্র। সেই প্রস্তুতির চূড়ান্ত প্রহরে বসে পরমেশ্বরের আলোকে টইটুম্বুর দেখছেন যতীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানের আকাশ।

সেই আলোর ঝর্ণাধারায় ডুবে গিয়েছে মহাবিপ্লবীর সমস্ত জীবন, তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রতিটি কর্মের ধারা। কল্পনাতীত মহত্ত্বের বিশালতায় পরিপ্লুত তিনি।...

আনন্দের অবিমিশ্র এক সরোবর।...স্বচ্ছ প্রশান্তির বুকে অকস্মাৎ জাগে তীব্র যন্ত্রণার তরঙ্গ।...ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ে শরীরের বেলাভূমিতে। ...ক্ষণিক কাঁপন জাগে স্নায়ুতন্ত্রের সূক্ষ্ম পর্দায়।...

কিসের এত জ্বালা, তীব্র এই যন্ত্রণা ?

যতীন্দ্রনাথ চোক মেলেন। আলো জ্বলান। হঠাৎ আলোয় হেসে ওঠে বনভূমি। যতীন্দ্রনাথ দেখেন : এঁকেবেঁকে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে বিষাক্ত একটা সাপ।

পাশের লাঠিটা তুলে নিয়ে তখনি তিনি সংহার করলেন মৃত্যুর সেই দূতকে।

সারা গা তাঁর অবশ হয়ে আসছে। পায়ের ওপর ছোট্ট একটা ক্ষত বেয়ে তিরতির করে ক্ষীণ রক্তধারা নেমে এসেছে। পরণের বসন ছিঁড়ে ক্ষতস্থানের ওপর সজোরে বাঁধলেন যতীন্দ্রনাথ। লাঠি হাতে উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পদক্ষেপে বিষের যাতনা বহন করে ফিরে এলেন আশ্রমে।

শিষ্যেরা অনুমান করলেন কঠিন কিছু ঘটেছে। পায়ের পটি দেখে বুঝতে

বাকি রইল না—সাপের কামড়। যতীন্দ্রনাথ সন্তর্পণে শুয়ে পড়লেন।

সারারাত অত যন্ত্রণার মধ্যেও একটিবার কুঞ্চিত হল না তাঁর অবসন্ন মুখমণ্ডল। মাঝে মাঝে একটু হেসে শিষ্যদের সঙ্গে রসিকতা করতে লাগলেন। কেটে গেল কালরাত্রি।

যতীন্দ্রনাথ উঠে বসলেন। হেসে বললেন: "আমাদের প্রাণ কি এত অল্পে যায় রে?"

সাপের কামড়ের পর কয়েকদিন যতীন্দ্রনাথ দুর্বল ছিলেন।

এমনি সময়ে এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের ঘরে আগুন লাগল। গ্রামবাসীদের তরফ থেকে লোক এল সাধুবাবাকে খবর দিতে।

সশিষ্য যতীন্দ্রনাথ গেলেন দ্রুতপদে।

শিষ্যেরা ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে ছুটলেন। ওদিকে আগুন ছড়াচ্ছে গৃহস্থের গোলঘরের চালে। সারা বছরের ধান সেখানে মজুত।...

যতীন্দ্রনাথ ছুটে গিয়ে গোলাঘরে ঢুকলেন। "দাদা পাঁচ-ছয় মণের একটা একটা ধানের বোরা নিয়ে 'হরি ওঁ' করছেন আর ঘর হতে গড়িয়ে গড়িয়ে সেগুলো বাইরে নিয়ে আসছেন," নলিনীকান্ত লিখেছেন।

অসুস্থ শরীর তাঁর, তার ওপর এই অমানুষিক পরিশ্রম! "আমরা গিয়ে তাঁকে বাধা দিলাম," নলিনীকান্ত লিখেছেন, "তারপর আমরা ওই ধানের বোরা পাঁচজনে কোন প্রকারে অতি কষ্টে নড়াতে পারলাম। এটা বাইরের শক্তিতে নয়, শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস আর মনের জোরে সম্ভব হয়েছিল।..."

॥ ছয় ॥

আরো একদিনের কথা।

গোধূলির দেরি নেই, সমস্ত আকাশ আলোর উৎসবে রঙিন। যতীন্দ্রনাথ নির্জন একটি মাঠে বসে। অদূরে মণীন্দ্র চক্রবর্তী। অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা হবার পর হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ কেমন যেন নীরব হয়ে গেলেন।

যতীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের কথা মণীন্দ্রনাথবাবু বিশেষ জানেন না। জানেন না যে যৌবনের প্রারম্ভে আধ্যাত্মিক এষণা নিয়ে যতীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সমীপে, নিবিড়ভাবে মিশেছেন

তাঁর সঙ্গে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে। স্বামী অভেদানন্দ আর স্বামী অখণ্ডা-নন্দের সঙ্গে যেমন, তেমনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের মতো মনীষীর সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ ছিল। জানেন না যে স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মন্ত্রশিষ্য যতীন্দ্রনাথ।

তাই যতীন্দ্রনাথের সহসা ভাব পরিবর্তন দেখে মণীন্দ্রবাবুও আর কথা না বলে চুপ করে বসে রইলেন যতীন্দ্রনাথের পাশে। প্রশান্ত তাঁর ধ্যানপ্রদীপ্ত দৃষ্টির রহস্যময়তা দেখে মণীন্দ্রবাবুরও মনে বুঝি রং ধরল। যতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে বসে তিনি উপভোগ করতে লাগলেন অব্যক্ত এক আনন্দের স্বাদ।

বহুক্ষণ কেটে যায়।…

যতীন্দ্রনাথের চোখে পলক পড়ে না। কিসের এক আবেশে তাঁর সারা শরীর রোমাঞ্চিত।…নয়ন বাষ্পাকুল।…তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে মণীন্দ্রবাবু তাকান সামনের জঙ্গলের দিকে।

"শাল, আসান প্রভৃতি গাছগুলি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে," মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, "দিন প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে।…গাছের মাথায় এক একফালি রৌদ্র স্তিমিত রশ্মি বিকীরণ করিতেছে—

"যতীন একদৃষ্টে সম্মুখস্থ একটি শালগাছের দিকে তাকাইয়া আছেন। আমি উঠি উঠি করিতেছি। যতীনের দিকে নজর পড়িতেই দেখিলাম তিনি প্রস্তরমূর্তিবৎ অচল, দৃষ্টি কিন্তু ঐ সম্মুখস্থ শালগাছের দিকে।…তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া আমি আর উঠিবার ইচ্ছা করিলাম না।

"এইরূপে আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।…

"যতীন হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিলেন : দাদা, দেখ, দেখ! ওই যে আমার কৃষ্ণ!…"

যতীন্দ্রনাথের আকুল কণ্ঠ শুনে মণীন্দ্রবাবু বিস্মিত হয়ে দেখেন।—কোথায় কৃষ্ণ? কিছুই তো চোখে পড়ে না।

"ওই যে, শালগাছের ডালে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন!…"

গাছের দিকে বারবার করে তাকালেন মণীন্দ্রবাবু। ভাল করে দেখলেন। তিনি লিখেছেন, "কই আমি ত' কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

অথচ যতীন্দ্রনাথ আবার বললেন, "দাদা, ওই যে, দেখ! আমার কৃষ্ণ আমার দিকে চেয়ে হাসছেন!"…

কয়েক মুহূর্ত বাদে ভাবের ঘোরে যতীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর,

"দাদা, দেখ, দেখ, দেখ !"···বলে তিনি মণীন্দ্রবাবুর হাত ধরে তাঁকেও টেনে দাঁড় করালেন। মণীন্দ্রবাবুর সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে গেল।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন তিনি পেলেন না। তিনি লিখেছেন, "আমিও উঠিলাম। কিন্তু আমার সে চোখ কই ?···আমায় দেখাইবার জন্য যতীন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেও, আমি অভাগা, সে-ভাগ্য কোথায় পাইব ?···"

তিনি আরো লিখেছেন, "আনন্দে অধীর যতীন যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।···তাঁহার স্কন্ধে কত দায়িত্ব! কাজের জন্য কত চিন্তা; কত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্মুখে রহিয়াছে! যতীন যেন সবই ভুলিয়া গিয়াছেন!··· তিনি তন্ময় হইয়াই রহিলেন।

"যতীনের মন যে ভগবৎ-ভক্তিতে পূর্ণ ছিল তাহা আমি ইতিপূর্বে এক-দিনের জন্যও উপলব্ধি করি নাই। মনে কী এক আশ্চর্য ভাব লইয়া দুইজনে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত বসিয়া রহিলাম। এ যে পরম ভক্তে ভাবাবেশ!

"যতীন, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জন্ম।"

জার্মানীর মিলিটারি আতাশে ফন্ পাপেন্ ৩১-৫-১৯১৫ তারিখে জানাচ্ছেন নিউ ইয়র্ক থেকে টেলিগ্রাম ক'রে :

"এক।—'মাভেরিক' স্টীমারের সঙ্গে গত এপ্রিলের গোড়ায় 'অ্যানি লার্সেন' জাহাজের দেখা হয় সকোরো দ্বীপে; অস্ত্রগুলি পাচারের ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য ছিল। মার্কিন জাহাজ 'এমমা'-র নাবিকরাও তখন উপস্থিত ছিল। খাবার জল নেবার জন্যে দু'টি জাহাজই যখন মার্কিন উপকূলে গিয়ে পৌছয় তখন মার্কিন ত্রাণ-জাহাজ 'নৌশান' থেকে চারজন বিদ্রোহী নাবিককে গ্রেপ্তার করা হয়।···এই সূত্রেই 'অ্যানি লার্সেন' আর 'মাভেরিক' জাহাজের গোপন সম্পর্ক ধরা পড়ে যায় মার্কিন ও ইংরেজ নৌবহরের কাছে। খবরের কাগজের ধারণা হয় অস্ত্র নিয়ে জাহাজ দু'টি যাচ্ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায়। ইংরেজ জাহাজ 'নিউ কাসল্' সম্ভবত সকোরো দ্বীপ অভিমুখে রওনা হয়েছে। শাংহাই এবং বাটাভিয়াকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছে যাতে ক'রে দুই জায়গা থেকেই 'মাভেরিক'-কে সাবধান ক'রে দিয়ে করাচী অভিমুখে সোজা চ'লে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। স্টীমারে পাঁচজন ভারতীয় আছেন। তাঁরা অস্ত্র খালাস ক'রে নিতে সাহায্য করবেন।

"দুই।—দ্বিতীয় কিস্তী অস্ত্রবাহী জাহাজ আগামী ১৫ই জুন এখান থেকে-

বাটাভিয়া যাবে ; এই ডাচ্ জাহাজটি নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে এ-পথে, এর নাম 'জেম্বার' (Djember) : এই জাহাজে কোনও যাত্রী নেওয়া হবে না ; উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। বাটাভিয়া পৌঁছতে এর আন্দাজ চল্লিশ দিন লাগবে। পিকিং থেকে বিশ্বস্ত কর্মী লী-চাও-কে বাটাভিয়া পাঠানো হয়েছে সেখানে উপযুক্ত ঘাঁটি করবার জন্যে, যাতে ক'রে সেই ঘাঁটি থেকে সুমাত্রায় অস্ত্র পৌঁছে দেওয়া যায় কিংবা—সরাসরি ভারতেই নামিয়ে দেওয়া যায়। উক্ত স্টীমারটিতে একজন ভারতীয় থাকছেন এই ব্যাপারে সহায়তার জন্য।...

"...অধ্যাপক (হেরম্বলাল) গুপ্ত যেন শ্যামদেশ এবং ভারতবর্ষে যান প্রচারের কাজে।"

জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউন্ট জন্ ব্যার্নস্টর্ফ এবং মিলিটারী আতাশে ফন্ পাপেন্ স্বয়ং ভারতের জন্য নিউ ইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়ার মজুদ অস্ত্র থেকে এগারো গাড়ি মাল উক্ত 'অ্যানি লার্সেন' জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন। 'মাভেরিক'-এর সঙ্গে এইসব অস্ত্রাদি গিয়ে পৌঁছবে বালেশ্বরে।

এই ঘটনার পিঠপিঠ, নিরাশ না হ'য়ে পাপেন্ এবং ব্যার্নস্টর্ফ দ্বিতীয় কিস্তী অস্ত্র নতুন একটা জাহাজে ক'রে পাঠাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে।

"গীতায় সাধা ছিল তাঁর জীবন," যতীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছেন ডাঃ যাদু-গোপাল, "সুখ-দুঃখ, বাঁচা-মরা, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, নিন্দা-স্তুতি তাঁর কাছে ছিল তুল্য।.. "

দেশের রাজনৈতিক মুক্তি ব্যতীত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক প্রগতি ক্লিষ্ট হচ্ছে বলেই তো যতীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম প্রস্তুতি থেকেই—বিশ শতকের সূচনা-কালেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন পথ-প্রদর্শকের ভূমিকায় : এ-কথা আগেও বলেছি। তিনি নিষ্কাম পুরুষ ব'লেই না সমস্ত কিছুর সূচনা ক'রে তার বৃদ্ধি এবং পরিণতির পর্বেও কর্মস্রোতের ঘূর্ণিপাকের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত থেকেছেন, ইতিহাসের ওঠা-পড়া চলেছে তাঁকেই ঘিরে, অথচ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্নও তিনি, ও-সবকিছুরও উর্ধ্বে কোথায় যেন তাঁর স্বর্লোক : নিন্দায় তিনি বিচলিত হন নি, স্তুতিতে অভিরুচি জাগে নি তাঁর, জয়ে যেমন পরাজয়ে তেমনি সমান প্রফুল্ল, অন্তর্মুখী, উর্ধ্বচারী থেকেছেন তিনি। ধরা-ছোঁয়ার আওতায় থেকেও রহস্যময় ব'লে তাঁকে মনে হয়েছে অনেকের। তাই বুঝি ডাঃ যাদুগোপাল লিখেছেন, "যতীন্দ্রনাথ ছিলেন

আলাদা থাকের মানুষ। আমাদের মতো সাধারণ ব্যক্তির বহু ঊর্ধ্বে এবং আমাদের সকলকে ছাপিয়ে। তাঁর প্রাণের আলোক-শিখা যেন কোনও উচ্চলোক থেকে জ্বালিয়ে নিচে নামতেন তিনি।"

যাদুগোপালবাবুর মুখেই শোনাচ্ছি 'গীতার পুরুষ' যতীন্দ্রনাথের স্থৈর্য আর সমতার দৃষ্টান্ত : "তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুল। তাঁর চেহারার বর্ণনা-সমেত ফটো দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া হল। তাঁকে ধরিয়ে দিলে মোটা পুরস্কার মিলবে, বিদেশী সরকার তাও বিধিমতো প্রচার করল।...

"বালেশ্বরে তিনি জার্মান ষড়যন্ত্রের পরিণতিস্বরূপ অস্ত্রপাতি প্রাপ্তির আশায়...কালাতিপাত করতে লাগলেন। কালক্রমে অস্ত্রবাহী জার্মান-জাহাজ ধৃত হবার খবর তাঁকে দেওয়া হল। ভাগ্যচক্রের নিষ্ঠুর আঘাত।... আমরা কত সঙ্কোচ করছিলাম মন্দ খবরটা তাকে দিতে। এমন-কি ব্যবস্থা করেছিলাম হঠাৎ সব খবর না বলে ক্রমে গোটা ব্যাপারটা তাঁর কাছে প্রকাশ করতে।

"তিনি কিন্তু যেমন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে শুনতে আরম্ভ করেছিলেন তেমনি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে শোনা একনিশ্বাসে শেষ করলেন। যেন বিষম বা বিরাট কিছু অঘটন ঘটে নি।

"শান্তভাবেই বললেন : '...ভগবান শুধরে দিলেন। আমরা বিদেশের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম। দেশ কিন্তু নিজের জোরে দাঁড়াবে। অপরের সাহায্যে নয়।...' —তাই বলতে পারি তিনি ছিলেন যেন রূপমূর্ত গীতা।"*

যাদুবাবুর এই উক্তির ওপর পুরো নির্ভর যাঁরা না করতে চান, তাঁদের জন্য নলিনীকান্ত করের লেখাও তুলে দিই : "আমার মনে নাই কোন্ একটা খবরের কাগজে জাহাজ ধরা পড়বার detail বেরিয়েছিল। নরেনদা (ভট্টাচার্য) তারই cutting আমাকে দিয়ে বললেন যে, আবার ডাঙা-পথে (অস্ত্র) আনবার ব্যবস্থা হচ্ছে।...

"আমি মহুলডিহায় গিয়ে জাহাজ ধরা পড়ার কথা দাদাকে বললাম এবং cutting-টা দিলাম। দাদা শুনেই খুব জোরে হাসতে হাসতে বললেন :

"Country's salvation from within not from without !..."

আর যা-ই হোক, বিপ্লবীর পক্ষে যে হাল ছেড়ে দেওয়া অসমীচীন, তা

---

* 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'।

যেন যতীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যদের শিখিয়ে দিতে চাইলেন। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতাই যে ভবিষ্যৎ সাফল্যের অভ্রান্ত ভিত্তি, তারই ওপর গ'ড়ে উঠবে সার্থকতার অভ্রংলিহ মন্দির—সেই শিক্ষায় বুকে বেঁধে এগিয়ে চললেন বিপ্লবীরা।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির পদানত চেকোশ্লোভাকিয়া। রাজনৈতিক স্বার্থবশত ফ্রান্সের মুখাপেক্ষী চেক্-বিপ্লবীরা ভারতীয়দের মতো, আমেরিকায় ব'সে চেষ্টা করছেন কী ক'রে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায়।

ইতিমধ্যে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে ভারতীয় বিপ্লবের অগ্রগতি দেখে মুখে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালেও চেক্-বিপ্লবীরা অন্তরে অন্তরে বিরূপ হয়ে উঠলেন। এক মুক্তিকামী জাতি অপর মুক্তিকামী জাতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবেন—স্বাভাবিক এই ধর্মের ওপর আস্থা নিয়ে ভারতীয়রা চেক্‌দের সঙ্গে মেলামেশা করেন।

যখন জার্মান-জাহাজে ক'রে ভারতবর্ষের অভ্যুত্থানের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র যাবার খবর সংগ্রহ করলেন চেক্‌রা—তখন তাঁরা আর স্থির থাকতে পারলেন না।

ফ্রান্স আর রাশিয়ার মুখাপেক্ষী চেক্-বিপ্লবীরা তলায় তলায় অবিলম্বেই এ-সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন আন্তর্জাতিক ফরাসী গোয়েন্দা-বিভাগকে। ফরাসীরা আকর্ষণ করেলন বৃটিশদের দৃষ্টি। সাংকেতিক ভাষায় সে-বৃত্তান্ত চাউর হয়ে গেল 'মিত্রশক্তি'র বিভিন্ন ঘাঁটিতে।

দারুণ সতর্কতার ব্যবস্থা হল।

সারা ভারতে ধর-পাকড়ের ধুম পড়ে গেল নতুন করে। দিল্লীর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-বিভাগ থেকে ডেনহাম আগেই সন্ধানে বেরিয়েছেন—যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর জ্যোতিষ্কমণ্ডলকে না গ্রেপ্তার করে ক্ষান্ত হবেন না, এই সঙ্কল্পে। আন্তর্জাতিক ভারতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত কবতে বদ্ধপরিকর তাঁরা!

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান এবং ওলন্দাজ অধিকৃত উপনিবেশগুলিতে কঠোর প্রহরা বসল। প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রশক্তির চর-জাহাজ ধোবাফেরা করতে লাগল। তৎপর হল ফরাসী গোয়েন্দা-বিভাগ।

বাধা অতিক্রম করাই তো বিপ্লবীর প্রধান উপজীব্য। অসাধ্যসাধনে তাঁর আনন্দ।

বিদেশীসূত্রে যেসব আয়োজন হয়েছিল, তার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাই অগাস্ট মাসেই যতীন্দ্রনাথের শিষ্য নরেন ভট্টাচার্য (ওরফে মার্টিন বা M. N. Roy) এবং ফণী চক্রবর্তী আবার রওনা হলেন বর্মা, মালয়, সুমাত্রা হয়ে যবদ্বীপের রাজধানী বাটাভিয়া (জাকার্তা) অভিমুখে।

জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যতীন্দ্রনাথের দূতেরা জানলেন যে জার্মানরাও হাল ছাড়েন নি এখনো। আরো কয়েকটা জাহাজের ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা। তাদের একটি জাহাজ আন্দামান আক্রমণ ক'রে ভারতীয় বিপ্লবীদের যেমন মুক্ত ক'রে নেবে, তেমনি সিঙ্গাপুর থেকে '২১শে ফেব্রুয়ারী' অভ্যুত্থানের বন্দী সৈন্যদেরও মুক্ত করে নিয়ে অগ্রসর হবে ভারত অভিমুখে। সঙ্গে থাকবে বহু হাজার রাইফেল, পিস্তল, হাতবোমা, মেশিনগান, কয়েক লক্ষ টাকা।

ওদিকে শাংহাইয়ে গিয়ে ফণী চক্রবর্তী দেখেন যে বেশকিছু হাতিয়ার ও অর্থ সংগ্রহ করে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু অপেক্ষা করছেন সেখানে। তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেছেন নীলসেন নামে জনৈক ভারত-অনুরাগী জার্মানের বাড়িতে।

ইতিপূর্বেই উক্ত নীলসেন কিছু টাকা ও আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে দু'টি চীনেম্যানকে পেনাং হয়ে কলকাতা পাঠান। কালকাতায় যতীন্দ্রনাথের বিপ্লব-সংস্থা 'শ্রমজীবী সমবায়'-এর ঠিকানায় বাংলার কর্মীদের হাতে ওই অর্থ ও অস্ত্র দেবার নির্দেশ দেন নীলসেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে চীনেম্যান দু'টি ধরা পড়লেন সিঙ্গাপুরে।

আবার, অবনী মুখার্জী রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে যথেষ্ট রসদ ও তথ্য নিয়ে ভারতবর্ষে ফেরবার পথে গ্রেপ্তার হলেন সিঙ্গাপুরে। ধরা প'ড়ে অবনী বহু নাম-ঠিকানা ব'লে দিয়ে অনেক কথা ফাঁস করে রেহাই পান। এইভাবে দুর্ভাগ্যক্রমে শুরু হয় তাঁর বেপরোয়া স্বার্থদুষ্ট জীবন। শোনা যায় অবনীবাবু দেশের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেন রেহাই পাবার পরে।

অবনীর কাছে শ্যামের ইঞ্জিনীয়ার অমর সিং-এর নাম পেয়ে, তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এসে বর্মার মান্দালয় জেলে তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হল।

নীলসেন এবং ফণী চক্রবর্তীকে শাংহাইয়ে গ্রেপ্তার করা হল। বেগতিক বুঝে রাসবিহারী বসু পালিয়ে গেলেন জাপানে, তাঁর নিরাপদ আশ্রয়-চ্ছায়ায়; নতুন সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন তিনি॥

পূর্ণ আহুতি

কপ্তিপদা। সাধুবাবার আশ্রম।

অগাস্ট মাসের শেষ হয় হয়। বাংলাদেশের খবর এল: ৭ই অগাস্ট তারিখে যতীন্দ্রনাথের বৈদেশিক লেনদেনের অফিস 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স'-এ খানাতল্লাসী হয়ে গিয়েছে। হরিকুমার চক্রবর্তী আর তাঁর অনুজ মাখনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শৈলেশ্বর বসুর ভাইকেও।

হরিবাবু প্রভৃতির নামে আগে থেকেই ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশন অনুযায়ী হুলিয়া চাউর করা হয়েছিল। সেই আইনেই তাঁদের রাজবন্দী করে ফেলে সরকার। হরিবাবুকে গ্রেপ্তার করবার সময় ডেনহাম নাকি বলেন, "I know, you are a fish of the deep water."

'শ্রমজীবী সমবায়'-এর অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সংবাদ পেয়ে অন্তর্ধান করেছেন তখন। তাঁকে পুলিশ খুঁজছে।

কলকাতার অবস্থা সঙ্গীন। যতীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর সহকারী নেতারা নির্দেশ চেয়ে পাঠিয়েছেন: কী কর্তব্য?

—ধরা দেওয়া চলবে না। ধরা দিস্ না! জবাব পাঠালেন যতীন্দ্রনাথ।

'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স'-এর স্বরূপ সম্বন্ধে ভারত সরকার পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন বৃটিশ প্যাসিফিক ফ্লীটের গোয়েন্দা বিভাগের সাঙ্কেতিক বার্তায়। তারপরে বিপ্লবীরা বিদেশ থেকে পাওয়া ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্ট্ ভাঙাতে গিয়ে একবার সন্দেহভাজন হয়ে গেলেন। এর পরে খোঁজ করতে করতে 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স'-এর স্বরূপ আরো উদ্‌ঘাটিত হয়।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীদের আভাস দেন যে, এর পরেই চোট আসতে পারে বালেশ্বর 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম'-এর ওপর; শৈলেশ্বরকে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ তারপরেই পুলিশের দৃষ্টি পড়বে কপ্তিপদার ওপর। খুব সাবধানে এখন থাকা দরকার।

আর নলিনী করকে যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন সেখানকার সকলের কুশল আনতে এবং তাঁর নির্দেশ জানিয়ে দিতে: ধরা পড়া চলবে না।

যাদুবাবু লিখেছেন যে, বালেশ্বর যাবার আগে যতীন্দ্রনাথ তাঁর মনের

বাসনা প্রকাশ করে বলেন যে বহু যুগ ধরে অধীন থাকার দরুণ জাতটা হীন-বীর্য হয়ে গেছে। দেশের ছেলেকে বন্দুক ধরিয়ে তিনি লড়িয়ে যেতে চান। সবচেয়ে কমপক্ষে এবারে এটুকু করে যেতে হবে। দেশের যুবক ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়তে জানে, জাতির চরিত্রে এই পরিবর্তনটুকু এনে দিয়ে তিনি যাবেন। তাঁর কথায় কেমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল। তাঁর সামনে গেলে ভীরুও বীর হয়ে যেত। 'না, হতে পারে না'—এমন কথা তাঁর শব্দ-ভাণ্ডারে ছিল না। তাঁর সান্নিধ্যে থাকলে 'অসম্ভব' কথাটা অন্তর থেকে মুছে যেত।*

যতীন্দ্রনাথকে ওদিকে বিদেশে সরিয়ে নেবার জন্যে নরেন ভট্টাচার্য উঠে-পড়ে চেষ্টা করছেন ; দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বিপ্লবের গুরুকে রাখা মোটেই আর নিরাপদ নয়।

হেসে যতীন্দ্রনাথ উড়িয়ে দিলেন এই প্রস্তাব।

দু-একজন শিষ্যের মনে চকিতে খেলে গিয়েছিল যতীন্দ্রনাথেরই প্রিয় একটি উক্তি, "আমরা মরব, জাত জাগবে তাতে!"

তবে কি···? —অসমাপ্ত থাকে শিষ্যদের মনের সংশয়। অসম্ভব সেই পরিণতির কথা ভাবতেও শিউরে ওঠে তাঁদের অন্তর। শিববিহীন যজ্ঞ ক্ষণিকের জন্যেও যদি-বা সম্ভব হয়ে থাকে, বিপ্লবের এই মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ ব্যর্থবিকল হয়ে যাবে মহানায়কের অনুপস্থিতিতে!

বালেশ্বর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট রেজিন্যাল্ড জর্জ কিলবি আদালতে যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি বলেছিলেন, "৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯১৫) মাঝ রাতের ট্রেনে বাংলাদেশ থেকে এসে উপস্থিত হন মিঃ ডেনহ্যাম, মিঃ ব্যর্ড, এবং মিঃ টেগার্ট।

"১৯১৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ভোরবেলা আমি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে খবর পাঠাই, তিনি অবিলম্বে আসেন। আমি তাঁকে সশস্ত্র কনস্টেবল সংগ্রহ করতে বলি : বালেশ্বর শহরের জেনার‍্যাল (ইউনিভার্সাল) এম্পোরিয়াম খানাতল্লাসী করা হবে।"

চার্লস অগাস্টাস টেগার্ট এবং লেসলি নিউম্যান ব্যর্ড তখন কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, আর গডফ্রে চার্লস ডেনহ্যাম কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা

* 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' : ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী : পৃঃ ৪২৮।

বিভাগের ডি. আই. জি.: বাংলাদেশ তোলপাড় করে তুলছেন তাঁরা বিপ্লবীদের নাজেহাল করবার অভিপ্রায়ে।

চার্লস টেগার্ট যতীন্দ্রনাথকে মর্মে মর্মে চেনেন। যতীন্দ্রনাথ একাধিকবার টেগার্ট সাহেবকে হাতের মুঠোয় পেয়েও করুণার হাসি হেসে ছেড়ে দিয়েছেন। এই টেগার্ট' যেদিন ১৯১০ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে যতীন্দ্রনাথকে অবশেষে গ্রেপ্তার করতে যান, তখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখিয়ে যতীন্দ্রনাথের হাতে হাতকড়া পরাতে তিনি এগিয়ে যাবার সময় এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন যে, হোঁচট খেয়ে পড়ে যান; যতীন্দ্রনাথ সহাস্যে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে তুলে ধরে বলেন,

"Beg your pardon, Mr. Tegart!"*

৫ই সেপ্টেম্বর ভোরবেলা শুরু হল 'ইউনিভার্স'াল এম্পোরিয়াম' খানা-তল্লাস। প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে দীর্ঘ অনুসন্ধানের শেষে সন্তোষজনক তেমন কিছুই পাওয়া গেল না সেখানে।

তবু গ্রেপ্তার করা হল শৈলেশ্বর বসু, তাঁর সহকারী নিমাই এবং স্থানীয় সহচর নারায়ণ ব্রহ্মচারীকে। নারায়ণবাবু আবগারি বিভাগের কর্মচারী।

কিন্তু 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' থেকে তাঁরা হদিস পেয়ে গেলেন কপ্তিপদা জঙ্গলের। বালেশ্বর থেকে তা' কতদূর, কি ভাবে সেখানে যাওয়া যায়, সব হদিস নিলেন টেগার্ট কিলবি সাহেবের কাছে।

মাত্র ত্রিশ মাইলের ব্যবধান শুনে, টেগার্ট স্থির করলেন: অবিলম্বে কপ্তিপদা যেতে হবে।

অগত্যা, বালেশ্বরের সশস্ত্র পুলিশ, নীলগিরি রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ ও ময়ূরভঞ্জের সশস্ত্র পুলিশকে সতর্ক রেখে, দলবল নিয়ে সাহেবেরা রওনা হলেন কপ্তিপদা অভিমুখে।

ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি লিখেছেন, "দুটি মোটর নিয়ে আমরা রওনা হলাম ...৬ই সেপ্টেম্বর সকালে। একটি মোটর পুলিশের, অপরটি প্রুফ ডিপার্টমেণ্টের। আমাদের দৃঢ় ধারণা হয় যে, কপ্তিপদার কাছাকাছি কোথাও রাজনীতির দিক থেকে আপত্তিজনক কয়েকজনের একটি আস্তানা আছে। ৬ই সন্ধ্যের পর আমরা পৌছলাম সেখানে।

"সেই রাতেই আমি ময়ূরভঞ্জের সাবডিভিশনাল অফিসারের কাছে চিঠি

* 'আত্মশক্তি' ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ দ্রষ্টব্য॥

দিলাম, কারণ কপ্তিপদা তাঁরই এলাকাভুক্ত। তিনি ৭ই সেপ্টেম্বর সকাল সাতটায় এলেন।...”

৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যের আগেই যতীন্দ্রনাথের কাছে খবর এল: মোটরে করে সাহেবেরা আসছেন; তাঁদের পিছু পিছু হাতীর পিঠে চেপে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বহু পুলিশও আসছে।

কপ্তিপদার ডাকবাংলোয় এসে উঠলেন আগন্তুকেরা। তাঁদের স্বরূপ যতীন্দ্রনাথের অজানা নয়। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে নদী পার হয়ে তিনি বাংলোর খুব কাছ থেকেই ঠাহর করে এলেন তাঁর পুরনো বন্ধুদের।...

দ্রুত পদক্ষেপে তিনি আস্তানায় ফিরে এলেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন আশ্রমের সবাইকে। আর চিত্তপ্রিয় ও মনোরঞ্জনকে বললেন: এখুনি বেরিয়ে পড়বার জন্যে তৈরী হয়ে নে!

শিষ্য দুজন বিশেষ করে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন: “দাদা, আপনি আমাদের ভাবনা না ভেবে জঙ্গলের নির্দিষ্ট পথ ধরে সহজেই তো অন্তর্ধান করতে পারেন। আর তা' হলে দেরি করবেন না। আমাদের মতো সৈনিকের পাশে দাঁড়িয়ে সাধারণের অদৃষ্ট আপনি যদি নিজেও বরণ করে নেন, দলের সবাই আমাদের কী ভাববে বলুন তো? আমরা প্রাণ থাকতে এভাবে আপনাকে বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে দেব না, দাদা!”

যতীন্দ্রনাথের চোখেমুখের দৃঢ় সঙ্কল্প কোমল হয়ে আসে ব্যথিত ভৎর্সনায়, “ভেবেছিলাম তোরা যারা আমার খুব কাছে থাকিস—তোরা অন্তত তোদের দাদাকে ভুল বুঝবি না। বিপদে পড়ে আত্মরক্ষা করাই বুঝি নেতার প্রধান কাজ, পালিয়ে যাওয়া? যে-ঘোর সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়েও তোবা আমায় বলতে পারছিস অন্তর্ধান করতে, সেই সঙ্কটই তো চেয়েছি আমরা মনেপ্রাণে। তাকে এই চরম লগ্নে সমাদরে বরণ না করে পালাতে যাব কেন বলতো?”

আশ্রমে তখন ভীমা নামে এক রোগী শয্যাগত। দরিদ্র গ্রামবাসী সে—খানিক আগেও নিজে হাতে সাধুবাবা তাকে পথ্য দিয়েছেন।

সে সজল চোখে যতীন্দ্রনাথের হাত দুটো ধরে সহজ আবেগে বলে, “স্বামীজী-রাজা, তোমাদের কেন চলে যেতে হবে আমি বুঝতে পারছি না। বোধহয় যারা এসেছে শুনছি—ওরা তোমাদের শত্রু। তবু আমি বলি, তোমার এই ভীমার মতো আরো অনেক অভাগা দিন গুণছে তোমার জন্যে।

তুমি আমাদের দেবতা—তুমি যদি বিপদের দিকে যাও, আমাদের কে বাঁচাবে বল ? তোমার দরদ আমি ভুলতে পারব না, তুমিই আমার জীবনটা ফিরিয়ে দিলে !"

"নারে ভীমা, আমি চলে যাব না। তোদের পাশেই ফিরে আসব আবার !" থমথম করে মহানায়কের গলা।

ভীমার দেখাশোনার ভার দুজন বিশ্বাসী চাকরের হাতে দিয়ে, ভীমার শয্যাপার্শ্ব ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন যতীন্দ্রনাথ। বললেন, "আর শোন, যদি কেউ জানতে চায়, বলিস : বাবুরা 'হ্যাবড়া' শিকারে গেছে !"

সুতুরিয়া নামে একটা চাকর কিছুতেই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গ ছাড়বে না। মণীন্দ্রবাবুর বহুদিনের চাকর সে। যতীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগত। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে গিয়ে দাঁড়ায় যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় ও মনোরঞ্জনের পিছনে।

অদূরেই মণীন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ি। সেদিকে পা বাড়ালেন মহানায়ক। সুতুরিয়া তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করল না কিছুতেই।

"তাঁহাদের তৎপরতা, সতর্কতা ছিল অতি প্রবল।...বিশেষত যতীন সকল দিকেই সদা সতর্ক থাকিতেন।...তবে তাঁহাদের সকল সতর্কতার শেষ পর্যায়ের কথা এখন বলিব।" মণীন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন।

"বাদল লাগিয়াছে। তিন-চার দিন কখনও বেশি কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছে। ভাদ্র মাস। ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সাল। রাত প্রায় দশটা।

"আমার কাছে যতীন ও কালিদাস (চিত্তপ্রিয়) আসিয়া আমাকে ডাকিল। আমি ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিলাম। একটু বিশেষ ব্যস্তভাবেই যতীন বলিলেন : দাদা, আমরা তোমার এখান হইতে চলিলাম।

"আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যতীন বলিলেন : ...আজ এই আবহাওয়ার মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা অবশ্যই বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে।..."

"আমি বলিলাম : তোমারা এ সংবাদ কোথা হইতে পাইলে ?..."

যতীন্দ্রনাথ সবকথা বিশদ জানালেন মণীন্দ্র চক্রবর্তীকে। এবং বললেন, "আমি সন্ধান লইতে বাংলোর দিকে অগ্রসর হইলাম। পথ প্রায় জনশূন্য।

আমি বাংলোর নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম, সেখানে আলো জ্বলিতেছে। আরও একটু নিকটে গিয়া দেখিলাম, আগন্তুকেরা সাহেবই বট।...কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দেখিলাম, কপ্তিপদার রাজার বাটী হইতে উহাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া একটি লোক বাংলোয় গেল। আমি তাহার ফিরিবার পথে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেই সে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আসিয়াছে। সে মাত্র বলিল: কলকাতার সাহেব আসিয়াছে। তাহারা চৌকিদারকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছে।..."*

আরো কিছু কথাবার্তার পর যতীন্দ্রনাথ মণীন্দ্রবাবুকে বললেন যে তাঁরা তিনজন তালডিহায় † যাচ্ছেন: সেখানে নীরেন ও জ্যোতীশকে ডেকে নিয়ে তাঁরা নিজেদের পথে এগিয়ে যাবেন।

মণীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে একটা গাদা বন্দুক ধার নিয়ে যতীন্দ্রনাথ চ'লে যেতে উদ্যত হ'লেন।

মণিবাবু লিখেছেন, "মনটা কেমন করিয়া উঠিল। এই কি শেষ বিদায়? ...কয়েক মুহূর্ত পরে যতীন বলিলেন: সাহেবেরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, আধঘণ্টাখানেক পূর্বে, অর্থাৎ ভোরবেলায় তাহারা ন্যাবড়া শিকারে গিয়াছে!..."

জঙ্গলের পথ দিয়ে সুহুরিয়া পথ দেখিয়ে শিষ্য-পরিবৃত যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে চলল তালডিহার পথে।

মহুলডিহা থেকে বারো মাইল দূরে এই তালডিহাতেও যতীন্দ্রনাথ অপর একটি আস্তানা করিয়েছিলেন—এক সঙ্গে বেশি লোক না থেকে মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া থাকলে জনসাধারণের দৃষ্টি কম আকৃষ্ট হবে বলে। নীরেন আর জ্যোতীশ পাল তখন ওখানে।

তালডিহা পৌঁছেই যতীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন: ওরে, এখুনি তৈরি হয়ে নে। যেতে হবে।

এখানেও একই অনুরোধ: "দাদা, আপনার অমূল্য জীবন রক্ষা করবার ব্রত নিয়েই আমরা এখানে এসেছিলাম। আমাদের সামনে সেই তো একমাত্র কর্তব্য! বিপদের সামনে এইভাবে আমাদের জন্যে কালক্ষেপ আপনি যদি করেন, কোন্ মুখে গিয়ে অন্যান্য বিপ্লবীদের সামনে দাঁড়াব

* মণীন্দ্র চক্রবর্তীর খাতা থেকে॥

† মহুলডিহা থেকে ১২ মাইল দূরে॥

আমরা? আপনি যদি জঙ্গলের পথে চলে যান, কার সাধ্য আপনার হদিস পায়?”

যতীন্দ্রনাথ এবারেও বুঝিয়ে বলেন, “দেখ, বহু যুগ ধরে বিদেশীর অধীনে থেকে আমরা গোটা জাতিটাই হীনবীর্য হয়ে গিয়েছি। আমাদের যুবশক্তি যে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেশের জন্যে সত্যের জন্যে আদর্শের জন্যে লড়তে জানে—আমাদের পরবর্তী যুগে যারা এ দেশের মাটিতে জন্মাবে, তাদের জন্যে এই গর্বটুকু করবার অধিকার আমরা দিয়ে যাব। অনাগত দিনের নতুন সৈন্য-বাহিনীর জন্যে আমরা পথ বেঁধে দিয়ে যাব। আমাদের এই পথেই তারা এগিয়ে যাবে মুক্তির সঙ্কল্প সার্থক সফল করে।...”

গুরুর আদেশ শিরোধার্য। নীরবে পথে পা বাড়ালেন জ্যোতীশ পাল, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, আর মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত—এগিয়ে চললেন তাঁরা সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

কপ্তিপদার বিশ্বস্ত চাকর সুতুরিয়া—স্বামীজীর পদধূলি মাথায় নিয়ে সাশ্রু নেত্রে করে ফিরে গেল তাঁরই নির্দেশে।

জঙ্গলের ভয়াল পথ। তার ওপর অন্ধকার। কলিযুগের পঞ্চপাণ্ডব চলেছেন কুটিল কৌরবদের দশ অক্ষৌহিণীর দৃষ্টি এড়িয়ে। তাঁদের অজ্ঞাত-বাসের পর্ব যে ফুরোয় নি এখনো!

ভাদ্র মাস। ঘোর বর্ষা। কালো আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ। মুহু-মু'হু বিদ্যুতের চমক। মাঝরাতের পর থেকে ঝমঝমিয়ে আকাশ-মাটি কাঁপানো বৃষ্টির দারুণ তোড় নেমেছে।

সঙ্গের টাকাকড়ি এবং আগ্নেয়াস্ত্রগুলো সযত্নে পুরু চামড়ার থলিতে রেখে চাদরে মুড়ে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে চলেছেন তাঁর শিষ্য-চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে। চলেছেন অজানিতের পথে।

গোটা জাতির শৌর্যের বীর্যের ত্যাগের আর দেশপ্রেমের ইতিহাস ধ্রুবতারার মতো তাঁদের ধ্যানের আকাশ আলো করে রেখেছে। আর বহন করে নিয়ে চলেছেন তাঁরা পরাধীন এক জাতির নিয়তি—স্বাধীনতার সুতীব্র সঙ্কল্প, তেত্রিশ কোটি মানবের প্রাণ-ভোমরা নিহিত যে আজ ওই একটি অমূল্য হৃদয়ের অভ্যন্তরে।

৭ই সেপ্টেম্বর। ভোরবেলা।

বিশেষ সামরিক সতর্কতা অবলম্বন করে সাহেবেরা দলবল নিয়ে রওনা হলেন কপ্তিপদার জঙ্গলে বাঙালী বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করতে।

কিলবি সাহেবের জবান: "নির্দিষ্ট স্থানে আমরা উপস্থিত হয়েছি শুনে হাতির পিঠ থেকে আমরা নামলাম। জঙ্গলের মধ্যে একটা বাড়ি দেখে সেটা ঘেরাও করে ফেললাম। বাড়িটা আমাদের রাত্রিবাসের জায়গা থেকে মাইল দুয়েক দূরে।

"কে যেন বলছে কানে এল: ওখানে কেউই নেই।—উঠোনে ঢুকে দেখি চারধারের ঘরগুলোয় তালা ঝুলছে। উঠোনের একটা গাছে একটা টারগেট টাঙানো। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গজের মতো উঠোনটা। টারগেটের স্থানে স্থানে এবং গাছের গায়েও বুলেটের চিহ্ন দেখা গেল। উঠোনের পাশে একটা কুস্তির আখড়া।

"সাবডিভিশনাল অফিসার বললেন: এখানে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বন্দুকের লাইসেন্স ছিল না।

"আমরা গায়ের জোরে দোর ভেঙে ফেলা সাব্যস্ত করলাম।..."

সমস্যা জাগল: কে এগিয়ে যাবে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ওই গহ্বরে! বাঘের ঘরে অম্লান বদনে প্রবেশ করবার মতো উৎসাহ কম লোকেরই থাকে।

টেগার্ট সাহেব আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন সাহেবদের—বিদেশ-বিভুঁইয়ে কাঁচা প্রাণটি যদি খোয়াতে না চাও, ভুল করেও আগ-বাড়িয়ে যেও না। বাঘের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক এই বিপ্লবীরা। আর তাদের নেতা ওই মোকার্জি সাহেব যে বাস্তবে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে কত বাঘকে নাস্তানাবুদ করে 'বাঘা যতীন' হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই!

অতএব—ময়ূরভঞ্জের বাঙালী হাকিম অক্ষয় চ্যাটার্জির ওপর হুকুম হল সাধুবাবার আশ্রমের দরজা ভাঙবার।...

টারগেটের বুলেট চিহ্নগুলির দিকে তাকিয়ে আর এই বিপদের মুখে একলা এগিয়ে যাবার আদেশের তাৎপর্য বুঝে নিয়ে অক্ষয়বাবুর উপলব্ধি হতে দেরি লাগল না, হাকিম হবার কী ঝামেলা!

ইষ্টনাম স্মরণ করে তিনি দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেলেন। আর আশ্রমের দরজা তাগ্ করে উঁচিয়ে রইল পুলিশের বন্দুক।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বার দুই হাঁক দিলেন অক্ষয়বাবু: ভিতরে যে-ই

থাকুন, বেরিয়ে আসুন।

কেউই আসেন না। সাহেবদেরও তখন সাহস জেগে গিয়েছে। সবাই চড়াও হয়ে প্রচণ্ড লাথি মেরে দরজা খুলে ফেললেন হাট করে।

ঘরের মধ্যেও কেউ নেই বিশেষ। এক কোণে অসুস্থ একজন স্থানীয় লোক—অচৈতন্য, শয্যাশায়ী। তাকে জেরা করে জানা গেল, নাম তার ভীমা বেহারা। বহু প্রশ্নে তাকে জর্জরিত করে এইটুকু মাত্র জানা গেল, বাবুরা ন্যাবড়া শিকারে গিয়েছেন।

ঘরের এক পাশে একটা কেরোসিন কাঠের আলমারিতে কিছু কাগজ-পত্রের বাণ্ডিল। একটা তাকের ওপর কয়েকটা ওষুধপত্রের শিশিবোতল। গোটাকয়েক ধুতিচাদর। আরো কত কি!

কিলবি সাহেবের জবান:

"We looked through the things hastily. We found books in English, some (gun) powder, some shot, a case of homoeopathic medicines and many other things. We consulted as to what should be done and first we reached a neighbouring house belonging to Manindra Chakravarti which is about 100 yards distant, but found only the ordinary occupants and not the Bengali residents of the first house..."

মণীন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, "...বৃষ্টির কামাই নাই। আমারও শান্তি নাই। বাবুদের ঘরের দিকে কিছু অগ্রসর হইয়া দুই-চারি বার দেখিলাম। ...চাকর দুইজনকেও তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন ন্যাবড়া শিকার করিতে যাইতেছেন। তাহারা তাহা অবিশ্বাস করে নাই। কারণ এরূপ শিকারে যাওয়া প্রায়ই হইত।...

"ন্যাবড়া শিকার বলে: বাদলের সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হওয়ার কালে বন্য জন্তুরা বনমধ্যে ইতস্তত বিচরণ করিতে থাকে। নরম মাটিতে তাহাদের পায়ের দাগ পড়ে। ওই দাগ দেখিয়া...সেই পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া জন্তুর নিকট পঁহুছানো যায়। এবং সতর্ক শিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছোঁড়েন।...

"সকাল হইল। কেহ আসিল না। ক্রমে বেলা আটটারও অতিরিক্ত হইল। আমি মুখ ধুইয়া বাইরের বড় চালা ঘরটিতে বসিয়া আছি অশান্ত

মনে। যেন শত্রুর প্রতীক্ষা করিতেছি।

"এমন সময় সত্যিই একজন কনস্টেবল আসিয়া আমাকে জানাইল : বাবু, আপনাকে এস-ডি-ও ডাকিতেছেন।

"বুঝিলাম এবার আমার সম্মুখ যুদ্ধ। তখন আমার ভয় হইল না কেন, জানি না। আমি আগে হইতেই জানিতাম বলিয়াই বোধহয় !...

"আমি একটি জামা গায়ে দিয়া একটি ছাতা লইয়া সেপাইয়ের আগে আগেই চলিলাম। সেপাই বলিয়াছিল এস-ডি-ও বাংলোয় আছেন। আমি একটু ন্যাকামো করিয়া সরকারী বাংলোর রাস্তায় চলিলাম। সেপাই তৎক্ষণাৎ আমায় বলিল : বাবু, এদিকে, এই বাবুদের বাংলোয় চলুন !—

"আমি তখন সেই পথ ধরিলাম।..."

ওদিকে, সাহেবরা বিমর্ষ চিত্তে খানিক পরামর্শ করে হুকুম দিলেন : যে যেদিকে পার, ছুটে যাও। গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করে দাও—বাঙালী ডাকাতদের ধরিয়ে দিতে পারলে প্রচুর টাকা ইনাম পাবে।

চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরা বসিয়ে, হাজার হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে সাহেবরা মণীন্দ্র চক্রবর্তীর অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁদের হাতে সময় কম। বালেশ্বর শহরে ফিরে গিয়ে আরো সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করে এনে গোটা অঞ্চলটা ঘেরাও করে ফেলা দরকার। একটা মাছিও যেন না পালাতে পারে, বিপ্লবী তো দূরের কথা।

"কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম", মণীন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, "বাবুদের ঘরের দুই দিকে দুই সারি পুলিশ বন্দুক কাঁধে করিয়া টহল দিতেছে, আর তিনজন সাহেব তাহাদের মধ্যে ছুটোছুটির মত ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক করিতেছেন। কপ্তিপদা ও নিকটস্থ গ্রাম হইতে দর্শকের সংখ্যাও অনেক।

"এই দর্শকবৃন্দের মধ্যে, আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল একটি বিশেষ লোকের দিকে। সে, কপ্তিপদার হরি মহাপাত্র। সে সাহেবদের কাছে কাছেই ঘুরিতেছে। দু-একবার কি যেন কথাও হইতেছে। তখন বুঝিতে পারিলাম, তালডিহায় বাবুদের যে ঘর আছে, তাহা এই হরি মহাপাত্রের জায়গায়।... বাবুরা সরকারী সংস্রব একেবারেই করিতেন না। ইহার কারণ সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কারণ বলা বাহুল্য। সর্বক্ষেত্রেই সাবধানতা অবলম্বন করা তো তাঁহাদের নীতিই ছিল।...হরি মহাপাত্রের সঙ্গে সাহেবদের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া আমি শঙ্কিত হইলাম। তবে কি শম্ভু (নীরেন) ও প্রমথ

(জ্যোতীশ পাল)-কে সেখানে ধরিতে যাইতেছে ? মনটা অস্থির হইল।

"আমি কনস্টেবলের সহিত সাহেবদের নিকটস্থ হইবামাত্র এস-ডি-ও অক্ষয় চাটুজ্যে মহাশয় ত্বরিত পদে আমার নিকট আসিলেন। এবং বলিলেন : বাবুরা কোথায় ?

"আমি পূর্ব পরামর্শ অনুযায়ী বলিলাম : আমার নিকট হইতে একটি বন্দুক লইয়া তাঁহারা ন্যাবড়া শিকারে গিয়াছেন।

"অতি সন্দিহান সাহেবগণ অক্ষয়বাবুর সহিত আমায় কথা বলিতে দেখিয়া সত্বর...দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন।

"প্রথমে ডেনহ্যাম সাহেবই আসিলেন। আমার সম্মুখস্থ অক্ষয়বাবুকে একেবারে পশ্চাতে ফেলিয়া আমার সম্মুখীন হইলেন। অক্ষয়বাবু বলিলেন : এই মণীন্দ্র ; আপনি কি ইহাকে চান ?

"সাহেব আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অক্ষয়বাবুকে কোন উত্তর দিলেন না। আমাকে বলিলেন :

—বাবুরা কোথায় ?

—ন্যাবড়া শিকারে গিয়াছেন।

—কতক্ষণ ?

—প্রায় দুই ঘণ্টা হইবে। ভোরবেলাতেই গিয়াছেন।

—কোনদিকে গিয়াছেন ?

"আমি দক্ষিণ দিকের জঙ্গল নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলাম। বলিলাম : বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে ওই জঙ্গলেই তাঁহাদের সাক্ষাৎ মিলিবে।—আনাড়ির ভাণ করিয়া আমি পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলাম : বাবুদের নিকট আপনাদের কি প্রয়োজন আছে ?

"সাহেব ইহার উত্তর দিলেন না। আমিও উত্তর পাইব না, তাহা ভালভাবেই জানি।...আরো দুইজন সাহেব আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন :

—কতজন বাবু এখানে থাকেন ?

—মাত্র তিনজন।

—তাঁহাদের বাড়ি কোথায় ?

—কলিকাতা।

—ঠিকানা বল।

—কলিকাতার ঠিকানা আমি জানি না।

"সাহেবের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি কহিলেন: তোমরা একসঙ্গে থাক, আর ইহাদের ঠিকানা জান না? ইহা কি সম্ভব?

—আমি থাকি আমার বাড়িতে। বাবুরা তাঁহাদের এই বাড়িতে। আর আমি চাষী মানুষ। আমাকে সর্বদাই ক্ষেত-খামারে মুনিষের সঙ্গে থাকিতে হয়। তাঁহাদের কলিকাতার ঠিকানা আমি জিজ্ঞাসা করিতে যাইব কেন?

—এই সব লোক তোমার নিকট অনেক দিন হইতে রহিয়াছে। তাহাদের চিঠিপত্র অবশ্যই এখানে আসে। এবং ইহারাও উত্তর দিয়া থাকে। নয় কি?

—তাহা অবশ্য হইতে পারে। কিন্তু আমার মত কর্মব্যস্ত লোকের তাহা জানা সম্ভব নয়। ইঁহারা কলিকাতার বাবু। এখানে জমি কিনিয়া চাষ করিতেছেন এবং কপ্তিপদার মহারাজার নিকট জঙ্গলে ইজারা লইবার জন্য যাতায়াত করিতেছেন, তাহাও জানি এবং এই সব জমির জন্য কবুলিয়ৎ দিয়া আমার নিকট রেজিস্ট্রি করাইয়া লইয়াছেন। ইঁহাদের অবিশ্বাসের কোনও কারণ তো আমি দেখিতে পাই নাই। আজ আপনাদের ধরণ-ধারণ দেখিয়াই আমার প্রথম সন্দেহ হইতেছে। বাবুরা কি চোর? না ডাকাত? আপনি বলুন না!

"সাহেবরা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে প্রশ্ন করিল: বাবুদের নিকট কি ছোট ছোট পিস্তল ছিল?—আমি বলিলাম: না, তাহা আমি কখনও দেখি নাই।

"পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রামের লোক এই অদ্ভুত কাণ্ড শুনিয়া ছুটিয়া সমবেত হইতেছিল। সাহেব তাঁহার পকেট হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া কহিলেন:

—এমনি পিস্তল লইয়া কি বাবুরা শিকারে বাহির হন?

—না। তাঁহারা শিকারে যাইবার সময় আমার নিকট হইতে বন্দুক চাহিয়া লইয়া যান।

"এই সময়ে, আগন্তুকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল: হুজুর, বাবুদের হাতে আমি পিস্তল দেখিয়াছি।

"লোকটি কপ্তিপদা রাজার হাতির মাহুত।...বুঝিলাম, আমার বিরুদ্ধে

ইহারই মধ্যে একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে। সাহেব মাহুতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

—বাবুদের হাতে তুমি কি করিয়া পিস্তল দেখিলে ? (তার আগেই তিনি পিস্তলটি পকেটে রাখিয়াছেন।)

—শিকারে তাঁহারা যখন যান, তখন দেখিয়াছি।

"শুনিয়া আমি একটু বিব্রত বোধ করিলাম। সম্পূর্ণভাবেই জানিলাম, সে মিথ্যা বলিতেছে। আমি প্রশ্ন করিলাম : বল দেখি, বাবুদের হাতের পিস্তল কত বড় ছিল ?

"মাহুত দুই হাত ফাঁক করিয়া যাহা দেখাইল, তাহাতে সাহেব বুঝিলেন, তাহার কথা মিথ্যা। কারণ পিস্তল তো বিঘৎ-প্রমাণ। অতবড় হইতেই পারে না।...সাহেবরা এ-কথাও জানেন যে সাধারণকে দেখাইয়া বাবুরা পিস্তল ব্যবহার করিবার মত লোক নহেন। তাই সাহেব ধমকের স্বরে মাহুতকে বিদায় করিলেন। আর যাহারা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, মাহুতের দুরবস্থা দেখিয়া তাহারা ভয় পাইয়া গেল।"

এইভাবে, বেলা একটা বেজে গেল। সাহেবরা তখন হুকুম দিলেন, মণীন্দ্রবাবুর বাড়ি তল্লাস করতে।

অত সৈন্য-সামন্ত, সাহেব, বন্দুক, হাতি, প্রভৃতির মিছিল দেখতে গ্রামের পর গ্রাম থেকে বিস্মিত-বিহ্বল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটে এসেছিল। মণীন্দ্র-বাবুর ভাষায়, "হাতিগুলিও সেই বন্দুকধারী পুলিশদের পাশে পাশেই ঘুরিতেছিল। একটি অপূর্ব দৃশ্য।...এই সুবৃহৎ আয়োজন মহুলডিহা শুধু নয়, কপ্তিপদা ও কপ্তিপদার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতে যাহারা আসিয়াছিল সবাই দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

"এত বড় মিছিল এখানে, এখানে কি এদেশে বোধহয় নিকট অতীতে কেহ দেখে নাই।...আমাদের সাবডিভিশন অফিসে খবর দিয়া...রিজার্ভে যত পুলিশ আছে সব সশস্ত্র হইয়া আসিবার আদেশ জানাইয়া তাহাদের সকলকে ও বালেশ্বর পুলিশ দল সকলে তাহাদের নিকট জুটিয়াছে। এবং নীলগিরির কিছু পুলিশ ও হাতিও আসিয়াছে।...

"বাবুদের ঘরের নিকট আসিয়া, বাবুরা ঘরে আছেন কিনা তাহার সন্ধান ভালভাবে না লইয়া বাবুদের ঘরে সাহেবরা আসেন নাই।*

* ভীমা নামে স্থানীয় যে লোকটি যতীন্দ্রনাথের ঘরে শয্যাশায়ী ছিল, তার রিপোর্ট দেখলে

"ইহাতেই বুঝিলাম, সাহেবরা যতীনের দলকে বা বিপ্লবী বাঙালী দলকে খুব ভয় করে। উহারা যে বাবুদের ভীষণ ভয় করে তাহা ভীমার কথাতেও বুঝিলাম।..."

সাহেবরা এরপর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চড়াও হলেন মণীন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে। সকালবেলাতেই পুলিশ সেখানে মোতায়েন করা ছিল। এখন এস-ডি-ও সাহেবের পিছু পিছু সাহেবরাও কিছু পুলিশ নিয়ে ঢুকে পড়লেন মণীন্দ্রবাবুর অন্তঃপুরে।

জলে-ভেজা বুটের অস্থির আওয়াজে চমকে ওঠে মণীন্দ্রবাবুর শিশু পুত্র-কন্যারা।

তল্লাসীর নামে গোটা বাড়ি চ'ষে ফেলে, জিনিসপত্র তছনছ ক'রে, পছন্দ-মতো এটা-সেটা আত্মসাৎ ক'রে পুলিশেরা সাহেবদের হাতে একতাড়া চিঠি-পত্র আর অনেকগুলো বন্দুক এনে দিল। সবকটা বন্দুকেরই লাইসেন্স আছে।

মণীন্দ্রবাবু বললেন, "এতগুলি বন্দুক রাখিবার একমাত্র উদ্দেশ্য—জমির ধান পাকিবার সময় বন্যহস্তীরা আসিয়া ধান নষ্ট করে। সেইজন্যই লোক জাগাইতে হয়।..."

তল্লাস-শেষে মণীন্দ্রবাবু ও তাঁর ভায়রাভাইকে নিয়ে সাহেবরা আবার চললেন সাধুবাবার আশ্রমে। সেখানে গিয়ে কি সব পরামর্শ করলেন। তারপর মণীন্দ্রবাবুকে তাঁরা 'বাবু'দের নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

মণীন্দ্রবাবুই যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের নতুন নতুন নামে অভিহিত করেছিলেন। অপ্রত্যাশিত রকমে সেই নামগুলো কাজে লেগে গেল। খাতা বার ক'রে সাহেবরা লিখে নিল পাঁচটি নাম : সাধুবাবা (যতীন্দ্রনাথ), কালিদাস (চিত্তপ্রিয়), যোগানন্দ (মনোরঞ্জন), শম্ভু (নীরেন), আর প্রমথ (জ্যোতীশ পাল) !

'যোগানন্দ' নাম শুনে ডেন্‌হ্যাম মন্তব্য করলেন, "ওহো, এখানেও বুঝি আনন্দমঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ?"

ডেনহ্যামকে কপ্তিপদার বাংলোয় নামিয়ে দিয়ে সাহেবরা বালেশ্বর অভিমুখে রওনা হলেন আরো লোকজন সংগ্রহ করতে। মহুলডিহা ও তার আশেপাশে সর্বত্র সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী টহল দিতে লাগল। সাধুবাবার

সাহেবদের সাহসের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হতে হয়।

আশ্রম ঘিরেই তাদের প্রধান আনাগোনা চলল। একদল সেখানে মোতায়েনও থাকল।

"সাহেবরা চলিয়া গেলে", মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, "আমি বাবুদের ঘরে যাইয়া ভীমা বেহারার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সেদিন ভীমাও তখনো কিছু খাইতে পায় নাই। সে অবশ্য মরণাপন্ন দশা হইতে এখন কতকটা ভাল হইয়াছে। তাহাকে তাহার বাড়িতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। এবং কিছু খাদ্য ও জল দিলাম। সে একটু সুস্থ হইল।...

"অনেকদিন, প্রায় তিন-চারি মাস ভীমা পড়িয়া থাকিয়া বাবুদের দোকান ও চাষবাস ছাড়াও যেন কিছু অন্য ভাব বুঝিয়াছিল। কারণ সে বাবুদের নিকট প্রায়ই রাত্রে এবং কখনো দিনেও অন্য অনেক বাবুকে আসিতে দেখিত। স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে না পারিলেও অন্য সকলের চেয়ে কিছু বেশিই সে জানিত।

"বাবুদের দয়ায় সে মুগ্ধ ছিল। বাবুরাই তাহাকে ঔষধ পথ্য দিয়া আরোগ্যের পথে আনিয়াছেন। সে বাবুদের কাছে কখনও বহু টাকা দেখিয়াছে, পিস্তলও দেখিয়াছে।

"বাবুদের কাছে যে উপকার সে পাইয়াছিল সে-সময়ও সেই কৃতজ্ঞতা সে ভুলে নাই। তাহার কথায় তাহাই বুঝিলাম।...সে ও চাকর দু'টি বুঝিয়াছিল যে, বাবুদের এই যাত্রার মধ্যেও কিছু যেন গুরুত্ব আছে।..."

পাছে লোকের মনে কোন সন্দেহ জাগে, সেইজন্যে যতীন্দ্রনাথ সর্বদাই নিজেকে ও তাঁর সঙ্গীদের ঘোর সংসারীরূপে গ্রামবাসীদের কাছে ফুটিয়ে তুলতেন। দোকান দেওয়া, চাষবাস করা, টাকাকড়ির হিসেব রাখা প্রভৃতির সাহায্যে তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের মনে বিশ্বাস জাগিয়েছিলেন যে, তাঁরা কেউই ভবঘুরে নন। মণীন্দ্রবাবুর ভাষায়, "এই বেচাকেনার কাজে সঙ্গীরা সকলেই অস্বস্তিবোধ করিতেন, কিন্তু লোক-দেখান একটা কাজ চাই। তা না হলে লোকে বলবে ভবঘুরে। ভবঘুরে বিশ্বাস জাগা বড়ই বিপজ্জনক, ইহা তাঁহারা ভালভাবেই জানিতেন। সেইজন্যই এই আবরণ।..."

"...বিপ্লবীরা বিদেশী শাসকদের ভয় দেখাইতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনা অনেকটা সিদ্ধ হইয়াছে।—এইসব কথা ভাবিতে ভাবিতে ভীমাকে তাহার বাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আমি বাড়ি ফিরিলাম," মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন, "কিছু জল খাইয়া আমার ভায়রাভাইকে সঙ্গে লইয়া সাহেবের

হুকুমে পুনরায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কপ্তিপদার বাংলোয় উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গীকে সাবধান হইয়া কথা বলিবার অনেক উপদেশ দিলাম। কারণ সে সব কথায় ভয় পায়। দুর্বল চিত্তের লোক।···

"···প্রথমেই S. D. O. অক্ষয়বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমায় অনুচ্চস্বরে বলিলেন: সরকার তোমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন।

"আমি নিরুত্তর হইয়াই রহিলাম। স্থির হইয়াই প্রথম দণ্ডাজ্ঞা শুনিলাম। ···আমি তখন সকল দণ্ডের বোঝাই বহিতে সক্ষম, মন এমনি অচঞ্চল হইয়াছিল।···"

সারাদিনের উপবাস ও উদ্বেগের পরে রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মণীন্দ্রবাবু সপরিবারে শুয়ে পড়েছেন। সাধুবাবার আশ্রমের চারিধারে ও মণিবাবুর বাড়ি ঘিরেও প্রহরা রয়েছে।

"রাত্রি তখন বারোটা কি সাড়ে বারোটা হইবে," মণিবাবু লিখেছেন, "আমার ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালায় হঠাৎ যেন যতীন ডাকিলেন: দাদা! দাদা!—অবশ্য উচ্চস্বরে নয়।

"আমি ডাক শুনিয়া তাঁহাদের কাছে জানালার ধারে উপস্থিত হইলাম। এবং নিকটস্থ হইয়াই বলিলাম: ভাই, পুলিশ বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে। তোমাদের পাইলেই না জানি কী ঘটিয়া যাইবে এখনি।

"অবশ্য আমার ঘরের দক্ষিণ দিকেই পুকুরের পাড় ও অব্যবহার্য স্থান: সেদিকে পুলিশ ছিল না।

"যতীন অতি সংক্ষেপেই আমাকে প্রশ্ন করিলেন: দাদা, এখানকার খবর কী?

"আমিও সংক্ষেপেই সমস্ত জানাইয়া বলিলাম: সাহেবরা ও পুলিশ বালেশ্বর এবং বারিপদার দিক ঘিরিয়া আছে। তোমরা মেঘাসনি পাহাড়ের দিকে বনপথ ধরিয়া চলিয়া যাও।

"যতীন উদাত্ত-কণ্ঠে বলিলেন: দাদা, পায়ের ধুলা দাও। ভয় কি? আমরা বালেশ্বরের পথেই যাইব। আমরা অরণ্যে কেন যাইব? জনারণ্যেই যাইব।

"তাঁহাদের নিকট কোনও টাকা-পয়সা ছিল না তখন। আমার নিকট

গচ্ছিত অর্থ হইতে দশ টাকার পাঁচখানি নোট দিলাম। পাঁচজনেই···চলিয়া গেল।···পুলিশ সে-কথা জানিতে পারিল না।···তাহাদের ধারণা ছিল বাবুরা আর কখনই এখানে আসিবেন না।···

"আমার হৃদয়ানন্দ ভাইয়েরা আমার নিকট চিরবিদায় লইলেন। সে-বেদনা মনই বুঝিল। আর কেহ বুঝিল না। পথের দুই ধারে দুর্দান্ত শত্রু ইংরেজের চরেরা যেখানে সতর্ক হইয়া টহল দিতেছে, সেই বেষ্টনীর মধ্যে পাঁচটি তরুণ। যেন জীবন আহুতি দিবার জন্যেই প্রবেশ করিল।

"বন্দে মাতরম্!···

"আজ আমার আনন্দমঠ শূন্য হইল!"

৮ই সেপ্টেম্বর। ১৯১৫ সাল। বালেশ্বর।

চারিদিকে কানাঘুষোয় রটে গিয়েছে: বাঙালী ডাকাত এসেছে এ-অঞ্চলে উপদ্রব করতে। সবাই যেন সতর্ক থাকে। ডাকাতদের ধ'রে দিতে পারলে বহু হাজার টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে।

বালেশ্বর স্টেশনের তিন মাইল উত্তরে, জগন্নাথ ট্রাঙ্ক রোডে অবস্থিত বুড়াবালাম নদীর খেয়াঘাট থেকে শুরু করে গোটা এলাকা সশস্ত্র পুলিশে ছেয়ে গিয়েছে। স্টেশনেও সশস্ত্র পুলিশ এবং সাদা পোষাকে গোয়েন্দারা ঘোরাঘুরি করছে।

ভোর-রাত। কাক-পক্ষী জাগে নি তখনো। যতীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন বালেশ্বর স্টেশনে। সঙ্গীরাও ছাড়া-ছাড়াভাবে চলেছেন সঙ্গে।

অপেক্ষমাণ একটা ট্রেন। তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে তাঁরা গাড়িতে উঠে বসলেন।—

গাড়ি ছেড়ে দিল একটু বাদেই।

কিন্তু, যতীন্দ্রনাথের খটকা লাগল: এত বড় ট্রেনের অনুপাতে যাত্রী-সংখ্যা যেন নেহাৎ কম। ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝতে দেরি হল না—এ-ট্রেনের সব যাত্রীই প্রায় ছদ্মবেশী পুলিশ।

যাত্রীদের ক্লান্ত চোখে তখনো ঘুম জড়ানো।

ইঙ্গিতে নির্দেশ ছড়িয়ে দিলেন যতীন্দ্রনাথ: পাঁচজনে অল্পে অল্পে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। টিকিট ছিঁড়ে ফেললেন। স্টেশনের চৌহদ্দি পেরিয়ে গিয়ে তাঁরা রেললাইনের পশ্চিম দিয়ে ধানক্ষেত পার হয়ে শহর ছাড়িয়ে

পাড়ি দিলেন মেঠোপথে।

হরিপুর গ্রাম পার হয়ে সশিষ্য যতীন্দ্রনাথ এগিয়ে চললেন বুড়াবালাম নদীর তীর-বরাবর। অনিদ্রায় অনাহারেও বিপ্লবী মহানায়ক আর তাঁর শিষ্য-চতুষ্টয় এগিয়ে চলেন অকাতরে।

৯ই সেপ্টেম্বর। ১৯১৫ সাল।

ভোরের আলো ফুটতে এখনো অনেক দেরি। পুব-আকাশে জমাট অন্ধকারের বুকে জেগেছে ঈষৎ শুভ্রতার স্পন্দন। পরম প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে আছে উড়িষ্যা। ঘুমিয়ে আছে বাংলা। ঘুমিয়ে আছে আসমুদ্র হিমাচলের জনগণ।...

ঘুমিয়ে আছে যতীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র—ঝিনাইদা। ঘুমিয়ে আছেন সেখানে যতীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী ইন্দুবালা দেবী। আছে তিনটি নাবালক সন্তান: আশালতা, তেজেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ। ঘুমিয়ে আছেন যতীন্দ্র-নাথের মাতৃসমানা সহোদরা, বিনোদবালা দেবী।

বিনোদবালা স্বপ্ন দেখছেন।...

বিনোদবালা দেখছেন: অনন্ত আলোকের পাথার এসে প্লাবিত করে দিচ্ছে জীবনের প্রতিটি কোষ, অণু, পরমাণু। আলোয় আলোয় বিহ্বল বিভামৌন পৃথিবী।...

আলোয় আলোয় নিবিচল আকাশ, দিগন্ত।...

আর—সেই আলোর অকৃপণ উৎসবমুখর দিগন্তে দেখা দিলেন এসে—সমস্ত আলোব কেন্দ্রস্বরূপ জ্যোতির্ময় এক পুরুষ। অঙ্গে তাঁর পীতবাস। নবদূর্বাদলশ্যাম বর্ণ।...

বিনোদবালার অন্তরের অতলে স্পন্দন জাগিয়ে—অন্তস্তলের গহনে গহনে স্নেহের নির্ঝরিণীকে নির্বাধ মুক্তির আনন্দে উদ্বেলিত ক'রে, সেই মূর্তি দাঁড়ালেন এসে বিনোদবালার সামনে।...

কে?...কে তুমি?...কে তুমি জ্যোতির্ময় সুন্দর?...

সমস্ত সত্তা তাঁর থরথর করে কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠল মধুস্রাবী উদাত্ত-কণ্ঠের পরিচিত সম্ভাষণে:

'দিদি!'...

জ্যোতির্ময় পুরুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বিনোদবালার দৃষ্টির ওপর। বিস্মিতা

হন বিনোদবালা দেবী!—একি, এ-যে যতি!…এ-যে জ্যোতি!…এ-যে তাঁরই প্রাণের নিধি যতীন্দ্রনাথ!…

জোড়-করে যতীন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন এসে দিদি বিনোদবালার সামনে। জোড়-করে মিনতি জানালেন জ্যোতির্ময় পুরুষ:

"দিদি! এ জন্মের মতো বিদায় দাও আমায়। শেষবারের মতো তোমাদের দেখতে এলাম!"

শেষবারের মতো? শেষবারের মতো দেখতে এলি?—চকিতা বিনোদবালা দেবী আকুল হয়ে হাত বাড়ান, কোলে টানতে চান স্নেহের ভাইটিকে। তোকে যেতে দিতে হবে? নারে, না, না!…আরো কাছে আয় ভাই! কাছে আয়—

কিন্তু, কই?…

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের মূর্তিতে বিলীন হয়ে যায় যতি। বিলীন হয়ে যান যতীন্দ্রনাথ। বিলীন হয়ে যায় বিনোদবালা দেবীর জীবনের সমস্ত জ্যোতি!…

অন্ধকার।…সূচীভেদ্য নির্মম অন্ধকার।…

ডুকরে কেঁদে ওঠেন বিনোদবালা: নারে, না, তুই যাস্‌নে যাস্‌নে—

ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে বিনোদবালা দেখেন: অঝোর অশ্রুতে ভিজে গিয়েছে বালিশ, ভিজে গিয়েছে বুক, পিঠ, চাদর। আর বিহ্বলা ব্যাকুলা ইন্দুবালা চিত্রার্পিতের মতো এসে বসেছেন পাশে। তাঁরও প্রতীক্ষানত দুই চোখে অনর্গল অশ্রুধারা।…

সংবিৎ ফিরে পান বিনোদবালা; আত্মসম্বরণ করে নেন। কিন্তু ইন্দুবালাকে এড়ানো যায় না। ইন্দুবালা প্রশ্ন করেন, "কী দিদি? কী হয়েছে? অমন করছিলেন কেন?…"

ব্যথার বিক্ষুব্ধ সাগর নিমেষে নিস্পন্দ স্ফটিকের রূপ নেয়। চোখের জল চোখেই থেকে যায়। হাসবার চেষ্টা ক'রে দিদি বলেন, "আরে পাগ্‌লি, আমার কথা আর বলিস কেন? হবে আবার কী? হাতটা বোধহয় বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল, নিশ্বাসের কষ্টে অমনধারা করছিলাম!…"

ইন্দুবালা দিদিকে আর জেরা করেন না। মনে পড়ে যায় পরমারাধ্য স্বামীর পত্রাংশ, "ক্ষণিক দুর্বলতা সকলেরই আসিতে পারে; সেরূপ অবস্থায় দিদিকে সাহায্য করিও ও তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিও।…"

ছেলেদের গায়ের চাদরটা ঠিকমতো করে জড়িয়ে দিয়ে ইন্দুবালা চলে যান দৈনন্দিন গৃহকর্মের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখতে।

আর দিদি—চুপি চুপি চোখের জল ফেলতে ফেলতে উঠে যান কবিতার খাতা হাতে। গিয়ে নির্জন চিলে-কোঠায় খাতা খুলে বসেন।

লেখনীর মুখে বেরিয়ে আসে সুদীর্ঘ কবিতার নির্ঝ'র। লিখতে লিখতে দিদির চোখের জল বাধা মানে না :

(একি) সর্বাপদপার অগণ্য অপার
মুরতির সার মুরতি রে
(জিনি) নীলোৎপলদল প্রভা নিরমল
শ্যামল বরণ ভাতি রে !
(তাহে) ঘোর পীতবাস কোটি চন্দ্রাভাস
নেহারি বদন জ্যোতিরে !
(আজি) কি ছলনা হরি ! বুঝিতে না পারি
কি দিব্য মাধুরী হেরি এ ;
(নাহি) শঙ্খ, চক্র, গদা, করে পদ্ম কোথা,
(হেরি) নারায়ণ-রূপ একি রে ?
(কিবা) মূর্তি করুণার যুক্ত দু'টি কর
(কহে) নয়ন আশারে তিতি' রে :
("দিদি !) জনমের তরে বিদায় দাও মোরে
(আজি) নেহার' প্রাণের জ্যোতি রে !"
(বলি) "আয় ! কোলে আয় !" ধরা নাহি পাই
চকিতে লুকালি কোথা রে ?
(হেরি) একি অপরূপ নারায়ণ রূপ
কেন আজি মোর জ্যোতি রে ?

নিশা শেষে হেরি একি স্বপ্ন চমৎকার
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে জ্যোতি একাকার ?
তবে কি সে মহারত্ন নাই এ-ধরায় ?
প্রাণাধিক ভাই মম সত্য কিরে নাই ?

উঠিল রে কাঁদি প্রাণ স্বপ্ন অবসানে
আর কি সে হারানিধি পাব না জীবনে ?
ভাই সম বন্ধু নাই এ তিন ভুবনে
মণিহারা ফণী আমি সে ভ্রাতৃ-বিহনে।
তোমাহারা দিশাহারা ছুটিয়া বেড়াই
কোথা গেলে পাব তোরে প্রাণাধিক ভাই ?
বীরের জীবনব্রত সাধি' এ ভারতে
জীবনের নশ্বরত্ব দেখায়ে জগতে
সত্য কি অমরধামে গেল চলি' ভাই ?
মায়ামুগ্ধ প্রাণে বল শান্তি কোথা পাই !
একাশ্রয় তুমি মোর সংসার আশ্রমে
কেমনে রহিব হেথা তোমার বিহনে ?
নিশিদিন কাঁদে প্রাণ তব গুণ স্মরি'
কেন ভাই গেলে মোরে একা পরিহরি' ?
আশৈশব সাথী তুমি প্রাণের সোদর !
একসাথে লভিয়াছি মায়ের আদর,
এক মাতৃস্তন্য-সুধা পিয়ে প্রাণ ভরি'
পবিত্র জীবন মোরা এ ধরায় ধরি।
একসাথে ধূলাখেলা করেছি দু'জনে
একসাথে লভি শিক্ষা জননী-সদনে,
একসাথে পিতৃহারা শৈশব-সময়ে,
একসাথে মাতৃশোক লভেছি উভয়ে।
গৃহী করি' তোমা, আনি' গৃহলক্ষ্মী ঘরে
পশিলাম কত সুখে সংসার-আগারে।
গৃহধর্ম একসাথে করেছি সাধন,
নির্লিপ্ত সংসারী তুমি, সাধনার ধন।
মায়ার বাঁধনে কভু বাঁধা না পড়িলে,
বিবেক-বৈরাগ্য সহ সংসার করিলে।
আসক্তিবিহীন শুদ্ধ স্নেহময় প্রাণ,
মমত্ব-স্খলিত চিত্ত উদার মহান !

স্বার্থহীন ভালবাসা পূরিত অন্তর,
আর্তজনে দয়া, দীনহীনে দান আর
জীবনের নিত্য ব্রত পর-উপকার
ছিল যে উন্নত প্রাণে সাধনা তোমার।
অনিত্য সংসার লীলা জানিয়ে অন্তরে,
মুক্তিপথে চলেছ রে নিরন্তর-তরে।
সর্বজয়ী আত্মজয়ী প্রসন্ন-মূরতি
সত্য সরলতা মাখা উদার প্রকৃতি।
সুবিশাল কর্মক্ষেত্রে কর্তব্য সাধিতে,
আশৈশব সিদ্ধহস্ত বিদ্যাশিক্ষা হ'তে,
সুদৃঢ় সঙ্কল্পে ভরা প্রশস্ত হৃদয়
সাহস উদ্যমপূর্ণ সদা কর্মময়,
অসামান্য বল-বীর্য সহ হৃদি-বল
কষ্টসহিষ্ণুতা ধৈর্য্য লভিলে সকল।
শৈশব জীবন হ'তে বিধাতার দয়া,
ভোগস্পৃহাশূন্য প্রাণ, সদানন্দ হিয়া,
পিতৃমাতৃ-সেবা সুখে বঞ্চিত জীবনে,
বিশ্বসেবা-ব্রতে ব্রতী ছিলে প্রাণপণে।
রোগী, শোকী, দুঃখী তরে সদা তব প্রাণ
কাঁদিয়াছে অকাতরে, দেছ সেবা, দান।
যৌবনে আকাঙ্ক্ষা উচ্চ পুষিলে অন্তরে,
আশা না পুরিল তব বিদ্যাশিক্ষা ক'রে।
সতত শিক্ষার্থী তরে সকরুণ প্রাণে
শিক্ষা বিধানিতে অর্থ দানিলে যতনে।
বলিতে উন্নত চিত্তে—"আমার সংসার
ক্ষুদ্র গৃহে নহে শুধু, জগৎ আমার!"
অমিয়-পূরিত সেই সুমধুর কথা,
আর কি শুনিব ভাই, যাবে হৃদি-ব্যথা?
অহর্নিশ বাজে প্রাণে স্মৃতির লহরী,
তোমাহারা সেই গৃহে, রহিনু সংসারী।

মানব-জন্মের সার—ঈশ্বর-সাধনা,
সাধিলে অন্তরে সেই সত্য-উপাসনা,
পুণ্য পবিত্রতা শান্তি সুবিস্তৃত পথে
ভ্রমণ করিলে ভাই লয়ে সাথে সাথে।
ঈশ্বরে নির্ভর সদা, আত্ম-সমর্পণ
শিখালে জীবনে, যাপি' কঠোর জীবন।
দুঃখিনী ভারত-মা'র দুঃখ-বিমোচনে,
কত না করিলে যত্ন অকপট-প্রাণে।
সতত গৌরবে চলি' মৃত্যুর সোপানে
রাখিলে অমর-কীর্তি আত্ম-বিসর্জনে।
উৎসাহ উদ্যম ভরা কী নির্ভীক চিতে
যুঝিলে জীবন ভরি' বিপদের সাথে।
তোমা হেন ভ্রাতৃরত্ন বহু পুণ্য-ফলে
লভেছিনু, ভাগ্যদোষে হারাই অকালে।
অমর বাঞ্ছিত তুমি, (কেন) চিনি নাই ?
সেই অনুতাপে আজি মনস্তাপ পাই।
কর্তব্যের গুরুভার লয়েছি মাথায়
মায়ার নিগড় পরিয়াছি দু' পায়।
তব শোকানল হৃদে জ্বলিছে প্রখর,
ভীষণ পরীক্ষাময় জীবন আমার।
সবলে চলিতে ভাই প্রতি পদে পদে !—
হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে মহা অবসাদে।
তুমি ত জীবনে দিলে উপদেশ কত,
এবে দাও শক্তি : বহি গুরুভার যত।
পরমেশ-প্রিয় তুমি, তাঁর স্নিগ্ধ কোলে
তোমা ধনে আজি তিনি লয়েছেন তুলে।
লও ভাই তাঁর পদে যাচিয়ে করুণা
মোর তরে, দাও বল সহিতে যাতনা।
ইন্দু যে দুখিনী আজি তোমার বিহনে
দাও শান্তিবারি তার নিত্য-দগ্ধ প্রাণে।

অনর্থ সংসার-জ্বালা ভুলি সে জীবনে
পায় যেন চিরন্তন আরাধ্য-রতনে।
চেয়ে মোর জ্যোতিহারা ইন্দু-মুখপানে
শতধা বিদীর্ণ হিয়া ধৈরয না মানে।
তিনটি গচ্ছিত রত্ন সমীপে তাহার :
দিও শক্তি উপযুক্তরূপে পালিবার।
উদাদের মুখ চাহি' কাঁদিলে হৃদয়
উপদেশ-বাণী তব মনে যেন হয়।
"দিদি !
এ-জগতে হা হুতাশ অনেকেই করে,
কর কাজ কর্মক্ষেত্রে বুকে বল ধ'রে,
বিফল রোদনে কাল না করি' ক্ষেপণ,
নিয়ত শ্রীগুরুপদ করিও স্মরণ।
যাঁহার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তাঁহারই ইচ্ছায় যে জন মিলায়
তা থাকে অভাব তার শোক তাপ নাই !"
—আর কি সে-কথা কভু শুনিব না ভাই ?
উন্নত জীবন্মুক্ত যতীন্দ্র আমার !
বারেক দেখাও ওই স্বর্গীয় আকার।
স্বপনে হেরিনু ভাই যে-মুরতি চিন্
সেইরূপে ভাই-রূপ হয়েছ কি লীন ?
মুক্তি হেতু করে নর কঠোর সাধন
আজি করতলে তব সে-অমূল্য ধন।
ধন্য ভাই তুমি মম ধন্য মোর পিতা,
তোমা হেন পুত্রে ধরি' ধন্যা মোর মাতা,
বংশের গৌরব তুমি তব বংশধর
তব কীর্তি স্মরি' ধন্য হবে নিরন্তর ॥*

৯ই সেপ্টেম্বর। ১৯১৫ সাল। ২৩শে ভাদ্র, ১৩২২।

* 'আনন্দবাজার পত্রিকা'—যতীন্দ্রনাথ স্মরণ-সংখ্যা, (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল)—দ্রষ্টব্য ॥

বালেশ্বর।...বুড়াবালাম নদীর তীর। আকাশ মেঘে ঢাকা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে টিপ্ টিপ্ ক'রে!

গোবিন্দপুর গ্রামের কাছাকাছি এসে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যেরা আটকা পড়েছেন। ভাদ্র-শেষের ভরা নদী। মাঝিরা পার ক'রে নিতে নারাজ। বলে: সরকারের হুকুম নেই নদী পার ক'রে দেওয়া।*

কিন্তু ততক্ষণে একটা মাঝির খেয়াল হ'তে সে তার সঙ্গীদের উস্কে দিল: এরাই নিশ্চয় বাঙালী ডাকাত। এদের ধরে দিলে সরকার বহু টাকা দেবে।

গোবিন্দপুরের আধ-মাইলটাক দূরে সানাই সাহু এবং বুরুন্দু মোহান্তি ঘাটে বসে মাছ ধরছিল। সানাই সাহুর ভাই বাবু সাহু বালেশ্বর থেকে বাঙালী ডাকাত আগমনের খবর এনে ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং ফুলারি ঘাটের পুলিশ প্রহরীদের কাছেও সে শুনেছিল—তারা বাঙালী ডাকাত ধরতে এসেছে।

আগন্তুকদের সংখ্যা পাঁচজন এবং মুখে বাংলা ভাষা, পরণে মালকোঁচা-মারা ধুতি, আদুড় গা—সবই সানাই সাহুর মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগাল। তার ওপর বাবুরা যখন বললেন যে, তাঁদের হ্যাভারস্যাক ও জামাকাপড়-গুলোও যদি ডিঙি করে পার করে দেওয়া হয়, তাঁরা নিজেরা সাঁতরেই ওপারে যাবেন। এবং ভাড়া দেবেন—এটুকুর জন্যে অবিশ্বাস্য ভাড়াই—আট আনা!

ততক্ষণে বাবুরা আরো আধ-মাইল দূরে নলপুর ঘাটে গিয়ে একটা নৌকোয় উঠে বসেছেন এবং পনেরো-ষোল বছরের ছোকরা ডুলি মাঝিকে বলছেন নদী পার করে দিতে।

বাঁ দিকের ঘাটে গিয়ে নেমে ডুলি মাঝির পয়সা মিটিয়ে দিয়েই বাবুরা দক্ষিণমুখো পা চালালেন ভগুয়া গ্রামের কাছেই দুর্গম এক জঙ্গল অভিমুখে।

গ্রামবাসীরা হাঁক দিতে দিতে ছুটে এল: বাবুরা জঙ্গলের পথ দিয়ে এলে, নদী পার হয়ে আবার জঙ্গলের দিকে চলেছ কার খোঁজে? তোমাদের পরিচয় চাই।

বাবুরা গ্রামবাসীদের দিকে এগিয়ে গেলেন কিন্তু কিছু বললেন না। সানাই তখন তাঁদের গিয়ে নদীর পাড়-বরাবর যে রাস্তা গিয়েছে, সেই পথে

* পরবর্তী বিবরণগুলি অধিকাংশই সরকারী রিপোর্ট থেকে নেওয়া। T. S. Macpherson (I. C. S.)-এর রায় দ্রষ্টব্য॥

যেতে বলল। বাবুরা খানিক সে-পথ দিয়ে গিয়ে আবার জঙ্গলের পথ ধরছেন দেখে গ্রামবাসীরা আবার তাঁদের 'ভুল' শুধরে দিল।

ইতিমধ্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে বুরুন্দুকে পাঠানো হল থানায় খবর দিতে।

মনোরঞ্জনই ঝুলি কাঁধে আগে আগে চলছিলেন। হাতে তাঁর একটা র‍্যাপার ঝোলানো। গ্রামবাসীদের অত্যাচারে বাবুরা বললেন, তাঁরা রেল লাইনের পথে যাচ্ছেন—'সরকারী লোগ্‌' তাঁরা পঞ্চায়েতের কাজে এসেছেন।

পাড়-বরাবর আরো বেশ-খানিক চলে, বাবুরা বসলেন গিয়ে গাছের তলায় জিরিয়ে নিতে।

এই সুযোগে সানাই গিয়ে তার দাদা বাবু সাহুকে ডেকে আনল। আর বুরুন্দুও ফিরে এল দফাদারের ভাই রঙ্গ রাউতকে নিয়ে।

এরা আসতে গ্রামবাসীদের সাহস বেড়ে গেল। তারা বাবুদের ছেঁকে ধরে তাঁদের পরিচয় চেয়ে উত্যক্ত করতে লাগল। অবশেষে বাবুরা উঠে প'ড়ে নিজেদের পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই গ্রামবাসীরা পথ আগলে রইল।

তাদের জোর করে সরিয়ে দিয়ে বাবুরা যেই এগিয়ে গিয়েছেন, অমনি— "ডাকাত! ডাকাত!" রোলে মুখরিত হয়ে উঠল নিঃঝুম পল্লীর সকাল। দারুণ হট্টগোল।

গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল সে-খবর। হৈ হৈ করে অশিক্ষিত পল্লী-বাসীরা ছুটে আসতে লাগল 'ডাকাত' দেখবার লোভে। বেশি যাদের বাসনা, তারা ততক্ষণে 'ডাকাত'দের পিছু নিয়েছে।

গভীর অনুতাপের সঙ্গে নীরেন বললেন, "দাদা, আমরা যার জন্যে চুরি করতে বেরিয়েছি, তারাই আমাদের চোর বলে চেঁচাচ্ছে? এত পিছিয়ে রয়েছে এ অঞ্চলের লোক?"

যতীন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন। মিষ্টি-কথায় গ্রামবাসীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন, তাঁরা ডাকাত নন। অযথা কেন হল্লা করছে তারা? সরকারী কাজের জন্যে তাঁরা এসেছেন, নিজেদের ইচ্ছেমতো যেদিকে খুশি যাবেন।

দফাদারের ভাই রঙ্গ রাউত চেঁচিয়ে বলল, "ওসব কথা থানায় গিয়ে বলবেন চলুন।"—তার কথায় অশিক্ষিত জনতা হুজুগে মেতে উঠল। পরম উৎসাহে ধাওয়া করে চলল বিপ্লবীদের পিছু পিছু।

বাবুরা এবার পিস্তল বার করতে বাধ্য হলেন। ব'লে উঠলেন, "দেখি তোমরা কি ক'রে আমাদের আগলে রাখ!"

সঙ্গে সঙ্গে ভীত জনতা ছড়িয়ে প'ড়ে পথ ক'রে দিল।

বাবুরা পাড়-বরাবর উত্তরমুখো চললেন।

নিরাপদ ব্যবধান রেখে জনতার মিছিল চেঁচাতে চেঁচাতে চলল বাবুদের পেছনে। গ্রামের পর গ্রাম থেকে মজা দেখতে ছুটে আসতে লাগল লোক। মেয়ে, শিশু, বুড়ো—কেউ বাদ গেল না বুঝি!

কামতানা গ্রামের কাছে এসে চিত্তপ্রিয় চেঁচিয়ে উঠলেন জনতার উদ্দেশ্যে, "আর যদি একটুও এগোও তোমরা, এই দেখ পিস্তল; আমরা গুলী করতে বাধ্য হব! নিজেদের ভাল চাও তো ফিরে যাও এখুনি!"

কিন্তু বাবুরা যে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলী ছুঁড়বেন, জনতা মোটেই তা' আশা করে নি। তার ওপর 'ডাকাত' ধরার নেশা, বহু হাজার টাকার স্বপ্ন! —তাই উত্তরোত্তর ভিড় ঠেলে সাহসী গ্রামবাসীরা অগ্রসর হতে লাগল।

চিত্তপ্রিয়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। রঙ্গ রাউতকে লক্ষ্য করে তিনি দুটো ফাঁকা আওয়াজ করলেন।

আওয়াজে চকিত হয়ে থমকে দাঁড়াল জনতা!

কিন্তু অতিলোভে তখন হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সানাই সাহু আর রঙ্গ রাউত। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে তারা যেই যতীন্দ্রনাথের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, আবার গর্জে উঠল পিস্তল।

"ওরে, বাবুদের কাছে গুলী নেই! মিছিমিছি আওয়াজ করে ভয় দেখাচ্ছে!"—চেঁচিয়ে উঠল সানাই সাহু।

বাবুরা সবে গিয়ে দামুদা গ্রামের কাছেই একটা চালতা গাছের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় রাজু মোহান্তি নামে একটি প্রৌঢ় "ডাকাত ধরলে হাজার হাজার টাকা পাবে", ব'লে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে করতে ছুটে এল।

নতুন উদ্দীপনায় গ্রামবাসীরা ঠেলে আসছে দেখে, যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে কি পরামর্শ করে এবার এগিয়ে এলেন মনোরঞ্জন। গর্জে উঠল তাঁর অগ্নিনালিকা।

রাজু ততক্ষণে যতীন্দ্রনাথকে ধরবার জন্যে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। গুলী লাগল তার পায়ে। পাড়ের পূর্বদিকের ঢালু জমি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল তার দেহটা গ্রামবাসীদের ভিড়ের দিকে।

মুখ থুবড়ে রক্তাক্ত কলেবর রাজুকে পড়তে দেখে তার ভাই মুরলী মোহান্তি আর সাজোয়ান ছোকরা সুদাম গিরি আর্তনাদ করে উঠল, "মেরে ফেললে! পালাও, পালাও!" এবং নিজেরাও উর্ধ্বশ্বাসে রণে ভঙ্গ দিল।

এই সুযোগে, যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, জ্যোতীশ, নরেন, ও মনোরঞ্জন উত্তরমুখো যতটা পারেন এগিয়ে গেলেন ময়ূরভঞ্জ রোডের দিকে।

তখন গ্রামবাসীরা মুমূর্ষু রাজু মোহান্তির চারিপাশে খানিক জটলা করে, একদল রওনা হল বালেশ্বরে খবর দিতে; পথেই তাদের সঙ্গে দেখা হল সাব-ইন্সপেক্টরের। তিনিও বাঙালী 'ডাকাত' ধরবার হুকুম পেয়ে তখন টহল দিচ্ছিলেন। সাব-ইন্সপেক্টর তখন গ্রামবাসীদের পাঠিয়ে দিলেন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছে এবং নিজে রওনা হলেন অকুস্থলের দিকে।

রাজু মোহান্তিকে বেশিক্ষণ ভবযন্ত্রণা সইতে হল না। তার সঙ্গেই আহত সুদাম গিরিকে দেখাশোনা করবার জন্যে দু-একজন গ্রামবাসী অকুস্থলে রইল। বাদবাকি, যথেষ্ট ব্যবধান রেখে বিপ্লবীদের অনুসরণ করতে লাগল।

তাদের মধ্যে থেকে সানাই জানা আগ বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে সাহুপাড়া গ্রামে খবর দিল: 'ডাকাত'রা সেদিকেই আসছেন। লাঠিসোঁটা হাতে গ্রামবাসীরা হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল। দামুদা থেকে ঘুরপথে ছুটতে ছুটতে সশিষ্য যতীন্দ্রনাথ এসে সাহুপাড়া দিয়েই উঠলেন ময়ূরভঞ্জ রোডে।

পথের পাশে একটা করমচা গাছের তলায় বিপ্লবীরা বসে পড়লেন। সাহুপাড়াবাসীরা লাঠিসোঁটা হাতে এগিয়ে এসে তাঁদের ঘিরে ধরে আবার তাঁদের পরিচয় জানতে চেয়ে উত্যক্ত করতেই নীরবে বিপ্লবীরা তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্রে গুলী ভরে নিলেন সকলের চোখের সামনেই। এবং অত্যন্ত ক্লান্তপদে তাঁরা ময়ূরভঞ্জ রোড পার হয়ে বসে পড়লেন গিয়ে একটা তেঁতুল গাছের নিচে।

ইতিমধ্যে সাব-ইন্সপেক্টর চিন্তামণি সাহু তার ইউনিফর্ম ত্যাগ করে এসে উপস্থিত হল ভিড়ের মধ্যে। এবং আরো কয়েকজনকে পাঠাল বালেশ্বরে, সশস্ত্র সৈন্য-বাহিনীর বিলম্ব দেখে।

পরপর তিন-চারদিন খাওয়া নেই, ঘুম নেই, একদণ্ড বিশ্রাম নেই—মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়েছে রোদে, বৃষ্টিতে, কাদায়। খিদেয় তেষ্টায় অবসন্ন সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে যতীন্দ্রনাথ বুঝলেন, সামান্য কিছু পেটে না দিতে পারলে এভাবে আর বেশিক্ষণ চলা সম্ভব হবে না।

কাছেই ছোট একটা গ্রাম। গ্রামের কোণে একটেরে এক মুদির দোকান। সেখান থেকে মাত্র কয়েক আনার চিঁড়া-মুড়কি কিনে, দাম দিলেন এঁরা দশ টাকা। হাতে খুচরো নেই। ভাঙানি গুণে নেবার অবসর নেই। এগিয়ে চললেন তাঁরা।

সামান্য চিঁড়ে-মুড়কির দাম দশ টাকা?…দোকানদার অবাক হয়ে দু'দণ্ড তাকাল। তারপর দূরে দেখতে পেল লাঠিসোঁটা হাতে গ্রামবাসীরা আসছে বাবুদের পথ অনুসরণ করে। মুদির বুঝতে দেরি হল না—এঁরাই সেই 'ডাকাত!'

হৈ চৈ বাধিয়ে দিল মুদি।

খাওয়া মাথায় উঠল। অভুক্ত চিঁড়ে-মুড়কি ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ালেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ। তাঁর দেখাদেখি শিষ্য-চতুষ্টয়। পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে এগিয়ে চললেন তাঁরা।

যে-দেশবাসীর কল্যাণ সাধনায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছেন সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁকেই আজ স্বদেশের এক অখ্যাত পল্লী-অঞ্চলে শিষ্যদের নিয়ে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে; সেই দেশবাসীরাই তাঁকে তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে 'ডাকাত' আখ্যায় অভিহিত ক'রে? অস্ত্র সঙ্গে আছে, অথচ অশিক্ষিত জনতার ওপর সে অস্ত্রের প্রয়োগেও আপত্তি যতীন্দ্রনাথের। আত্মরক্ষার জন্যে একটা-দুটো ফাঁকা আওয়াজ করা হচ্ছে বড়জোর—আর প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে এদের অত্যাচারে!

নীরেনের চোখ ফেটে জল পড়বার উপক্রম। ঈশ্বর, ওরা জানে না কী ওরা করছে! ওদের ক্ষমা কোর!'—উক্তিটি বুঝি তাঁদের চিত্তে বড় ক'রে সহসা ফুটে উঠল বিপ্লবী সাধনার অপ্রত্যাশিত এই অগ্নি-পরীক্ষার দুর্বিষহ যাতনার ক্ষণে!

কোথায় তাঁরা খুঁজছেন পছন্দসই একটা জায়গা যেখান থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের অনাগত বিপ্লবীদের জন্যে রেখে যাবেন অভূতপূর্ব শৌর্যের আদর্শ, দিয়ে যাবেন হার না-মানবার দুর্নিবার সঙ্কল্প—

না, তাঁদেরই ছুটে বেড়াতে হচ্ছে বিদেশী শাসকের ছলে ক্ষেপে-ওঠা দেশবাসীর আক্রমণ থেকে আত্মগোপন করবার জন্যে। দেশবাসীর চোখে

তাঁরা আজ ডাকাত ছাড়া কিছুই নন? ধন্য ইংরেজের ছল, ধন্য ভারতের আত্মবিস্মৃত জাতীয়তাবোধ আর হুজুগপ্রিয়তা।

কিন্তু, শিকল-দেবীর ওই পূজা-বেদীই কি চিরসত্য হ'য়ে খাড়া রইবে? জাতি কি জাগবে না? সত্যের জয় কি সম্ভব হবে না?···

সাহুপাড়ায় অপেক্ষমাণ পুলিশ ও গ্রামবাসীরা এগিয়ে এসে অনবরত ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে বিপ্লবীদের।

"ভয় পেলে চলবে না," যতীন্দ্রনাথ বললেন, "ওদের দঙ্গল ভেঙে এগিয়ে যেতে হবে!"

পুলিশ ও সৈন্যরা ঠিকমতো বুঝে ওঠবার আগেই ছুটতে ছুটতে বিপ্লবীরা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সাব-ইন্সপেক্টর চিন্তামণি সাহু সাদা পোশাক প'রে সজাগ ছিল। সে গিয়ে যেই যতীন্দ্রনাথকে জাপটে ধরল—পলকে প্রলয় ঘটল!

গুলতির আগায় খোলামকুচির মতো সাতহাত দূরে ঠিকরে পড়ল গিয়ে চিন্তামণি। একদম ভূলুণ্ঠিত।

সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবের ওই দুর্দশা দেখে থ' মেরে গেল জনতা। চিন্তামণি কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের খেপিয়ে তুলতে লাগল—তাড়াতাড়ি এঁদের ধরে ফেলতে পারলেই হাজার হাজার টাকা পাওয়া যাবে—

জনতা নতুন উৎসাহে আবার এঁদের দিকে এগিয়ে এল। আবার, বাধ্য হয়ে, গর্জে উঠল বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র।

পথ খানিক পরিষ্কার হল।

একটু এগিয়ে যেতেই, সামনে পড়ল প্রকৃতির বাধা—'অমৃত' নদী: পঞ্চাশ-ষাট গজ চওড়া। অস্ত্রশস্ত্র, কাপড়-চোপড় পুঁটলি করে মাথায় নিয়ে সাঁতরে বিপ্লবীরা পার হয়ে গেলেন নদীটা।

চিন্তামণি এবং তার দুঃসাহসী আট-ন'জন সঙ্গীও সাঁতরে ওপারে গিয়ে পৌঁছল। অন্যান্য গ্রামবাসীরা মাদ্রাজ ট্রাঙ্ক রোড* ধরে দক্ষিণ তীর বরাবর এগিয়ে চলল।

শ্রান্ত অবসন্ন সঙ্গী-চতুষ্টয় নিয়ে ছুটতে ছুটতে যতীন্দ্রনাথ দক্ষিণদিকের ঘুরপথে একটা জলা ধানখেতের কাদা ভেঙে উপস্থিত হলেন চাষাখণ্ড গ্রামের

* বর্তমানে 'যতীন মুখার্জী রোড' নাম হয়েছে।

শেষ সীমায়। সেখানেই, ম'জে যাওয়া 'দেশোয়া-গড়িয়া' পুকুরের ধারে একটি টিলার ওপর উঠে পড়লেন তাঁরা। বহুদূর অবধি চারধারের সমতল ভূমি এখান থেকে তাঁদের চোখে পড়ল। টিলা-ভরতি উইয়ের ঢিপি এবং পুরু কাঁটাগাছের ঝোপ বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পশ্চিম দিকটা চমৎকার সুরক্ষিত। প্রায় আড়াই গজ ঘন হ'য়ে জঙ্গল উঠেছে সেদিকে, বেড়ার মতো!

টিলাটা যতীন্দ্রনাথের পছন্দ হ'ল। সেখানেই তাঁরা ব'সে জিরিয়ে নিতে লাগলেন।

নীরেনের পা আহত। এক নাগাড়ে এতটা হাঁটহাঁটি পরপর ক'দিন ধ'রে করতে হ'য়েছে। আরো দুর্বল হ'য়ে পড়েছে তাঁর পা। হোঁচট খাচ্ছেন পায়ে পায়ে। যতীন্দ্রনাথ তুলে ধরছেন। তবু পা বুঝি আর চলছিল না।

খানিক আগেও নীরেন বলেছেন, চিত্ত, মনোরঞ্জন, তোরা দাদাকে বুঝিয়ে বল্, আমার জন্যে আর দেরি না করে তিনি যেন একাই এগিয়ে যান। দেশের মুখ চেয়ে, স্বাধীনতার সাফল্য চেয়ে দাদা যদি এগিয়ে যেতে পারেন, ভবিষ্যতে তিনি অনেক বড় করে বিপ্লব সংঘটিত করতে পারবেন—"

কথাটা কানে যেতেই সস্নেহে যতীন্দ্রনাথ নীরেনকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, "এক-যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না ভাই, হতে পারে না! আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা একসঙ্গেই লড়াই করব। মরব। মরে দেশের লোককে শিখিয়ে যাব বাঁচবার মত বাঁচতে হয় কি করে। এই মৃত্যুর চেয়ে সফলতর কাম্যতর আর-কোনও সমাপ্তি আমাদের জীবনে হত না রে!"

ওদিকে, গ্রামবাসীদের তরফ থেকে রঙ্গ রাউত ও মুরলী মোহান্তি যখন বালেশ্বর পৌঁছে থানায় গিয়ে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বিশদ খবর দিল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ রাউতকে মোটরে করে নিয়ে গেলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি সাহেবের কাছে। কিলবি তার আগের দিন বালেশ্বর শহরে ফিরে সৈন্য সাজাতে ব্যস্ত ছিলেন।

কিলবি সাহেবের জবান:

"৯ই সেপ্টেম্বর বেলা দুটো নাগাদ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে আমায় জানালেন যে, পাঁচজন বাঙালীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা একটি

গ্রামবাসীকে গুলী করে মেরেছেন এবং একজনকে আহত করে রেখে পালিয়ে যাচ্ছেন।

"তাঁকে আমি সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে অকুস্থলের দিকে যেতে নির্দেশ দিয়ে প্রুফ ডিপার্টমেন্টে গিয়ে নিজে উপস্থিত হলাম। তাঁদের মোটরগাড়িটা ধার নেবার অনুমতি সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি গাড়ির ড্রাইভার অনুপস্থিত। স্টাফ সার্জেণ্ট রাদারফোর্ড গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত দেখে আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম। আমার বাড়ির সামনেও তখন সশস্ত্র পুলিশবাহিনী হাজির হয়ে গিয়েছে। তাদের একটা দলকে আমরা দুই-ঘোড়ায় টানা গাড়ি করে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলাম। এবং কিছু সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে সার্জেণ্ট রাদারফোর্ড আর আমি প্রুফ ডিপার্টমেণ্টের গাড়িতে গিয়ে বসামাত্র গাড়ির চালকও হাজির হয়েছে দেখা গেল।

"তবুও আমি রাদারফোর্ডকেও সঙ্গে নিলাম। আরো অনেক সশস্ত্র পুলিশ সমেত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁর গাড়ি নিয়ে আমাদের অনুসরণ করতে লাগলেন।..."

স্টাফ সার্জেণ্ট রাদারফোর্ডের জবান :

"৯ই সেপ্টেম্বর দুপুরবেলা আমি অফিসে ছিলাম। মেজর ফ্রীথ-এর নির্দেশে আমি প্রুফ ডিপার্টমেণ্টের গাড়ি চালিয়ে মিঃ কিলবিকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যাই। মিঃ কিলবি কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তির খোঁজে বার হচ্ছিলেন। তাঁর বাড়ি পৌঁছে মিঃ কিলবি আমায় বললেন, চট্ করে যতটা পারি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসতে।

"আমি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিয়ে পুলিশ লাইনের দিকে গাড়ি চালালাম।

"ইতিমধ্যে প্রুফ ডিপার্টমেণ্টের চালকও এসে পৌঁছল। আমি মিঃ কিলবিকে বললাম : আমারো যাবার প্রয়োজন হবে কি তা' হলে?—তিনি বললেন : নিশ্চয়ই হবে। যেহেতু আমি সামরিক বিভাগের লোক, আমি জানতে চাইলাম : সঠিক নির্দেশ কি?—উনি বললেন : পাঁচজন সশস্ত্র বিপ্লবীর সন্ধানে চলেছেন তাঁরা; নাজেহাল হবার সমূহ সম্ভাবনাই আছে—আমি জানতে চাইলাম : আমাদের ওপর প্রতিপক্ষ গুলী চালালে আমাদেরও গুলী চালানোর নির্দেশ আছে কী?—এবং তিনি জবাব দিলেন : বিলক্ষণ গুলী চালাবেন ওঁরা যেই গুলী চালাতে শুরু করবেন।

"ফ্রেঞ্চ ডিপার্টমেন্টের গাড়িতে একজন গ্রামবাসীও রইল পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে। আরো সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পেছনে পেছনে আসতে লাগলেন।…"

কিলবি-সাহেবের জবান:

ফুলারিঘাটে পৌঁছে আমরা গাড়ি থেকে সবাই নেমে পড়লাম, নৌকো করে নদী পার হয়ে পাকা রাস্তা (ময়ূরভঞ্জ রোড) দিয়ে রওনা হলাম বারিপদার দিকে।…"

রাদারফোর্ডের জবান:

"ময়ূরভঞ্জ রোড ধরে প্রায় তিন হাজার গজ যাবার পর এক চৌকিদার এসে আমাদের ডানদিকের জঙ্গল দেখিয়ে বলল যে, যাঁদের খোঁজে আমরা এসেছি—এই ধার দিয়ে তাঁরা গিয়েছেন!…

"আমরা তখন ময়ূরভঞ্জ রোড আর ট্রাঙ্ক রোডের চৌমাথা পেরিয়ে শ' দুয়েক গজ মাত্র গিয়েছি। আমি সশস্ত্র পুলিশদের দুইভাগে বিভক্ত করে একটা দল পাঠিয়ে দিলাম সার্জেন্ট রাদারফোর্ডের পরিচালনায় ময়ূরভঞ্জ রোড বরাবর।"—

কিলবি সাহেবের জবান:

"এবং আমি অন্য দলটি নিয়ে," তিনি বলেছেন, "চৌমাথায় ফিরে গিয়ে অন্য পথটা ধরে এগিয়ে চললাম। খানিক গিয়েই সাইকেল আরোহী এক চাপরাশীর সঙ্গে দেখা। তার সাইকেলটা নিয়ে আমি ট্রাঙ্ক রোড ধরে এগিয়ে গেলাম, সশস্ত্র পুলিশদের তাড়াতাড়ি আসতে ব'লে। সঙ্গে আমার রিভলভারটা মাত্র নিলাম। আমার রাইফেল ও সরঞ্জাম পেছনে একজনকে দিয়ে পা চালাতে ব'লে এলাম।

"বাঁ দিক দিয়ে একজন গ্রামবাসী মাঠ ভেঙে আমার দিকে ছুটে আসছে, চোখে পড়ল। লোকটি বলল: ওই, ওইদিকে আছেন ওঁরা!

"আমি বুঝলাম—বিপ্লবীদের কথাই ও বলছে। দূরে খোলা মাঠের মধ্যেও দেখলাম একদল গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে তাদের একটা লম্বা বাঁশ, তার মাথায় কাপড় বাঁধা।

"গ্রামবাসীর সহায়তায়, মাথার ওপর পিস্তলটা তুলে ধরে আমি ট্রাঙ্ক রোডের বাঁ ধারের নালাটা পার হয়ে নিশান-সঙ্কেতকারীদের দিকে পা চালালাম। নালায় এক-বুক জল। আগের ক'দিন কি রকম বৃষ্টি হয়েছিল

মনে নেই, কিন্তু আমরা যেদিন কপ্তিপদা যাই সেদিন সত্যিই দারুণ বৃষ্টি পড়ছিল।

"নিশানধারীরা এগিয়ে এসে বলতে লাগল: এইদিকে, এইদিকে!— ব'লে বিপ্লবীদের বিশ্রামস্থলের দিকে নিয়ে গেল আমাকে। সেদিকে এগিয়ে যেতেই একটা পপ্-পপ্-পপ্ আওয়াজ আমার কানে এল, আর গ্রামবাসীরা ব'লে উঠল: ওই যে, ওইখানে!···

"আর-একটু এগিয়ে যেতেই দেখি মেঠোপথ দিয়ে আমার দলের সশস্ত্র পুলিশেরা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে। যে লোকটার হাতে আমার রাইফেল কার্তুজ ছিল সে এগিয়ে এসে সেগুলো আমায় দিল। আমারটা পয়েন্ট তিনশ' তিন স্পোর্টিং মার্টিনি মেটফোর্ড রাইফেল।···

বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আগের রাতেও দারুণ ঝড়-জল গিয়েছে। এখনো বৃষ্টির বিরাম নেই। অনবরত টিপ্‌টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে।

ঊর্ধ্বপানে—মুখোমুখি যেন ভাগ্য-বিধাতার দিকে চাইলেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ।

আশৈশব যে-বহ্নি জ্বলছে তাঁর অন্তরে—

আশৈশব যে-বহ্নির ইন্ধন জুগিয়েছেন জননী শরৎশশী দেবী, নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে, জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির মাধ্যমে, তাঁর অসামান্য শিক্ষার সাহায্যে, গল্পে, কাহিনীতে, স্নেহে, শাসনে—

যে-বহ্নির ইন্ধন জুগিয়েছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের দুর্ধর্ষ অস্ত্র-বিশারদ ফেরাজ শেখ, বাংলাদেশে যার নাম হয় ফেরাজ মিঞা—তার স্বাধীনতা-প্রিয় মনের উদার অবাধ স্বপ্ন দিয়ে—

যে-বহ্নির ইন্ধন জুগিয়েছেন হিন্দু-মেলার অন্যতম প্রবর্তক, স্বনামধন্য স্বাধীনতাকামী লেখক যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ: তাঁর অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তুলে ধরে, মাৎসিনি, গরিবল্‌দির জীবনী দিয়ে—

যে-বহ্নির ইন্ধন জুগিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর লোকোত্তর বিভূতির বিভায়, তাঁর অবতারতুল্য গুরুদেবের প্রসাদে—

যে-বহ্নির ইন্ধন জুগিয়েছেন বিশ শতকের অধ্যাত্ম-গুরু শ্রীঅরবিন্দ* তাঁর

* বালেশ্বর-যুদ্ধের পরেই শোনা যায়, শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে, বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্র

দেবসুলভ ঋষি-দৃষ্টির স্বচ্ছতায়—

যে-বহ্নির ইন্ধন জুগিয়েছেন শিষ্য-বৎসল শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ, আপন অপরিসীম স্নেহের দীপ্তিতে—

যে-বহ্নির ইন্ধন জুগিয়েছেন মাতৃসমানা সহোদরা বিনোদবালা দেবী আর সাধ্বী সহধর্মিণী ইন্দুবালা দেবী, তাঁদের ত্যাগের তিতিক্ষার মহান ব্রতে অটল একনিষ্ঠ অনুপ্রেরিত থেকে—

যে-বহ্নির পাবক-স্পর্শে স্বদেশের মঙ্গলের জন্যে আপন আপন জীবন বলির মতো উৎসর্গ ক'রে এগিয়ে এসেছেন বাংলার তথা সারা ভারতের শত-সহস্র সন্তান, দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী—

যে-বহ্নির পাগল-করা সম্মোহনী শক্তির কঠোর আদরে শত শত প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন, চারু বসু, বীরেন দত্তগুপ্ত, কর্তার সিং, পিংলে অন্তরের গভীরতম আস্পৃহা নিয়ে উঠেছেন গিয়ে ফাঁসীর মঞ্চে, নয়তো নিজের বুকেই ঢেলে দিয়েছেন মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের গরল-দীপন—

যে-বহ্নির তীব্র অনুভবে ব্যাকুলা হয়ে উঠেছিলেন ভক্তজননী শ্রীশ্রীসারদা মাতা—

সেই বহ্নির মূর্তপ্রতীক যুগপুরুষ যতীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত তপস্যাবল একাগ্র উৎশিখ ক'রে তুললেন আকাশচুম্বী এষণার হোমানলে।···

এই হোমানলের রুদ্র লেলিহানে তিনি পুড়িয়ে দিয়ে যাবেন বিরাট এই জাতির বহুশতাব্দী অর্জিত দাসত্বের শৃঙ্খল, পুড়িয়ে দিয়ে যাবেন অজ্ঞান অসত্য আর অবিচারের সব অভিশাপ।

তা-ই হবে তাঁর পূর্ণ আহুতি।···

বিমল বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে আবার জননী ভারতবর্ষের কোটি কোটি সন্তানের চিত্ত। বিমল বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে ভারতের আকাশ বাতাস মাটি জল। বিমল বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে আবার আর্য-সন্তানদের প্রতিটি রক্তকণা।

আবার ভারতের জনপদে, তীর্থে তীর্থে ঘরে ঘরে জাগবে পবিত্র সাম-মন্ত্রের গীতধ্বনি, স্বাধীন ভারত ফিরে পাবে তার জ্ঞান, তার ঐতিহ্যগত মর্যাদা, তার তপশ্চর্যা, তার দেব-কেন্দ্রিক সমাজের ছন্দ। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সনাতন অধ্যাত্মজ্ঞানের সমাবেশে নতুন প্রগতির সূচনা হবে।

ভারত ফিরে পাবে অমৃতত্বের অধিকার। বিশ্ব-মানবতাকে দীক্ষিত

থেকে তিনি তাঁর grace withdraw ক'রে নিয়েছেন॥

করবে ভারত অন্তর্মুখী অভিযানের ব্রতে।

একই খাতে প্রবাহিত হবে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের জ্ঞান ও বীর্য, শান্তি ও শৌর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তির স্রোতধারা।

দার্শনিক যতীন্দ্রনাথের একটি রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তিতে, "বন্ধন মুক্তির আদর্শই বাঙালী মনে একটি প্রধান বিশেষত্ব। এই ঔদার্যবোধের ধারা রামমোহন হইতে শুরু করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন পাল প্রমুখ মনীষীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বাংলার এই সমন্বয়ী মুক্তি চেতনারই উত্তরসাধক।*

কিলবির জবান :

"আমার রাইফেলটা নিয়ে আমি জঙ্গলের দিকে বিপ্লবীদের লক্ষ্য ক'রে একটা গুলী চালালাম। অর্থাৎ ওঁদের সতর্ক ক'রে দিলাম যে, আমাদের হাতে দূরপাল্লার একটা রাইফেলও আছে, কাজেই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে যাওয়া ওঁদের পক্ষে হিতকর হবে না বিশেষ।

"আমি তখন ওঁদের জঙ্গলটা থেকে শ'চারেক গজ দূরে। ওঁরা প্রত্যুত্তর দিলেন না। আমি আরো শ'খানেক গজ এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে চলল পুলিশবাহিনী ও গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের আমি তফাৎ যেতে ব'লে ব'সে পড়লাম।

"খানিক বাদে দেখতে পেলাম, পুলিশবাহিনী সমভিব্যাহারে সার্জেণ্ট রাদারফোর্ড ধানখেত ভেঙে পশ্চিমদিক থেকে আসছেন। ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখলাম, ওঁরা সকলেই ভীষণরকম হাঁপাচ্ছেন। ওঁরা এসে পৌছলেন অবশেষে।..."

সার্জেণ্ট রাদারফোর্ডের জবান :

"আমরা রওনা হবার সময়েই স্থির করেছিলাম যে, যে-দল আগে গিয়ে পৌছবে, অন্য-দলটির জন্যে অপেক্ষা করবে। মিঃ কিলবির দলই প্রথম পৌছল। আমরা পৌছে দেখি সদলবলে কিলবি সাহেব ধানের খেতে শুয়ে আছেন উপুড় হয়ে।

"আমি জানতে চাইলাম : বিপ্লবীদের দেখা পাওয়া গিয়েছে কিনা।—

* 'যুগান্তর' : ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮।

উনি বললেন : না। সেইসঙ্গেই আরো বললেন যে, আমাদের ঠিক সামনেই ডানদিকের ওই জঙ্গলটাতে ওঁরা আত্মগোপন ক'রে আছেন।

"মিঃ কিলবি আমায় জিজ্ঞেস করলেন : কী করা কর্তব্য ? আমি পরামর্শ দিলাম, গুলী চালাতে চালাতে এগিয়ে গিয়ে চারধার থেকে প্রতিপক্ষকে ঘিরে ফেলতে।

"আলোচ্য জঙ্গল থেকে আমরা তখন শ'তিনেক গজ দূরে, (একটা মানচিত্র দেখিয়ে) এই পুকুরটার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, এইখানে। আমরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আরো পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেলাম।...আমি একদম ডানদিকে রইলাম। বাঁদিকে রইলেন মিঃ কিলবি ; তাঁর বাঁদিকে আরো কিছু সশস্ত্র পুলিশ। এবং মাঝখানে অন্যান্য সশস্ত্রবাহিনী।..."

গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ট্রেঞ্চ থেকে গুলী চালানো। সে-ট্রেঞ্চ কোনও ক্ষেত্রে মানুষই খুঁড়ে তৈরি করে নেয় ; কোনও ক্ষেত্রে আবার প্রকৃতির খেয়ালে এমন আবরণ সৃষ্টি হয় যে, তার আড়ালে থেকেই ট্রেঞ্চের সমস্ত সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

বেছে বেছে যে-টিলাটার ওপর মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ সশিষ্য এসে উঠেছিলেন, সেটির ওপর এক-মানুষ উঁচু উঁচু চার-পাঁচটা উইঢিপি ছাড়া ছাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; ঢিপিগুলো ঘিরে ঘন কাঁটাঝোপ—আগেই বলেছি। বিধিদত্ত ট্রেঞ্চের আড়ালে ব'সে অস্ত্র তৈরি রাখলেন যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্য-চতুষ্টয়।

টিলার পেছনেই প্রায় ম'জে যাওয়া 'দেশোয়া' পুকুর। সেদিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম।

দূরবীন দিয়ে চিত্তপ্রিয় দেখলেন :

একদিকে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি সাহেবের নেতৃত্বে প্রথম এসে পৌঁছল সশস্ত্র এক পুলিশবাহিনী। তাদের মোটামুটি রকম সাজিয়ে নিয়ে কিলবি সাহেব তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করলেন।

অন্যদিকে—সার্জেন্ট রাদারফোর্ডের নেতৃত্বে আরেক বাহিনী সশস্ত্র পুলিশ। কয়েকজন গ্রামবাসী তাদেরও পথ দেখিয়ে আনছে।

যতীন্দ্রনাথের সঙ্কেতের অপেক্ষায় অস্ত্র হাতে নিয়ে দু'জন তৈরি থাকলেন। অন্য দু'জন 'মাউজার' পিস্তলের ক্লিপ থেকে কার্তুজ সাজিয়ে এগিয়ে দেবার

জন্মে প্রস্তুত রইলেন।

কিলবি সাহেব তাঁর দূর-পাল্লার রাইফেল চালিয়েও প্রতিপক্ষের কোন জবাব না পেয়ে ভেবেছিলেন হয়তো এঁদের হাতে দূর-পাল্লার অস্ত্র নেই।

পুরোভাগে দেশী সৈন্যদের রেখে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা একটু যেন গা বাঁচিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

সব্যসাচী যতীন্দ্রনাথ—দুই হাতেই নিপুণভাবে গুলী চালাতে সক্ষম তিনি। অব্যর্থ লক্ষ্য তাঁর।

প্রায় আড়াইশ' গজ দূরে এসে পড়ল শত্রুসৈন্য। অমনি টিলার বুক চিরে ধ্বনিত হল শার্দুলকণ্ঠের প্রশান্ত নির্দেশ—'FIRE!'

নিমেষে গর্জে উঠল অমিত শক্তিসম্পন্ন মাউজার পিস্তল : কট্‌কট্‌… কটাকট্‌…কটাকট্‌!…

এমন আচমকা আক্রমণে রাদারফোর্ডের সৈন্যবাহিনী তার সেনাপতি-সমেত রীতিমতো পিছু হঠতে বাধ্য হল। এবং ধানখেতের প্যাচপেচে কাদায় লুটিয়ে পড়ল তাদের কয়েকটি নিষ্প্রাণ দেহ।

রাদারফোর্ডের সৈন্যবাহিনীর দুর্গতি দেখে কিলবি সাহেবের সৈন্যরাও রাদারফোর্ডের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী শুয়ে পড়ল কাদা-মাটিতে, চাষের জমিতে; এমন সঙ্গীন অবস্থায় গুলী চালাবে কি? মাথা তোলাই যে দায়!

কিলবির ভাষায় :

"It was full day light when they fired on us. We lay down. They fired a considerable number of shots—firing sporadically. I heard the shots passing by us. We then crawled forward. They continued firing at us as we did so. I gave orders to fire, and my party returned their fire."

তারপর কিলবি সাহেব বলছেন :

"As to the place whence the firing against us came, I could not see the persons firing. All I could see were four bushes which appeared in a line, and the firing obviously came from behind..."

এরই সঙ্গে শোনাই সার্জেন্ট রাদারফোর্ডের ভাষার একটু নমুনা :

"...Meantime, in order to get a view of the men behind

the bush, I had circled round to the right. I lay down on one of the pathways on a ridge between two fields and the men behind the bushes opened fire on me forthwith. A good many shots whistled past me and the coolie who was with me. This is that spot where I lay down (marked Q on the map Exhibit No. 2). I got up and went 50 yards further to the right to a spot where cover was better, and where I hoped for a better view of the men. There I again lay down, and there I was again fired upon. Thinking that my white topi was attracting fire, I took it off and placed it as far away to the right as I could, and I wriggled forward on the path for 20 or 30 yards until I thought the cover was good behind a large suft of grass. Occasional shots still came in my direction. *I took breath there for a few minutes.*···Presently a man got up and fired in my direction, and I returned his fire, but my shot fell short, striking in the mud 5 or 6 yards short···

"···One did not hear the sound of much firing—you don't with pistol-shooting as there is a very small report, unless the bullet whistles past yourself. The shooting I heard before I came up was not in all possibility fired by a mauser pistol but by a rifle. The sound of a pistol carries perhaps 50 yards.···"

যুদ্ধ যখন শুরু হয়, সূর্য মাঝ-আকাশের চৌহদ্দি পেরিয়ে গিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়। গুলী চালাতে চালাতে বিপ্লবীরা দেখেন—পুঞ্জীভূত মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য হেলে পড়েছে অস্তাচল অভিমুখে। জঙ্গলে, মাঠে মাঠে, কাছে, দূরে, সর্বত্র—অল্পে অল্পে সন্ধ্যার ম্লান আভা ছড়িয়ে পড়ছে।

সরকার-পক্ষের একটা গুলী বিঁধে যতীন্দ্রনাথের দক্ষিণ বাহু দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। শিথিল হয়ে গিয়েছে মুঠো। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বাঁ হাতে তিনি অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। অপ্রতিহত রেখেছেন অগ্নি-

উদ্‌গীরণ।…

বিস্মিতচিত্তে সরকার-পক্ষের নেতারা ভাবেন: একী হল? কোথায় যেন হিসেব মিলছে না! এমন পরাজয় তো আশা করা যায় নি!…"কোনও স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে যতীন্দ্রনাথ যদি জন্ম নিতেন, অদ্বিতীয় রণ-দক্ষতার জন্যে, নিপুণ নেতৃত্বের জন্যে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকতেন তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে!"—কিলবি সাহেব মন্তব্য করলেন।…

বুড়াবালাম নদীর তীরের এই অসম সংগ্রাম বিশ্ব ইতিহাসেরই এক অশ্রুতপূর্ব অধ্যায় বুঝি রচনা করতে চলল।…

রাদারফোর্ডের একটা গুলী চিত্তপ্রিয়ের মাথা ঘেঁষে চ'লে গেল। সেটা এড়িয়ে তিনি আবার অস্ত্র তুলে ধরা-মাত্র অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিপক্ষের সার্জেন্ট আবার গুলী চালালেন।

"দাদা!" ব'লে লুটিয়ে পড়লেন তরুণ বীর চিত্তপ্রিয়। যতীন্দ্রনাথেরও তলপেটে বুলেট লাগল। সস্নেহে তিনি কোলে তুলে নিলেন মহান বিপ্লবী চিত্তপ্রিয়ের মাথা।

সেই অভয় আশ্রয়ে পরম নিশ্চিন্তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে চিত্তপ্রিয় চলে গেলেন বীরোচিত স্বর্গধামের উচ্চতম শিখর-লোকে।

পশ্চিম আকাশে তখন জমাট রক্তের রং।…

নিষ্প্রাণ চিত্তপ্রিয়ের দেহ কোলে নিয়ে বাঁ হাতে যতীন্দ্রনাথ গুলী চালিয়ে চললেন নির্বিচলচিত্তে। জ্যোতিশ পাল গুলী ভ'রে ঠিক এগিয়ে দিতে দিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। পালা ক'রে অবশিষ্ট দু'জনেও গুলী চালাচ্ছেন।

পঞ্চপাণ্ডবের একজন চলে গেলেন। বীরের উচিত প্রতিশোধ নিতেই বুঝি তৎপর হলেন যতীন্দ্রনাথ।

"…যতীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় হৃৎপিণ্ড চিত্তপ্রিয়ের নিষ্প্রাণ দেহ এ-ভাবে যদি অন্য-কোনও অবস্থায় তাঁর কোলে এসে পড়ত, তা' হ'লে হয়তো পুত্র-শোকাতুর অন্ধমুনির মতোই তিনি অধীর হ'য়ে কেঁদে উঠতেন," জনৈক বিপ্লবী লিখেছেন। "কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যে শোকেরও অবকাশ নেই।"

জ্যোতিশ পাল ব'লে উঠলেন, "দাদা, টোটা তো প্রায় শেষ!"

"না, না!" যতীন্দ্রনাথ পুরু চামড়ার একটা থলি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটায় এখনো প্রচুর রসদ আছে। এ-যাত্রায় আমাদের বোধহয় ঠেকাতে

পারল না ওরা! দেখ্, কী হয়!…”

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চামড়ার থলির চাবিটা পাওয়া গেল না কোথাও।…

একি দুর্দৈব?

থলির চামড়া অতি শক্ত। তেমনি পুরু।

ওদিকে দিনের বিষণ্ণ আলো স্তিমিত হ'য়ে গিয়েছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কোলে রক্তাক্ত পশ্চিম দিগন্ত ধারণ করেছে ভয়াল সুন্দর রূপ। যেন কালো রূপশিখা মহাকালীর চিরতিমিরাবৃত বয়ানে ঝলসে উঠেছে লোলুপ শোণিতাপ্লুত জিহ্বা: বলি চাই! বলি চাই!—

মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার।…

কার্তুজ-ভর্তি চামড়ার থলি খুলতে চেষ্টা করবার আগেই আরেকটা গুলী এসে গুঁড়িয়ে দিল যতীন্দ্রনাথের বাঁ হাতের আঙুল। অস্ত্র খ'সে পড়ল।—

“গুলী থামাস্‌নে, থামালে চলবে না!” ব'লে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ, “নিভে যাবার আগে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠা চাই। তোরাও চালা।…”

শিথিল ডানহাতে আবার কোনমতে অস্ত্র তুলে ধরলেন তিনি।

উপর্যুপরি গুলী বর্ষিত হ'তে লাগল। রক্তে ভেসে যেতে লাগল যতীন্দ্রনাথের সারা গা: সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অমৃত-দুর্লভ শোণিতধারায়, সাধক-বিপ্লবীর অমূল্য পবিত্র রুধিরে তীর্থস্থানের পর্যায়ে উন্নীত হ'য়ে গেল চাষাখণ্ডের মাটি।…

যতীন্দ্রনাথ তবু অস্ত্রত্যাগ করলেন না।

জ্যোতিশ পালেরও বুকের ডানদিক ফুঁড়ে একটা বুলেট চ'লে গেল। তাঁর সর্বাঙ্গও রক্তাপ্লুত। রক্তাপ্লুত নীরেন। রক্তাপ্লুত মনোরঞ্জন। সারা গা তাঁদের ক্ষত-বিক্ষত।

অসহ্য এই নির্মমতা, অসহ্য এই দৃশ্য!

মনোরঞ্জন অস্ত্রত্যাগ ক'রে ছুটে গেলেন, আঁজলা ভ'রে জল এনে ঢেলে দিতে লাগলেন মহানায়কের মুখে চোখে। জ্যোতিশকেও শুশ্রূষা করতে লাগলেন নীরেন ও মনোরঞ্জন।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে সমস্ত পৃথিবীতে।…

“নীরেন! মনোরঞ্জন!” যতীন্দ্রনাথ ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলেন, “তোরা রইলি। ওরে, তোরা মরবার আগে দেশবাসীকে মুক্তকণ্ঠে ব'লে যাস—আমরা ডাকাত

নই! দেশবাসীকে জানিয়ে যাস আমাদের মহান ব্রতের কথা। নতুন যুগের কর্মীরা এই দৃষ্টান্ত থেকেই খুঁজে পাবে তাদের পাথেয়: দেশ জাগবে, এগিয়ে যাবে আমাদেরই পথে!...”

রাদারফোর্ডের জবান:

“Almost immediately after the water-carrier came out, two men came out from behind the bush direct in my line facing me unarmed. They called out in perfect English: *Don't fire, Sir, we surrender*! Then I got up, advanced towards them, and told them to put up their hands, and come along to me...”

কিলবির জবান:

“There was interchange of shots for some time. I fired some shots but never saw our opponents at all. Suddenly while I was looking the other way to give orders to a constable, I heard a noise, probably a shout from Sergeant Rutherford, and looking forward I saw two men outside the bushes quite below the embankment of the tank, who were standing and holding up their hands. Then I jumped up and shouted: *Cease fire*!

“I then went forward as fast as I could, and shouted out to Sergeant Rutherford who was approaching from a different side, and was nearer to our opponents than I was: *Look out, there are three more*!

রাদারফোর্ড, কিলবি এবং বিদেশী শাসকের সৈন্য-বাহিনীর অন্যান্য সকলেই শ্রদ্ধাভরে এগিয়ে গিয়ে ঘিরে দাঁড়ালেন নবভারতের পঞ্চপাণ্ডবকে।

রাদারফোর্ডের জবান: “ইতিমধ্যে পুলিশেরাও এসে গিয়েছে দেখে আমি তাদের হাতে বন্দী দু'জনকে (নীরেন ও মনোরঞ্জনকে) সমর্পণ করলাম। তারপর সতর্কভাবে রাইফেল উঁচিয়ে ঝোপগুলোর কাছে গিয়ে অন্য তিনজনকে দেখতে পেলাম। একজনের নিষ্প্রাণ দেহ একটা ঝোপের

গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা; আহত একজন চিৎ হ'য়ে পড়ে আছেন; মৃতের দিকে তাঁর পা; ঝোপটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে শুয়ে আছেন তিনি। তিনি মোটামুটি নড়াচড়া করতে সক্ষম দেখলাম। অন্যজন আহত অবস্থায় কাত হ'য়ে দ্বিতীয়জনের কাছেই শুয়ে।

"এই রিভলবারটি এবং এই তিনটি পিস্তল তৃতীয় ব্যক্তির প্রায় গজ দেড়েক দূরে বেশ কিছু কার্তুজ ও বারুদের সঙ্গে ডাঁই ক'রে রাখা ছিল।...দুটি পিস্তলের সঙ্গে স্টিক লাগানোই ছিল; এই পিস্তলটির স্টিক ভেঙে গিয়েছিল।

"মিঃ কিলবি আসতে আসতে আমি পরীক্ষা ক'রে দেখছিলাম—অস্ত্রগুলি সব লোড করাই আছে কিনা। Exhibit II (a) to (c) পিস্তল তিনটির গুলী একহাজার গজ দূর পর্যন্ত যায়। তাদের একটি, বিশেষ ক'রে আমি দেখলাম, পাঁচশ' গজ দূরের পাল্লায় নিয়ন্ত্রিত করা ছিল। কথাটা আমার এত স্পষ্ট মনে থাকার কারণ, আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলাম অস্ত্রগুলির মারাত্মক তেজ লক্ষ্য ক'রে।

"চারটি অস্ত্রেই গুলী ভরা ছিল। বন্দী-দু'জনের একজন আমায় সাবধান ক'রে দিয়ে বললেন: ওগুলো লোড্ করা আছে, হুঁসিয়ার!—

"গুলী বের ক'রে নেবার কায়দাটা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছিলাম না। তখন পূর্বোক্ত বন্দীটি বললেন: দিন, স্যার, দেখিয়ে দিচ্ছি!—

"আমি তাঁকে এই অস্ত্রটা দিলাম! তিনি সেটা থেকে কার্তুজগুলো বের করে রাখলেন। আরও একটা অস্ত্র তিনি 'আন্‌লোড্' ক'রে দেবার পর অন্যদুটো আমিই করতে পারলাম।

"অন্য বন্দীটি তখন আহত দু'জনের শুশ্রূষার ব্যবস্থায় রত ছিলেন।

"আমি বন্দুক সম্বন্ধে খুব তেমন পারদর্শী না হ'লেও বলতে পারি যে, এই অস্ত্রগুলি অন্তত পাঁচ বছর যাবৎ ব্যবহার করা হচ্ছে। অবশ্য ইতিপূর্বে আমি কক্ষণো এমন জটিল ধরনের অটোমেটিক পিস্তল বা রিভলভার দেখিনি সেকথা স্বীকার করছি," বলে আদালতে রাদারফোর্ড মাউজার-পিস্তলে গুলী ভরবার কৌশল প্রদর্শন করেন Exhibit No. III অস্ত্রটি নিয়ে।*

"তারপর দীর্ঘ জবানের উপান্তে রাদারফোর্ড বলেন, "কুলি সংগ্রহ ক'রে আনতে যাবার সময় পর্যন্ত accused 1 (নীরেন) এবং 2 (মনোরঞ্জন)-

* এই জবান তিনি ১৯১৫ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে দেন—নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিশের মামলার সময়ে।

এর হাত বাঁধা হয়নি ; তাঁরা আহত দুজনের দেখাশুনো করছিলেন।...না, একথা সত্যি নয় যে যতীন্দ্রনাথকে আমিই প্রথম জল এনে দিই। আমার কাছে তিনি জল চান। কিন্তু আমার মাথায় টুপি না থাকায় মিঃ কিলবি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর টুপি ক'রে জল নিয়ে আসেন। আমি তখন যতীন্দ্রনাথের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে ব্যস্ত ছিলাম।..."

যতীন্দ্রনাথের কথামতো রাদারফোর্ড নীরেন আর মনোরঞ্জনকে যতীন্দ্রনাথের পাশে এসে বসবার অনুমতি দিলেন। মনোরঞ্জন সাগ্রহে যতীন্দ্রনাথের মাথাটা কোলে নিয়ে বসলেন। আর নীরেন নিলেন জ্যোতিশ পালের ভার। ইতিমধ্যে মিঃ কিলবি হন্তদন্ত হ'য়ে ফিরে এলেন চাপরাসীদের কি হুকুম দিয়ে।

যতীন্দ্রনাথ তৃষ্ণার্ত শুনে, তিনি বলছেন,

"The first thing I did was to fetch some water in my hat from the *jhil* nearby for the wounded, I gave it to them and they drank it."*

তারপর, মিঃ কিলবি বলছেন, 'আমি গ্রামবাসীদের ডেকে বললাম তিনটে খাটিয়া নিয়ে আসতে। আহত দু'জনকে এবং নিহত চিত্তপ্রিয়কে তার ওপর শুইয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামবাসীরা কেউই আমাদের কথা কানে তুলছে না দেখে একদল পুলিশ নিয়ে আমিই রওনা হলাম এবং মাইল-খানেক দূর থেকে তিনটে খাটিয়া নিয়ে ফিরে এলাম।

"চিত্তপ্রিয়ের দেহ এবং আহত-দু'জনকেও খাটিয়ায় শুইয়ে আমরা বালেশ্বর অভিমুখে রওনা হ'তে প্রস্তুত হলাম।..."

ইতিমধ্যে হেড্-কনস্টেবল এসে যতীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মনোরঞ্জন তাকে জিজ্ঞেস করলেন : "তোমার জাত কি ভাই ?"

---

* এই রিপোর্টগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে সাহেবদের এই আন্তরিক ব্যবহারের অমর্যাদা যতীন্দ্রনাথ করেন নি। তাঁরা বীরের জাত ; বীরের শোচনীয় দুরবস্থা তাঁদেরই হাতে ঘটতে দেখে বিচলিত হ'য়ে কিলবি সাহেব জল এনে দিলে সে-জল যতীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করেন ব'লে যে জনশ্রুতি, সেটিও যতীন্দ্রনাথের উদার মহান চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। এটিই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ ব্যক্তিগতভাবে কাউকেই তো ঘৃণা করতেন না তিনি। তিনি চেয়েছিলেন বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র গঠন করতে।

"শিখ !"—সে জবাব দিল।

তাই শুনে যতীন্দ্রনাথ তাকে বললেন : "তা' হ'লে তুমি তো আমার ভাই ! বালেশ্বর যাবার সময় তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারবে না ?"

"মাথায় ক'রে যদি হয়, তা-ও আপনাকে নিয়ে যাব, বাবু। আমি কথা দিচ্ছি।" শিখটি জবাব দেয় অকপট উৎসাহের সঙ্গে।

সেইসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ তাকে বলে দিলেন যে, বালেশ্বর স্টেশনের কাছেই একটা পুকুরের ধারের একটা বিশেষ গাছের নিচে, মাটিতে একটা খোঁড়লের মধ্যে দরকারি একটা খাম তিনি রেখে এসেছেন। সেটা কোনমতে সে যেন তাঁদের কাছে পৌঁছে দেয় অথবা ডাকে ফেলে দেয়।

সেদিন রাতেই এবং পরদিন সকালেও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে গিয়ে হেড্-কনস্টেবলটি সেই খামের সন্ধান করে। কিন্তু সেটা খুঁজে পায় না। কারণ তার আগেই সেটা খুঁজে পেয়ে গ্রামবাসীরা পুলিশের কাছে সঁপে দেয়।*

ইতিমধ্যে কিলবি সাহেব এসে চিত্তপ্রিয়ের দেহটা একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। রাদারফোর্ড তাঁর সহায়তা করলেন। দেখলেন ফার্স্ট'-এড্ কি রকম কাজ দিচ্ছে।

সমস্ত দিন আকাশ মেঘাবৃত ছিল। বৃষ্টিও পড়ছে থেকে থেকে। সন্ধ্যের সমাগমে শুরু হ'ল তুমুল দুর্যোগ। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল।...

অশ্বারোহী দূত মারফৎ বালেশ্বর গভর্নমেণ্ট হাসপাতালে কিলবি ব'লে পাঠালেন—কয়েকজন আহতকে ভর্তি এবং চিকিৎসা করবার জন্যে ডাক্তারেরা যেন সহযোগী সমেত প্রস্তুত থাকেন।

আহত যতীন্দ্রনাথের গায়ে জল পড়ছে দেখে নিজের গায়ের কোট খুলে নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি সাহেব ভাল ক'রে যতীন্দ্রনাথের সারা গায়ে সেটা জড়িয়ে দিলেন।

যতীন্দ্রনাথ মিঃ কিলবির কাছে কথাপ্রসঙ্গে বললেন,

"See that no injustice is done to these boys under the British Raj. Whatever has happened, I am responsible—"

মিঃ কিলবি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, উপরোক্ত কথাকটিই—

* এই খামের মধ্যে পাওয়া লেখাগুলিই সেদিন ঝড় তুলেছিল বৃটিশ শাসকদের খাসমহলে। তার উল্লেখ আগেই করেছি॥

'Were the exact words of Jotin. That was in English.'

অত যন্ত্রণার মধ্যেও যতীন্দ্রনাথের বা তাঁর শিষ্যদের মুখ থেকে কষ্টের সামান্যতম অভিব্যক্তি না দেখে বিস্মিত হলেন সাহেবরা।

রাত এগারোটা নাগাদ—

বিপুল শোভাযাত্রা এসে হাজির হল বালেশ্বর গভর্নমেণ্ট হাসপাতালের সামনে। অগণ্য সশস্ত্র পুলিশ, অশ্বারোহী আর মিলিটারি প্রহরায় হাসপাতালের বারান্দায় এনে তিনটি খাটিয়া নামানো হল।

পুলিশ ব্যূহ রচনা করে দাঁড়াল। পুলিশের বড়-সাহেবের হুকুম ব্যতীত কারোরই হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে প্রবেশের অধিকার নেই বলে ঘোষণা করা হল জনসাধারণ্যে।

সশস্ত্র প্রহরীর পেছন পেছন ঢুকলেন প্রবীণ বিজ্ঞ সার্জন ডাঃ খান বাহাদুর রহমান, আর সহকারী সার্জন গাঙ্গুলি। সঙ্গে একজন লেডি ডাক্তার, দু'জন কম্পাউণ্ডার, চারজন অভিজ্ঞা নার্স, তিনজন কুলি ও দু'জন মেথর।

ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন: যতীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বাঙ্গ অবারিত। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ও দুটি মেটাকার্পাল অস্থি গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। তলপেট ও নাভির ধারেই বুলেটের ক্ষত। টাটকা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কটিবাস রক্তে ভিজে উঠেছে।...রক্তবমি হচ্ছে ঘন-ঘন। আঘাত অতি সাঙ্ঘাতিক। "যেন যবনিকা পতনে আর দেরি নেই," লিখেছেন সহকারী-সার্জন গাঙ্গুলি।

অমর বীর চিত্তপ্রিয়ের দেহ পাঠানো হল শব-ব্যবচ্ছেদের ঘরে...

নীরেন ও মনোরঞ্জনের আঘাত খুব বেশি নয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর, তাঁদের হাজতে পাঠানো হল।

জ্যোতিশ পালের অবস্থাও খুব মারাত্মক নয়: স্যালাইন ইঞ্জেকশান প্রভৃতি দিয়ে, মিলিটারি শাস্ত্রীর হেপাজতে তাঁকে নার্স-সমেত আলাদা ঘরে রাখা হল।

যতীন্দ্রনাথকে স্থানান্তরিত করা হল অপারেশন রুমে।

অপারেশন রুমে তখুনি বিছানা পড়ল। ডাক্তারের নির্দেশ মতো যতীন্দ্রনাথকে বিছানায় শুইয়ে দেবার পর ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি সাহেব ছটফট

করতে লাগলেন। মহান বীর যতীন্দ্রনাথের এই মর্মান্তিক চেহারা কিলবির পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল।

তিনি অধীর হয়ে পড়লেন। ছুটে গিয়ে ডাক্তারের অনুমতি নিলেন, "দেখ, এত রক্তবমি হচ্ছে। খানিক soft drink দিলে কেমন হয়, ডাক্তার।"

চাপরাশি দিয়ে কিলবি লেমনেড আনালেন। নিজে হাতে করে যতীন্দ্রনাথের গলায় অল্প অল্প করে তা ঢেলে দিলেন। কিন্তু বমি থামল না।

ইনট্রা-ভেনাস, গ্লুকোস বা রক্ত, কিংবা প্লাজমার ট্রান্সফিউশান দেবার প্রথা তখনো এদেশে চালু হয় নি। কয়েকটা ইঞ্জেকশান দিয়ে ডাক্তার তখন ড্রিপ স্যালাইনের ব্যবস্থা করলেন।

মাঝে মাঝে দশ-পনেরো মিনিটের জন্যে যতীন্দ্রনাথ ঝিমিয়ে পড়ছেন। রক্তবমি হওয়া একটু কমল।

সিভিল সার্জন পরীক্ষা করে দেখলেন, অপারেশান সহ্য করবার মতো শক্তি তখনো যতীন্দ্রনাথ রাখেন।

অপারেশানের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

কিলবি প্রশ্ন করলেন, "ডাক্তার, অপারেশানের আগে ডিক্লেয়ারেশান নিতে হবে। S. D. O. সাহেবকে খবর পাঠিয়েছি। তিনি তো এখনো এসে পড়লেন না। যতীনবাবুকে জিগ্যেস করে দেখুন আমার কাছে তিনি আর-কিছু বলবেন?"

"হ্যাঁ, বলব, মিঃ কিলবি!" যতীন্দ্রনাথই জবাব দিলেন, "আবার বলব: See that no injustice is done to those boys under the British Raj. Whatever has happened, I am responsible for all that—"

কিলবি লিখে নিলেন কথাগুলি।

গুলীর আঘাতে যতীন্দ্রনাথের ডান হাত প্রায় অবশ। হেসে তিনি টিপসই দিয়ে দিলেন।

প্রবল একটা কাশির দমক এল।

রক্তবমি হল আবার। হেসে উঠলেন যতীন্দ্রনাথ: "আশ্চর্য! দেহে এখনো রক্ত আছে? সান্ত্বনার মধ্যে এই—মায়ের পুজোয় এই রক্ত অঞ্জলি

দিয়ে যেতে পারলাম। এ কোনদিনই ব্যর্থ যাবে না!…"

সেই রাতেই অপারেশান শেষ হল। অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। সার্জন মনে মনে আশান্বিত হলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর। ১৯১৫ সাল।

ভোরবেলা চার্লস টেগার্ট এলেন। সাম্রাজ্যবাদের পরম পূজারী টেগার্ট দেখতে এলেন তাঁর বহুদিনের 'বন্ধু'—স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ মহানায়ক যতীন্দ্রনাথকে।

কিলবি আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রনাথের শয্যাপার্শ্বে। টেগার্টের সঙ্গে সঙ্গে এলেন ডেনহাম, ব্যর্ড, রাদারফোর্ড, মেজর ক্রীথ!

সার্জনের অনুমতি নিয়ে যতীন্দ্রনাথের ঘরে টেগার্ট ও অন্যান্য সাহেবেরা প্রবেশ করতেই সহজাত রসিকতার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বললেন, "Good morning, Mr. Tegart!… তোমার সঙ্গে দেখা হল, ভালই হল।— আমি তো চললাম!…"

তারপর তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

খানিক নীরব থেকে তিনি টেগার্টকেও বললেন, "আমি চললাম। যারা রইল—তারা নিরপরাধী। আমার দোষেই তারা এভাবে ধরা পড়ল। দেখো, এদের ওপর যেন অন্যায় অত্যাচার না হয়।"

অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে টেগার্ট বললেন, "Tell me, Mukerjee, what can I do for you?"

যতীন্দ্রনাথের বয়ান ঝলসে উঠল অনির্বচনীয় শান্তি আর আনন্দে, "No, thanks! All's over. Good bye."

১০ই সেপ্টেম্বর। ১৯১৫ সাল।

টেগার্ট প্রমুখ আগন্তুকেরা বেরিয়ে যাবার অনতিকাল পরেই খবর ছড়িয়ে পড়ল: যতীন্দ্রনাথের স্টিচ ছিঁড়ে গিয়েছে। অনর্গল ধারায় রক্ত ছুটে চলেছে।

সার্জন, নার্স, সহকারী ডাক্তারেরা সবাই ছুটে এলেন। ত্বরিত হস্তে কাজে লেগে গেলেন তাঁরা। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করলেন না।

কিন্তু—

শত চেষ্টাতেও কেউ আর ধরে রাখতে পারল না অমূল্য সেই জীবন।

হাসিমুখেই মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে চলে গেলেন সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।—

দেশের মুক্তির জন্যে এই আত্মত্যাগের প্রাণবন্ত দৃশ্য দেখে মুগ্ধ সন্তপ্ত দেশী ও বিদেশী কর্মচারীরা নতমস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। বালেশ্বর গভর্নমেণ্ট হাসপাতালের এই রাজকীয় অতিথির মহাপ্রয়াণের লগ্নে আন্তরিকতার অশ্রু অর্ঘ্যের মতো ঝরে পড়ল দেশপ্রেমিকদের চোখ বেয়ে। সৃজনোন্মুখ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অন্যতম এই নির্মাতার মহাতর্পণে যোগ দিয়ে তাঁরা ধন্য হলেন।

কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হল বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথের আত্মদানের সংবাদ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাছেও সংবাদ পৌঁছল।

রবীন্দ্রনাথ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "এতকালের পরাধীন দেশে এ মৃত্যুও ছোট নয়। কিন্তু যতীনের জীবনের সাধনা—"

এতটা বলে তাঁর ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে কেঁপে থেমে গেল। দূরের দিকে চেয়ে তিনি বসে রইলেন। একটু বাদে তিনি একটা খাতা টেনে নিয়ে কিছুকাল আগে লেখা এই কবিতাটি পড়ে শোনালেন :

ওরে তোদের ত্বর সহে না আর ?
এখনো শীত হয়নি অবসান।
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
সবাই মিলে গেয়ে উঠিস গান ?
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল।
ওরে খ্যাপা, ওরে হিসাব-ভোলা,
দূর হতে তার পায়ের শব্দে মেতে
সেই অতিথির ঢাকতে পথের ধুলা
তোরা আপন মরণ দিলি পেতে।
না দেখে না শুনেই তোদের বাঁধন পড়ল খসে

চোখের দেখার অপেক্ষাতে
রইলি নে আর বসে।

পুরো কবিতাটি পড়া হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ আবার চুপ করে গেলেন। আর কোনও কথাই বললেন না। কবির এই ভাবান্তর দেখে উপস্থিত সকলেই ঘর ছেড়ে সন্তর্পণে চলে গেলেন।

কবি নির্জনে বসে রইলেন গম্ভীর হয়ে।*

যতীন্দ্রনাথের প্রয়াণের সংবাদ পেয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অজস্র জলের ধারা। ঘরের দরজা দিয়ে অভুক্ত অস্নাত দেশবন্ধু চোখের জলের নীরব অঞ্জলি জানালেন মৃত্যুঞ্জয় যতীন্দ্রনাথের কীর্তি স্মরণ ক'রে।

---

* পাটনা কলেজের ডেমনস্ট্রেটর গিরিজাবাবু তখন মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন। সেদিন তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই এই বিবরণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯২১ সালে।

রবীন্দ্রনাথের উক্ত কবিতাটি 'অগ্রণী' শিরোনামায় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। 'অগ্রণী' অর্থাৎ পাইওনিয়ার কথাটা যতীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বহুভাবেই বহু বার ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন, ১৯৪৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরে Hindusthan Standard-এ অবিস্মরণীয় যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যতীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে—তার শিরোনামা ছিল: Pioneer O Pioneer!)—উপরোক্ত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন যতীন্দ্রনাথের দেহাবসানের কয়েক মাস মাত্র আগে যখন যতীন্দ্রনাথের শিষ্যদের কর্মচাঞ্চল্যে বাংলাদেশ থরহরি কম্পমান।

কয়া-শিলাইদহ যাতায়াত-কালেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম যতীন্দ্রনাথকে দেখেন। যতীন্দ্রনাথের বড়মামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নানাভাবেই রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। যতীন্দ্রনাথ বিশ্বকবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে সুযোগ পান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, নিবেদিতা প্রভৃতির মাধ্যমে। এ বিষয়ে বিপ্লবী কিরণচন্দ্র মুখার্জীই হয়তো সর্বাধিক খবর সংগ্রহ করেছিলেন।

আর ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত-ও লিখেছেন: "দাদার (যতীন্দ্রনাথের) সঙ্গে অল্প আলাপের মধ্যেও সহজেই রবীন্দ্রনাথের কথা উঠেছে। দেখেছি উনিও কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন।...লক্ষ্য করেছি যে সে-শ্রদ্ধার ভিতরও একটা ব্যক্তিগত স্পর্শের লক্ষণ।..."

অন্যত্র ভূপেনবাবু লিখেছেন, "...রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ', 'পথ ও পাথেয়' প্রভৃতি প্রবন্ধ বের হবার পর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের বড় একটি অংশ রবীন্দ্রনাথের ঘোর সমালোচক হয়ে ওঠেন।...কিন্তু দাদার Spirit-টি ছিল অন্য ধরনের। মতের পার্থক্য সত্ত্বেও জাতির শিক্ষক শ্রেণীর লোকদের তিনি গভীর অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতেন। এবং তাঁদের কথা বুঝতে চেষ্টা করতেন। তাঁর সামনে যে সমস্যা ছিল, তা ভিন্ন।..."

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে 'বলাকা'র যুগে তাঁর মন একটি ব্যক্তিগত ব্যথায় আচ্ছন্ন ছিল। কী সেই ব্যথা, আমরা না জানলেও, স্বাধীনতা সংগ্রামের এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বলাকা'র অনেক কবিতাই নতুন তাৎপর্য পায়।

সপরিবারে অশৌচ পালন করলেন তিনি পুরোপুরি নিষ্ঠা-সহকারে।*

অশৌচ পালন করলেন দেশের কত শত মুক্তিকামী নরনারী! অশৌচ পালন করলেন যতীন্দ্রনাথের অগণ্য শিষ্য, সহকর্মী, ভাই, বোন, তাঁর অসংখ্য মানস-সন্তান।

চার্লস টেগার্ট কলকাতায় ফিরে এলেন।

যতীন্দ্রনাথের বন্ধু ব্যারিস্টার জে. এন. রায় তাকে গিয়ে জিগ্যেস করলেন: 'ব্যাপারটা কি সত্যিই, নাকি সরকারের এ-ও একটা কৌশল?'

নত দৃষ্টিতে অভিভূতকণ্ঠে টেগার্ট জবাব দিলেন,

"Unfortunately he is dead!"

ব্যারিস্টার রায় কথাটার ওপর ঝোঁক দিয়ে বললেন,

"Why do you say—unfortunately?"

সৌজন্যে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে টেগার্ট বললেন, "I have high regard for him. I have met the bravest Indian, But—I had to perform my duty!"

যতীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কর্মরত ভারতীয় বিপ্লবী ও ভারত-হিতৈষীদের মাঝে। মুহ্যমান বিপ্লবীরা। মুহ্যমান ভারতবাসী। মুহ্যমান—ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশ্বের জনগণ।

স্তব্ধ বেদনায়, অব্যক্ত গৌরবে তাঁরা স্মরণ করলেন শাশ্বত ভারতবর্ষের আদর্শে দীক্ষিত বিভূতি-স্বরূপ এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের মহান্ কর্মধারাকে।···

মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে, যতীন্দ্রনাথ যে-শিক্ষা নিজের জীবন দিয়ে মূর্ত করে গেলেন—ভবিষ্যৎ মানবতার সামনে যে-দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, তা' স্মরণ করে সেদিনের প্রতিটি চিন্তাশীল নাগরিকই হতবাক না হয়ে পারলেন না।

'বিপ্লবের পদচিহ্ন' গ্রন্থের প্রারম্ভেই সেদিনের প্রাঞ্জল চিত্র এঁকেছেন পরবর্তী যুগের বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত: "জার্মানী থেকে অস্ত্র এসে পৌছতে পারল না। আমেরিকা-প্রবাসী চেকোস্লোভাক বিপ্লবীরা খবর দিয়ে দিল—সমগ্র ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রটা ধরা পড়ে গেল।

* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা অর্পণাদেবীর মুখেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।

"বালেশ্বরের হলদিঘাটে যতীনদা নিহত হলেন।...দাদার মৃত্যুর পর সবাই প্রায় ভেঙে পড়েছেন—আজ যেমন গান্ধীজীর মৃত্যুর পর সারা দেশ।"

'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী লিখলেন, "...শ্রীঅরবিন্দকে মনে হত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিলককে ধুরন্ধর রাষ্ট্রনৈতিক। গ্যারিবলডির অভাব খুবই বোধ করছিলাম।...গ্যারিবলডি যে চাই-ই চাই। এই তৃতীয় ব্যক্তির সন্ধানে মন ফিরতে লাগল।

"শেষ পর্যন্ত দেখলাম...আমাদের দেশে গ্যারিবলডির অভ্যুদয় হ'ল যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর মধ্যে দিয়ে। বিদেশী এক প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে বালেশ্বরের চাষাখন্দের যুদ্ধে ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ সেনানায়ক রূপে যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে শিখিয়ে গেলেন। নতুন এই দৃষ্টান্ত দেখে দেশের সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠতে থাকল—নবভারত সেদিন এই পদাঙ্ক অনুসরণের প্রেরণায় উদ্বেলিত, উদ্বুদ্ধ।

"এরই পরিণতিতে দেশ একদিন পেল সূর্য সেনের অধিনায়কত্ব। আরো অনেক পরে, এই আদর্শের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সর্বশেষ অভিযান করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বর্মা-আসামের প্রান্তে এসে কোহিমার যুদ্ধে।..." (পৃঃ ৬৩১)

অন্যত্র যাদুগোপালবাবু লিখেছেন, "প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিদেশী শক্তির (জার্মানির) সাহায্যে যেভাবে দেশ স্বাধীন করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৪১ সালে সুভাষবাবুও তাকে হুবহু অনুসরণ করলেন।..." (পৃঃ ৬০৪)

বালেশ্বর যুদ্ধের দিনের প্রসঙ্গে যাদুগোপালবাবু লিখেছেন, "সেদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে, ভারতের অকুতোভয় বিপ্লবী-আত্মার অর্ঘ্য দেশমায়ের পায়ে এমনি করে লুটিয়ে পড়েছিল। দেশব্রতী বীরদের পালিয়ে বাঁচার পালা শেষ করে সম্মুখ-সমরে আত্মাহুতির নতুন পথে দেশের বিদ্রোহী শক্তিকে কীভাবে বলীয়ান করা যায়—তাই তাঁরা দেখিয়ে গেলেন।

"স্বাধীনতার যুদ্ধ-যজ্ঞে বালেশ্বরের যুদ্ধ এমন সমিধ জুগিয়ে গেল যে, হোমাগ্নি আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। দেশ সেদিন অপূর্ব সমৃদ্ধিতে মহিমান্বিত হল!..." (পৃঃ ৪০৯)

বিহার-উড়িষ্যার লেফটেনান্ট গভর্নরের নিয়োগক্রমে টি এস ম্যাকফার্সন (আই সি এস), অনারেবল নিমাইচরণ মিত্র এবং রায়সাহেব দয়ানিধি দাসের মিলিত একটি কমিশন—১৯১৫ সালের Section 4 of the Act IV অনুযায়ী, নীরেন্দ্র (ওরফে নরেন্দ্র) দাসগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং জ্যোতিশচন্দ্র পালের বিচারে রত হলেন।

সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার নিযুক্ত হলেন ব্যারিস্টার পি সি মানুক এবং পাবলিক প্রসিকিউটর টি এন বোস।

নীরেন এবং মনোরঞ্জনের পক্ষ নিলেন ব্যারিস্টার এন সি সেন, বালেশ্বরের স্বনামধন্য দেশপ্রাণ আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ ঘোষ* এবং মাদারিপুরের উকিল অন্নদাচরণ দাস (নীরেনের কাকা)।

জ্যোতিশ পালের পক্ষ নিলেন রজনীকান্ত গাঙ্গুলি, বালেশ্বরের উকিল।

পীনাল কোডের ৩০২ ও ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী, ১১৪ এবং ১৪৯ ধারা অনুযায়ী, এবং ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী তাঁদের দীর্ঘ বিচারের শেষে, ১৯১৫ সালের ১৬ই অক্টোবর চূড়ান্ত রায় উচ্চারিত হল। ক্রিমিনাল প্রসিডিওরের কোড—২২১, ২২২ এবং ২২৩ ধারা অনুযায়ীও এঁদের মধ্যে প্রথম দুজনেই অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। ম্যাকফার্সন কমিশনের মতে,

"We find that Nirendra and Manoranjan were armed body-guard of Joitn, prepared to go to any length to safeguard him..."

এবং "In respect of the offence of murder the Commissioners are unable to discover any ground for failing to pass the capital sentence upon the first two accused. They are youngmen of about 22 and 20 years of age respectively; Nirendra an athlete, and Manoranjan of fine physique; possessing the advantage of respectable birth and fair education, who deliberately chose a path which could only have one-ending. Practised in and armed with weapons of the most deadly description and associated with desperate outlaws whose cause

* এখনো ইনি জীবিত আছেন (এই গ্রন্থ-রচনার কালে)।

they made their own—it was only a question of time until these resolute men committed murder...

"Upon the first, second and fifth charges the sentence of the Commissioners under section 302 of Penal Code upon Narendra Das Gupta, alias Nirendra Chandra Das Gupta is that he be *hanged* by the neck until he is dead—and upon Manoranjan Sen Gupta it is that he be *hanged* by the neck until he is dead—"

ইংরেজের আদালতে বিচারের পর্ব এইভাবেই শেষ হল।

দিদি বিনোদবালা দেবীর কাছে মনোরঞ্জন আর নীরেনের গোপন লিপি দিয়ে গেলেন নীরেনের কাকা—মাদারিপুরের উকিল অন্নদা দাসগুপ্ত :

"দিদি! কাল আমাদের জীবনের বিজয়াদশমী। আপনাদের এবং চিরপ্রিয় জন্মভূমিকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। যাবার আগে মাতৃভূমির স্বাধীনতাই প্রার্থনা করে যাব। আবার যেন এ-দেশেই জন্মগ্রহণ করে দাদার অসমাপ্ত ব্রত উদ্‌যাপন করে যেতে পারি, এই আশীর্বাদ করুন।..."

শোনা গেল, জেলে থেকে সাত-আট পাউণ্ড ওজন বেড়ে গিয়েছিল তাঁদের।

"নীরেন! মনোরঞ্জন! তোরা রইলি—দেশের লোককে বলে যাস, আমরা ডাকাত নই!"

মহানায়কের এই অন্তিম উক্তি শেলের মতো বাজতে থাকে পরম বীর নীরেন আর মনোরঞ্জনের অন্তরে অহর্নিশি।

অবশেষে সুযোগ এল।

ফাঁসীর প্রাক্‌কালে, যতীন্দ্রনাথের শেষ নির্দেশ স্মরণ করে অমর শহীদ মনোরঞ্জন আর নীরেন অনর্গল ইংরেজি আর বাংলায় প্রায় আধঘণ্টা ধরে প্রাণ-কাঁপানো জ্বালাময়ী ভাষায় জাতির উদ্দেশ্যে জানিয়ে গেলেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও তাঁর বাণী। এবং ঘুরে-ফিরে সমের মতো উচ্চারণ করে গেলেন :

"Down with the British Raj in India!

অগ্নিস্রাবী সেই ভাষা সমবেত ইংরেজ ও দেশী রাজকর্মচারীদের কানে

অসহ্য ঠেকল। তাঁদের কেউ কেউ কানে রুমাল চাপা দিয়ে অধোবদনে বসে রইলেন।

নীরেন আর মনোরঞ্জন জানিয়ে গেলেন: যে-মহাপুরুষ অবশেষে ডাকাতের আখ্যায় ভূষিত হয়ে বালেশ্বর হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, তাঁর কাহিনী দেশকে শোনাবার মতো মার্ক এণ্টনি দুর্ভাগ্যক্রমে পরাধীন দেশে জন্মায় নি, যে-মার্ক এণ্টনি বিশ্ববাসীর সামনে দাঁড়িয়ে বলে যেতে পারত—অখণ্ড মানবতার মঙ্গল-কল্পে যতীন্দ্রনাথ কী চেয়েছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে কী তিনি রেখে গেলেন অমৃতের অধিকারী বিশ্বমানবতার জন্যে।

ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে মনোরঞ্জন আর নীরেন একটি-মাত্র মন্ত্র দিয়ে গেলেন, সহুঙ্কারে প্রণতি জানিয়ে গেলেন সেই মন্ত্রের ভাষায়:

"বন্দে মাতরম্!"

আন্দামানে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠানো হল জ্যোতিশ পালকে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় জ্যোতিশ পালের আন্দামান-বাসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অত্যাচারে পাগল করে জ্যোতিশকে কিছুদিন বাদে ইংরেজ সরকার এনে রাখল বহরমপুর জেলে। দীর্ঘ এক যুগের কারাভোগ করে তিনিও বিদায় নিলেন ইহলোক থেকে।

মৃত্যুর আগে জ্যোতিশ পাল বহরমপুরে জেলের কুঠুরির দেয়ালে কয়লা দিয়ে লিখে রেখে গেলেন যতীন্দ্রনাথের মহান কীর্তি-কাহিনী।

ইংরেজ সরকারের চোখে পড়া-মাত্র, একপ্রস্থ চুনকামের আড়ালে সে ইতিহাস মুছে গেল। সে কাহিনী কিন্তু অমর আলোকে ভাস্বর রইল জাতির হৃদয়-পটে।

অবিস্মরণীয় সেই কাহিনী, অবিস্মরণীয় সেই ইতিহাস!

'অগ্নি-বীণা'র কবির হৃদয়তন্ত্রীতে দীপক তানের ঝঙ্কার উঠল। যতীন্দ্র-নাথের স্মৃতি-তর্পণের উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালে যখন ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারী বেঙ্গল রেজিমেণ্ট গঠন করালেন, কাজী নজরুল ইসলাম তাতে যোগ দেন এবং বিদেশে যান হাবিলদার রূপে। যতীন্দ্রনাথের প্রয়াণের সেই বীরত্বপূর্ণ

গাথাই নজরুল ইসলাম গেয়ে উঠলেন রুদ্র ভৈরব কণ্ঠে।

বালাশোর—বুড়ি বালামের তীরে—
নবভারতের হলদিঘাট,
উদয়-গোধূলি রণে রাঙা হয়ে
উঠেছিল যথা অস্তপাট।

আ-নীল গগন-গম্বুজ ছোঁওয়া
কাঁপিয়া উঠিল নীল-অচল,
অস্তরবিরে ঝুঁটি ধরে আনে
মধ্য-গগনে কোন পাগল!
আপন বুকের রক্ত-ঝলকে
পাংশু-রবিরে করে লোহিত
বিমানে বিমানে বাজে দুন্দুভি,
থর থর কাঁপে স্বর্গ-ভিত্।
দেবকী-মাতার বুকের পাথার
নড়িল কারায় অকস্মাৎ
বিনা মেঘে হল দৈত্যপুরীর
প্রাসাদে সেদিন বজ্রপাত।
নাচে ভৈরব, শিবানী, প্রমথ
জুড়িয়া শ্মশান মৃত্যু-নাট,
বালাশোর—বুড়িবালামের তীর—
নবভারতের হলদিঘাট।

অভিমন্যুর দেখেছিস রণ?
যদি দেখিস্ নি, দেখিবি আয়
আধা-পৃথিবীর রাজার হাজার
সেনারে চারি তরুণ হটায়।
ভাবী ভারতের না-চাহিতে আসা
নবীন প্রতাপ নেপোলিয়ন

অগ্নি যতীন্দ্র—রণোন্মত্ত—
শনির সহিত অশনি-রণ।
ছুই বাহু আর পশ্চাতে তার
রুষিছে তিন বালক শের:
চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন,
নীরেন—ত্রিশূল ভৈরবের।
বাঙালীর রণ দেখে যা রে তোরা
রাজপুত, শিখ, মারাঠা, জাঠ।
বালাশোর—বুড়িবালামের তীর—
নবভারতের হলদিঘাট।

চার হাতিয়ারে দেখে যা কেমনে
বধিতে হয় রে চার হাজার,
মহাকাল করে কেমনে নাকাল
নিতাই গোরার লালবাজার!
অস্ত্রের রণ দেখেছিস তোরা,
দেখ্ নিরস্ত্র প্রাণের রণ;
প্রাণ যদি থাকে—কেমনে সাহসী
করে সহস্র প্রাণ হরণ!
হিংস-বুদ্ধ-মহিমা দেখিবি
আয় অহিংস বুদ্ধগণ—
হেসে যারা প্রাণ নিতে জানে, প্রাণ
দিতে পারে তারা হেসে কেমন।
অধীন ভারত করিল প্রথম
স্বাধীন-ভারত-মন্ত্র পাঠ,
বালাশোর—বুড়িবালামের তীর—
নবভারতের হলদিঘাট।

সে-মহিমা হেরি ঝুঁকিয়া পড়েছে
অসীম আকাশ, স্বর্গদ্বার,

ভারতের পূজা-অঞ্জলি যেন
দেয় শিবে খাড়া নীল পাহাড়।
গগনচুম্বী গিরি-শির হতে
ইঙ্গিত দিল বীরের দল :
"মোরা স্বর্গের পাইয়াছি পথ—
তোরা যাবি যদি, এ-পথে চল্!
স্বর্গ-সোপানে রাখিনু চিহ্ন
মোদের বুকের রক্ত-ছাপ,
ঐ সে রক্ত-সোপানে আরোহি'
মোছরে পরাধীনতার পাপ।
তোরা ছুটে আয় অগণিত সেনা
খুলে দিনু দুর্গের কবাট!"
বালাশোর—বুড়িবালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট!*
("প্রলয় শিখা")

যুগে যুগে দেশের চারণকবির কণ্ঠে, বাউলের একতারায়, আর পল্লী অঞ্চলে মাঠে-ঘাটে যে মহানায়কের মানবিক করুণাস্বরূপ কীর্তি-গাথা গীত হতে লাগল, তারই ছন্দে দুলে উঠলেন চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় :

"বুড়িবালাম-এর তীরে
বুকের শোণিতে যেদিন তোমরা রাঙালে ধরিত্রীরে,
সম্মুখ-রণে যুঝি প্রাণপণে ঘুমালে বীরের দল—
মৃত্যু সেদিন জ্বালালো শ্মশানে মুক্তির হোমানল।
নিজেরে সেদিন নিঃশেষ করে বিলায়ে গেলে যে আলো,
সেই আলোকের রক্তশিখায় মিলায় রাতের কালো।
সেদিনের সেই মৃত্যুর দান সকল দৈন্য হরি'
নবজীবনের গরিমায় মরু তুলিছে শ্যামল করি।

* কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রলয়-শিখা' বইটি এই কবিতাটির জন্যে বাজেয়াপ্ত হয়। কবির সহধর্মিণী প্রমীলা দেবীর অনুমতিক্রমে কবিতাটি মুদ্রিত হল।

আজি তোমাদের স্মরি'
নবীন আশার কনক-কিরণে উঠিছে চিত্ত ভরি।
সারা তনু-মন ঝঙ্কার দিয়া গাহিতেছে অনুখন—
বাঘা যতীন্দ্র ছিল সে বাঙালী, ছিল মনোরঞ্জন,
চিত্ত, নীরেন—বাঙালীর ছেলে! এই আকাশের তলে
প্রাণ তাহাদের উঠিল বিকশি' হাসির ও অশ্রুজলে!
কে বলে এ দেশে মানুষ কেবল কল্প-কুঞ্জবাসী?
মোহনলালের অসির সঙ্গে চণ্ডীদাসের বাঁশী
মিশেছে এ-দেশে,—খোলের সঙ্গে বাজে শাক্তের ঢাক,—
কোকিল-ডাকের সঙ্গে হেথায় গর্জে বাঘের ডাক,—
কপোতাক্ষির সঙ্গে ছুটেছে ভীষণ পদ্মা নাচি'—
ভোমরার সাথে বাঁধিয়াছে বাসা পাহাড়িয়া মৌমাছি,
বেণু-রাগিণীর সঙ্গে নাগিণী ফণা নাচাইয়া খেলে,—
শ্যামলা-ধরার বুক চিরে নীল পাহাড় উঠেছে ঠেলে।
কোমলে কঠিনে মেশানো এ-নীতি, তরুণেরা এই দেশে
বটের ছায়ায় বাঁশরি বাজায়,—ফাঁসী কাঠে মরে হেসে।

বিজয়ী বীরের দল!—
মরিয়া তোমরা শিখাইয়া গেলে বাঁচিবার কৌশল।
দেখালে—দেশের মুক্তির পথ মৃত্যুর বুক দিয়া,—
এর চেয়ে কোন সোজা পথ নাই,—লাটের সভায় গিয়া
গরম গরম কথায় মূর্খ জনতা ভোলানো যায়—
মুক্তি—সে বড় নির্মম-প্রাণ—সব কিছু সে যে চায়!
অযুত বীরের রক্তে তাহার রঙিন চরণতল,—
পদযুগ ঘিরি' অশ্রু-সাগর করিতেছে টলমল।
তার দেখা মেলে ফাঁসীর মঞ্চে, নীরন্ধ্র কারাগারে,
আপন বলিতে কিছুই যখন থাকে না তখন দ্বারে
নীরব চরণে সে আসি' দাঁড়ায়; মৃত্যুর সম্মুখে
কোথা হতে এসে চুপে চুপে হেসে চুম্বন দেয় মুখে!

সে চায় প্রাণের সকল দরদ, সবটুকু ভালবাসা,—
তারে যে চেয়েছে প্রাণ-মন দিয়ে, ভেঙেছে তাহার বাসা।
ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া হয়েছে সে পথচারী,—
কূলে কালি দিয়া অকূল সাগরে দিয়েছে সে-জন পাড়ি।

জ্বালালে যে হোমানল—
শত শিখা মেলি' পরশিবে তাহা মহা-অম্বর-তল।
কুটিরে কুটিরে ছড়াবে আগুন,—সাঁঝের আকাশতলে
তোমাদের কথা জননী শিশুরে কহিবে অশ্রুজলে!
পিতা শুনাইবে পুত্রেরে তার,—ভ্রাতা ছোট ভগিনীরে,—
কেমন করিয়া মরিলে তোমরা বুড়িবালামের তীরে।
সেই মরণের অমরকাহিনী ছন্দে রচিবে কবি,—
শিল্পী ফুটাবে চিত্রে বীরের শেষ-বিদায়ের ছবি.
চারণ গাহিবে পথে পথে সেই মৃত্যুর জয়গান,
সে গান শুনিয়া বক্ষে বক্ষে জাগিবে তরুণ প্রাণ।
প্রতাপ, মোহন, সীতারাম আর মীরমদনের পাশে
রক্ত-আখরে তোমাদের কথা লেখা রবে ইতিহাসে!*

["সব-হারাদের গান"]

* কবির সম্মতিক্রমে এটি মুদ্রিত হল॥

পরিশিষ্ট

১। মহাবিপ্লবী তারকনাথ দাস

২। যতীন মুখার্জী ও মানবেন্দ্রনাথ

মহাবিপ্লবী তারকনাথ দাস

পরিধানে নিখুঁত স্যুট-নেকটাই, পক্ককেশ কৃষ্ণকায় সাহেবটির সামনে একথালা গরম লুচি ; সাবেকি হিন্দু রীতিতে আচমন সেরে তিনি সান্ধ্য-ভোজনে বসেছেন। গৃহকর্ত্রী মন্তব্য করলেন, "কাকাবাবু, কে বলবে আপনি পঞ্চাশ বছর প্রবাসী থেকে এই সন্থ দেশে ফিরেছেন ?" প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ জবাব দিলেন : "মাগো, হিন্দুর ছেলে,—যেখানেই থাক, তার হিন্দুত্ব হারাবে কি ক'রে ?" পৌত্রতুল্য এক কিশোর অবিরাম প্রশ্নে তাঁকে অতিষ্ঠ করবার পরিবর্তে তাঁর প্রশ্রয় লাভ ক'রে মুখিয়ে উঠেছে। তদ্গত চিত্তে বৃদ্ধ বলে চলেছেন : "বুঝলে হে, দাদু, আমি তখন ইস্তাম্বুলের পাট চুকিয়ে দিয়ে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, লালা হরদয়াল, বরকতুল্লা, তিরুমল আচারী প্রভৃতিকে বিদায় জানিয়ে ফিরে যাচ্ছি মার্কিন মুল্লুকে। সেটা ১৯১৬ সালের মার্চ মাস ; জুরিখে পৌঁছেই খবর পেলাম যে যতীনদা বালেশ্বরের যুদ্ধে আত্মনিবেদন করেছেন। কিছুকাল পরে যতীনদার হাতে গড়া ছেলে—অধ্যাপক শৈলেন ঘোষ মেক্সিকো থেকে কালিফর্নিয়ায় ফিরে বিশদভাবে আমায় বর্ণনা দেন মহান সেই সংগ্রামের। মেক্সিকোয় তখনো এম্. এন. রায় (নরেন ভট্টাচার্য) ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন—নূতন এক মানবতাবাদের প্রচার ক'রে তিনি তাঁর গুরু যতীন মুখার্জীর অসম্পূর্ণ সাধনায় সিদ্ধি আনতে ব্রতী। সেই সঙ্কল্পই আমাদের বুকে জ্বলছে তখন। অন্তরে অন্তরে হিন্দু থেকে আমরা নেমেছিলাম বিশ্ব-মানবতার সেবায় !"

উক্তিগুলি জন্ স্টাইনবেকের কপোলপ্রসূত কোনও চরিত্রের স্মৃতি-চারণ নয় ; ঢাকুরিয়া লেকের ধারে ব্রজদার গুল-তাপ্পিও নয়। মার্কিন মহাফেজ-খানায় দিস্তে দিস্তে সরকারি তথ্যের ধুলিধুসর ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে সম্প্রতি আমার মনে পড়ছিল ১৯৫২ সালে ডঃ তারকনাথ দাসের সান্নিধ্যে কাটানো রোমাঞ্চকর এক সন্ধ্যার স্মৃতি।

১৮৮৪ সালের ১৫ই জুন তারকনাথের জন্ম কাঁচড়াপাড়ার উপকণ্ঠে মাজুপাড়া গ্রামে। পিতা কালীমোহন ছিলেন কলকাতার সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারী। ষোল বছর বয়সে স্কুলের প্রবন্ধ প্রতি-

যোগিতায় তারকনাথ যে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেন, তা উক্ত সভায় আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের বিশেষ অভিনন্দনে প্রস্ফুট হতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্যের বন্ধু প্রমথনাথ ছিলেন কলকাতা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা—এই সমিতিই পরবর্তীকালে 'যুগান্তর' দল নামে খ্যাতি লাভ করে ব্রিটিশ সরকারের দলিল দস্তাবেজ জুড়ে। এই সমিতির শাখা যখন ঢাকায় উদ্বোধন করতে যান প্রমথনাথ ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে, রাষ্ট্রনেতা বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে তাঁর পাশে সেদিন উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র পুলিন দাস এবং ছাত্রনেতা তারকনাথ দাস। স্বদেশচিন্তার প্রথম দার্শনিক মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন প্রত্যক্ষভাবে প্রমথনাথ ও বিপিনচন্দ্রের অন্তরে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলেন, রাজনারায়ণের দৌহিত্র শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে এসে সেই আগুন তখন লেলিহান-প্রমাণ হয়ে উঠেছে। লোকমান্য তিলকের সহযোগিতায় কলকাতা তখন শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে উগ্রপন্থী স্বদেশ-প্রেমের বাণী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সারা ভারতে এনে দিয়েছে জাগরণ। জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বহু জাতীয়তাবাদী নমস্য চিন্তাবিদ সমবেত হয়েছেন ; নিবেদিতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তরুণ বাংলার প্রতিভূরূপে সেখানে বিনয়কুমার সরকার, রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখার্জী প্রভৃতির সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যেও পাই আবার ওই তারকনাথ দাস, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গুরুদত্ত কুমার প্রমুখ কয়েকটি হীরক-প্রতিভার দেখা।

মহারাষ্ট্রের শিবাজী বাংলায় যথেষ্ট আলোড়ন আনতে যদি না পারেন, সেই ভাবনায় প্রতীকরূপে বাংলার রাজা সীতারাম রায়কে দাঁড় করিয়ে স্বদেশী উৎসবের সূচনা হল ; যশোরে সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুরে সীতারাম উৎসবের পৌরোহিত্য করতে গেলেন ১৯০৬ সালের সূচনায় বিপ্লবী সংগঠনের প্রাণপুরুষ যতীন মুখার্জী (বাঘা যতীন), তাঁর সঙ্গেও দেখি পার্শ্বচরের মতো তারকনাথ দাসকে। যতীন মুখার্জীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বাড়তি একটি মূল্যবোধ সেদিনের বিপ্লবীদের কাছে যুক্ত ছিল : নিবেদিতার পরে একমাত্র যতীন মুখার্জীই ধন্য হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে ; তাঁর কাছে বিবেকানন্দ অকপটে ব্যক্ত করেছিলেন আপন স্বাধীনতা-সংগ্রামের অভিনব পরিকল্পনা। মহম্মদপুরে গোপন একটি

বৈঠকে যতীন মুখার্জীকে ঘিরে যে মুষ্টিমেয় কর্মী উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন তারকনাথ দাস, শ্রীশ সেন, সত্যেন সেন ও অধর লস্কর। এর পিঠপিঠ, ক'বছরের ব্যবধানে এঁরা চারজনেই বিদেশ অভিমুখে রওনা হলেন ভারতের সেবার অঙ্গ হিসাবে। উক্ত বৈঠকে আলোচিত প্রসঙ্গের যথাযথ বর্ণনা আমরা পাইনি। কিন্তু অনুমান করা সমীচীন যে ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে বিশ্বজনের সহানুভূতি অর্জনের সঙ্গে সামরিক এবং কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী হবার বাসনা এঁদের হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেন যতীন মুখার্জী। এর পিছনে ছিল বিবেকানন্দের এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণা।

১৯০৬ সালেই দেখি তারকনাথকে পাগড়ি-মাথায় তারক ব্রহ্মচারী ছদ্মনামে প্রথমত মাদ্রাজে সফররত। সেখানে তাঁর দৃপ্ত বাণী এনে দিয়েছিল যে উন্মাদনা—তা তাঁর আগে বিবেকানন্দ ও বিপিন পাল ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারেননি। তারকনাথের সংস্পর্শে সেদিন যে-যুবশক্তি সর্বস্বপণ ক'রে এগিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে অবিস্মরণীয় ছিলেন নীলকান্ত ব্রহ্মচারী, সুব্রহ্মণ্য শিব, চিদাম্বরম পিল্লাই। কোনদিন এঁরা ভুলতে পারেননি তারকনাথের কাছে তাঁদের দীক্ষার ঋণ! ওই বছরেই জাপান হয়ে তারকনাথ পৌঁছলেন গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলবর্তী সান্ ফ্রান্সিস্কোতে। স্থানীয় বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নাম লেখালেন ছাত্র হিসাবে এবং তিলকের খাস প্রতিনিধি পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করলেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ। অর্থের সমস্যা মিটল—দেশ থেকে অধর লস্কর যখন এলেন বাংলার বিপ্লবী দলের পরবর্তী প্রতিনিধিরূপে। নড়াইল জমিদার এস্টেটের নায়েব ইন্দুভূষণ মিত্র উক্ত জমিদারীর একলাখ টাকা আত্মসাৎ ক'রে যতীন মুখার্জীর বন্ধু হীরালাল রায় ও কবিরাজ বিজয় রায়ের হাতে সমর্পণ করেন! অধরের রাহা-খরচ ছাড়াও সেই অর্থ তারকনাথকে দিল ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে Free Hindusthan পত্রিকা প্রকাশের স্পর্ধা।

বার্কলে থেকে মার্কিন সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে তারকনাথ মার্কিন শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরূপে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ভ্যাঙ্কুভারে। ইংরেজ সরকারের ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের নগ্নতম অভিব্যক্তি তখন ভ্যাঙ্কুভারে। অর্ধভুক্ত অশিক্ষিত ভারতীয় শ্রমিকের জীবন নিয়ে সেখানে তখন ছিনিমিনি খেলছে ইংরেজের রাজনীতি। শুল্কবিভাগে বসেই আইনের মারপ্যাঁচ সম্বন্ধে নিপুণ

তারকনাথ জীবিকার-সন্ধানে-সমাগত দেশোয়ালী ভাইদের দিতে থাকেন উপযুক্ত পরামর্শ, স্থানীয় সরকারের সঙ্গে তাদের পক্ষ সমর্থন ক'রে চালান চিঠি-চাপাটি আর তাদের সুখ দুঃখের সমব্যথী হয়ে তিনি গড়ে তুললেন ওখানে "স্বদেশ সেবক" নামে একটি প্রতিষ্ঠান : নিউ ওয়েস্টমিন্স্টার অঞ্চলের মিল্সাইডে আবাসিক এই বিদ্যালয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের তিনি দিতে থাকেন গণিত ও ইংরেজিতে শিক্ষা এবং সেইসঙ্গে তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে দিলেন জাতীয়তাবাদের আদর্শ। তারকনাথের পাশে রইলেন অক্লান্ত দেশপ্রেমিক অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন বসু আর কলকাতা থেকে আগত জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের হিন্দীর প্রাক্তন অধ্যাপক গুরুদত্ত কুমার। সঙ্ঘবদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় ব্যাপকভাবে দানা বেঁধে উঠলো অন্যান্য সঙ্ঘ। এদের সম্পদে-বিপদে অপরিহার্য হলেন তারকনাথ।

ভ্যাঙ্কুভারে "লণ্ডন টাইম্স্" পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ক্রিপেন্ প্রমুখ কিছু ব্রিটিশ সাংবাদিকের রিপোর্ট এবং গুপ্তচরের বৃত্তান্তের ভিত্তিতে তারকনাথের গতিবিধি অত্যন্ত অহিতকর জ্ঞান ক'রে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ থেকে একটি ঝানু গোয়েন্দাকে মোতায়েন করল তারকনাথের উপরে নজর রাখতে। গোয়েন্দাটির নাম উইলিয়াম চার্লস হপ্কিন্সন্; দিল্লীতে তার জন্ম, বাপ ছিল ইংরেজ, পুলিশের লোক। হিন্দী ও উর্দু ভাষায় সহজ অধিকারবশত হপ্কিন্সন্ অতি শীঘ্র স্থানীয় ভারতীয়দের মজলিসে-জলসায় হাজির থেকে তারকনাথের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে তৎপর হয়। পরশ্রীকাতর কিছু ভারতীয়ও তারকনাথের চরিত্রের উপরে কটাক্ষ করতে বাকি রাখেননি এই গুপ্তচরটির সামনে। উদাহরণ স্বরূপ একটি শোচনীয় কাহিনীই যথেষ্ট। ব্রহ্মচর্যে-দীক্ষিত উচ্চ আদর্শবাদী এই বীরের অন্তরে বাঙালীসুলভ যে-রোমান্টিক অনুভূতি ছিল, তাঁর ছাব্বিশ-বছর বয়স নাগাদ সেখানে সাড়া তুলল সদ্বংশজাত শ্বেতাঙ্গিনী এক তরুণীর প্রণয়; কয়েকদিনের জন্য তরুণীটির সঙ্গে তারকনাথ ছুটিতে যাবার অপরাধে ঈর্ষান্বিত কিছু ভাইয়া তাঁর চরিত্র শোধরাতে চেষ্টা করেন উত্তম-মধ্যম দিয়ে। আমাদের ঠিক জানা নেই—এই তরুণীটিই তারকনাথের পত্নী মেরী কীটিং দাস কিনা। আজীবন এঁরা পরস্পরের সাহচর্যে উন্নত এক জীবন যাপন করেছেন।

তারকনাথের চরিত্রের এই "কলঙ্ক" মারাত্মক এক অভিযোগের সামনে

তাঁকে ঠেলে দিল ; ব্রিটিশ শুল্কবিভাগের কেরাণীরূপে স্থানীয় ভারতীয়দের উপরে জোর-জবরদস্তি ক'রে হপ্‌কিন্সন্ যে উৎকোচ আদায় করত, তার বিরুদ্ধে তারকনাথ উপরওয়ালার কাছে অনুযোগ করামাত্র হপ্‌কিন্সনের পক্ষ সমর্থন করে উল্টে তারকনাথকেই ঘুষখোর অপবাদ দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯০৮ সালের শেষভাগে মার্কিন শুল্কবিভাগের সহযোগিতায় তারকনাথকে বরখাস্ত করাল। গুরুদত্ত কুমারের হাতে কানাডার বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত ক'রে তারকনাথ Free Hindusthan পত্রিকার অফিস উঠিয়ে নিয়ে গেলেন মার্কিন এলাকাস্থ সীয়াট্‌লে। ব্রিটিশ এলাকা থেকে প্রকাশকালে এতদিন যে সতর্ক ভাষা তিনি বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতেন, সীয়াট্‌ল্ থেকে তার আর প্রয়োজন রইল না। যথেষ্ট খোলা-খুলিভাবে তিনি চড়া সুরে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের বিপক্ষ-পর্যালোচনা শুরু করলেন। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই তারকনাথের একটি উক্তি মুদ্রিত হত : "সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মানবতারই সেবা এবং সভ্যতার ধর্ম!" টলস্টয় থেকে শুরু ক'রে হাইণ্ডম্যান, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, মাদাম কামা প্রভৃতি সাগ্রহে পত্রিকাটি পাঠ করতেন এবং তারকনাথকে পত্র দিয়ে তাঁর উৎসাহে ইন্ধন জোগাতেন। অল্পকালের মধ্যেই—১৯০৮ সালের অগাস্ট সংখ্যা থেকে—পত্রিকাটির মুগ্ধ পাঠক হিসাবে মার্কিন প্রবাসী প্রবীণ আইরিশ বিপ্লবী জর্জ ফ্রীম্যান ("ফিটস্‌জেরাল্‌ড") আহ্বান জানালেন তারকনাথকে নিউ ইয়র্কে, "গেলিক অ্যামেরিকান্" পত্রিকার অফিস থেকে "ফ্রী হিন্দুস্থান" প্রকাশের প্রস্তাব জানিয়ে। ফ্রীম্যানের দুই ভারতীয় বন্ধু—মহম্মদ বরকতুল্লা (১৮৬৪-১৯২৮) ও স্যামুয়েল যোশী—ছাড়াও, ব্রডওয়ের ভারতপ্রেমিক উকিল মাইরন ফেল্‌পস্ প্রভৃতি তারকনাথকে নিউ ইয়র্কে আনাতে পেরে উৎফুল্ল হলেন। এখানেই, ক'দিনের মধ্যে তারকনাথ পেলেন তাঁর পূর্ব-পরিচিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গ : বিবেকানন্দের অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ (১৮৮০-১৯২৮) ছিলেন কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ; সিস্টার নিবেদিতার প্রচেষ্টায় রাজরোষ থেকে মুক্তি পেয়ে নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হলেন তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে।

ভারতবর্ষে তখন চলেছে উত্তরোত্তর চাঞ্চল্যকর ঘটনার পরম্পরায় বিপুল এক জাগরণ : দার্জিলিঙের পথে চারটি ইংরেজ অফিসারকে একাহাতে কিছু শিষ্টাচার শেখানর অপরাধে যতীন মুখার্জীর বিরুদ্ধে মামলা ; ক্ষুদিরাম ও

প্রফুল্ল চাকীর আত্মদান; মানিকতলা বোমার বাগান আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে লোকমান্য তিলকের প্রবন্ধ প্রকাশ এবং তাঁর দ্বীপান্তর—সবই গণচেতনার সামনে এনে দিতে লাগল নিত্য নূতন প্রেরণা। বাঙালীকে সামরিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার ক্ষোভ জাতীয় নেতাদের হৃদয়ে যেভাবে জাগ্রত ছিল, তাকে মূর্ত করেন যতীন মুখার্জী, তিনি মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন কিছু সংখ্যক বিপ্লবী কর্মীকে বিদেশ থেকে আধুনিক সামরিক শাস্ত্রে দক্ষ করিয়ে দেশের সর্বত্র তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হক। "যতীন্দর উপাধ্যায়" নাম নিয়ে যতীন বাঁড়ুজ্যে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব-ক্রমে বরোদা সৈন্য-বিভাগে নাম লেখাতে পেরেছিলেন, ভুললে চলবে না। তারকনাথ, খানখোজে, অধর লস্কর এবং জ্ঞান চ্যাটার্জি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাছাবাছা কয়েকটি সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনার শেষে হাতে-কলমে কাজে নামলেন: সামরিক শিক্ষার মক্কা ব'লে সুবিদিত ভারমণ্টের নরউইচ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পেলেন তারকনাথ। হপ্-কিন্সনের রিপোর্টে ভাইসরয় মিণ্টোর টনক নড়ল; বিচলিত চিত্তে ১৯০৯ সালে তিনি লণ্ডনে মর্লি সাহেবকে অনুরোধ জানালেন—ওয়াশিংটনের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে বিশদ বিবরণের জন্য পত্র দিতে। ফলত, ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ মিলিটারি আতাশে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল জেম্‌স্ শরণ নিলেন মার্কিন সৈন্যবিভাগের কর্মকর্তা জেনারেল উদারস্পুনের; উদারস্পুন এবং মেজর জেনারেল ফ্রাঙ্কলিন বেল এই ঘটনার কিছু আগেই ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণক্রমে দূর-প্রাচ্য ভ্রমণ করে এসে ব্রিটিশ শাসনের বিশেষ অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। নরউইচ্ মিলিটারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যাপ্টেন লেসলী চ্যাপম্যান শুধুমাত্র তারকনাথের উপস্থিতি স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকলেন না; উদারস্পুনকে তিনি জানালেন "অত্যন্ত মেধাবী এই উচ্চ-শিক্ষিত" ছাত্রটি সম্পর্কে তাঁর সমীহপূর্ণ মনোভাব এবং "উগ্র ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপ সত্ত্বেও" বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেট ক্লাবের পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদনা প্রভৃতির সূত্রে গরম গরম বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির মাধ্যমে "এমন-কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা চামড়া ছাত্রদের মহলেও এর প্রতিপত্তি"র বৃত্তান্ত। আরও সাঙ্ঘাতিক একটি সংবাদ দিলেন তিনি: বিখ্যাত ভারমণ্ট ন্যাশনাল গার্ডের প্রার্থীরূপেও তারকনাথকে নির্বাচনের চিন্তা করছেন কর্তৃপক্ষ। উদারস্পুনের মধ্যস্থতায় জেম্‌স্ সাবধান করে দিলেন চ্যাপম্যানকে

—মার্কিন সরকারের মিত্রশক্তি ব্রিটিশদের "স্বার্থবিরোধী কিছু অবাঞ্ছিত শিক্ষার্থীকে" ওই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্রয় দিচ্ছে—তার প্রতিফল সম্পর্কে। ব্রিটিশ সরকারের এই চোখ রাঙানো যথেষ্ট ফলপ্রসূ হল: ১৯০৯ সালের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তারকনাথকে লিখিতভাবে জানালেন "ব্রিটিশ-বিরোধী তাঁর মনোবৃত্তির দরুন" পরবর্তী বছর থেকে তাঁকে আর এই প্রতিষ্ঠানে রাখা সম্ভব নয়; তিনি চান যদি, তাঁকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করতে সাহায্য করা হবে। উল্লসিত জেমস ধন্যবাদ জানিয়ে উদারস্পুনকে লিখলেন—তিনি আশা করবেন, এসব চরিত্রের লোক গিয়ে হার্ভার্ডের ছাত্রদের মাথা খাবে না।

১৯০৮ সালের অক্টোবর সংখ্যা "ফ্রি হিন্দুস্থান"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তারকনাথ দুঃখ জানিয়েছিলেন যে আশী হাজার শিখ আর দেশী সৈন্যের সঙ্গে নেপালের জং বাহাদুর প্রেরিত আশী হাজার গুর্খাসৈন্য একত্রিত করে মাত্র হাজার চল্লিশ ব্রিটিশ সৈন্য সমর্থ হয়েছিল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমন করতে। ১৯০৭ সালে লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে বিদ্রোহী দেশোয়ালী ভাইদের বিরুদ্ধে শিখ সৈন্যরা গুলি ছুঁড়তে অস্বীকার করেন—এই দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে তারকনাথ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, কী ভাবে ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীতে বিভিন্ন ভারতীয় সৈন্যের সহযোগিতায় স্বাধীনতা আন্দোলন সার্থক হয়ে উঠবে। তাঁর এই উক্তির আড়ালে পাই ফোর্ট উইলিয়ামে ও অন্যত্র মোতায়েন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যতীন মুখার্জীর অনুগামীদের অক্লান্ত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রভাব। ১৯০৯ সালের প্রথম সংখ্যাটির সূচনাতেই রাশিয়ান চিত্রকর ভেরেচাগিন্-এর আঁকা একটি ছবির সঙ্গে তারকনাথ মন্তব্য ছাপলেন: "১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরে, ১৮৫৮ সালের শান্তি স্থাপনেরও পরবর্তীকালে—প্রতিনিধি-স্থানীয় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক সক্ষম কর্মীদের বিধ্বস্ত করে ব্রিটিশ কামানের গোলা। বিদেশী অত্যাচারীর হাত থেকে যে দেশভক্তরা ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন—তাঁদের মনে আতঙ্ক জাগাতে তাঁদের সামনে নৃশংসতম এই নজির রেখে দিল ব্রিটিশ সরকার। জগতের যে কোনও জাতির মতো এই দেশভক্তরাও ছিলেন স্বাধীনতার অনুরাগী।" ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় "শিখদের জাগরণ" নামে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তারকনাথ লিখলেন: "ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড বলে শিখ সৈন্যদের সুনাম।

আমরা পুলকিত চিত্তে লক্ষ করছি—কী ভাবে ক্রমে ক্রমে শিখ সৈন্যেরা ব্রিটিশের ক্রীতদাসের ভূমিকা থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।" ১৯০৯ সালের ৩রা অক্টোবরে ভ্যাঙ্কুভারে শিখ গুরুদ্বারের এক অধিবেশনে চতুর্দশ শিখ বাহিনীর ২৭৬০ নং সিপাই সরদার গরীব সিং কী নির্ভীকভাবে বক্সার যুদ্ধে অর্জিত তাঁর পদক খুলে ফেলে শপথ নিলেন—"ভবিষ্যতে পদক আর পরব না, আর উর্দি আঁটব না।"—তার প্রশংসায় মুখর হলেন তারকনাথ। ১৯১০ সালের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় তারকনাথ ঘোষণা করলেন যে ভারতের উর্বরতম মস্তিষ্কবিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বিপ্লবের প্রসারে তৎপর হয়ে দাবানলের মতো বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছেন দেশের সর্বত্র। জাতীয় জাগরণের লক্ষণরূপে উৎফুল্ল জনগণ বোমা ও রিভলভারের ব্যবহারকে স্বাগত জানাচ্ছে। "আর একক সাহসে উদ্বুদ্ধ শহীদের প্রয়োজন নেই—এখন চাই সঙ্ঘবদ্ধ গণ-সংগ্রাম।" স্মরণে রাখতে হবে, হাওড়া মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কারাগারে বসে এই সময়েই যতীন মুখার্জী চালিয়ে যাচ্ছেন আসন্ন গণ-সংগ্রামের প্রস্তুতি।

অতঃপর তারকনাথের "ফ্রী হিন্দুস্থান" পত্রিকার কণ্ঠরোধের পালা। মার্কিন সরকারের কাছ থেকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত জানতে পারলেন যে নিউ ইয়র্কের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মস্ ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জর্জ ফ্রীম্যান-কে ডাক দিয়ে হুকুম জানিয়েছেন উক্ত পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করতে। সেই সঙ্গে "গেলিক অ্যামেরিকান" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক জন্ ডিভয় নোটিস দেন ফ্রীম্যান-কে যে ১৯১০ সালের ডিসেম্বরের পরে তাঁকে আর চাকরিতে বহাল রাখা যাবে না। কপর্দকহীন বৃদ্ধ এই আইরিশ বিপ্লবীকে সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ থেকে আশ্বাস পাঠালেন মাদাম কামা এবং সাধ্যমতো মাসোহারা তাঁকে পাঠাতে থাকেন নিয়মিতভাবে।

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত "ফ্রি হিন্দুস্থান" পত্রিকার চেয়েও প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন সৈন্য-বিভাগে বিপ্লবের আদর্শ চাউর করবার মানসে তারকনাথ তাঁর বন্ধু ও শিষ্য গুরুদত্ত কুমারের সম্পাদনায় ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে গুরুমুখীতে প্রকাশ করলেন নূতন এক মাসিক পত্রিকা—"স্বদেশ সেবক"! সারা ভারতে বিভিন্ন সৈন্যাবাসে অতি দ্রুত এই পত্রিকাটির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর চড়ছিল সম্পাদকের বাচনভঙ্গী, অবশেষে শুল্ক, আইনের শরণ নিয়ে ১৯১১ সালের মার্চ মাসে পত্রিকাটির ভারতবর্ষে প্রবেশ

নিষিদ্ধ হল। এর ছত্রে ছত্রে তারকনাথের ভাষার প্রতিধ্বনি নির্ণয় ক'রে ব্রিটিশ সরকার আর একপ্রস্থ প্রমাদ গুণতে বাধ্য হল।

কানাডায় ভারতীয়দের প্রবেশ রুদ্ধ ক'রে ও স্থানীয় প্রবাসী ভারতীয়দের পুত্র-পরিবারকে দেশ থেকে আনানোর বিপক্ষে আইনের কড়াকড়ি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে "স্বদেশ সেবক" সোচ্চার হতে থাকল প্রতিবাদের মাত্রা বৃদ্ধি করে। ১৯১২ সালের জুন মাসে কানাডা সরকার আপসের ধাক্কায় স্থানীয় খালসা দিওয়ান সমিতির অধ্যক্ষ ভগসিং আর বলবন্ত সিং-এর পরিবারকে কানাডায় প্রবেশের অনুমতি দিতেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। পরবর্তী ১৮ই সেপ্টেম্বরে কানাডার গভর্ণর জেনারেল ভ্যাঙ্কুভার পরিদর্শনে আসবেন খবর পেয়ে শহরের পৌরপিতা খালসাদের আমন্ত্রণ জানাবেন শোভাযাত্রায় যোগ দিতে। প্রত্যুত্তরে ৮ই সেপ্টেম্বর ভগ সিং এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে তাঁর অক্ষমতা জানালেন—"যার অসংখ্য হেতু সম্বন্ধে পৌরসভার সদস্যরা এবং ইমিগ্রেশন বিভাগের সভ্যরা সকলেই বিলক্ষণ সচেতন!"...সরকারী মনোভাবের প্রতিকূল যে-উষ্মা প্রবাসী ভারতীয়দের মনে সঞ্চিত ছিল, তাকে সরাসরিভাবে ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহে পরিণত করবার জন্য তারকনাথ চিহ্নিত হয়ে রইলেন। ১৯১৩ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত নেতার কাছে বার্কলে থেকে লেখা তারকনাথের একটি পত্র সরকারি নথিপত্রে স্থান পেল: "আমি এখন অকুস্থলে—শিখ ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে কাজে মেতেছি।... ভারতের মেরুদণ্ড যে-জনসাধারণ, তার মধ্যে হাতে-কলমে কাজ করবার লোকের বড়ই অভাব। সরদার অজিত সিং যদি এখানে আসতে পারতেন ইউরোপ ছেড়ে, তাঁর ভ্রমণের খরচ আমি এখান থেকে বহন করতে পারতাম। আমার শিখ বন্ধুদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি; তাঁরা সবাই কাজ চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুত; কিন্তু কোথায় সেই নেতা?" এর পরবর্তী কালে অজিত সিং-এর গতিবিধির সঙ্গে তারকনাথের বাসনার সংযোগ কোনমতেই কাকতালীয় বলে মেনে নেয়নি ইংরেজ পুলিশ। মাদাম কামার "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় ১৯১৩ সালের মার্চে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সঙ্গে এই পত্রটির একাধিক সাদৃশ্য থেকে উক্ত পুলিশ বুঝে নিল বেনামী প্রবন্ধটির লেখকের স্বরূপ। প্রবন্ধটিতে তারকনাথ লেখেন: "কিছুকাল আগে আমি বলেছিলাম যে আমাদের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আমাদের বিপ্লব আন্দোলন রূপান্তরিত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এক গণ-আন্দোলনে। এই সংগ্রাম

সার্থক হবে তখনই—যখন কিনা আমরা পাব বিপুল জনগণের এবং সৈন্য-বাহিনীর সহযোগিতা।"

ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে আলোচনাপ্রসঙ্গে যতীন মুখার্জী একবার বলেছিলেন: "হতাশার মতো বিলাসে বিপ্লবীর কোনও অধিকার নেই।" তারকনাথও ব্যর্থতায় মুষড়ে না পড়ে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক এডোয়ার্ড ম্যাকম্যাহনের সহযোগিতায় নূতন এক বিদ্যালয় খুললেন সীয়াট্‌লে, ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসে—মূলত প্রবাসী ভারতীয়দের সাক্ষর করবার উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গেই কানাডাতে ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে অভিনব এক ভারত-বিদ্বেষী আইন জারি হচ্ছে শুনে গুরুদত্ত কুমারের আহ্বানে তারকনাথ ছুটে গেলেন ভ্যাঙ্কুভারে; খুললেন সেখানেও একটি ভারতীয় ছাত্রাবাস, লণ্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত "ভারত নিবাস"-এর অনুরূপ। ১৯১১ সালের মার্চ মাসে "স্বদেশ সেবক" পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিয়ে দিয়ে কুমারের নিরাপত্তার বিপক্ষে স্থানীয় সরকার এমন তর্জন-গর্জন শুরু করল যে ভ্যাঙ্কুভার থেকে প্রাণ হাতে কুমার আশ্রয় নিলেন গিয়ে সীয়াট্‌লে। তাঁর আরব্ধ কর্ম চালু রাখলেন "হুসেন রহিম" ছদ্মনামে পোরবন্দরের হিন্দু দেশপ্রেমিক ছগন খৈরাজ বর্মা। হিন্দু ও শিখদের মধ্যে হপ্‌কিন্সন তখন বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে; ক্ষিপ্রহাতে রহিম তার প্রতিকারে সক্ষম হলেন। তারকনাথের সঙ্গে তাঁর সংযোগ অক্ষুণ্ণ রইল।

খেত-খামারে ভারতীয় শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, কল-কারখানায় মজুরের মতো খেটে, অশিক্ষিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যভাব জাগিয়ে ১৯০৬ সাল থেকে দেশপ্রেমের বীজ বপন করে চলেছিলেন তারকনাথ। বিভিন্ন হাসপাতালে স্ট্রেচার-বাহকের কাজ করে, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে নামমাত্র চাকরি ক'রে অর্জিত অর্থ দিয়ে তারকনাথ একাধারে উচ্চ থেকে উচ্চতর শিক্ষার ধাপে উঠতে উঠতে বহুমুখী প্রতিভার সাহায্যে একাধিক ডিগ্রি লাভ করেছেন যেমন, তেমনি স্বদেশ-সেবকের ভূমিকায় অটল থেকে চালু রেখেছেন তিনি ভারতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলোরূপে অবশেষে মনোনীত হলেন তিনি ১৯১১ সালে; এম্. এ. পাশ করে "রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক বিনিময়" বিষয়ে এই বছরেই শুরু করেন তিনি তাঁর ডক্টরেট থীসিস।

সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়ে সাময়িক অর্থসাচ্ছল্যের সুযোগ নিয়ে East India Association নামে একটি কেন্দ্র স্থাপন করে ঐক্যবদ্ধ করে তুললেন কানাডা ও অ্যামেরিকায় সক্রিয় বিভিন্ন ভারতীয় সঙ্ঘ সমিতিগুলির প্রচেষ্টাকে। উচ্চ চিন্তার জগতে প্রতিষ্ঠালব্ধ মার্কিন মনীষীদের সঙ্গে তারকনাথের সৌহার্দ্যের কল্যাণে এবং আপন ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য দিয়ে তিনি সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন। আজীবন তিনি পেয়েছেন অধ্যাপক রবার্ট মর্স লাভেটের মতো অগণিত মহাত্মার সর্বস্ব-পণ করা সহানুভূতি ও বন্ধুত্ব, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক আপ্‌হাম পোপ ও সংস্কৃতের অধ্যাপক আর্থর রাইডার, পালো আলতো (স্ট্যানফোর্ড) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডেভিড স্টার জর্ডান ও অধ্যাপক স্টুয়ার্ট ছিলেন তারকনাথের গুণমুগ্ধ।

এই সন্ধিক্ষণে কলকাতা বিপ্লবী-সংগঠনের প্রতিনিধি জিতেন লাহিড়ি এসে তারকনাথকে দিলেন শুভ-সংবাদ : যতীন মুখার্জীর একচ্ছত্র নেতৃত্বে নূতন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন বিপ্লবীরা এবং তাঁদের সহযোগিতার্থে উত্তর ভারতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রাসবিহারী বসু। প্রায় পিঠপিঠই কালিফোর্নিয়াতে আবির্ভূত হলেন হরদয়াল। লণ্ডনে ও প্যারিসে কিছুকাল তিনি কৃষ্ণবর্মা, মাদাম কামা, সাভারকর ও বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের সাকরেদি করলেও চট্টোর মতো চালু প্রতিভার সঙ্গে টক্কর বাধিয়ে তিনি খুঁজছিলেন রণে ভঙ্গ দেবার সুযোগ। সাভারকরের গ্রেপ্তার নিয়ে হুলস্থূল বাধা-মাত্র হরদয়াল চলে যান ওয়েস্ট ইণ্ডিজে—দেহে যক্ষ্মার সংক্রমণ ও মনে গভীর নিরাশা নিয়ে। মার্তিনিকে বাসকালীন তাঁর হাতে এসে পড়ে কার্ল মার্ক্সের রচনাবলী এবং নৈরাজ্যবাদী কিছু দিবাস্বপ্নের ইস্তাহার। কতক চাঙ্গা বোধ করে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হন সংস্কৃতের অধ্যাপনা প্রত্যাশায় ; অধ্যাপক উড্‌স্ সেখানে যে-নিষ্ঠা নিয়ে পতঞ্জলির "যোগসূত্র" মূল সংস্কৃত থেকে পড়াচ্ছেন, তার বহরে চক্ষু চড়কগাছ হরদয়াল আবার পিঠটান দিয়ে প্রশান্তির অন্বেষণে চলে গেলেন হাওয়াই দ্বীপে। অনন্তর কালিফোর্নিয়া—তাঁর পরবর্তী রণক্ষেত্র। তারকনাথের সৌজন্যে ১৯১২ সালের জানুয়ারি থেকে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের লেকচারার পদ পেলেন তিনি। অন্তরে কিন্তু তখন তাঁর বয়ে চলেছে সর্বনাশা এক ঝঞ্ঝা : মার্ক্সবাদ, নৈরাজ্যবাদ, অবৈধ প্রণয় প্রভৃতি এলোপাথাড়ি

হাজার-রকম বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তিনি! দায়ে-পড়ে ব্রহ্মচর্য-পালনের কুফলে দোদুল্যমান হরদয়াল তাঁর দেশে ফেলে-আসা কন্যা শান্তির প্রায়-সমবয়স্কা এক সুইস ছাত্রী ফ্রীডা হাউসউইর্থ-এর প্রেমে হাবুডুবু। ভারতীয় দর্শনের ক্লাস এই পরিস্থিতিতে কেমন চলতে পারে, অনুমান করা সহজ। একদিন ঝোঁকের মাথায় ধাঁ ক'রে হরদয়াল তীব্র অশালীন ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দকে সমাজের শত্রু, পলায়নবাদী দর্শন-প্রচারক প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করলেন। ক্লাসরুমে উপস্থিত জিতেন লাহিড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সংযত ভাষায় স্মরণ করালেন হরদয়ালকে যে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের বহু পূর্বেই বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক চিন্তা উদ্বুদ্ধ করেছে ভারতের নেতৃবৃন্দকে এবং প্রগতিশীল সেই চিন্তার প্রভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রাম অচিরে পরিণত হতে চলেছে গণযুদ্ধে। লাহিড়ি স্মরণ করালেন হরদয়ালকে—বিবেকানন্দ পলায়ন-বাদী ছিলেন না; সংগ্রামের সমস্ত দাবিকে অস্বীকার করে সত্যিই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন যিনি—তিনি, স্বয়ং হরদয়াল। "আপনি জানেন কি, মিঃ হরদয়াল," বললেন জিতেন লাহিড়ি, "এ দেশেই আপনার আশেপাশে শত সহস্র দেশভক্ত ভারতীয় আজ মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে উদ্যত; এমন মহামূল্য মানব-জীবন—আপনি যদি চাইতেন, তাদের দেদীপ্যমান ক'রে তুলতে পারতেন সামান্য প্রচেষ্টাতে!"

এই দিনের প্রত্যক্ষদর্শী অপর এক ভারতীয় বিপ্লবী—মাদ্রাজের দারিসি চেঞ্চিয়া—লিখেছেন যে লাহিড়ির ভর্ৎসনায় বিমূঢ় হরদয়াল হৃত-সংবিত ফিরে পেয়েই অধ্যাপনায় ইস্তফা দিয়ে ঈশ্বরাদিষ্ট নবীর মতো মহোৎসাহে কালিফোর্নিয়ার খেত-খামারে, খনিতে, কারখানায় খুঁজে বেড়াতে লাগলেন ভারতীয় শ্রমিক-কৃষিজীবী-মজুরদের; ছ'বছরের পরিশ্রমে চিন্তাবিদ তারক-নাথ যেসব সঙ্ঘ-সমিতি দাঁড় করিয়েছেন, পাগল হরদয়াল তাদের মধ্যে এনে দিলেন অপূর্ব এক উন্মাদনা। ১৯১৩ সালের ১১ই জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক থেকে তারকনাথ পেলেন হরদয়ালের জরুরি টেলিগ্রাম: ১৩ তারিখে বার্কলেতে স্বদেশ প্রেমিকদের ফেডারেশন আহূত হয়েছে—সেখানে সুষ্ঠু এক কর্মসূচী পেশ করবার জন্য তারকনাথের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। বাংলার 'যুগান্তর' দলের কীর্তি স্মরণ করে সান্‌ফ্রান্সিস্কোর ৪৩৬ হিল্ স্ট্রীটে স্থাপিত হল 'যুগান্তর আশ্রম'; আন্দোলনের মুখপত্র 'গদর'এর প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হলেন গুরুদত্ত কুমার। কিন্তু ১৯১৩ সালের মে মাসে কুমার চলে

গেলেন ম্যানিলাতে—তারকনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী সেখানে, হংকংএ ও শাংহাইএ বিপ্লবীদের আস্তানা গাড়তে। দিল্লী থেকে আগত রামচন্দ্র পেশোয়ারীর সম্পাদনায় 'গদর' প্রকাশিত হল ওই বছরের নভেম্বরে। ক্রমে ক্রমে হিন্দী, উর্দু, গুরুমুখী ও গুজরাতি নিয়মিত সংস্করণ ছাড়াও কিছু ইংরেজী, পুশতু ও গুর্থালি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে 'গদর' ছড়িয়ে দিল দেশে দেশে ভারতের মুক্তি-সাধনার বাণী। কিন্তু মার্কসবাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে হরদয়াল আবার ফিরে গেলেন ছত্রিশ-রকম শ্রেণী-সংগ্রামের পথে; আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের সান্‌ফ্রান্সিস্কো শাখার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে তিনি 'গদর'-এর সমস্ত দায়িত্ব তারকনাথের হাতে ছেড়ে দিয়ে ১৯১৪ সালের জানুয়ারি নাগাদ মেতে উঠলেন মার্কিন সরকারের বৈদেশিক নীতির পর্যালোচনায়! ইতিমধ্যে—ইংরেজ সরকারের ও ইংরেজ জাতির একান্ত অনুরক্ত উড্‌রো উইলসন ১৯১২ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হয়ে প্রকাশ্য সমর্থন জানালেন সমস্ত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিকার-প্রচেষ্টায়। ১৯১৪ সালের ২৫শে মার্চ সমাজবিরোধী আন্দোলনের অভিযোগে হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করা হল; জামিনে খালাস পেয়ে তিনি সুইৎজারল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে নিমগ্ন হলেন আবার ক্রীড়া-রমণ-রণে। ঠেকে শেখবার পরিবর্তে দেখে শেখবার পক্ষপাতী তারকনাথ অবিলম্বে গ্রহণ করলেন মার্কিন নাগরিকত্ব—যাতে করে অযথা হেনস্তা না হতে হয় উইলসনের মিত্রদের চক্রান্তে এবং যথাসাধ্য আইনসম্মত পথে যাতে করে চালিয়ে যেতে পারেন মার্কিন ভূমি থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৯১৪ সালের ২৩শে মে তিনশ ছিয়াত্তর জন পাঞ্জাবী যাত্রী সমেত বাবা গুরুদিৎ সিং 'কোমাগাতা মারু' জাহাজে ক'রে যখন ভ্যাঙ্কুভারে পৌছলেন, স্থানীয় সরকার এই যাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। জাহাজের অভ্যন্তরে এবং শহরের সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভের আয়োজন করলেন তারকনাথের বন্ধুবর্গ। অবশেষে যখন সসৈন্য দ্বিতীয় একটি জাহাজ কামান দাগানোর ভয় দেখিয়ে দু'মাস বাদে 'কোমাগাতা মারু'কে কলকাতা অভিমুখে ফেরত পাঠিয়ে দিল—গুরুদিৎ সিং-এর হাতে তারকনাথ দিয়ে দিলেন—'যুগান্তর' দলের নেতৃবৃন্দের তালিকা—সেখানে পালটা বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ৩রা সেপ্টেম্বর যখন 'কোমাগাতা মারু' বজবজে পৌছল, যতীন মুখার্জীর প্রধান সচিব অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সেখানে

আপ্যায়ন জানান গুরুদিৎ সিংকে। 'কোমাগাতা মারু' ভ্যাঙ্কুভার ত্যাগের প্রাক্কালে যাত্রীদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেবার ব্যবস্থা করছিলেন তারকনাথ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে ওয়াশিংটন জেলার পোর্ট এঞ্জেল্‌সে অস্ত্রাদি কিনে তারকনাথ তা ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় পাঠিয়ে দেন হোশিয়ারপুরের হরনাম সিং সাহরী, ভগ সিং, মেওয়া সিং ও বলবন্ত সিং-এর হাতে। তারকনাথের সহায়তা করেন হংকং থেকে আগত 'গ্রন্থী' ভগবান সিং। ১৯১৩ সালের শেষে তারকনাথ কলকাতা পাঠিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু অধ্যাপক সুরেন্দ্রমোহন বসুকে ; পথে প্যারিস থেকে সুরেন্দ্রমোহন মারাত্মক এক রাশিয়ান বোমা-প্রস্তুত প্রণালী পাঠিয়েছিলেন তারকনাথকে— তার একটি কপি সমেত হরনাম সিং-এর ডেরায় ধরা পড়ে তারকনাথের লেখা কয়েকটি আপত্তিজনক" পত্র, অন্যান্য বোমা-প্রস্তুতের সরঞ্জাম সমেত।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে ভ্যাঙ্কুভারে মামলা শুরু হল ; প্রকাশ্য আদালতে, ১৯১৪ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে মেওয়া সিং-এর গুলিতে নিহত হল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অবলম্বন ইন্সপেক্টর হপ্‌কিন্সন ! প্রায় সাত বছর ধরে ভারতীয় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তার পুঞ্জীভূত দুষ্কৃতিতে এইভাবে যবনিকা পড়ল। ১৯১৫ সালের ১১ই জানুয়ারি ফাঁসী যাবার আগে শহীদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মেওয়া সিং বিবৃতি দিলেন যে শিখ গুরুদ্বারে ভগ সিংকে হত্যা করবার অপরাধে তিনি হপ্‌কিন্সের প্রাণ হরণ করেছেন ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে।

·

১৯১৪ সালের শেষভাগে বার্লিন থেকে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণ নিয়ে ধীরেন সরকার ও নারায়ণস্বামী মারাঠে অ্যামেরিকায় পৌঁছেই তারকনাথ, বরকতুল্লা, জিতেন লাহিড়ি, বীরেন দাশগুপ্ত প্রভৃতিকে জানালেন বার্লিনে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধাদের কর্মসূচী। বাঙালী-বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে ইতিপূর্বে রামচন্দ্র পেশোয়ারী আর গোবিন বিহারী লাল 'গদর'কে বাঙালী-প্রভাব থেকে মুক্ত করতে উদ্যত হন। "বাঙালী" বলেই বার্লিনে অপর দূত হেরম্বলাল গুপ্ত এদের কাছে পেলেন প্রত্যাখ্যান। অথচ শুরু থেকে অখণ্ড ভারতের আদর্শে অনুপ্রাণিত তারকনাথ হিন্দু-মুসলমান-শিখ-জাঠ-অচ্ছুৎ ভেদাভেদ ভুলিয়ে দেশের সেবার জন্য সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন, সবার প্রয়োজনে বুক পেতে দেন। অপ্রাসঙ্গিক নয় জেনে একটি কথা

এখানে বলা দরকার। যে-রবীন্দ্রনাথের সুপারিশ নিয়ে গোবিন্ বিহারী মার্কিন নাগরিকত্ব অর্জন করেন, সর্বভারতে পূজিত সেই কবি সম্পর্কে (বাঙালী বলে ?) তাঁর তাচ্ছিল্যপূর্ণ বিবৃতি আমরা পাই মার্কিন দপ্তরে! ১৯২৮ সালে বহাল তবিয়তে সানফ্রান্সিস্কোয় জীবিত গোবিন্ বিহারী দীর্ঘ টেলিফোন-আলোচনায় বর্তমান লেখককে কঠোর গলায় শুনিয়ে দেন: "I have no faith in Bengalis ; I can't receive you !" ইতিহাসের বুক থেকে বাঙালীর অবদানকে মুছে ফেলবার হাস্যকর প্রচেষ্টায় রামচন্দ্রের বিধবা পত্নী তারকনাথ সম্পর্কে রূপান্তরে জবাব দেন: "Oh that Bengali student !" সানফ্রান্সিস্কো আদালতে রামচন্দ্রের মারাত্মক ভুলের সংশোধন করে তারকনাথ যে-লিখিত বিবৃতি দেন, তা থেকে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জাগে—রামচন্দ্র একটু যদি নমনীয় বুদ্ধি দিয়ে এই উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারতেন,—তাঁকে অমন শোচনীয় মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হত না। সে-প্রসঙ্গ পরে আসবে।

১৯১৪ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক ছাত্র পরিষদের আসন্ন অধিবেশনকে উপলক্ষ করে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের প্রতিনিধি হিসাবে তারকনাথ ইউরোপে যাবার অনুমতি গ্রহণ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূত্রেই তুরস্ক সফরের অনুমতিও তিনি পান। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে বার্লিনে পৌঁছে তারকনাথ-প্রমুখ পূর্বোক্ত বিপ্লবীরা চট্টো-র সঙ্গে আলোচনা ক'রে মার্কিন পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁকে ওয়াকিবহাল করলেন এবং ইউরোপে প্রস্তুতির পর্ব কতটা অগ্রসর, জানতে পারলেন। এতদিন কোনমতেই চট্টোর আহ্বানে সাড়া না দিলেও অবশেষে তারকনাথ ও বরকতুল্লার টানে জেনিভা ছেড়ে হরদয়াল বার্লিনে হাজির হলেন ১৯১৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি। ১৩ই ফেব্রুয়ারি সেখানে জুটলেন এসে হাথরাসের দেশপ্রাণ রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ। স্বয়ং কাইজারের পদক, খেতাব এবং আদাব গ্রহণ ক'রে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান তালেবরদের উদ্দেশে কাইজারের অনুরোধ-পত্র নিয়ে রওনা দিলেন তুরস্ক অভিমুখে: ওখানে বিভিন্ন ইংরেজ সৈন্য-বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের কারামুক্ত ক'রে আফগানিস্থান হয়ে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা রইল তাঁর। রাজার আগে আগে রইলেন চট্টো, তারকনাথ, বরকতুল্লা, হরদয়াল, তিরুমল আচারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যে তারকনাথ গিয়েছিলেন, কার্যক্ষেত্রে জার্মান কর্মচারীদের গাফিলতির দরুন তা গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে

দেখে জুরিখ হয়ে ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে তিনি কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরা দিয়েই "প্রাচ্যের সমস্যা বিষয়ে গবেষণা"র অজুহাতে জাপানে যান। সেখানে ব'সে বিপুলকায় একটি গ্রন্থ "Japanese Expansion and its significance in World Politics" রচনায় হাত দেন; উক্ত গ্রন্থের একাংশ "Is Japan a Menace to Asia" ১৯১৭ সালে শাংহাইয়ে প্রকাশিত হয় চীনের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শাও-ই হংটং-এর ভূমিকাসমেত। বিপ্লব আন্দোলনের স্বার্থে রাসবিহারী বসু ও হেরম্বলাল গুপ্তের সঙ্গে সহযোগিতার পাশাপাশি তিনি টোকিওতে প্রাচ্যদেশীয় রাজনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন এবং সেইসূত্রে ১৯১৭ সালে "রাশিয়ান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ" উপলক্ষে মস্কো যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন যখন, টোকিওর মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁকে পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে সানফ্রান্সিস্কোয় ফিরে যাবার—কারণ, মার্কিন স্বার্থবিরোধী কার্যাবলীর অভিযোগে সেখানে মামলা দায়ের হয়েছে। ফিরতি পথে আগস্ট মাসে তাঁকে হনোলুলুতে মার্কিন পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার ক'রে সানফ্রান্সিস্কোর হাজতে আবদ্ধ রাখে।

তারকনাথের অনুপস্থিতিতে মার্কিনভূমিতে ঘটনার ধারা পর্যালোচনার একটু প্রয়োজন এখানে। রামচন্দ্রের 'গদর' দল হেরম্বলাল গুপ্তকে পাত্তা না দিলেও সংগঠনের দায়িত্বপূর্ণ কর্মে হেরম্ব জাপান রওনা হলেন যখন, তাঁকে হটিয়ে বার্লিন কমিটির প্রতিনিধিরূপে অ্যামেরিকায় তখন তৎপর হয়ে উঠলেন চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী; তাঁর পরামর্শদাতার ভূমিকায় থাকেন আর্নেস্ট সেকুনা নামে এক জার্মান সুদের ব্যাপারি। দু'জনে মিলে জার্মানীর অর্থসাহায্যের বহুলাংশ বাড়ি, জমি ও সম্পত্তি কেনা-বেচার ব্যবসায় নিয়োগ ক'রে ট্যাঁক ভারি করলেন। 'গদর' দলে তখন রীতিমতো ভাঙন ধরেছে। রামচন্দ্রের জুলুমবাজি অস্বীকার ক'রে তারকনাথের বন্ধু ভগবান সিং নূতন নেতৃত্ব দিয়ে দলটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে অগ্রসর হলেন। এমনি দুর্দিনে চক্রবর্তী কিছু নগদ টাকা দিয়ে রামচন্দ্রকে কব্জা ক'রে দুর্নীতির প্রসার ঘটালেন। ধীরেন সেন ও ভগবান সিং তখনো চেষ্টা করছেন, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্যের জন্য কিউবা ও পানামায় ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে!

১৯১৭ সালের ৬ই এপ্রিল সরকারীভাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন

মিত্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকরূপে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিলেন। তার ঠিক একমাস আগেই—চন্দ্রকান্ত ও সেকুনাকে মার্কিন পুলিশ গ্রেপ্তার করল জার্মানীর সহযোগিতায় ভারতবর্ষে ইংরেজ-সরকারকে নাজেহাল করবার চক্রান্ত মার্কিনভূমিতে ব'সে পরিচালনার অভিযোগে। ৭ই এপ্রিলের মধ্যেই ধরা পড়লেন রামচন্দ্র, হেরম্বলাল গুপ্ত প্রমুখ অন্যান্য বিপ্লবী নেতা, একই অভিযোগে! বিদ্রোহের মনোভাব নিয়ে কয়েক সহস্র ভারতীয় চরমপন্থীকে ভারতে পাঠানো, "ম্যাভারিক" প্রভৃতি কয়েকটি জাহাজ ভাড়া ক'রে ভারতে বিদ্রোহ চালানোর জন্য অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো—বহুবিধ ষড়যন্ত্রে এঁদের লিপ্ত দেখা গিয়েছে, মাণ্ডেল নামে এক ব্রিটিশ গোয়েন্দা কোম্পানির রিপোর্ট অনুযায়ী। জুলাই মাসের মধ্যে জগতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মার্কিন ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ গ্রেপ্তার ক'রে আনলেন এই অভিযোগের অংশীদাররূপে রাজধানী ওয়াশিংটনের জার্মান মিলিটারি আতাশে ফন পাপেন, সানফ্রান্সিস্কোর জার্মান কনসাল ফ্রান্স বপ্, উক্ত শহরের জার্মান মিলিটারি আতাশে ফন্ ব্রিঙ্কেন্, শিকাগোর জার্মান কনসাল ফন্ রাইসভিৎস, হনোলুলুর জার্মান কন্সাল গেয়র্গ রোদরিক ও তাঁর সচিব শ্রোয়েদের্, গুস্তাভ ইয়াকব্সেন, আলবের্ট ভেদে, জর্জ পল বোয়াম, তারকনাথ দাস, ভগবান সিং প্রমুখকে। যাঁদের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট থাকা সত্ত্বেও কোন দণ্ড দেওয়া গেল না, তাঁদের অন্যতম রইলেন এম. এন. রায়, হরদয়াল, বীরেন চট্টো প্রভৃতি। ধরা পড়ামাত্র গুপ্তসমিতির সব কথা ফাঁস ক'রে দিয়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষের সামনে রাজসাক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন চন্দ্রকান্ত, সেকুনা প্রভৃতি উভচর কিছু স্বার্থান্বেষী। ৭ই জুলাই গ্র্যাণ্ড জুরি গঠিত হল—সানফ্রান্সিস্কো মামলায় অভিযুক্ত দুষ্কৃতকারীদের বিচারের জন্য। এই বিচারের প্রহসন চলে দীর্ঘ পাঁচ মাস: আনুমানিক ত্রিশ লক্ষ ডলার ব্যয় বহন করেন মার্কিন সরকার। ১৯১৮ সালের ২২শে এপ্রিল "সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিক্ল্" পত্রিকায় এই মামলাটিকে মার্কিন ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে বর্ণনা করা হয়। অধ্যাপক লাভেট তাঁর আত্মজীবনীতে এই মামলাটিকে মার্কিন জীবনের জঘন্যতম অধ্যায় ব'লে চিহ্নিত করেছেন—ব্রিটিশ সরকারের নির্লজ্জ দাবিকে নিরীহ ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবার জন্য কোনদিন তিনি তৎকালীন মার্কিন রাজনীতির দুর্বলতাকে ক্ষমা করতে পারেননি। রাজসাক্ষীদের তালিকায় নূতন যেসব নাম সংযোজিত হল,

তাদের মধ্যে রইলেন "ম্যাভারিক" জাহাজের কাপ্তেন জন স্টার-হাণ্ট, দুমুখো গুপ্তচর দাউস দেকার, টেহল সিং প্রভৃতি দশজন ঘৃণ্য চরিত্রের জীব।

অভিযুক্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রকারীর ভূমিকা থেকে আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মীর আসনে অধিষ্ঠিত করতে তৎপর হলেন তারকনাথ। জামিনে খালাস পেয়েই ১৯১৭ সালের ২১শে নভেম্বর তিনি শৈলেন ঘোষ, ভগবান সিং এবং আগ্‌নেস্ স্মেডলীকে নিয়ে স্থাপন করলেন 'Indian Nationalist Party'র মার্কিন শাখা এবং নিজেদের ঘোষণা করলেন স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধি রূপে। যতীন মুখার্জীর উত্তর-সাধক যাদুগোপালের স্বাক্ষর নকল করে স্মেডলী ইস্তাহার পাঠালেন রাষ্ট্রপতি উইলসন্ থেকে শুরু করে আমেরিকাস্থ বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রদূতের কাছে; রাশিয়ায় বসে ট্রটস্কি এই ইস্তাহারের কপি পেয়ে সক্রিয় হলেন এঁদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনে। মামলার চাপ সহ্য না করতে পেরে দেশপ্রেমিক যোধসিং মহাজন উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন লক্ষ করে জরুরি আবেদন পাঠালেন তারকনাথ ১৯১৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে। ফল-স্বরূপ যোধসিং-এর মানসিক বিকৃতির পরিমাপ নিতে উইলসন্ নিয়োগ করলেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল অভিজ্ঞ চিকিৎসককে। ৯ই মার্চ তাঁদের মর্মন্তুদ বিবরণ থেকে আমরা পাই "উচ্চ মানবপ্রেমিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ" এক দেশভক্তের পরিচয়।

১৯১৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বিচারের রায়ে বাইশ মাসের কারাদণ্ড লাভ করলেন তারকনাথ। বিচারক প্রেস্টন ও তাঁর সহকারী মিস অ্যানেট অ্যাবোট-এর সনির্বন্ধ অনুরোধ এই মামলার "সবচেয়ে বিপজ্জনক চরিত্র" তারকনাথের মার্কিন নাগরিকত্ব নাকচ করে তাঁকে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে সমর্পণের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে খবর পেয়ে প্রবল ধিক্কার উঠল বিশিষ্ট মার্কিন নাগরিকদের তরফ থেকে; বিখ্যাত কিছু অধ্যাপক, ধর্মযাজক, সেনেটার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সিণ্ডিকেট ও উদারপন্থী সংস্থার প্রতিনিধিরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রপতি উইল্‌সনের কাছে লিখিত পত্রে যে প্রতিবাদ পেশ করলেন, তা অভাবনীয়। মামলায় তারকনাথের অনুকূল সাক্ষ্য দেবার অপরাধে প্রবীণ অধ্যাপক আপহাম্ পোপ-কে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার থেকে অপসারণের প্রস্তাব তুললেন পাবলিক প্রসি-কিউটার। অনুরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করতে লাগলেন তারকনাথের শুভাকাঙ্ক্ষী

উইলিয়াম উদারস্পুন* এবং তাঁর পত্নী মেরিয়ন, মেরিয়নের প্রথম পক্ষের দুই পুত্র কার্লটন ও জন্ নোবল্ ওয়াশবার্ন, জন-এর বাগদত্তা ব্রুমা জালাস্নেক ক্রাউস, তাঁদের বন্ধু-দম্পতি মেরী ও লেমুয়েল পার্টন। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তারকনাথের সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্ত থেকেই কার্লটন তাঁর প্রতি সৌহার্দ্য-পরবশ, পরম সমাদরে তারকনাথকে নিয়ে যান তাঁর বাড়িতে; মা মেরিয়ন ছিলেন দশটি গ্রন্থের লেখিকা, মার্কিন Who's Who তাঁর বহুমুখী প্রতিভার গুণগানে চতুর্মুখ। রাষ্ট্রপতি বেঞ্জামিন হ্যারিসনের আমলে মেরিয়নের মামা জেনারেল জন্ নোব্ল্ ছিলেন খ্যাতনামা একজন মন্ত্রী।

১৮৯৩ সালে শিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে মেরিয়ন ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সামাজিক ও সাহিত্যিক কর্মদক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকবাদের জগতে ভারতের প্রভাব বিষয়ে তিনি বহু গবেষণা করেন। মেরিয়নের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী উইলিয়াম উদারস্পুন ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী এবং মার্কিন স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জন্ উদারস্পুনের বংশধর। ডেমোক্রেটিক ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির মুখপাত্ররূপে উইলিয়াম দুই দু'বার আমন্ত্রণ পান ডেপুটি হিসাবে; কিন্তু শ্রমিক সমবায় প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত থেকে তিনি নামেননি কখনো সরাসরিভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে। মেক্সিকোতে তিনি একাধিক মার্কিন শিল্পপতির পরামর্শদাতা থাকাকালীন উচ্চ-মহলের আদান-প্রদান ক্ষেত্রে ও-দেশের রাষ্ট্রপতি জেনারেল 'পরফিরিও দিয়াজ'-এর সঙ্গে তাঁর ভালরকম পরিচয় ছিল এবং সম্ভবত তাঁর মাধ্যমেই স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর "ম্যাভারিক" জাহাজটি ভারত-যাত্রার জন্য নির্বাচিত হয়। "অ্যানি লার্সেন" জাহাজের জুয়ান ব্যার্নার্দো বাউয়েন উঠতি-বয়স থেকেই উদারস্পুনের স্নেহ পান। চিন্তা ও দর্শনের প্রথম স্তরে বসে উদারস্পুন পত্র-বিনিময় করতেন স্বয়ং লেনিন এবং ট্রটস্কির সঙ্গে। এই পরিবারের সকলেই ছিলেন তারকনাথের মহান্ ব্যক্তিত্বের ভক্ত।

১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে তারকের বন্ধু এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শৈলেন ঘোষ কালিফোর্নিয়ায় গিয়ে ধনগোপাল মুখার্জীর আতিথ্য পান। তারপরে নিউইয়র্কে গিয়ে তিনি আশ্রয় পান এম.

*পূর্বোক্ত মার্কিন জেনারেল উদারস্পুনের সঙ্গে এঁর কোনও আত্মীয়তা ছিল না।

এন. রায়ের বাসায়—কলকাতা থেকে যাদুগোপাল মুখার্জীর কিছু নির্দেশ বহন করে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আগনেস স্মেডলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তাঁর। বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণের সংবাদে রায়ের সঙ্গে ১৯১৭ সালের মে মাসে যখন শৈলেন মেক্সিকো যান, তখন আগ্নেসের অনুরোধে মার্কিন সমাজতন্ত্রবাদী বার্নার্ড গ্যালাণ্ট তাঁকে একটি পরিচয়পত্র দেন—মেক্সিকোতে মন্তেস্ দো'কা-র নামে। ভূপেন মুখার্জী ওরফে মিত্র ওরফে জুয়ান সাঞ্চেস ছদ্মনামে মেক্সিকো থেকে শৈলেন প্রত্যাবর্তন করলেন ১৯১৭ সালের ২১শে নভেম্বর; তারকনাথ সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে তাঁরই পাড়াতে শৈলেনের জন্য বাসা ভাড়া নেন এবং তাঁকে ভিড়িয়ে দেন পড়শী উদার-স্পূনদের দলে। শৈলেনের উদ্ভাবিত যাবতীয় যন্ত্রপাতির নমুনা দেখে মুগ্ধ হয়ে উইলিয়ম বিশেষত ঝর্ণা-কলমের পরিকল্পনাটির পেটেণ্ট নিয়ে সেটি বাজারে ছাড়তে ব্রতী হন এবং মেরিয়ন তাঁদের পারিবারিক বন্ধু বৈজ্ঞানিক আলেক্সাণ্ডার গ্রেহাম বেল্-এর সঙ্গে শৈলেনের আলাপ করান। অবশেষে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিরূপে শৈলেনকে যখন তারকনাথ মস্কো পাঠালেন ট্রটস্কির আমন্ত্রণে, তখন উদারস্পূন-গোষ্ঠী শৈলেনের হাতে দিলেন নিউইয়র্কের বহু বিশিষ্ট নাগরিকের নামে পরিচয়পত্র। মার্কিন সামরিক বিভাগের গুপ্তচর প্রকারান্তরে শৈলেনের এই দৌত্যের সংবাদ পেয়ে ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে "আপত্তিজনক" বহু কাগজপত্র সমেত নিউইয়র্কে তাঁকে গ্রেপ্তার করে; দুদিন আগেই তারা আগ্নেসকেও হাজতে পোরে; সেই সঙ্গে সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে তারকনাথের ডেরায়, উদারস্পূনদের ডেরায়, ব্লুমার ডেরায় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বন্ধুদের ডেরায় হানা দিয়ে পুলিশ বহু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে। তারকনাথের অনুপস্থিতিতে ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ থেকে সমাগত ব্রিটিশ পুলিশের কর্মকর্তা ডেনহ্যাম্ সাহেব স্বয়ং তাঁর বাসা থেকে বহু জিনিসপত্র আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে যাবার কথা মামলায় চাউর হয়ে গেলে জনসাধারণ্যে ধিক্কার জাগে মার্কিন সরকারের ব্রিটিশ তোষণনীতির বিরুদ্ধে। ১৯১৮ সালের ১৮ই মার্চ উদারস্পূনের বাড়ি থেকে টেলিফোন-যোগে স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের কাছে তারকনাথ টেলিগ্রাম পাঠালেন শৈলেন ঘোষ ও আগ্নেস স্মেডলীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সানফ্রান্সিস্কোর পুলিশের আচরণ সম্পর্কে। তার পরদিনই অতি দীর্ঘ একটি পত্রে উদারস্পন্ ও লিখিতভাবে উইল্‌সনের কাছে ব্যক্ত করেন তারকনাথ ও

শৈলেনের "শান্তিপূর্ণ বিপ্লব দর্শন"। মার্কিন তথ্যশালায় রক্ষিত এই পত্রটি বিশেষ আলোকপাত করতে পারবে তারকনাথের ব্যক্তিত্বের সন্ধানী ভবিষ্যৎ জীবনী লেখকের অন্বেষণে।

আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত বারীন ঘোষ যেমন সাময়িক হতাশায় মুহ্যমান হয়ে এবং তামাম বিপ্লব প্রচেষ্টায় সমাপ্তি অনুমান ক'রে অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, তেমনি রামচন্দ্রও নিজেকে প্রফুল্লচাকী-ক্ষুদিরাম-মদনলাল ধিংড়ার সমগোত্রীয় শহীদের ভূমিকায় কল্পনা ক'রে দিন গুণতে থাকেন—কবে তাঁকে ব্রিটিশ পুলিশ ভারতে নিয়ে গিয়ে ফাঁসী দেবে। ১৯১৮ সালের ৬ই এপ্রিল তাঁর বিবৃতির এবং তাঁর এই পরাভূত মানসিকতার সমালোচনা ক'রে তারকনাথ যুক্তিপূর্ণ এক ভাষণে সানফ্রান্সিস্কোর আদালতের বিচারক-মণ্ডলীর সামনে প্রমাণ করলেন যে অভিযুক্ত অন্যান্য আসামীদের কাউকেই কিছু না জানিয়ে সকলের তরফ থেকে রামচন্দ্র যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তাঁর অধিকার নেই, কারণ কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে শুধুমাত্র আপন অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। তারকনাথ স্পষ্ট ভাষায় সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করে ঘোষণা করলেন যে কোনমতেই তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা নিজেদের অপরাধী মনে করেন না ; মার্কিন স্বার্থবিরোধী কোনরকম কার্য-কলাপেই তাঁরা লিপ্ত ছিলেন না : "আমরা আমাদের জন্মভূমির স্বাধীনতাকে চরম লক্ষ্য বলে মনে করি এবং ভারতবর্ষের নির্যাতিত জনগণের মঙ্গলার্থে আমরা যেটুকু করতে পেরেছি, মার্কিন আইন-মতে কোনক্রমেই তা দূষণীয় নয়।…নিজেকে আমি তিলমাত্র অপরাধী মনে করি না, সুতরাং ভারতবর্ষে নিয়ে গিয়ে আমায় দণ্ড দেবার অনুকূল কোনও আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দিতে আমি অপারগ।" জগতের নিপীড়িত ছত্রিশ জাতির ত্রাণকল্পে মার্কিন জনগণ যে প্রচেষ্টায় রত, সরকারী সহানুভূতি থেকে তা যদি বঞ্চিত না হয়ে থাকে, তবে কেন ভারতের মুক্তিকামী এই সংগ্রাম নিন্দনীয় হবে—প্রশ্ন তুললেন তারকনাথ। বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করে ব্যারিস্টার ম্যাকগাওয়ান প্রাঞ্জল ক'রে তুললেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বেচ্ছাচারী রূপ, স্মরণ করালেন—কী ভাবে প্রতিশ্রুতির পরে প্রতিশ্রুতি দিয়েও ওই সরকার কথার খেলাপ করে চলেছে এবং অবজ্ঞা করে চলেছে জনমতকে ; তারকনাথ প্রমুখ প্রতিকারপ্রার্থী দেশভক্তদের জীবন কীভাবে অতিষ্ঠ করে তুলেছে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকায়, কানাডায় এবং জগতের অন্যত্র নির্মম চক্রান্তের

সাহায্যে : "আয়ারল্যাণ্ডের শ'খানেক প্রতিনিধি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে থাকলেও, ত্রিশকোটি ভারতীয়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলবার জন্য একটি প্রতিনিধিও নেই সেখানে !"

১৯১৮ সালের ২৩শে এপ্রিল—বিচারের রায় বের হবার ঠিক একসপ্তাহ আগে—আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিলেন রামচন্দ্র। তারকনাথ, সন্তোখ সিং ও ভগবান সিং যথাক্রমে বাইশ মাস, একুশ মাস ও আঠারো মাসের কারাদণ্ড লাভ করলেন। তারকনাথকে ব্রিটিশের হাতে তুলে না দিতে পেরে মর্মাহত প্রেস্টন মন্তব্য করলেন : "মহাযুদ্ধের সূচনা থেকে আমেরিকায় অন্তত এর চেয়ে মারাত্মক দুষ্কৃতকারী দেখা যায়নি !" কান্‌সাসের কুখ্যাত লেভেন্‌-ওয়ার্থ কারাগারে অবরুদ্ধ তারকনাথের মার্কিন নাগরিকত্ব-হরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রইল ; তাঁর সঙ্গে শৈলেন ঘোষ, আগনেস স্মেডলী, উদারস্প্‌ন-দম্পতি, তাঁদের দুইপুত্র ও ভাবি পুত্রবধূ ব্লুমা, পার্টন-দম্পতি প্রভৃতিকে জড়িয়ে পূর্বোক্ত নূতন মামলাটির নাম হল Indian Nationalist Party Case ; নিউ ইয়র্কের উকিল গীলবার্ট রো ১৯১৯ সালের ১৩ই জানুয়ারি একটি পত্রে অ্যাটর্নি জেনারেল ও-ব্রায়নকে তীব্র ভৎ'সনা করলেন স্মেডলী ও ঘোষকে অবৈধভাবে দীর্ঘকাল আটক রেখে অস্বাভাবিকরকম চড়া জামিনে তাঁদের ছেড়ে দিয়েও নজরবন্দী রাখার দরুন। ঘোষ ও স্মেডলীর সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর জীবনালেখ্য উপস্থাপিত ক'রে এঁদের পাঠ-জীবনের কৃতিত্ব ও ব্যক্তিগত আদর্শবাদের উচ্চমান সম্পর্কে ও-ব্রায়নকে সচেতন করে দিয়ে অস্বাভাবিক ধাতুতে নির্মিত এই দুটি তরুণকে "চিন্তাবিলাসী যৌবনের স্বাভাবিক প্রেরণায়" ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য দূর করবার ব্রতে নামবার সপক্ষে অভিনন্দন জানান ; স্বদেশের মঙ্গলেচ্ছু "শৈলেন ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন" হয়ে মার্কিন ছত্র-ছায়ায় আশ্রয় নেন। পত্রের উপসংহারে গীলবার্ট রো দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ও-ব্রায়নের—কারাবাসী তারকনাথের অগোচরে সরকার যেভাবে উঠে-পড়ে লেগেছে তাঁর দণ্ডভার বৃদ্ধির ধান্ধায়, কতদূর তা গর্হিত এবং আইনবিরোধী। "যে-কোনও মার্কিন নাগরিকের মতোই তারকের অধিকার আছে আত্মপক্ষ সমর্থনে এবং নিজের কার্যের জন্য কৈফিয়ৎ দেবার।"

আটলান্টিক উপকূলের জর্জিয়া জেলার ছোট এক মফস্বল শহরে ওকালতি করতেন জন্ প্রেস্টন ; খামোকা সানফ্রান্সিস্কোর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মামলা পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে ধরাকে তিনি সরা জ্ঞান করতে থাকেন। যেসব

অভিযুক্তদের চামড়া সাদা নয় অসঙ্কোচে তাদের তিনি "নিগার" সম্বোধন করতে থাকেন। এইসূত্রে প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের একান্ত সচিব জোসেফ টিউমাল্‌টির দপ্তরে পুঞ্জীভূত পত্রাদির মধ্যে চিত্তাকর্ষক প্রতিবাদ পেশ করলেন ১৯১৮ সালের ১৪ই জুন তারিখে লণ্ডন-প্যারিস ব্যাঙ্কের সানফ্রান্সিস্কো শাখার অধ্যক্ষ: অভিযুক্ত এই বিপ্লবীদের সাঙ্ঘাতিক চরিত্রের দুর্বৃত্তে পরিণত করবার হীন প্রয়াসের বর্ণনা দিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, "স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতির চেয়ে কোন অংশেই অধিক র‍্যাডিকাল (উগ্রপন্থী) এঁরা নন!" এঁদের নিষ্পেষিত করবার প্ররোচনায় ব্রিটিশ পুলিশের ভূমিকারও উল্লেখ করলেন পত্র-লেখক। বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধে বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর দেহাবসানের মূলে ডেনহ্যাম সাহেবের বিচক্ষণতা উচ্চমহল থেকে অভিনন্দন পাবার পরে ডেনহ্যাম হয়ে ওঠেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুর্ধর্ষ এক অভিভাবক। প্রেস্টনের পরামর্শদাতার ভূমিকায় মার্কিনভূমিতে বসে মার্কিন রীতিবিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে তিনি প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সর্বনাশে মেতে উঠেছিলেন। প্রেস্টনের সহকারী মিস্ অ্যানেট অ্যাবোটকে ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর রূঢ় আচরণের জন্য সোল্লাস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করা হল নিউ ইয়র্কের এক ইংরেজ ক্লাবের তরফ থেকে। এইসব বিপ্লবীদের মার্কিন জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে প্রেস্টন শরণ নিলেন অপাপবিদ্ধ চরিত্রের প্রতি মার্কিন জাতির অনুরাগের। আদালতে তাই বারে বারে তিনি রামচন্দ্রের উল্লেখ করতে গিয়ে স্মরণ করান—ইনি জার্মানীর অর্থভুক্ত তাঁবেদার; পানামায় বাসকালীন ভগবান সিং ভাড়া করেছিলেন একটি উপপত্নী; শৈলেন ঘোষ ধরা পড়েন নিউ ইয়র্কে—একটি নারীর সান্নিধ্যে; তারকনাথের গ্রেপ্তারের সংবাদে বিচলিত হয়ে তাঁর সঙ্গে যখন কার্লটন ওয়াশবার্ণ দেখা করতে যান, "ন্যক্কারজনক বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি" রূপে কার্লটনের (শ্বেতাঙ্গিনী) পত্নী তারকের কেদারার হাতায় উপবেশন করে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন; লেনিন ও ট্রটস্কির মতো সন্দেহজনক চরিত্রের লোকের সঙ্গে উদারস্পূন চিঠি-চাপাটি চালান এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধব সকলেই—বিশেষত ব্লুমা এবং পার্টন-দম্পতি—বলশেভিক আদর্শের প্রচারক; উদারস্পূন স্বয়ং "হৃতপ্রতিপত্তি এক সমাজতন্ত্রবাদী ব্যারিস্টার এবং ডাহা জোচ্চোর", মেরিয়ন "শান্তিবাদ ও হিন্দুদর্শনের চর্চায় ডুবে আপন মার্কিন সত্তা খুইয়েছেন···এবং মার্কিন স্বার্থ সম্বন্ধে বিলকুল উদাসীন" ইত্যাদি।

প্রেস্টনের হাস্যকর আচরণের আড়ালে সক্রিয় অহমিকাপূর্ণ গ্রাম্য মনোভাবে তিতিবিরক্ত হয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁকে নির্দেশ দিলেন ১৯১৯ সালের ১লা এপ্রিল : উদারস্পু ন-দম্পতি ও ব্লুমাকে অবিলম্বে নিষ্কৃতি দেওয়া হক। ওই বছরেই ২৪শে নভেম্বরে স্মেডলী ও শৈলেন ঘোষও নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। কিন্তু অত সহজে নিস্তার পেলেন না তারকনাথ দাস।

প্রধান বিচারপতির পদ থেকে প্রেস্টনকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর সহকারী মিস অ্যাবোট-কে সরকার নিয়োগ করেই জানতে পারল প্রেস্টনের সঙ্গে অ্যাবোটের অন্তরের মিল কত গভীর ছিল। ১৯১৯ সালের ৬ই নভেম্বরে তারকনাথের প্রতিকূল পুঞ্জীভূত অভিযোগ একত্রিত করে মিস অ্যাবোট্ শেষবারের মতো মোক্ষম আঘাত হানতে উদ্যত হলেন তারকনাথকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দেবার অভিপ্রায়ে : "আগ্রাসী রণপ্রিয়" এই "উগ্র এবং চরম স্বার্থপর" ব্যক্তিটির কাছে "মার্কিন নাগরিকত্ব ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পন্থামাত্র"—যদিও সেই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পশ্চাতে "তারকনাথ দাসের স্বীয় মহিমা বৃদ্ধিই" এর একমাত্র উপজীব্য। "আমাদের বিন্দুমাত্র বাসনা নেই তারকনাথ দাস বা অন্য কোনও যদু-মধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ বাড়ানোর," লিখলেন মিস অ্যাবোট! "কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তিটি কী সাঙ্ঘাতিক চরিত্রের জীব সে-বিষয়ে আমার পূর্বসূরী প্রধান বিচারক প্রেস্টনের অভিমতই যথেষ্ট প্রাঞ্জল। এ-হেন চরিত্রের লোককে সহনাগরিক বলে মেনে নিতে নিতান্তই আমাদের গৌরবে বাধে!" ১৯২২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর এবং ১৯২৩ সালের ৩রা আগস্ট মার্কিন বিচার মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারকনাথ মার্কিন আইনের চোখে নির্দোষ প্রমাণিত হলেও ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তাঁকে বারে বারে নাজেহাল হতে দেখি আমরা। ওই বছরের ৯ই জুন তারিখে তাঁর স্ত্রী মেরী কীটিংস দাসের পাসপোর্ট নবীকরণ উপলক্ষে আর একপ্রস্থ বিতণ্ডার সূচনা হল, তারকনাথের মার্কিন নাগরিকত্ব বজায় রাখা সমীচীন কিনা, এই প্রশ্ন নিয়ে। প্রাক্তন সিদ্ধান্তের নজির টেনে "বিপুলকায় ফাইলের স্তূপ" ঘেঁটে অ্যাটর্নী-জেনারেল লু রিং বিশেষভাবে তারকনাথের উচ্চস্তরের মানববৃত্তি ও প্রতিভার উপরে জোর দিয়ে বিতর্কে ছেদ টানলেন। ইতিমধ্যে জর্জটাউন (ওয়াশিংটন) বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে "আন্তর্জাতিক আইন ও সৌভ্রাত্র" বিষয়ে থীসিস লিখে খোদ মার্কিন রাষ্ট্রপতি কালভিন্ কুলিজ'এর হাত থেকে তারকনাথ

লাভ করেছেন তাঁর ডক্টরেট এবং মানপত্র, বৃত হয়েছেন আন্তর্জাতিক আইন সমিতির মার্কিন শাখার সদস্যপদে, প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন বিশ্ববিশ্রুত একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ক'রে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলী সমাদৃত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে।

আপন গরিমা-বৃদ্ধিই তাঁর লক্ষ্য ছিল না—তার একটু পরিচয় দিই। দুটি মামলার মধ্যবর্তী সময়ে, দুইপ্রস্থ কারাবাসের সুযোগ নিয়ে তিনি কয়েকটি গভীর মননশীল প্রবন্ধ রচনা ক'রে ভারতের জনগণের সত্যকার আস্পৃহা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। সেইসঙ্গে অধ্যাপক লাভেট প্রমুখ সাতাশ জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মার্কিন নাগরিককে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন Friends of Freedom for India সমিতি, যার ব্রত ছিল প্রকাশ্যভাবে "ভারতবর্ষ থেকে সমাগত রাজনৈতিক শরণার্থীদের অধিকার মার্কিন-ভূমিতে অক্ষুণ্ণ রাখা"। ১৯২০ সালের ২৬শে জুলাই ইমিগ্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টর মিঃ রোড্স আকস্মিকভাবে পেনসিলভানিয়ার বেথলেহেম ইস্পাত কারখানা তল্লাস ক'রে পঞ্চাশটি ভারতীয় শ্রমিককে ঘেরাও করেন এবং তাদের নিয়ে গিয়ে সঁপে দেন ব্রিটিশ নৌবহরের হাতে—তাদের ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। লোকমান্য তিলকের শিষ্য হার্দিকর এবং মার্কিন সরকারের লেখ্যপ্রমাণক (নোটারি পাবলিক) মারে বার্ণেজ-কে নিয়ে তারকনাথ ছুটে গেলেন এলিস আইল্যাণ্ডে; অজ্ঞাতকুলশীল এই ভারতীয় শ্রমিকদের সঙ্গে এবং বন্দরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করে তিনি তা উপস্থাপিত করলেন অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরে এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন এই ধরনের "ক্রমাগত ব্যাপক" অবৈধ আচরণের প্রতিকার করতে। এই ঘটনাটিও প্রভূত নিন্দা জাগায় মার্কিন জনসাধারণ্যে—বিশেষত যখন জানাজানি হয়ে গেল যে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ উক্ত শ্রমিকদের সাগরপার করে দেবার দক্ষিণা হিসাবে মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চড়া একপ্রস্থ রাহা খরচ আদায় করেও সহায়-সম্বলহীন এই ভারতীয় শ্রমিকদের গলায় গামছা দিয়ে খাটিয়ে নিচ্ছিল খালাসীরূপে, "বিনা ভাড়ায় জাহাজে চড়া"র অপরাধে। মার্কিন সরকার যে এ-ধরনের দুর্নীতিকে আস্কারা দিতে পারেন না—সে-বিষয়ে সংশয়বিহীন তারকনাথ শ্রম-মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব করলেন—সরকার এবং ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যস্থরূপে বিনা বেতনে কাজ করবার। ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে তারকনাথ যে

অতীতে এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সে-কথা বিস্মৃত হলেন না সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী। তারকনাথের উৎসাহেই নিউ ইয়র্কের ব্যবহারজীবী স্যামুয়েল গোল্ড মার্কিন সরকারের দরবারে প্রশ্ন তুললেন: ১. ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষ থেকে আগত শ্রমিকদের মার্কিন মুলুকে প্রবেশের সপক্ষে কোনও কোটা আছে কি?—২. এই শ্রেণীর শ্রমিকরা কি ইচ্ছামতো মার্কিন নাগরিকত্ব অর্জনের কোনও অধিকার রাখে?—৩. ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের কোনও ব্যবসায়ী কি আবাসিকভাবে যতদিন খুশী চেম্বার ভাড়া নিয়ে ও-দেশে অর্থ উপার্জন করতে পারে?—৪. গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন সরকারের মধ্যে নিষ্পন্ন বাণিজ্য-চুক্তি কি ব্রিটিশ ভারতের ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?

হরদয়াল, ধনগোপাল মুখার্জী, শৈলেন ঘোষ, এম্. এন. রায় প্রভৃতি সন্দেহজনক চরিত্রের ভারতীয়দের সঙ্গে তারকনাথের বন্ধুত্ব মার্কিন পুলিশের চক্ষুশূল ছিল, তেমনি বামপন্থী সাকো ও ভাঞ্জেত্তির সমর্থকদের সঙ্গে তাঁর লেনদেন, ইউরোপ থেকে বীরেন চট্টো-কে মার্কিন দেশে আনানোর প্রচেষ্টা, আইরিশ বিপ্লবী নেতা ইমন ডি ভ্যালেরার সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন বিনিময়—সবই সজাগ দৃষ্টিতে মার্কিন পুলিশের গুপ্তচর পর্যবেক্ষণ করত এবং উপরওলার কাছে রিপোর্ট দিত। সর্বোপরি পণ্ডিচেরীতে তিনি চিঠি দিতেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে সাধনার নির্দেশ প্রার্থনা করে। ১৯২৪ সালের ১০ই জুলাই আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছে তারকনাথের সাধনার প্রশংসা করে বলেছিলেন: "সে বেশ ভালরকম উন্নতি করে চলেছে, যতক্ষণ না মনের চেয়ে উচ্চতম কোন-কিছুর সন্ধান সে পাচ্ছে, ততদিন তাকে সাধনা চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন।"

১৯৫২ সালে, দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছরের প্রবাস-জীবনের শেষে স্বল্প-মেয়াদে তারকনাথ ফিরে এসেছিলেন জন্মভূমির কোলে। ৯ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় আয়োজিত এক জনসভায় তিনি তাঁর জীবনের প্রথম প্রেরণাদাতা যতীন মুখার্জী-কে (বাঘা যতীন) স্মরণ করে বলেছিলেন: "দেশের জনসাধারণ দেশের জন্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহাদের সেই ত্যাগবরণের ইচ্ছাকে কি করিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত করিয়া দেশকে বড় করিয়া তুলিতে পারা যায় তাহা নেতৃবৃন্দ বড় বেশী চিন্তা করেন নাই। দেশের যুবশক্তিকে আজ সেই ভার গ্রহণ করিতে হইবে। যতীনদার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া

তাহাদিগকে প্রকৃত কাজ করিয়া যাইতে হইবে। যতীনদা জেলায় জেলায় সংগঠন তৈরী করিয়াছিলেন। তেমনি করিয়া দেশের যুবশক্তিকেও সারা দেশে সংগঠন তৈরী করিতে হইবে। তাহা না হইলে বাঙলা ও ভারত বড় হইতে পারিবে না।···যতীনদার কাজ করিবার প্রণালীতে ছিল সামরিক নিয়মশৃঙ্খলা। তাঁহার কর্মপদ্ধতিতে আংশিক শৃঙ্খলা বলিতে কিছু ছিল না। পূর্ণ অনাবিল শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠাই যতীনদার কর্মপ্রণালীতে দৃষ্ট হয়। সেইভাবেই জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা না হইলে যে জাতি আজ অনাহারে মৃত্যু পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে বাঁচান যাইবে না। আজ ভারতের যে স্বাধীনতা আসিয়াছে, দেশবাসী যদি যতীনদার আদর্শ অনুসরণ করিয়া শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার পথে কাজ না করে তাহা হইলে তাহারা সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। আপনারা যতীনদার মতো দেশের যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে সংগঠন করিতে প্রস্তুত আছেন কি? যতীনদা বাংলাদেশে তথা সারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে গুপ্ত এক গভর্ণমেণ্ট তৈরী করিতে চাহিয়াছিলেন। আজ সেই বাঙালা কেবল চীৎকার করিতে জানে।···সারা দেশে যতীনদার আদর্শে সামরিক সংগঠনের মতো সুশৃঙ্খল এক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবেই যতীনদার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে।"

যে মহাপুরুষ তাঁর উদার প্রগতিবাদের অপরাধে সারা জীবন মার্কিন সরকারের চোখে বামপন্থীরূপে পরিগণিত হয়েও "স্বধর্ম" বিসর্জন দেননি, কলকাতার জনসভায় সেদিন দেশপ্রাণ সেই বিপ্লবীকে কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবকের কাছে লাঞ্ছিত ধিক্কৃত হতে হয়েছিল—"মার্কিন সরকারের চর" অপবাদে। নিজগুণে তিনি তাদের ক্ষমা করলেও ইতিহাস কি ভুলতে পারবে তাঁর অন্তরের গোপন ক্রন্দন?

তথ্যপঞ্জী

[আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫২]

Dr. Prithwindra Mukherjee: *Les origines intellectuelles du mouvement d'independance de' l' Inde* (Thesis for State Doctorate, Sorbonne).

যতীন মুখার্জী ও মানবেন্দ্রনাথ

॥ এক ॥

মেক্সিকোয় প্রথম কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা, লেনিনের সান্নিধ্য-ধন্য মানবেন্দ্রনাথ রায় শিক্ষিত জগতে এক পরিচিত নাম। দুনিয়াদারির পর্ব চুকিয়ে, জীবনের সায়াহ্নকালে তিনি দেনাপাওনার খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন যা কিছু তিনি পেয়েছিলেন তাঁর প্রথম বিপ্লবী জীবনের গুরু যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। হয়তো-বা তাঁর উন্নাসিক কিছু ভক্ত-স্তাবকের অপ্রসন্ন দৃষ্টির সামনেই এই যতীন্দ্রনাথকে তিনি ঠাঁই দিয়েছিলেন লেনিন প্রমুখ যেসব ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি—তাঁদেরও অনেক ঊর্ধ্বে: "এঁরা সবাই মহামানব (great men); যতীনদা ছিলেন ভাল মানুষ (goodman) এবং তাঁর চেয়ে ভাল মানুষ আমি এখনো খুঁজে পাইনি।...তাঁকে বুঝতে হবে সেই অলোকসামান্যদের একজন বলে, যে অলোকসামান্যদের আদলেই গড়া হয়েছে মানুষকে, যে অলোকসামান্যরা, সংখ্যায় নগণ্য হলেও, মরজীবনযাপনান্তে চলে যান কালের বেলাভূমিতে আপাতদৃষ্ট পদচিহ্ন না রেখে। বস্তুত তাঁরাই স্থূল ব্যাপক মামুলি জীবনের অন্ধকার বিদীর্ণ করে অবতীর্ণ হন আশার আলোক বুকে জেলে।...মহা-মানবদের চাঁদের হাটে ক্বচিৎ আমরা ভাল মানুষদের আসন দিই। এই রেওয়াজ চালু থাকবে, যতদিন goodness স্বীকৃতি পাচ্ছে সত্যকার greatness-এর পরিমাপ রূপে।..."

ব্যাং হতে গেলেই যে ব্যাঙাচি হবার প্রয়োজন আছে, সামান্য এই জৈবিক বিধানটুকুর প্রতি সন্দিহান কিছু জীবনী-লেখক যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রায়ের স্বীকৃতিকে সম্ভবত ভীমরতির লক্ষণ ভেবে থাকবেন। কারণ, গুপ্ত সমিতির প্রায়ান্ধকার ইতিহাসের সুযোগ নিয়ে এঁরা কেউ কেউ ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায় যতীন মুখার্জীকে অধিষ্ঠিত করে শিক্ষানবীশ মানবেন্দ্রনাথকে (তখন অবশ্য নরেন ভট্টাচার্য) দিয়ে বাঘা বাঘা অঘটন সংঘটিত করিয়েছেন অথচ ভারতীয় এবং পাশ্চাত্যদেশীয় বিভিন্ন মহাফেজ-খানায় রক্ষিত আছে এমন সব নথিপত্র, যার সাহায্যে অদূরভবিষ্যতের গবেষকেরা এইসব অনুজের পুত্রদের কাছে কৈফিয়ত চাইবেন তাঁদের

জালিয়াতির জন্য। একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী যতীন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছেন: "নরেন আমার ডান হাত!" সেই ডান হাতকে যাঁরা হৃদয় বা মস্তিষ্কের স্থলাভিষিক্ত করতে চান, তাঁদের আচরণে শঙ্কিত হবার সময় আসন্ন।

আলোচ্য যুগ ও আন্দোলন নিয়ে দীর্ঘ তিন দশকের উপর নাড়াচাড়া করবার সুবাদে ১৮৭১ সালে যখন প্রথম হাতে পেলাম ফণী চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তি, তখন প্রত্যক্ষভাবে আমি গবেষণা করছি যুগান্তর দলের নমস্য নেতা (এবং যতীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য) ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের তত্ত্বাবধানে। পরোক্ষভাবে কলকাঠি নাড়ছেন এবং প্রেরণা দিচ্ছেন অরুণচন্দ্র গুহ, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ আর ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। এঁদের কাছে কথা দিয়েছিলাম ফণীর ওই স্বীকারোক্তি হুট করে ছাপব না; কারণ আলোচ্য যুগের ও আন্দোলনের বহু অম্ল-মধুর বাস্তবতার উল্লেখ করেছেন, ফণী, নিতান্ত দায়ে পড়ে। মার্কিন মহাফেজখানায় 'ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলা (সানফ্রান্সিস্কো)' সংক্রান্ত নথিপত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই স্বীকারোক্তি বিশেষ একটি তাৎপর্যের মর্যাদা পায়। আজ, ইতিহাসের স্বার্থেই, সংগৃহীত অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে ফণীর স্বীকারোক্তির অংশ-বিশেষ ব্যবহার করছি কিছু আলো-ছায়ার সন্ধানে।

॥ দুই ॥

"গায়ে জোরওলা কিছু ছেলের সঙ্গে পরিচয় করাতে পারিস?"

প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০) প্রশ্ন করলেন সোদপুরের শিক্ষাব্রতী শশীভূষণ রায় চৌধুরীকে। প্রমথনাথ নৈহাটির ছেলে। ১৮৭৫ সালে বিলেতে ব্যারিস্টারি পাস করবার প্রাক্কালে তাঁর বন্ধুত্ব হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)-এর সঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে প্রমথনাথের অন্তরে দেশপ্রেমের যে-আগুন জ্বলেছিল, তাতে ইন্ধন জুগিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ। রিপন কলেজ প্রতিষ্ঠা করে সুরেন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছেন প্রমথনাথকে আইনের অধ্যাপনা করতে। মিত্র সাহেবের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ আলাপ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর চেয়ে প্রায় বিশ বছরের কনিষ্ঠ "বন্ধু" শশিভূষণের। দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারের অজুহাতে স্বদেশানুরাগ জাগাতে যখন সুরেন্দ্রনাথ সারা ভারত

সফর করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, শশিভূষণ থেকেছেন তাঁর সঙ্গে। আপন জন্মগ্রাম তেঘরায় শশিভূষণ শ্রমিক ও মজুরদের জন্য নৈশবিদ্যালয় এবং কারিগরি শিক্ষার পলিটেক্‌নিক স্কুল খুলেছেন সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহে।[১]

১৯০০ সাল নাগাদ মিত্র-সাহেবের ওই প্রশ্ন শুনে শশিভূষণ তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন গুটিকয় যুবককে। ১৮৯১ সাল থেকে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ও মফস্বলে যেসব আখড়া গজিয়েছিল, সেখানে ঘুরে ঘুরে শশিভূষণ নিজেই সংযোগ স্থাপন করছিলেন উল্লেখযোগ্য কিছু ছেলে ছোকরার সঙ্গে—দেশের কাজে তাদের লাগিয়ে দেবেন বলে। সদ্য তখন 'আত্মোন্নতি' সমিতি স্থাপিত হয়েছে এখনকার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে, খেলাৎচন্দ্র বিদ্যালয়ে; ব্যায়ামে পারদর্শী সতীশ মুখুজ্যে, নিবারণ ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনাথ নন্দীকে খবর দিলেন শশিভূষণ—মিত্র-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। ঢাকার নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক শিক্ষকতা করতেন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় এবং ফাঁকে ফাঁকে আসতেন কলকাতায়। তাঁরও ডাক পড়ল। আর শশিভূষণ নিজে সঙ্গে করে প্রমথনাথ মিত্রের দরবারে হাজির করলেন বিশিষ্ট এক স্নেহ-ভাজন যুবককে: নাম তার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯১৫), ভবিষ্যতের বাঘা যতীন!

নানা কারণেই যুবকটি বিশিষ্ট। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের ভাইপো সুরেন ঠাকুরের কাছ থেকে শশিভূষণ জানতে পারেন যে ১৮৯৩ সালে কৃষ্ণনগর অ্যাংলো-ভার্নাকিউলার স্কুলের ছাত্রাবস্থায় নিজের জীবন বিপন্ন করে এক পাগলা ঘোড়াকে বশ করেন যতীন্দ্রনাথ—একটি শিশুকে বাঁচানর জন্য। দুরন্ত সহপাঠীদের নিয়ে গড়েছেন তিনি কৃষ্ণনগর-কুষ্টিয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে কয়েকটা ফুটবল ক্লাব আর কুস্তির আখড়া। যতীনের মামা কৃষ্ণনগরের উকিল বসন্ত চাটুজ্যে আর ঠাকুর বাড়ির সুরেন এই তরুণদের আমন্ত্রণে গিয়ে শোনাতেন তাদের দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের কাহিনী, দিতেন সরল কথায় আইন ও অর্থনীতির পাঠ। ১৮৯৭ সালে কলকাতার সেণ্ট্রাল কলেজে ভর্তি হয়েই যতীন্দ্রনাথ পেয়েছেন স্বামী অখণ্ডানন্দের মাধ্যমে খোদ বিবেকানন্দের নাগাল। বিবেকানন্দ খুঁজছিলেন তখন ইস্পাতের স্নায়ু আর বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্কসম্পন্ন কিছু ছেলে—সারা ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে। যতীন্দ্রনাথকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ নিয়মিত তাঁর কাছে যাবার: তাকে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক

স্বাধীনতা না এলে বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক ব্রত অসমাপ্ত থাকবে। যতীনকে তার সুগঠিত দেহের অনুশীলন বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়ে স্বামীজী তাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁরই কুস্তির গুরু অম্বু গুহের ছেলে ক্ষেত্র'র কাছে তালিম নিতে। আর তিনি যতীনকে বলেছিলেন—গীতাপাঠের সাহায্যে, কর্মযোগের সাধনায় জীবনের তাৎপর্য খুঁজে নিতে। বৈরাগ্যকে বিলাস মনে করে সমাজসেবার মাধ্যমে তাকে তিনি প্রবৃত্ত করেন মোক্ষের সন্ধানে। নিবেদিতা কলকাতায় এসে যখন মহামারীর প্রকোপ থেকে নাগরিকদের ত্রাণের ব্যবস্থা করলেন, তাঁর পাশেও দেখেছেন শশিভূষণ এই যতীন্দ্রনাথকে।[২]

এর অল্পকালের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে ধুত্তোর বলে দেশের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন যতীন মুখুজ্যে। জীবিকার জন্য প্রথম এক সাহেব কোম্পানিতে কিছু দিন চাকরি করে তার পরে তিনি মজঃফরপুর চলে যান ব্যারিস্টার প্রিংলে কেনেডির সচিবরূপে। কেনেডি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিভোগী ইতিহাস-গবেষক ও ইংরেজি 'ত্রিহুত কুরিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বছর-তিনেক তিনি ছিলেন তার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক। কংগ্রেস প্ল্যাটফর্ম থেকে তিনি দাবী জানাতেন ভারতের নিজস্ব জাতীয় সৈন্য-বাহিনী গঠনের স্বপক্ষে। কেনেডি প্রতিবাদ জানাতেন ভারতের অর্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্য-বাহিনীর ভরণ-পোষণের বিরুদ্ধে। এঁর কাছে যতীন্দ্রনাথ আপন ভাবনার অনুকূল বহু প্ররোচনাই লাভ করেন,—বিশেষত এই সময়েই যতীন্দ্রনাথের মনে প্রবল হয়ে ওঠে দেশীয় সৈন্যদের নিয়ে দেশের কাজে নামবার বাসনা। মজঃফরপুরেও যতীন্দ্রনাথ যুবক-মহলে চালু করলেন জিমনাস্টিক ও অ্যাথলেটিক্‌স্‌ প্রতিযোগিতার—এবং গীতাপাঠের।[৩]

কয়েকটি অসামান্য চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ ক্ষেত্র গুহের আখড়ায়। শচীন বাঁড়ুজ্যে তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন আপন পিতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের কাছে; যোগেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯০৪) পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের আশিস আর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহচর্য; বিবেকানন্দ তাঁর বৈঠকখানায় লিখে দিয়ে গিয়েছেন—১৯২৫ সালে ভারত স্বাধীন হবে! মাৎজিনী ও গারিবালদিকে তিনি বাঙালী পাঠকমহলে উপস্থিত করে ঘরে ঘরে জাগিয়েছেন স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা। মিত্র-সাহেব ছাড়াও, শশিভূষণের

উৎসাহে যতীন্দ্রনাথ উপনীত হয়েছেন সমসাময়িক বহু চিন্তানায়কের অন্দর-মহলে। মিত্র সাহেব ও শশিভূষণের সঙ্গে তিনি জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ (১৯০৮ সাল থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজ)-এর জিমনাশিয়মে দেখা পেয়েছেন নবযুগের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির; এঁদের মধ্যে প্রিয়ব্রত সরকার, পুলিন মুখুজ্যে, ধীরেন মিত্র, নিউ ইণ্ডিয়া ইনস্ট্যুটের প্রধান শিক্ষক নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ নন), সতীশ বসু প্রভৃতি মিত্র-সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাদর্শকে সামনে রেখে ১৯০২ সালে মদন মিত্র লেনে প্রতিষ্ঠা করলেন আদি 'অনুশীলন' সমিতি। এর থেকেই জন্ম নেবে ঢাকার 'অনুশীলন' দল এবং কলকাতার 'যুগান্তর' দল।

'অনুশীলন' সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবার ক'মাস আগে বরোদা থেকে নিবেদিতা ও সরলা ঘোষালের নামে শ্রীঅরবিন্দের পরিচয়পত্র সমেত আর এক যতীনের আবির্ভাব হল কলকাতায়। ইনি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩০)—বাঘা যতীন বা যতীন মুখুজ্যের চেয়ে মাত্র বছর-খানেকের বড়। ব্রিটিশ সরকার বাঙালীকে সৈন্য-বাহিনীতে ঢুকতে না-দেবার গ্লানি-মোচনের উদ্দেশ্য নিয়ে যতীন বাঁড়ুজ্যে বরোদায় গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের শরণ নেন। জে. এন. উপাধ্যায় ছদ্মনামে উক্ত রাজ্যের সৈন্য-বাহিনীতে আশানুরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি এলেন—বাঙালির ছেলেকে সামরিক শিক্ষা দিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত করতে। তাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের সঙ্কল্প। বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড আর কৈলাস বোস স্ট্রীটের মোড়ে আখড়া খুললেন যতীন বাঁড়ুজ্যে। দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল তাঁর সুনাম। অনুশীলন নেতা ও কর্মীদেরও প্রিয় হয়ে উঠল এই আড্ডা। শ্রীঅরবিন্দ দরাজ মাসোহারা পাঠিয়ে এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থানকে দিলেন যোগ্য মর্যাদা। সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে অধ্যাপক শ্রীশ সেন (বার্লিন কমিটি-প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম নেতা), সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি আসতে লাগলেন এখানে নব জাগরণের স্পন্দন পর্যবেক্ষণে।

সত্যি বলতে কি মিত্র সাহেব ঠিক এতখানি উগ্রপন্থী পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই 'অনুশীলন' তিনি উঠিয়ে নিয়ে গেলেন ৪৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। প্রায় তার পিঠপিঠ শ্রীঅরবিন্দের অনুজ বারীন ঘোষ এসে পড়লেন বরোদা থেকে; 'অনুশীলন' ভবনে আস্তানা গেড়ে যোগ দিলেন তিনি যতীন বাঁড়ুজ্যের আখড়ায়। কিন্তু বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের পছন্দ হল না

বারীনের সন্ত্রাসবাদী মনোভাব। এই মনোভাবের সঙ্গে না-জানা এক চাঞ্চল্যের টানে বারীনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন আখড়ার একদল কর্মী : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের অনুজ), আড়বেলিয়ার অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি চাইলেন বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের শৃঙ্খলা-প্রিয় আওতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে। ডাকাতির জন্য নিবেদিতার কাছে রিভলবার সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁরা বকুনি খেলেন। সপ্তাহখানেক নিরুদ্দেশ থেকে কর্মীরা ফিরে এলে বাঁড়ুজ্যে মশাই উদ্যত হলেন তাঁদের দণ্ড দিতে। বারীনে-বাঁড়ুজ্যের বনিবনা করাতে ১৯০৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় এসে উঠলেন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়িতে।

এই সুযোগে বিদ্যাভূষণ নিভৃত এক বৈঠকে শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলেন তাঁর স্নেহাস্পদ যতীন মুখুজ্যেকে[৪]। তিনজনেরই প্রধান লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন। সৈন্য-বাহিনীর মধ্যেও দেশপ্রেম প্রচারের দিকে তিনজনের ছিল সমান আগ্রহ। দেশের যুবশক্তিকে ক্ষাত্রধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য সর্বত্র অজস্র গুপ্ত সমিতির পত্তন ও রাজদ্রোহের প্রস্তুতি হবে প্রথম লক্ষ্য। সেই সঙ্গে জনমত প্রস্তুত করতে হবে প্রকাশ্য বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে। ব্রিটিশ-বিরোধী অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা লাভের জন্য বিদেশে পাঠাতে হবে কর্মীদের—উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি ও সামরিক শিক্ষা নেবেন তাঁরা বিদেশী সংস্থায় ভর্তি হয়ে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে গড়ে তুলতে হবে স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের বনিয়াদ।[৫]

বারীনের অনমনীয় আচরণের সংবাদে বরোদায় ফিরে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে কলকাতা ছেড়ে যেতে লিখলেন। বারীন ফিরে গেলেন বরোদায়। কিন্তু মিত্র-সাহেবের সঙ্গেও বাঁড়ুজ্যের তখন তাল রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠায় তিনি চলে গেলেন উত্তর ভারতে: সোহহং স্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হলেন বাঁড়ুজ্যে। নেপালে, তিব্বতে, গাড়োয়ালে, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, পঞ্জাবে, পেশোয়ারে, কাশ্মীরে —যখন যেখানে তিনি গেলেন, সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন শ্রীঅরবিন্দ-পরিকল্পিত বিপ্লবের বাণী। বিশেষত স্বামী দয়ানন্দ-প্রবর্তিত আর্যসমাজের সভ্যেরা অকুণ্ঠ সমাদরে গ্রহণ করলেন এই বাণী। নিরালম্ব তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন সৈন্য-বাহিনীর কেন্দ্রগুলির দিকে।[৬]

প্রায়-সমবয়সী এবং সমধর্মী এই বিপ্লবী বন্ধুকে যতীন মুখুজ্যে ভুলতে পারেন নি। নিজ কর্মসূচীর বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি স্বয়ং অথবা তাঁর দূত গিয়ে নিরালম্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। নিরালম্বও ঐকান্তিক মমত্ব নিয়ে যতীন মুখুজ্যের প্রয়াসে সরবরাহ করেছেন ঈপ্সিত লোকবল, তাঁকে দিয়েছেন আপন অভিজ্ঞতার সুফল।

সরকারি চাকরির প্রয়োজনে ১৯০৩ সাল থেকে যতীন মুখুজ্যেকে প্রতি বছরই ক'মাস দার্জিলিঙে কাটাতে হত। কলকাতা 'অনুশীলন'-এর শাখা 'বান্ধব সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন তিনি দার্জিলিঙে; মজফরপুরের মতো, এখানেও তাঁর শরীর-চর্চার আখড়া জনহিতকর ক্রিয়াকর্ম, গীতাপাঠের ক্লাস যুবক ও ছাত্রমহলে প্রভূত সাড়া তুলল।[৭] ১৯০৬ সালের এক সরকারি রিপোর্টে পাওয়া যায় এই অঞ্চলে নেপালি ভাষায় কিছু স্বদেশী বক্তৃতার নমুনা।[৮] উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও ১৯০৪ সাল নাগাদ 'বান্ধব সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন যে-নেতৃবৃন্দ, তাঁদের মধ্যে মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী ও অন্নদা কবিরাজ, যোগেন বিদ্যাভূষণের আত্মীয় হিসাবে, কলকাতাতেই যতীন মুখুজ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। রংপুরে এঁদের আগ্রহে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নেতা ঈশান চক্রবর্তীর: এঁর পুত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তী এবং শিষ্য প্রফুল্ল চাকী বিপ্লবী বাংলার প্রথম এবং দ্বিতীয় শহীদ। চন্দননগর গোঁদলপাড়াতেও 'বান্ধব সমিতি' স্থাপন করেন যাঁরা, তাঁদের পুরোধা অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়, বসন্ত বাঁড়ুজ্যে, শ্রীশ ঘোষ, অমরেন্দ্র চাটুজ্যে, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, উপেন বাঁড়ুজ্যে, জ্যোতিষ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গেও যতীন মুখুজ্যের ছিল গভীর বন্ধুত্ব। ১৯০৫ সালের শেষে যতীন্দ্রনাথ যখন হীরালাল রায় ও বিজয় রায়ের আমন্ত্রণে ভূষণামহম্মদপুরে যান সীতারাম উৎসবে পৌরোহিত্য করতে, সেখানেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি 'বান্ধব সমিতি': এখানে এক গুপ্ত বৈঠকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন তারকনাথ দাস, অধর নস্কর, শ্রীশচন্দ্র সেন (অধ্যাপক) ও সত্যেন সেন। এঁরা চারজনেই পিঠপিঠ বিদেশে রওনা হয়ে গেলেন এই বৈঠকের অল্পকালের মধ্যে।[৯]

শ্রীঅরবিন্দের অনুমোদন ও যতীন মুখুজ্যের উৎসাহে ১৯০৪ সালে কলকাতায় খোলা হল 'ছাত্রভাণ্ডার' মূলত নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক ও ইন্দ্রনাথ নন্দীকে কেন্দ্র করে। অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ, বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রচার এবং কলকাতার সঙ্গে মফস্বলের ও বিভিন্ন প্রদেশের গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে

সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব নিলেন এঁরা আপাতদৃষ্ট ব্যবসার আড়ালে। বাংলার জেলায় জেলায় বেশ কয়টি 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর শাখা খোলা হল: শিবপুরে ননীগোপাল সেনগুপ্তের কেন্দ্র, খিদিরপুরে ডাঃ শরৎ মিত্রের কেন্দ্র, মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র কানুনগো (দাস) ও সত্যেন বসুর কেন্দ্র তাদের মধ্যে অন্যতম। কিছু দিনের মধ্যেই 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের পিছনে অপরিহার্য হয়ে উঠল 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর অবদান।

বারীন ঘোষ ১৯০৪ সালে কলকাতা ফিরে এলেন শ্রীঅরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' পরিকল্পনা বাস্তব করতে। দেখতে দেখতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ল। বারীন উদ্যত হলেন নিজস্ব দল গঠন করতে। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাসে যে সমাজের চিত্র আঁকা ছিল, সেই সমাজের আদর্শকে রাজনীতিতে প্রবর্তনের মানসে ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে অবশেষে বার হল সাপ্তাহিক 'যুগান্তর', ২৭ নং কানাই ধর লেন থেকে। ১৯০৭ সালে মুরারিপুকুর বাগানে (মানিকতলায়) খুললেন তিনি বোমার কারখানা—তাঁর গুণমুগ্ধ পূর্বোক্ত কর্মীদের সঙ্গে যোগ দিলেন উপেন বাঁড়ুজ্যে, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি। এই সময় থেকে যতীন মুখুজ্যের নিকটতম সহকর্মী কিরণ মুখুজ্যে, নিখিলেশ্বর, কার্তিক দত্ত প্রভৃতিই চালু রাখলেন 'যুগান্তর' পত্রিকা।

এই পটভূমিকার উপান্তে দুটি ঘটনা স্মরণীয়।

প্রথমত, ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে জন্মভূমি কয়াগ্রামে এক নরখাদকের অত্যাচার থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে গিয়ে প্রায়-নিরস্ত্র যতীন্দ্রনাথ অতর্কিতে বাঘটির মুখোমুখি পড়ে যান। দীর্ঘক্ষণ বাঘে-মানুষে লড়াইয়ের শেষে একটা ভোজালি দিয়ে বাঘটাকে মেরে ফেললেন যতীন্দ্রনাথ। এই বীরত্বের সংবাদে গর্বিত দেশবাসী তাঁকে অভিহিত করল বাঘা যতীন নামে। হরিদ্বারের সন্ত ভোলানন্দ গিরি এ-ঘটনার পর থেকে তাঁর এই শিষ্যটিকে আপ্যায়ন করতেন 'মেরা শূরবীর' বলে।

দ্বিতীয়ত, ১৯০৬ সালের শেষে কলকাতা কংগ্রেসের অবকাশে, প্রমথনাথ মিত্রের পৌরোহিত্যে ও শ্রীঅরবিন্দের পরিচালনায় অখিল বঙ্গ বিপ্লবী সমিতিগুলির যে অধিবেশন বসে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে, সেখানে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করলেন যতীন্দ্রনাথ (তাঁর মামা ললিত চাটুজ্যের সঙ্গে), নদীয়া জেলার প্রতিনিধি নেতার ভূমিকায়।[১০]

॥ তিন ॥

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এ-কথা আজ সবাই জানেন। উত্তর ২৪-পরগনার আড়বেলিয়া গ্রামে নরেনের জন্ম হলেও, পিতা দীনবন্ধু সপরিবারে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাংড়িপোতায়, নরেনের মামাবাড়িতে বসবাস করতে থাকেন—নরেনের যখন বছর বারো বয়স। উনিশ শতকের নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে চাংড়িপোতা ছিল সুবিদিত: এই গ্রামের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা ও তার স্বনামধন্য সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-৮৬) সারা বাংলায় তখন বিখ্যাত। স্মৃতি-সাহিত্যে ও হিন্দু আইন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যবশত দ্বারকানাথ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পান। সহকর্মী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এঁর কাছে ইংরেজি চর্চা করেন: দ্বারকানাথের জ্ঞানের পরিধি শুধুমাত্র সাবেকি হিন্দুধর্ম সর্বস্ব ছিল না; তার পরিচয় তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে বহুপঠিত গ্রীস ও রোমের ইতিহাসদুটি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সূত্রে ব্রাহ্ম ধর্মের দিকপালদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও দ্বারকানাথ হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন; তাঁর ভাগ্নে শিবনাথ শাস্ত্রী অবশ্য ব্রাহ্ম হন।

দ্বারকানাথের দৌহিত্র ফণীন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বাল্যবন্ধুত্বের সূত্রে ফণীর দাদা হরিকুমারের সঙ্গেও নরেনের সখ্য হয়। হরিকুমারের বাবা আসামে কাজ করতেন বলে গোড়ায় গোড়ায় তাঁকে খুব বেশি চাংড়িপোতায় দেখা যেত না। অবশেষে পাকাপাকিভাবে হরিকুমার চাংড়িপোতায় এসে নরেন, ফণী, সাতকড়ি বাঁড়ুজ্যে ও শৈলেশ্বর বসুকে নিয়ে এক ডানপিটে দল গড়ে তোলেন। ইংরেজদের ব্যবস্থামাফিক আর কোনও ক্ষেত্রে বাঙালি তার শারীরিক ক্ষমতার সদ্ব্যবহার না করতে পারুক, সার্কাসে সে ছিল অদ্বিতীয়। সারা ভারতজোড়া যে বোসের সার্কাসের নামডাক—তার অধিকারী মতিলাল বসু ছিলেন পাশের হরিনাভি গ্রামের বাসিন্দা। এই সার্কাস সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ সোল্লাসে বলেছিলেন: "মতি দেখিয়ে গিয়েছে, বাঙালির দৈহিক বল কী করতে পারে!" গ্রামে যখনি ফিরতেন মতিলাল, অবাধে মিশতেন স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে এবং তাদের প্রশ্রয় দিতেন শরীরচর্চার দিকে। তাঁর প্রভাবে হরিকুমার বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন চাংড়িপোতা স্বাস্থ্যকেন্দ্র: কুস্তি ছাড়াও অন্যান্য ব্যায়ামের দিকে জোর দেন তাঁরা।

এই সময়ে বিচিত্র এক ব্যক্তির যাতায়াত ছিল ২৪-পরগনা, এবং চাংড়িপোতার ছেলেদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে তিনি তাদের মনে দারুণ এক সভা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। নরেনদের চেয়ে ইনি চৌদ্দ-পনেরো বছরের বড়—দিগ্‌গজ পণ্ডিত, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। আদি নিবাস ঢাকা। হুগলিতে বাস করছেন বহু বছর: চুঁচড়োয় বঙ্কিমচন্দ্র যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁকে ঘিরে যোগেন বিদ্যাভূষণ, ভূদেব মুখুজ্যে, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রভৃতির সভা বসত; জন্মভূমির হিতচিন্তায় এঁরা শুধুমাত্র কলমই ধরেননি—চুঁচড়ো, শ্রীরামপুর, চন্দননগরে এঁদের সান্নিধ্যে নানা আখড়া ও সমিতি গজিয়ে উঠেছিল। মোক্ষদাচরণ, প্রিয়নাথ করার, সতীশ সেন, পূর্বোক্ত অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় প্রভৃতি ছিলেন এইসব সমিতির প্রাণ। এঁদের প্রায়ই দেখা যেত তারাপদ বাঁড়ুজ্যে বা তারাখ্যাপার কাছে যাতায়াত করতে: গীতা ও চণ্ডী পাঠের ফাঁকে ফাঁকে ঝাঁজালো ভাষায় তারাখ্যাপা রাজদ্রোহ প্রচার করতেন, তার প্রমাণ মেলে পুলিশের দলিলে। প্রিয়নাথকে নিয়ে মোক্ষদাচরণ ঘন ঘন কাশীতেও যেতেন: সেখানেও রংপুরের সারদা মৈত্র, বরিশালের সতীশ মুখুজ্যে (প্রজ্ঞানানন্দ) প্রভৃতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এঁরা এক সমিতি গড়েন। কলকাতায় অনুশীলন, ছাত্র ভাণ্ডার প্রভৃতির সঙ্গে মোক্ষদার তো যোগ ছিলই, তদুপরি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সূত্রে জানা যায় ১৯০৫ সালের জুন মাসে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব যে ফিল্‌ড্ অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমি নামে সমিতি স্থাপন করেন অনুশীলন ভবনের কাছে, তার বাসিন্দাদের মধ্যে পাওয়া যায় বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখুজ্যে প্রভৃতির সঙ্গে মোক্ষদাচরণকেও। এই বছরেই ডিসেম্বর মাসে এঁরা অ্যালফ্রেড থিয়েটরে শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেন; সভানেত্রী (সরলা দেবী)-র অনুপস্থিতিতে যতীন মুখুজ্যেকে এঁরা পৌরোহিত্য করতে অনুরোধ জানান। কলকাতার ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হলে মোক্ষদাচরণও সেখানে অধ্যাপনা শুরু করেন।

১৯০৪ সালের শেষ ভাগে সম্ভবত মোক্ষদাচরণের প্রভাবেই, হরিকুমার ও নরেন কলকাতায় এসে একটি ঘর ভাড়া নিলেন খাস 'অনুশীলন' ভবনেই। নরেনের জ্ঞাতিদাদা অবিনাশ ভট্টাচার্য তখন বারীন ঘোষ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে ওখান থেকে অন্য ডেরায় উঠে যাবার জল্পনা কল্পনা করছেন। নিছক শরীরচর্চা দিয়ে কি ভাবে দেশোদ্ধার হবে: এই প্রশ্ন তখন হরিকুমার ও নরেনের মনে ঝড় তুলেছে। তারই প্রতিধ্বনি শোনেন তাঁরা মিত্র সাহেবের

কাছে মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর প্রস্তাবে : "আপনি দুর্বল বাঙলীকে সবল করে তুলে বিপ্লবে নামাবেন বলে দিন গুণছেন। কিন্তু ব্যায়ামাদি করিয়ে কত আর লোক পাবেন ? দেশের তৈরি মাল কাজে লাগানো হক না কেন ? দেশের কৃষকেরা সবল ; তাদের মধ্যে কাজ করা হক। পাবনার কৃষকেরা ১৮৮০ সালে একবার জমিদারদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে। নব্বইটি কাছারি একদিনে জ্বালিয়ে দেয়।...আমিই পাবনা থেকে পঞ্চাশ হাজার লোক এনে দেব।..."[১১]

সোদপুরের শশিভূষণ বিহার ও উড়িষ্যায় দেশপ্রেমের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে কয়েকটা শিক্ষা সদন ; মুঙ্গেরে যেমন তাঁর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন নিমধারী সিং প্রমুখ নেতারা, কটকে তেমনি আধুনিক উড়িষ্যার জনক গোপবন্ধু দাস ও মধুসূদন দাস (ন্যাশন্যাল ট্যানারি) সাহায্য করেন শশিভূষণকে 'সত্যবাদী ওপ্‌ন এয়ার বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠায় ; তাঁদের চেষ্টায় গোদাবরীশ মিশ্র, নীলকণ্ঠ দাস প্রমুখ এসে পড়েন শশিভূষণের কাছাকাছি। উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ লেগেছে—শশিভূষণের কাছে খবর পেয়ে মিত্র-সাহেব হরিকুমার আর নরেনকে পাঠালেন সেবাকার্যে ; এঁদের হৃদয়ের প্রসার ও দক্ষতা দেখে মিত্র-সাহেব এঁদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ ভাবনা-চিন্তার আলোচনা করতে থাকেন। হরিকুমার ও নরেনকে তিনি চক্রধরপুরের নিকটবর্তী এক জঙ্গলে পাঠালেন একবার রাসায়নিক মাল-মশলা সমেত—বোমার কারখানা খুলবেন বলে। কিন্তু তা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। যে যুগে অসময়ে বারীনের ডাকাতি প্রচেষ্টা নেতারা কেউই ভাল চোখে দেখেননি, তার পরবর্তী যুগে (মুরারিপুকুর সংক্রান্ত ধরপাকড়ের পরে) যতীন মুখুজ্যের নেতৃত্বে অর্থের অন্বেষণে ডাকাতি এবং বিপ্লবীদের প্রতি দেশবাসীর আস্থা অর্জনের জন্য রাজনৈতিক হত্যা সকলেই সানন্দে সমর্থন করেছেন।[১২]

১৯০৭ সালে সরকারি কাজের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরূপে যতীন মুখুজ্যে তিন বছরের মেয়াদে দার্জিলিঙে স্থানান্তরিত হলেন। অন্যান্য আস্তানায় যেমন, তেমনি অবাধেই তিনি যাতায়াত করতেন মুরারিপুকুর বোমার বাগানে। প্রফুল্ল চাকী একদিন দার্জিলিঙে উপস্থিত হয়ে যতীন্দ্র-নাথের কাছে আর্জি জানালেন : "বারীনদা আমায় পাঠিয়েছেন ছোটলাট ফ্রেজারকে হত্যা করতে ; তাঁর মতে আপনি আমায় সাহায্য করতে

পারবেন !" যতীন্দ্রনাথ মিষ্টি কথায় প্রফুল্লকে কলকাতা ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন : "বারীনবাবুকে জানিও, ঠিক সময় বুঝে তোমায় আমি ডাক দেব এই কাজের জন্য !" পরবর্তী ৬ই ডিসেম্বরে একই রাতে দুটি ঘটনা অনুষ্ঠিত হল ; খবর এল যতীন্দ্রনাথের কাছে। প্রথমটি : প্রফুল্ল চাকীকে সঙ্গে নিয়ে বারীনবাবুরা মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে বোমা ফেলেছেন। সমস্ত গুপ্ত সমিতিই তখনো যতীন মুখুজ্যের শিষ্য কৃষ্ণনগরের বিভূতি চক্রবর্তীর বানানো বোমা ব্যবহার করছেন। ১৯০৫ সালের গোড়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে কার্জন-সাহেব প্রাচ্যবাসীদের মিথ্যাবাদী বলেন। পত্র-পত্রিকা যখন এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল, এই বোমা-সমেত দুই-দু'বার যতীন মুখুজ্যের দুই বন্ধু ও শিষ্য (সামরাইলের জমিদার শ্রীশ দাস ও চণ্ডী মজুমদার) যান কার্জনকে বধ করতে।[১৩] দ্বিতীয়টি : মোক্ষদাচরণের নেতৃত্বে নরেন ভট্টাচার্য ওই রাতেই (৬ই ডিসেম্বর) চাংড়িপোতা স্টেশনে ডাকাতি করে ধরা পড়েছেন স্থানীয় কয়েকটি কর্মী-সমেত। মামলা রুজু হয়েছে।[১৪]

অখিল বঙ্গ নেতৃ-সম্মেলন উপলক্ষে এই ডিসেম্বরে কলকাতা ফিরে এসেই তাঁর ব্যারিস্টার-বন্ধু জে. এন. রায়কে যতীন্দ্রনাথ অনুরোধ করলেন নরেন ও অভিযুক্ত অন্যান্য আসামীদের পক্ষ সমর্থন করতে। ১২ই ফেব্রুয়ারি এরা খালাস পেয়ে গেলেন প্রমাণাভাবে। ডিসেম্বর মাসেই একদিন সাইকেল-সওয়ারি যতীন্দ্রনাথকে উপস্থিত হতে দেখে প্রফুল্ল চাকী ও খুলনার জিতেন রায়চৌধুরী ছুটে এসে তাঁকে একান্তে জানালেন : "দাদা, এ-বাগানে আর আসবেন না আপনি !" কারণ জানাতে চাইলে এঁরা বললেন যে প্রফুল্ল চাকী দার্জিলিং থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসার পরে সবার সামনে বারীন ঘোষ সপরিহাস মন্তব্য করেছেন : "সরকারি কর্মচারী আবার বিপ্লব করবে !" "আরে এই নিয়ে মন খারাপ করতে আছে ?" জবাব দিয়ে যতীন মুখুজ্যে মুরারিপুকুর বাগানে সবার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। কিছু কালের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ যখন কথা প্রসঙ্গে প্রস্তাব করলেন : কিংসফোর্ডকে সরানোর বোধ হয় সময় হয়েছে ; এ-বিষয়ে কিছু যদি করা যায়, যতীন যেন বারীনকে নির্দেশ দেন। তখন যতীনের মুখে বারীনের মন্তব্য শুনে শ্রীঅরবিন্দ ক্ষুণ্ণ হয়ে আভাস দিলেন যে তাঁর ধারণা শীঘ্রই বারীনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্ব চুকে যাবে—এবং তখনই যতীনের নেতৃত্বের সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন বিপ্লবীরা।[১৫]

১৯০৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে সহস্রাধিক স্বেচ্ছা-সেবক এবং দুই শতাধিক চিকিৎসকের ভূমিকায় বাংলার আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি থেকে বিপ্লবী কর্মীরা যে শৃঙ্খলা ও দক্ষতার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ গঙ্গাস্নানার্থীকে সাহায্য করলেন কলকাতায়, তার জন্য স্বয়ং পুলিশ তাঁদের অভিনন্দন জানালেও অন্যান্য মহল থেকে টিপ্পনী কাটা হল যে বিপ্লবীরা এই সুযোগে নিজেদের শৃঙ্খলাবোধের অনুশীলন করছেন ; সেই সঙ্গে জনপ্রিয় করে তুলছেন তাদের সমাজসেবা-কার্যকে ; আর দেশবাসীর কাছে প্রমাণ করেছেন—কত গুণে তাঁরা পুলিশের চেয়েও বেশি কর্মক্ষম।[১৬] বিবেকানন্দের আদর্শে অনু-প্রেরিত এই কর্মকুশলতার আড়ালে যতীন মুখার্জীর অবদান অপরিসীম, লিখছেন প্রত্যক্ষদর্শী ভবভূষণ মিত্র। এঁদের সাফল্যের দীর্ঘ প্রশংসা করে ১৫ই ফেব্রুয়ারি 'যুগান্তর' লিখল: "বাঙালীর ছেলেরা মান-অভিমান, লোকলজ্জা, বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে যাত্রিগণের সেবা করিতেছে দেখিয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল। এমনটি আর দেখি নাই…এ কি একেবারে যুগ-পরিবর্তন।"[১৭]

প্রায় এর পিঠপিঠই ফণী চক্রবর্তী দার্জিলিং যান। একদিন বিকেলের শীত-শীত ভাবটা কাটাতে সামান্য আফিং সেবন করে তিনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। নিজের অজান্তে কখন পথের ধারে ঘুমিয়ে পড়েছেন, হুঁস নেই। নেশা ভাঙতে দেখেন তাঁকে ঘিরে কৌতূহলী পথচারীর ভিড়। সেই ভিড় ঠেলে যতীন মুখার্জী তাঁকে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। বেশ কটা দিন এই অ-সাধারণ মানুষটির সঙ্গ পেয়ে ফণী অভিভূত: অনবরত লোক আসছে যাচ্ছে ; সদা-প্রফুল্ল যতীন্দ্রনাথ তাদের আপ্যায়নে ক্রটি রাখছেন না ; গীতার ক্লাস নিচ্ছেন।…কলকাতায় ফিরে মুগ্ধ চিত্তে হরিকুমার, নরেন ও অন্যান্য বন্ধুদের কাছে যতীনদার গুণগান করতে গিয়ে বারীন ঘোষের কাছে পেলেন অস্বাভাবিক রূঢ় ব্যবহার। এঁরা তখন মুরারিপুকুর বাগানে আড্ডা গেড়েছেন। এই ঘটনার উল্লেখ পাই নরেনের লেখায় (তিনি তখন জগৎসুদ্ধ লোকের চোখে এম. এন. রায়):

"অন্য দাদারা আকর্ষণীয় হবার সাধনা করতেন ; একমাত্র যতীন মুখার্জীর ছিল এক সহজাত চৌম্বক শক্তি, যার ফলে, চেলাধরা খেলায় রত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের চোখে তিনি ছিলেন যতখানি দুর্জ্ঞেয় ততটাই নৈরাশ্যকর। দাদা কোনদিন জাল ফেলতে নামেননি ; তা সত্ত্বেও তাঁকেই সকলে ভাল-

বাসত, এমন-কি অন্য দাদাদের অনুগামীরাও।…

"আমি তখনো আর-এক দাদার আওতায় কাজ করছি; একদিন সেই দাদা শুনলাম তাঁর এক চেলাকে ধমকাচ্ছেন অন্য কোন্ এক দাদার কাছে যাবার অপরাধে; অভিযুক্ত ছেলেটি শেষে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে উঠল: 'দাদা, কেন আপনি আমায় ওঁর কাছে যেতে মানা করেন, উনি যখন চান না যে আমি আপনার দল ছেড়ে যাই?…' কে এই আজব দাদাটি, দেখবার কৌতূহল আমি সংবরণ করতে পারিনি; তিরস্কৃত সহকর্মীটিকে চেপে ধরলাম। পরদিন চেলাধরা খেলায় নিস্পৃহ সেই অভিনব দাদাটিকে দেখতে গিয়ে চিরদিনের মতো মজে গেলাম। সেদিন আমি বুঝে উঠতে পারিনি, কী এই আকর্ষণের উৎস। বাইরে থেকে দেখতে তেমন কি অসাধারণ? যতই চমৎকার ব্যায়ামবিশারদ হন না তিনি, তাঁর চেহারাতে কই বিন্দুমাত্র ছাপ নেই তাঁর বহুবিশ্রুত অলৌকিক বিক্রমের? করুণা-প্রসাধিত হাম্‌বড়া ভাবও নেই লেশমাত্র!…"[১৮]

হরিকুমার চক্রবর্তী লিখছেন: "এবারে আমাদের জীবনের গতি স্থির হয়ে গেল। স্বামীজীর কর্মসন্ন্যাসই আমাদের আদর্শ। কর্ম ত্যাগের সন্ন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন মতের কথা শুনেছি। যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। চোখের সামনে ভাসছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মা যা হইবেন' সেই স্বপ্ন।… দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লব আন্দোলন যতীনদার সৃষ্টি। তাঁর যে কী আকর্ষণী শক্তি ছিল—সকলকে তিনি কাছে টেনে রাখতে পারতেন।… একবার নরেনের (এম. এন. রায়) সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক ও ঝগড়া। আমি স্বামীজীর অদ্বৈত বেদান্তকে গ্রহণ করেছি, মূর্তিপূজা আর ভগবানে বিশ্বাস করি না, নরেনের মূর্তি এবং ভগবান, দুয়েই বিশ্বাস। আমি বললুম, স্বামীজীর মত, ভগবান নেই, নরেন বলল, স্বামীজীর মত ভগবান আছেন। যতীনদা ঝগড়ার কথা শুনলেন। শুনে বললেন, চল আমার গুরুর কাছে। তাঁর গুরু ভোলা গিরি। তিনি কলকাতায় এসে রয়েছেন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে ভক্তের বাড়িতে। যতীনদার সঙ্গে আমরা প্রবেশ করতেই তিনি 'আরে বেটা' বলে যতীনদাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তাতেই যতীনদার উপর তাঁর ভালবাসার পরিমাণ বোঝা গেল। যতীনদা আমাদের সমস্যার কথা জানালেন। ভোলা গিরি তখন আমার দিকে ফিরে বললেন—বেটা, তোমার কথাই ঠিক ভগবান নেই। আমার

বুক দশহাত—চেয়ে দেখি নরেনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। তারপর নরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, না, ভগবান আছেন। পরে বললেন, যার যেমন ভাব। আমরা হতভম্ব। বাইরে আসতে আমরা যতীনদাকে বললুম, একি হল, উত্তর যে পেলাম না! যতীনদা বললেন, আরে স্বামীজীর কথা নিয়ে কি ঝগড়া করতে আছে? তিনি কত বড় ছিলেন তার ধারণা করবে কে! তাঁর কথা যদি ভারত শোনে ভারতের মহিমার কি সীমা থাকবে?..."[১৯]

দুই দিকপাল নরেন ইতিপূর্বে যতীন মুখুজ্যের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে নেমে অসাধ্য সাধনকে সম্ভব করা যায় দেখিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় নরেন (ভট্টাচার্য) শুধুমাত্র এঁদের দলবৃদ্ধিই করলেন না, আপন বৈশিষ্ট্যে অনতি-বিলম্বে তিনি পরিগণিত হলেন যতীন মুখুজ্যের অন্যতম দু'তিনজন সহকর্মী-দের মধ্যে। অন্য দুই নরেনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই।

যতীন্দ্রনাথের সহচর ও বন্ধু ইন্দ্রনাথ নন্দী লিখেছেন যে ফরিদপুরের (সামরাইল) জমিদার শ্রীশচন্দ্র দাসের কাছে তাঁর দুই শিষ্য নরেন বসু ও বিপিন গাঙ্গুলিকে তিনি লাঠিখেলা শিখতে পাঠিয়েছিলেন।[২০] এই শ্রীশ দাস দীক্ষা নিয়েছিলেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথের কাছে। ১৯০৭ সালে জামালপুরে যখন হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়ে ইংরেজ সরকার মুসলমান সম্প্রদায়কে সুয়োরানীর প্রশ্রয় দিচ্ছে, তখন (২১শে এপ্রিল) কলকাতা থেকে ইন্দ্রনাথ, নরেন বসু, বিপিন গাঙ্গুলি, যশোরের শিশির ঘোষ প্রভৃতি জামালপুরে গিয়ে একচোট বদলা দেন মুসলমানদের। প্রথম চারজনকে ১০৭ ধারা অনুযায়ী সরকার জামিন মুচলেকা দিতে বাধ্য করে। নরেন বসুকে ১৯০৮ সালের ২রা জুন নিখিলেশ্বরের সঙ্গে ঢাকায় গিয়ে অনুশীলনের সহযোগিতায় বাহ্রা ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। ওই বছরেই আবার (৯ই নভেম্বরে) নরেন বসু ও নরেন ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকেন দারোগা নন্দলালকে হত্যার সময়ে। ১৯০৯ সালের ২৫শে এপ্রিল নেতড়া ডাকাতিতেও অংশ গ্রহণ করেন এই দুই নরেন।

অন্য নরেন (ওরফে ভোলা চাটুজ্যে) ছিলেন শিবপুর ও কলকাতা 'ছাত্র ভাণ্ডার' কেন্দ্রের যোগসূত্র। প্রায় বঙ্গভঙ্গের যুগ থেকেই ফোর্ট উইলিয়াম সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে ইনি যোগ স্থাপন করেন যতীন মুখুজ্যের পরামর্শে। সৈন্য-অফিসারদের প্রথম প্রথম ইনি নিয়ে যেতেন শিবপুরে ননীগোপাল সেনগুপ্তের আড্ডায়। কিন্তু নদী পার হবার ঝুঁকি না নিয়ে শেষ পর্যন্ত

খিদিরপুরে ডাঃ শরৎ মিত্রের বাড়িতে এঁদের বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। উক্ত অফিসারদের নিয়ে নরেন চাটুজ্যে গিয়েছেন উত্তর ভারতের বিভিন্ন ছাউনিতে—কাশী, নৈনিতাল, লাহোর, পেশোয়ারে। যতীন মুখুজ্যের ইচ্ছানুসারে এই সূত্রগুলিকে রাসবিহারীর আওতার অতিরিক্ত সম্ভাবনারূপে পৃথক রেখেছিলেন নরেন চাটুজ্যে। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সময়ে (১৯১০-১১) শরৎ ডাক্তার বিচারাধীন থাকাকালীন খিদিরপুরের আশুতোষ ঘোষের হাতে এগুলির দায়িত্ব তুলে দিয়ে নরেন চাটুজ্যে ফেরার হয়ে যান। এই সূত্রগুলির কল্যাণেই কলকাতায় যখন অভিনব ট্যাক্সি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে, বিপ্লবীদের সহায়তা করেছিলেন কয়েকজন শিখ ট্যাক্সি-চালক।"[২১]

আলোচ্য যুগে এই তিন নরেন তাঁদের অসমসাহসিক নিয়মানুবর্তিতার জোরে বিপ্লবী সংগঠনকে দিলেন বিস্ময়কর তৎপরতা ও কর্মক্ষমতা।

॥ চার ॥

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে দিদি বিনোদবালা দেবী, স্ত্রী ইন্দুবালা আর শিশুকন্যা আশালতাকে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ দার্জিলিং ফিরে যাচ্ছেন। সঙ্গে আছেন বাল্যবন্ধু এবং মুরারিপুকুর বোমার বাগানের কর্মী ভবভূষণ মিত্র (স্বামী সত্যানন্দ)। শিলিগুড়ি স্টেশনে ক্যাপ্টেন মার্ফি, লেফ্‌টেনাণ্ট সামারভিল প্রমুখ চারটি অশিষ্ট সামরিক অফিসারের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের হাতাহাতি হয়। তারা মামলা ঠোকে। সারা দেশের পত্র-পত্রিকায় এই সাহেবদের আচরণের বিরুদ্ধে প্রকাশিত ধিক্কারের বহর দেখে সরকারের হুকুমমাফিক মামলা তুলে নেওয়া হয়। পরোক্ষ দণ্ডরূপে জুন মাসের গোড়ায় যতীন মুখুজ্যেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হল। ইতিহাসের দৃষ্টিতে শাপে বর হল।

মজঃফরপুরে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগী-ব্রতের ফলশ্রুতিরূপে ১৯০৮ সালের ২রা মে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হল। ১১ই আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসীর দিনে বিপ্লবীরা পালটা জবাব দিতে মনস্থ করেন। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ সমেত মুরারিপুকুরের কর্মীদল ছাড়াও দেশের সর্বত্র বহু বিপ্লবীকে তখন গ্রেপ্তার করে বিচারাধীন কারাগারে রাখা হয়েছে। সেই কারাগারে বসেই সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্ত গুলি করে মারলেন—৩১শে

আগস্ট—রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে। বারীন ঘোষ কারাগারে বসে তাঁর মত ও পথের সবিস্তার বর্ণনাসমেত বিবৃতি দিলেন; তাঁর অনুচরেরাও নেতার পন্থা অনুসরণ করে বিবৃতি দিয়ে দোষ স্বীকার করলেন। শ্রীঅরবিন্দ রইলেন নির্বাক। সতেরোজন কর্মী তাঁর দৃষ্টান্ত মেনেই বিবৃতি দিলেন না। এঁরা সবাই এক বছরের কারাবাস শেষে মুক্তিলাভ করলেন। বারীন ঘোষ সদলবলে গেলেন দ্বীপান্তরে। ভবভূষণ মিত্র, কুঞ্জলাল সাহা প্রভৃতি অভিযুক্ত আসামীদের সঙ্গে যতীন মুখুজ্যের দহরম-মহরমের উল্লেখ একাধিকবার করা হল এই আলিপুর (মুরারিপুকুর) বোমার মামলায়। এঁদের পক্ষ সমর্থনে যতীন মুখুজ্যের প্রচেষ্টাও অজ্ঞাত রইল না।[২২]

১৯০৮ সালের জুন মাসে দার্জিলিং থেকে ফিরেই যতীন্দ্রনাথ ছত্রভঙ্গ বিপ্লবীদের (যাঁরা ধরা পড়েননি) একত্র করে নূতন উত্তমে কাজে নামেন। সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে চাঞ্চল্যকর সন্ত্রাসবাদের তরঙ্গে বিপ্লবীরা সারা দেশ কাঁপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। নতুন জমানার সূচনায় (২রা জুন ১৯০৮) ও পরিশেষে (১১ই অক্টোবর ১৯০৯) কলকাতার 'যুগান্তর' ও ঢাকার 'অনুশীলন' কর্মীরা হাত মিলিয়ে জমজমাট দুটি ডাকাতি করলেন: প্রথমটি ঢাকার বাহ্রা গ্রামে, নগদ অর্থ ও গহনা মিলিয়ে তেইশ হাজার টাকা আসে বিপ্লবীদের হাতে; দ্বিতীয়টিও ঢাকায়, রাজেন্দ্রপুর গ্রামে, আনুমানিক বিশ হাজার টাকা। মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্যই মূলত এই অর্থ সংগৃহীত হয়। ১৯০৮ সালের ১৫ই আগস্ট ময়মনসিংহের বাজিতপুরে, ১৬ই সেপ্টেম্বর হুগলির বিঘাটিতে, ২৯শে নভেম্বর নদীয়ার রাইতায়, ২রা ডিসেম্বর হুগলির মোরহালে; ১৯০৯ সালের ২৩শে এপ্রিল ২৪ পরগনার নেতড়ায়, ১৬ আগস্ট খুলনার নাংলায়, ২৮শে অক্টোবর নদীয়ার হলুদবাড়িতে শুধুমাত্র 'যুগান্তর' কর্মীরাই ছোট বড় অন্যান্য যেসব ডাকাতি করেন—তার পিছনে আবিষ্কার করা গিয়েছে যতীন মুখুজ্যের প্রেরণা এবং একাধিক ক্ষেত্রে নরেন ভট্টাচার্যকে দেখা গিয়েছে নায়কের ভূমিকায়।

দেশপ্রেমিকদের স্তিমিত চেতনাকে সচকিত করতে সন্ত্রাসমূলক ঘটনাগুলিকে যতীন্দ্রনাথ মঞ্চস্থ করেন সুদক্ষ নাট্য-পরিচালকের ধাঁচে। ঘাত ও প্রতিঘাতের পারম্পর্য এখানে মনোরম। নমুনাস্বরূপ ধরা যাক—১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর, শহীদ কানাইলালের ফাঁসির তারিখ। সরকারের সঙ্গে বিপ্লবীদের শক্তিপরীক্ষার চরম তাৎপর্য-মণ্ডিত এই দিনটিকে স্বদেশানুরাগের

আলোকে উদ্ভাসিত করতে চাইলেন যতীন মুখুজ্যে। ৭ই নভেম্বর তিনি জিতেন রায়চৌধুরীকে পাঠালেন কলকাতার ওভারটুন হল-এ : ধীর সংযত চিত্তে জিতেন মঞ্চের ওপরে উঠে ছোটলাট এনড্রু ফ্রেজারকে গুলি করলেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বাবরি নামে এক সাহেব পাশ থেকে জিতেনের প্রসারিত বাহু চেপে ধরতে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল ; অমিত বলশালী জিতেন তখন ঝাঁকি মেরে সাহেবকে ফেলে দিয়ে আবার গুলি চালানোমাত্র প্রভুভক্ত বর্ধমানরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব তাঁর বিশাল বপু দিয়ে আড়াল করলেন ছোটলাটকে। জিতেনের কারাদণ্ড হল। বর্ধমানরাজ পেলেন নাইট কম্প্যানিয়নশিপ।[২৩]

৯ই নভেম্বর কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে গুণেন গুপ্ত (নরেন ভট্টাচার্য, নরেন বসু ও ভূষণ মিত্রের সহযোগিতায়) দারোগা নন্দ বাঁড়ুজ্যের ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। সরকার থেকে পুরস্কার পেয়েছিল নন্দলাল—বীর প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নেবার দরুন। তার রক্তে প্রফুল্ল চাকীর তর্পণ করলেন বিপ্লবীরা। এবং সতর্ক করে দিলেন দেশের শত্রুদের, তাদের পরিণাম সম্বন্ধে।[২৪]

১৯১০ সালে হাওড়া পাইকারি মামলায় যতীন মুখার্জীর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত হল এসব ঘটনা।[২৫]

সত্যেন বসুর ফাঁসি হল ১৯০৮ সালের ২১শে নভেম্বর ; তার প্রত্যুত্তরে স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ কয়েকটি শিষ্য নিয়ে নদীয়ার রাইতা গ্রামে এক মহাজনের আড়ত লুঠ করলেন ২৭শে নভেম্বরে। সংগৃহীত গহনা তিনি ভাঙিয়ে নিলেন কলকাতার বি সরকারের দোকানে।[২৬]

১৯০৮ সালের জুন মাস থেকে অবিশ্রাম অক্লান্ত যতীন্দ্রনাথ পুরনো গুপ্ত সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন জেলায় জেলায়। আন্দোলনকে ক্রমান্বয়ে গণযুদ্ধে পরিণত করবার পদ্ধতি বাতলেছেন আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শের সুযোগে। সন্ত্রাসবাদের সাম্প্রতিক প্রয়োজন ছাড়িয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করাও এই পর্বের কর্তব্য—স্মরণ করিয়েছেন তিনি তাঁর সহকর্মীদের। ১৯০৮ সালের শেষে সমস্ত সমিতি বেআইনি ঘোষিত হলে বিপ্লবী কর্মীদের মাথা গোঁজার জন্য কয়েকটি মেস খোলা হল—তাদের মধ্যে প্রধান রইল মেডিক্যাল কলেজের পিছনে শোভারাম বসাক স্ট্রীটের আস্তানা : যতীন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে এখানে

আত্মগোপন করতে এলেন ম্যানেজার নলিনীকান্ত কর, ফণী রায় ও বলদেব রায় (তিনজনেই গ্রামাঞ্চলে সেবার উদ্দেশ্যে হোমিওপ্যাথি পড়ছেন), ক্ষিতীশ সান্যাল (আই এ ক্লাসের ছাত্র), গিরীন ভৌমিক (আইনের ছাত্র) ; তা ছাড়া ইন্দ্রনাথ নন্দীর চেলারা—ধীরেন চক্রবর্তী, অহীন চাটুজ্যে, রণেন গাঙ্গুলি প্রভৃতিও—আশ্রয় পেলেন সেখানে। যতীন্দ্রনাথ, অতুল ঘোষ, দেবীপ্রসাদ রায় (খুড়ো), হরিশ সিকদার, সতীশ সরকারও নিয়মিত থাকতেন এখানে।

১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অব্ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন ফর ইণ্ডিয়ান্স' সমিতির পৃষ্ঠপোষক স্যার ডেনিয়েল হ্যামিণ্টন উৎসাহ করে বহু কৃতী ছাত্রকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজে করে বিদেশে পাঠান। সমিতি বেআইনি ঘোষিত হবার পরে স্যার ডেনিয়েলকে ধরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারদা-চরণ মিত্র বিপ্লবীদের জন্য সংগ্রহ করলেন সুন্দরবনের গোসাবায় এক প্রশস্ত জমি : 'বেঙ্গল ইয়ংমেন্স জমিদারি কো-অপারেটিভ' নাম দিয়ে এক সংস্থা রেজিস্ট্রি করে নিয়ে তার আশ্রয়ে বিপ্লবী কর্মীরা সমবায় প্রথাতে কৃষি উন্নয়ন এবং পল্লী এলাকায় বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারের কাজে নামলেন। তেবরায় শশিভূষণ রায়চৌধুরী যে পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই নজির সামনে রেখে বিপ্লবীরা মাগুরার হীরালাল রায়ের পরিচালনায় স্বদেশ সেবার নিরীহ পর্বে মন দিলেন। যতীন মুখুজ্যের শিষ্য নলিনীকান্ত করের সঙ্গে এইখানে আলাপ হল ঢাকা থেকে আগত বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত নামে এক তরুণের। এই নিরামিষাশী পথে দেশোদ্ধারের সন্ধান বীরেনের কাছে অসহনীয় ; তিনি চাইছেন জোরদার একটা-কিছু করতে।

এমনি একটা-কিছু না করতে পেরে অনেকেই তখন মনঃক্ষুণ্ণ। যতীন্দ্রনাথ তা জানতেন। চেতলার কর্মী চারুচন্দ্র ঘোষকে তিনি এক থোকে সতেরো হাজার টাকা দিলেন—চোরাই অস্ত্রের ব্যবসায়ী নূর খাঁর কাছ থেকে মশলা-পাতি ও কিছু বন্দুক-রিভলভার কেনবার জন্য। যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং তাঁর হাত-খালি না থাকলে চারু ঘোষ গোসাবা থেকে বাছা কর্মীদের নিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে ফুলেশ্বর ও বাদার কাছে অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতে লাগলেন। চারুর আত্মীয় ভূষণ মিত্র ('গুলে') ছিলেন নরেন ভট্টাচার্যদের কোদালিয়া-সোনারপুর শাখার সভ্য ; তিনিও যেতেন।

আলিপুর বোমার মামলার সরকারপক্ষীয় উকিল আশুতোষ বিশ্বাস এই সময়ে বাড়াবাড়ি করছেন ; তাঁর কম হাত ছিল না কানাইলাল ও সত্যেন বসুর ফাঁসির ব্যাপারে। প্রতিকার চাই ?

১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি চারুচন্দ্র বসু নামে এক তরুণ যতীন্দ্রনাথের আশিস নিয়ে পা বাড়ালেন। হাইকোর্টে ভরদুপুরে তিনি আশুবাবুকে খতম করে ধরা পড়ে গেলেন। এক মাসের উপর শত অত্যাচারেও তিনি মুখ খুললেন না। শুধু বললেন : "দেশদ্রোহী আশুকে আমি হত্যা করে ফাঁসি যাব—এটা বিধি-নির্দিষ্ট। Hang me tomorrow."

১৯শে মার্চ হৃষ্টচিত্তে ফাঁসির দড়ি গলায় বরণ করে চারুচন্দ্র বসু শহীদদের তালিকা বৃদ্ধি করলেন। ডাঃ যাদুগোপালের ভাষায় : "এঁরা কি সাধারণ মানুষ ? এঁদের উল্লেখ করে যথার্থ বলা যায় : কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা।"[২৭]

১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আড়াই মাসের মেয়াদে যতীন্দ্রনাথকে আবার দার্জিলিং যেতে হল। ২৭শে অক্টোবর সেখানকার লোইস জুবিলি স্যানাটরিয়ামে নেতড়ার ললিত চক্রবর্তী (বেঙা) অসুস্থ অবস্থায় ধরা পড়ল। প্রখ্যাত নেতা ও চারণ কবি হেম সেনের দলের ছেলে সে ; দুর্বল দেহ-মনে অত্যাচার না সইতে পেরে ২৯ তারিখে সে সব কথা ফাঁস করে দিল পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ ড্যালি'র কাছে ; ড্যালি তখন পুজোর ছুটি উপভোগ করছিলেন দার্জিলিঙে। আবার সেইদিনই হলুদবাড়ি ডাকাতির সংবাদে তিনি কলকাতায় ফিরে গেলেন। ১লা নভেম্বরে যতীন মুখুজ্যের বন্ধু ব্যারিস্টার রজত রায় দার্জিলিং গিয়ে ললিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বুঝলেন—ব্যাপারটা বহু দূর গড়িয়ে গিয়েছে। যা কিছু ললিত কবুল করেছে, তা প্রত্যাহারের বাসনা তার নেই।

গুপ্ত সমিতির বহু চমকপ্রদ সংবাদ ললিতের কাছে পাবার ধান্ধায় মুরারিপুকুর বোমার মামলার কুখ্যাত সামসুল আলম তাকে ডায়মণ্ডহারবারে ফিরিয়ে এনে জেরা শুরু করল। ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর বেঙা সবিস্তারে বহু কথা ফাঁস করে দিতেই তাকে ডায়মণ্ডহারবারের এস ডি ও সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে সামসুল আইনসিদ্ধ করে নিলেন তার স্বীকারোক্তি। খবরটা চাউর হয়ে গেল ; বিপ্লবীরা সময় পেলেন সতর্ক হবার।

যতীন মুখুজ্যেকে কেন্দ্র করে ব্যাপক এক ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছে এবং

মুরারিপুকুর বোমার বাগান সংক্রান্ত ধরপাকড়ের আগে ও তার পরবর্তী দেড় বছর ধরে যে প্রচণ্ড সন্ত্রাসবাদের ঢেউ খেলছে সারা ভারতে ও ভারতের বাইরেও—তার বিহিত করতে মরিয়া হয়ে উঠল পুলিশ।[২৮] সবচেয়ে মারাত্মক প্রমাণ পেল পুলিশ ; দীর্ঘকাল ধরে রাজদ্রোহ প্রচারের ফলে সৈন্য-বাহিনীর বহু অফিসার ও জওয়ান—বিশেষত পুরো ১০ম জাঠ রেজিমেণ্ট—বিপ্লবীদের সহযোগিতায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য তৈরি হচ্ছে।[২৯]

বেঙার স্বীকারোক্তি থেকে পুলিশ জানতে পারল যে নেতড়া ডাকাতির পরে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশেই বেঙা গিয়ে আত্মগোপন করে, কৃষ্ণনগরে উকিল ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। যতীন্দ্রনাথের বড়মামার ছেলে নিমাইকে ললিত চাটুজ্যের মুহুরি নিবারণ চক্রবর্তী স্টেশনে পাঠান বেঙাকে আনতে। বেঙা হলপ করে বলল যে 'যুগান্তর' অফিসের কার্তিক দত্ত ছিলেন যতীন মুখুজ্যের ও তাঁর ছোটমামা ললিত চাটুজ্যের সহচর। ১৯০৮ সালের ৪ঠা মার্চ কুষ্টিয়ার পাদরি হিকেন বোথামকে পুলিশের চর বলে হত্যা করেন কার্তিক এবং ছ' মাস জেলে থেকে তিনি যখন মুক্তি পেলেন, তাঁর সংবর্ধনার বিপুল আয়োজন করেন ললিত চাটুজ্যে। শ্রীঅরবিন্দ ও বারীনের সঙ্গেও এঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সংবাদ দিল বেঙা।

অবশেষে যতীন্দ্রনাথ সমেত বিপ্লবী দলের অবশিষ্ট কর্মীদের হাতের মুঠোয় পাবে বলে আনন্দে বিভোর সামসুল হলুদবাড়ি ডাকাতির জের টেনে কৃষ্ণনগর ও কয়ায় গেল ললিত চাটুজ্যে ও যতীন মুখুজ্যের বাড়ি তল্লাস করতে। মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে বাড়ির মহিলাদের সামনে সামসুল একটি অপমানসূচক মন্তব্য করতেই সর্বজনপূজিত বিনোদবালা দেবী (যতীন্দ্রনাথের দিদি) তর্জনী তুলে তাকে সতর্ক করে দেন : "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা দেখেছ ?" ঘাড় গুঁজে সামসুল দারোগাদের নিয়ে নিষ্ক্রমণের সময়ে শাসিয়ে যায় : "দেখে নেব !"

১৯১০ সালের ২১শে জানুয়ারি যতীন্দ্রনাথ নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবর পেলেন যে বেঙার স্বীকৃতির ভিত্তিতে পঞ্চাশজন বিপ্লবী সমেত তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাওড়া ষড়যন্ত্র নামে এক পাইকারি মামলা ফাঁদবার হুকুম পেয়ে গিয়েছে সামসুল। যতীন মুখুজ্যে, ললিত চাটুজ্যে, নিবারণ চক্রবর্তী, সুরেশ মজুমদার (পরাণ), নরেন ভট্টাচার্য, নরেন বসু, নরেন চাটুজ্যে, হেমচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ বিজয় চক্রবর্তী রইলেন এঁদের মধ্যে প্রধান।

২৪শে জানুয়ারী। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হেন্রিংটনের এজলাসে চলছে আলিপুর মামলার চূড়ান্ত শুনানী। সেখান থেকে পুলকিত অন্তরে সামসুল বার হয়ে ক'পা না যেতেই বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল; আদালতের গর্ভগৃহ মুখর হল তার করুণ আর্তনাদে। দ্বিতীয় এক গুলিতে তাকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে পাশের সিঁড়ি বেয়ে বীরেন তরতর করে নামতেই ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে ধরা পড়ে গেলেন।

এই হত্যাকাণ্ডে সরকারী মহল—এমন কি বড়লাট পর্যন্ত—কতটা বিমূঢ়, স্তম্ভিত হয়েছিল, তার প্রমাণ প্রবন্ধান্তরে দিয়েছি।[৩১]

নীরবে মাসখানেক ধরে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করে বীরেন যখন মনে মনে ফাঁসি যাবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় পুলিশের ডেপুটি কমিশনার চার্লস টেগার্টের ছলনায় আত্মহারা হয়ে বীরেন একদিন স্বগতোক্তি করলেন: "আর যে যাই বলুক, একজন কখনো আমায় ভুল বুঝবেন না!" কথার পিঠে কথা বসিয়ে বীরেনকে দিয়ে টেগার্ট কবুল করিয়ে নিল যে এই ব্যক্তিই হচ্ছেন যতীন মুখুজ্যে, যতীন মুখুজ্যেই রিভলভার দিয়ে বীরেনকে পাঠিয়েছিলেন সামসুলকে হত্যার জন্য।...

২৭শে জানুয়ারি গভীর রাতে, বেওয়ার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে, যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুচরদের গ্রেপ্তার করেছিল টেগার্ট। ৩০শে জানুয়ারি তাঁকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে খালাস দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার ৪০০ ধারা অনুযায়ী, ডাকাতির অভিযোগে, তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাওড়া জেলে পাঠানো হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারি নতুন করে তাঁকে আলিপুর জেলে নিয়ে গিয়ে ২০শে ফেব্রুয়ারি—বীরেনের ফাঁসির আগের দিন—ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো'র এজলাসে তাঁকে হাজির করা হল। যতীন্দ্রনাথের সমর্থনে ব্যারিস্টার জে এন রায় আগাম নোটিস না পাবার দরুন বীরেনকে জেরা করতে রাজি হলেন না। খোদ ছোটলাটের কাছে দরবার করেও বীরেনের ফাঁসির দিন পিছিয়ে দিতে পারল না কর্তৃপক্ষ। ফলে বীরেনের স্বীকারোক্তি আইনত অসিদ্ধ থেকে গেল।[৩২]

১২১ থেকে ১২৪ নং এবং ৩০২ নং ধারাগুলির অন্তর্ভুক্ত রাশীকৃত অভিযোগের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চরম যে অভিযোগ প্রমাণে তৎপর হল কর্তৃপক্ষ—সেটি হল সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ প্রচার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি। ক'মাস ধরে বারে বারে

তাঁকে হাওড়ার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির হতে হল। অবশেষে ২০শে জুলাই (১৯১০) তাঁর সহচর ও তাঁকে জড়িয়ে মামলা দায়ের করে স্বয়ং চিফ জাস্টিস এবং জাস্টিস দিগম্বর চাটুজ্যে ও ব্রেট সাহেবের তত্ত্বাবধানে মামলা শুরু হল ১লা ডিসেম্বর। ১৯১১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বেকসুর খালাস পেলেন যতীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্য-সহকর্মী সমেত। প্রত্যক্ষদর্শীদের মহলে জয়-জয়কার উঠল যতীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টির এবং তাঁর বিকেন্দ্রিক গুপ্ত সংগঠনের এই সাফল্য উপলক্ষে।

সরকার ভুলতে পারল না এই পরাজয়ের গ্লানি।[৩৩]

॥ পাঁচ ॥

বিচারাধীন কারাবাসের সুযোগে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হতে পেরে নরেন ভট্টাচার্য, সুরেশ মজুমদার প্রমুখ স্নেহভাজন কর্মী সম্যক এক ধারণা করতে পেরেছিলেন এঁর ব্যক্তিত্ব ও বিপ্লব-দর্শন সম্বন্ধে। যুক্তিতর্ক দিয়ে তাত্ত্বিক দর্শনের সূত্র খুব কমই উদ্ভাবন করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ; সনাতন ভারতের ঐতিহ্যে আস্থাশীল তিনি তাঁর জীবনকেই আপন দর্শনের ফলিত দৃষ্টান্তরূপে মেলে ধরেছিলেন। শিষ্যদের সামনে একটি অদ্ভুত ধারণাকে তিনি প্রাঞ্জল করতে যত্নশীল ছিলেন: এত বড় একটা দেশ, এত যুগের পরাধীনতা—রাতারাতি সেখানে বিপ্লব সার্থক করতে চাওয়া বাতুলতা। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হতে পারলে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে জানলে ভারতের রাজনৈতিক মুক্তিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এ প্রত্যয় তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। তিনি বলতেন: প্রাথমিক ব্যর্থতাই অন্তিম সাফল্যের অমোঘ প্রতিশ্রুতি। "আমরা প্রথমে একে একে তারপর দলে দলে মরব, আর ঠেলায় ঠেলায় জাতটা জাগবে।" জাত জাগা, অর্থাৎ গণ-বিপ্লব সংঘটিত করা।

ইওরোপে যে অদূরভবিষ্যতে এক মহাযুদ্ধ লাগছে, তার স্পষ্ট আভাস তিনি বহু পূর্বেই পেয়েছিলেন। তারই ভরসায় সঙ্গীদের তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন—কারামুক্তির পরবর্তী কটা বছর নীরবে শক্তি-সংহরণ করতে এবং সমস্ত সন্ত্রাসবাদ শিকেয় তুলে রাখতে। জেলায় জেলায় গুপ্ত সংগঠনের ভিত্তি মজবুত করে তোলাই হবে তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য।[৩৪]

১৯১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কনট্রাক্টরির ব্যবসা ফেঁদে পুরো তিনটি বছর অবিশ্রাম সফর করেছেন যতীন্দ্রনাথ—বাংলার পল্লী অঞ্চলে বিপ্লবের ক্ষেত্র দৃঢ় করবার অভিপ্রায়ে। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ঘুরেছেন তিনি ঘোড়ার পিঠে অথবা সাইকেলে। কলকাতার কর্মীদলগুলিও পরিদর্শন করে চলেছেন। বৃন্দাবন ও কাশী গিয়েছেন, বন্ধু যতীন বাঁড়ুজ্যে (নিরালম্ব স্বামী) ও অন্তরঙ্গ কিছু আত্মগোপনকারী বিপ্লবীকে তাঁর নতুন কর্মসূচী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে।

কারামুক্তির পরে নরেন ভট্টাচার্য তাঁর পুরনো ধর্ম-জিজ্ঞাসায় মন দিয়ে ভুলতে চাইলেন সন্ত্রাসবাদের নেশা। সন্ন্যাস নিয়ে কিছুদিন তিনি উত্তর ভারত পরিক্রমা করে পুলিশের তাড়নায় ফিরে এলেন কলকাতায়। তাঁর বন্ধু ফণী চক্রবর্তী তখন (১৯১২ সালে) রিপন কলেজে এম এ পড়ছেন এবং থাকেন ১২ মীরজাফর লেনে। অশান্ত নরেনকে টাকা দিয়ে তিনি এক রেস্তোরাঁ খোলালেন ক্লাইভ স্ট্রীটে: যতীন্দ্রনাথ, হরিকুমার, পরাণ (সুরেশ মজুমদার), ভোলানাথ চাটুজ্যে, মজিলপুর কেন্দ্রের নেতা তিনকড়ি দাস, শৈলেশ্বর বসু প্রভৃতির দেখা মিলত এখানে। অল্পকাল বাদে রেস্তোরাঁ উঠে গেল।

ভোলানাথের সঙ্গে ফণীর আলাপ হয় ১৯০৮ সালে, অনুশীলন আখড়ায়। ভোলা, নরেন আর ফণী ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠেছেন তখন হাত গুটিয়ে বসে থেকে। নূতন কোনও আন্দোলনের আশা সুদূরপরাহত দেখে তিনজনেই তখন মতলব ভাঁজছেন—ধনীর ঘরে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ির টাকায় অ্যামেরিকা চলে যাবার। একটি মেয়ের সঙ্গে ফণী কিছুদিন প্রেম করে বাধা পেলেন মেয়েটির অভিভাবকদের কাছে; মেয়েটি আত্মহত্যা করল; ফণী অন্যত্র বিয়ে করে ফেললেন।[৩৪ক]

যতীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য অতুলকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৯০-১৯৬৬) কলকাতা হিন্দু স্কুল থেকে পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে বিজ্ঞান পড়তেন। ফণীর সঙ্গে তখন তাঁর আলাপ। ১৯১১ সালে অতুল বি এসসি পড়তে গেলেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে। ঠিকাদারির কাজ উপলক্ষে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানে তাঁর দেখা-সাক্ষাতের সুবিধা হল। ১৯১২ সালে খুলনার দৌলতপুর কলেজে অধ্যাপনা করতেন 'যুগান্তর' দলের সভ্য শশিভূষণ রায়চৌধুরী, ডাঃ অমূল্য উকিল, মণীন্দ্র শেঠ ও শরৎ ঘোষ; তাঁদের টানে দৌলতপুর যাতা-

রাতের সুবাদে এবং শশিভূষণের দৌত্যে দুটি কৃতী ছাত্রের দেখা পেলেন যতীন্দ্রনাথ: সতীশ চক্রবর্তী (১৮৯১-১৯৬৮) আর ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৯৪-১৯৭৯); দু'জনকেই যতীন্দ্রনাথের খুব ভাল লেগে গেল। সতীশের দীক্ষাগুরু যশোরের শিশির ঘোষ (মুরারিপুকুর বোমার মামলায় দণ্ডিত) দীক্ষা নিয়েছিলেন খোদ যতীন মুখুজ্যের কাছেই। ১৯১২ সালে সতীশকে বহরমপুরে বি এ পড়তে পাঠিয়ে দিলেন যতীন্দ্রনাথ এবং অতুলের সহ-যোগিতা করতেও। এখানে তখন গুপ্ত সমিতির দারুণ রমরমা। চট্টগ্রামে সূর্য সেন (১৮৯৪-১৯৩৪) এখানেই অতুল ও সতীশের টানে 'যুগান্তর' দলভুক্ত হন। ১৯১৩ সালে সতীশের হাতে বহরমপুরের ভার দিয়ে অতুল-কৃষ্ণ কলকাতায় গিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম এসসি ক্লাসে যোগ দিলেন। পরের বছর সতীশও চলে এলেন ওখানে এম এ এবং আইন অধ্যয়নের জন্য। প্রধানত হার্ডিঞ্জ হোস্টেল, ইডেন হিন্দু হোস্টেল ও ১১০নং কলেজ স্ট্রীটে বিজ্ঞানের ছাত্রদের মেস তখন যতীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ছাত্রদের ও কর্মীদের অড্ডা। ভবিষ্যতের বহু কৃতী নাগরিক সরাসরি যতীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন এই ছাত্রাবাসগুলির কল্যাণে। নরেন ভট্টাচার্য ও ফণী চক্রবর্তীর সঙ্গে এখানেই যতীন্দ্রনাথ আলাপ করিয়ে দেন অতুলকৃষ্ণ ও সতীশের।[৩৫]

রাজনৈতিক কারণে ১৯০৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পুলিন দাস নির্বাসিত হলে 'অনুশীলন' (ঢাকা) মাখন সেনের নেতৃত্বে কাজ চালাচ্ছিল। ওই সময়ে মাখন সেনের ধর্মে মতি গভীরতর হয় তাঁর বন্ধু (বারীনের সহকর্মী) দেবব্রত বসু সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিলেন যখন। কলকাতায় এক বৈঠকে মাখন সেন প্রস্তাব করলেন, বঙ্গভঙ্গ রদ হবার ফলস্বরূপ অনুশীলনের কর্মীরা সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে সমাজসেবায় নামুন। নরেন সেন এই প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হয়ে মাখনকে উৎখাত করে নিজে নেতা হলেন। মাখন কলকাতাতেই থেকে গেলেন। ১৯১৩ সালে দামোদর বন্যাত্রাণ উপলক্ষে যতীন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্র চাটুজ্যের সংস্পর্শে এসে তিনি যুগান্তর দলে ভিড়ে গেলেন। মাখনের সুপারিশ নিয়ে অনুশীলনের কর্মী শশাঙ্ক (অমৃত হাজরা) অতুলকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন। শশাঙ্ক ছিলেন যুগান্তর-অনুশীলনের যৌথ ডাকাতির (বাহ্রাগ্রামের) ফেরারি আসামি। শশাঙ্কের আগ্রহক্রমে অতুল-কৃষ্ণ তাঁকে বোমা প্রস্তুত প্রণালীর শিক্ষা দিতে নিয়ে যান রাজাবাজারে

(২৯৬/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে) ; সেখানে যতীন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে ও অতুলের পরিচালনায়, চন্দননগরের মণীন্দ্র নায়েক গোপন কারখানা খুলে বিশেষ মারাত্মক রকম তেজি বোমা বানাচ্ছেন। অতুলের উদারতায় এই প্রথম অনুশীলন দলের হাতে বোমা এল। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত দৌলতপুরে পড়তে যাবার আগে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তেন ; তাঁর সহপাঠী ও ডাওাস হোস্টেলে রুমমেট ছিলেন কাশীর দেবনারায়ণ মুখুজ্যে। দু'জনেই তখন শশাঙ্কের বন্ধু। কাশী থেকে দেবনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে এলেন শচীন সান্যাল ; ইনি কলকাতার ছেলে এবং অতুলকৃষ্ণের পুরনো সহকর্মী হলেও ১৯০৮ সালে তাঁর বাবা কাশীতে বদলি হবার দরুন কাশীতে বাস করতেন। সেখানেই তিনি কলকাতার আদলে খুব ভাল একটা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন, মূলত শরীর-চর্চার জন্য। সশস্ত্র বিপ্লবের কথা শুনে কলকাতায় খোঁজখবর করতে এসে দেবনারায়ণ ও ভূপেন দত্তর সঙ্গে শশাঙ্কর কাছে যান। শশাঙ্ক তাঁকে ঢাকা দলে টেনে নিলেও কলকাতার যুগান্তর কর্মীদের প্রতি শচীন তাঁর আনুগত্য ও বন্ধুত্ব বজায় রাখেন। ভূপেন দত্ত ঢাকা অনুশীলন ছেড়ে পুরোপুরি যুগান্তর দলে ঢুকে গেলে শচীন তাঁর কাছে অনুযোগ করেন : "সময় থাকতে কেন আমায় খবর দিসনি ? আমিও তা হলে বাঙালদের দিকে অতটা ঝুঁকতাম না !"

শশাঙ্কের সঙ্গে নরেনের জানাশোনা হয় বাহ্রা ডাকাতির সূত্রে। অতুলের মাধ্যমে শশাঙ্ককে কলকাতায় ঘোরাফেরা করতে দেখে নরেনও উপস্থিত হন রাজাবাজারের কারখানায় এবং শশাঙ্ককে নিয়ে বোমা-বারুদ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করেন। কিন্তু মন তাঁর তখন পড়ে রয়েছে সাগর-পাড়ি দেবার দিকে।[৩৬]

যতীন্দ্রনাথ ঘনঘন কলকাতায় ফিরে আসছেন দেখে সবার সন্দেহ হল, ঘোরতর একটা কিছু ঘটবে। যুদ্ধ বেধে গেল। তার বাইশ দিন পরে (১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট) ইংরেজ কোম্পানি রডা ক' বাক্স মাউজার পিস্তল ও প্রচুর কার্তুজ আমদানি করেছে খবর পেয়ে বিপিন গাঙ্গুলী তাঁর চেলাদের নিয়ে দু বাক্স পিস্তল (৫০টি) ও ছেচল্লিশ হাজার কার্তুজ সরিয়ে ফেললেন। বাকি ৯৫০টি পিস্তল চলে গেল রডা কোম্পানির গুদামে। অস্ত্র-গুলি বিপিন গাঙ্গুলীর এক মাড়োয়ারি বন্ধুর বাড়িতে ডুলিয়ে সবাই সাপে ছুঁচো গেলার দায়ে পড়ে গেলেন। সতর্ক পুলিশ তন্নতন্ন করে হৃত অস্ত্রগুলির

খোঁজ করছে। মাড়োয়ারি বন্ধুটির বাড়ির লোক অস্ত্রের খবরে ভীত হয়ে অবিলম্বে ওগুলো সরিয়ে ফেলতে হুকুম দিয়েছেন। কোন মতে বাইশটা অস্ত্র স্থানান্তরিত করে বাকিগুলো সম্বন্ধে বিভ্রাটে পড়ে বিপিন স্থির করলেন ওগুলো গঙ্গায় ফেলে দেবেন।

সেপ্টেম্বরের গোড়ায় পাকাপাকিভাবে কলকাতায় ফিরে এসে এ-সংবাদ পেয়ে যতীন্দ্রনাথ আপসোস করে নরেনকে বললেন: "বিপিন যদি একটু খবর দিত, বাকি অস্ত্রগুলোও সংগ্রহ করা যেত!" তাঁরই অনুমোদন নিয়ে নরেন হাজির হন বিপিনের বন্ধুটির বাড়ি এবং আঠাশটি পিস্তল ও বাকি কার্তুজ উদ্ধার করে আনেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যতীন্দ্রনাথ অধিকাংশ অস্ত্র ও মশলা বিলিয়ে দিলেন বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতাদের মধ্যে।

নরেন অস্ত্র সরিয়েছেন খবর পেয়ে বিপিন চড়াও হলেন ফণীর বাড়িতে। ফণী সেগুলো ফেরত দিতে অস্বীকার করলে ক্রুদ্ধ বিপিন শাসিয়ে গেলেন নরেন ও ফণীর প্রাণনাশ করবেন বলে। নরেনও খাপ্পা হয়ে বিপিনকে খুঁজতে লাগলেন। ব্যাপারটি এত দূর আত্মঘাতী তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছতে দেখে অতুলকৃষ্ণ গিয়ে যতীন্দ্রনাথকে সব খুলে বললেন। বিপিন, নরেন, ফণী, গোপেন রায় আর অতুলকে এক পরামর্শ সভায় ডেকে যতীন্দ্রনাথ সব মনোমালিন্য দূর করে দিয়ে জানালেন যে তিনি সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিতে মনস্থ করেছেন। তারই জন্য অস্ত্রগুলি তিনি বিলি করে দিয়েছেন; যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে জার্মানির সহযোগিতায় সবাইকে এবারে একজোটে কাজে নামতে হবে।[৩৭]

যুদ্ধ বাধবার বছরখানেক আগে নরেন ও ফণীর বন্ধু ভোলানাথ চাটুজ্যে শ্যামদেশে গিয়েছিলেন ননীগোপাল বসুকে সঙ্গে নিয়ে। তখন সেখানে ব্রিটিশ-বিরোধী হাওয়া বইছে। পাকো অঞ্চলে বহু পঞ্জাবী দেশকর্মী জীবিকা হিসাবে জার্মান এঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে রেলপথ বানাচ্ছেন। ব্যাঙ্ককের বাঙালী উকিল কুমুদ মুখুজ্যের সঙ্গে শিখ গুরুদ্বারে গিয়ে ভোলানাথ সাক্ষাৎ পেয়েছেন এক গুপ্ত সমিতির। এঁদের সঙ্গে দূরপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলির বিপ্লবীদের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলস্থ 'গদর' দলের যোগাযোগ ছিল। বার্লিনে ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মান সরকারের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সমর্থনে তাঁরা অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ পাঠাবেন অ্যামেরিকা থেকে। স্থানীয় জার্মান দূতাবাসগুলি বার্লিন থেকে সরকারী

নির্দেশ পেয়েছেন এই মর্মে। অবিলম্বে ভারত থেকে লোক পাঠাতে হবে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য।[৩৮] ১৯১৪ সালের নভেম্বরের গোড়ায় ভোলানাথ কলকাতায় ফিরলেন এই গরম খবর নিয়ে।

এর ক'দিন বাদে অধ্যাপক শ্রীশ সেনের ভাই মাণ্ডরার সত্যেন সেন অ্যামেরিকা থেকে 'গদর' দলের প্রত্যক্ষ বিবরণ নিয়ে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন। সহযাত্রী বিষ্ণুগণেশ পিংলে ও কর্তার সিং সমভিব্যাহারে সত্যেন ক'দিন চীনে কাটিয়ে এসেছেন—ওখানকার 'গদর' কর্মীদের সঙ্গে এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। যতীন্দ্রনাথ তখুনি সত্যেন ও তাঁর সঙ্গীদের পাঠিয়ে দিলেন রাসবিহারী বসুর নামে পরিচয়-পত্র দিয়ে। পঞ্জাবে তখন কয়েক হাজার গদরপন্থী মার্কিন মুলুক থেকে ফিরে অধীর আগ্রহে দিন গুণছেন অভ্যুত্থানে নামবেন বলে।[৩৯]

গদরপন্থীদের আর তর সইছে না খবর পেয়ে যতীন্দ্রনাথ ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে কাশীতে এক বৈঠক ডাকলেন এবং রাসবিহারী, নরেন ও শচীন সান্যালের সঙ্গে স্থির করলেন যে পেশোয়ার থেকে বাংলা অবধি সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় ২১শে ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে। এই বৈঠকেই রাসবিহারী শুনলেন যতীন্দ্রনাথের কাছে—জার্মানির অস্ত্র-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এসে গিয়েছে।[৪০] ইতিপূর্বে ১৯১১ সালে একবার এবং ১৯১৩ সালের শেষেও রাসবিহারীকে দেখা গিয়েছে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতে। দ্বিতীয়বার যতীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন রাসবিহারীকে: "ফোর্ট উইলিয়াম দখল করতে হবে। পারবে?" মন্ত্রচালিতের মতো রাসবিহারী এই দায়িত্ব গ্রহণ করে কেল্লা অঞ্চলে এক হাবিলদারের সঙ্গে কথাও পাকা করেন।[৪১] যতীন মুখার্জীর প্রভাবে এসে রাসবিহারীর বৈপ্লবিক উদ্যম এক নূতন উদ্দীপনা লাভ করে; মুখার্জীর মধ্যে রাসবিহারী আবিষ্কার করেন সত্যকার এক গণনায়ককে।"[৪২]

চন্দননগরের পুরনো বিপ্লবী-দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই সময়ে মতিলাল রায় আসন্ন অভ্যুত্থানের মুখ চেয়ে কাজে নামেন। কাশীর শচীন সান্যাল যেমন, তেমনি মতি রায়ও রইলেন 'অনুশীলন' (ঢাকা) ও 'যুগান্তর' (কলকাতা) দলদুটির সংযোগস্থলে। চন্দননগরের বয়স্ক নেতা শ্রীশচন্দ্র ঘোষের মাসতুতো ভাই রাসবিহারীর সঙ্গেও মতিলাল সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এই মর্মে। যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারীর মধ্যেও তিনি যোগসূত্র

হবার প্রস্তাব করলেন।

"মতিলাল রায়ের আচরণের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমরা অবাক," ফণী চক্রবর্তী বিবৃতি দিয়েছেন: "দাদার ধারণা হয় জার্মানদের সঙ্গে সরাসরি কোনও সংযোগ হয়েছে ওদের এবং নিজেদের খবর আমাদের দিতে চায় না অথবা যথাসময়ে দেবে।"[৪৩]

অভ্যুত্থানের জন্য অর্থের প্রয়োজন? নরেন ভট্টাচার্য ভার নিলেন, স্বদেশী ডাকাতি করে টাকা তুলে দেবেন যতীন্দ্রনাথের হাতে। এই সুবাদে অতুল ঘোষ মাদারিপুরের নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসের কাছে বাছা কয়েকটি কর্মী চাইলে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাসগুপ্ত, রাধাচরণ প্রামাণিক ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ব্রজেন্দ্রলাল দত্ত বা জগাদা (যশোর দলের মারাত্মক কর্মী) এসে পড়লেন।

এই পাঁচজনের সঙ্গে নরেন ভট্টাচার্য, ফণী চক্রবর্তী ও পতিতপাবন দে ১৯১৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এসপ্ল্যানেড থেকে ট্যাক্সি নিয়ে গার্ডেনরীচ ও সার্কুলার রোডের মোড়ে ওত পেতে রইলেন। ইংরেজ সংস্থা বার্ড কোম্পানির দশ থলি টাকা (১৮,৪০০্) নিয়ে এক ছ্যাকড়াগাড়ি ওইদিন যাবার কথা। গাড়িটা এসে পড়তেই ট্যাক্সি গিয়ে দাঁড়াল তার পথ আগলে। চিত্তপ্রিয় গিয়ে ঘোড়ার রাশ ধরলেন; আর সবাই শান্তভাবে থলিগুলো ট্যাক্সিতে তুলে নিলেন। টাকাগুলো উল্টোডাঙার এক বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওখানে আত্মগোপনকারী বিপিন গাঙ্গুলীর জিম্মায় চার হাজারের মতো খুচরো রেখে বাকি টাকা ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের মেস্-এ গিয়ে "অর্থমন্ত্রী" গোপেন রায়ের হাতে দিয়ে বিপ্লবীরা নিশ্চিন্ত হলেন।[৪৪]

যতীন্দ্রনাথ তখন বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে একটা ভাড়া ঘরে উঠেছেন, পুরনো অনুশীলন-কর্মী পাঁচুগোপাল বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে। এই পাঁচুগোপালও শিবপুরের নরেন চাটুজ্যের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ প্রচারের কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে তাঁর 'আর্যনিবাস' হোটেলে যতীন্দ্রনাথ নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বিদ্যাসাগর স্ট্রীটের বাসায় বিপিন গাঙ্গুলী প্রায়ই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসে, ফিরে যাবার সময় অসহায়ের মতো এধার-ওধার তাকাতেন। "কি বিপিন, সঙ্গে অস্ত্রটস্ত্র আছে তো?" প্রশ্ন করতেন যতীন্দ্রনাথ। মাথা চুলকে জবাব দিতেন বিপিন: "নাঃ দাদা, আজও ভুলে গেছি—" "তাতে কি, এইটা নিয়ে যাও। যা দিনকাল

পড়েছে, খুব সতর্ক থেকো হে—" বলে একটা মাউজার পিস্তল এগিয়ে দিতেন যতীন্দ্রনাথ। পরপর ক'দিন এই ঘটনা দেখে নরেন অপ্রসন্ন হলে যতীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "বিপিনটা আমায় নেহাত গবেট ঠাউরেছে!"...১৮ই ফেব্রুয়ারি অতুল ঘোষ, নরেন ভট্টাচার্য ও সুশীল সেনকে সন্দেহক্রমে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। মাথাপিছু এক হাজার টাকা জামিনে তাঁদের ছেড়ে দিল ২২শে; ২রা মার্চ হাজরে দিতে হবে, কথা রইল। বৃথাই![৪৫]

নরেনের গ্রেপ্তারের সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে বিপিন তাঁর ডেরা ছেড়ে চলে এলেন যতীন্দ্রনাথের বাসায়। উল্টোডাঙার ঘরে পড়ে রইল বাক্স-ভর্তি চার হাজার টাকার খুচরো। শুনে ফণী ওটা উদ্ধার করতে গিয়ে দেখেন এক সাহেব সার্জেণ্ট একপাল হিন্দুস্থানী সেপাই নিয়ে বাড়িটা ঘেরাও করেছে। ফিরে এসে ফণী এই খবর দিতেই সবাই মাউজার পিস্তল পকেটে ও-মুখো পা বাড়ালেন। সঙ্গীদের নিষেধে কান না দিয়ে যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং, বিপিন গাঙ্গুলী, ফণী, বিনয় দত্ত ও "ফকিরচাঁদ মিত্র মেস্-এর ছেলেরা" (ভূপতি মজুমদার প্রমুখ চার-পাঁচজন) প্রায় রাত নটায় অকুস্থলে গিয়ে দেখেন পুলিশ চলে গিয়েছে। বাক্সের মধ্যে টাকাটা অক্ষত আছে। সেটা নিয়ে সবাই ফিরলেন বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে![৪৬]

১৯১৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি (নরেনের অনুপস্থিতিতে) ফণী চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গোপেন রায়, রাধাচরণ, নীরেন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, পতিতপাবন, সত্যরঞ্জন বসু ও নরেন ঘোষচৌধুরী বেলেঘাটার এক আড়তে ডাকাতি করে পনেরো হাজার টাকা এনে যতীন্দ্রনাথকে দিলেন। সবার সামনেই ওটা যতীন্দ্রনাথ গচ্ছিত রাখলেন বিপিন গাঙ্গুলীর জিম্মায়।[৪৭]

গোপেন রায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের ৭৯ নম্বরে। আত্মগোপনার্থে যতীন্দ্রনাথ, বিপিন, নরেন ভট্টাচার্য ও মাদারিপুরের কর্মীরা উঠলেন গিয়ে সেই আস্তানায়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি হঠাৎ গুপ্তচর নীরদ হালদার হাজির হয়ে "আরে যতীনবাবু, আপনিও এখানে—" বলে সোল্লাসে চেঁচাতেই নেতার দৃষ্টিতে সমর্থন পেয়ে নীরেন দাশগুপ্ত তাকে গুলি করলেন। ভূলুণ্ঠিত নীরদকে ফেলে রেখে, আর গুলি না চালিয়ে ছত্রভঙ্গ হবার নির্দেশ দিলেন যতীন্দ্রনাথ। একদল চলে গেলেন খিদিরপুর আড্ডায়, অন্যদল বঙ্গবাসী কলেজের মেস্-এ। ফণী চাংড়িপোতা থেকে খবর পেয়ে যতীন্দ্রনাথদের নিয়ে গেলেন তাঁর মীর্জাফর লেনের

বাড়িতে।[৪৮]

তার ঠিক চারদিন পরে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, দুই মনোরঞ্জন (সেনগুপ্ত ও গুপ্ত), নীরেন, নরেন ঘোষচৌধুরী ও সুশীল সেন উপস্থিত হলেন এখনকার আজাদ হিন্দ বাগের মোড়ে। সঙ্গত কারণেই নরেন ভট্টাচার্যকে বার হতে দেননি যতীন্দ্রনাথ। সি আই ডি ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখুজ্যে তখন ধরপাকড়ের নেশায় মুখিয়ে উঠেছে। বারে-বারে বিপ্লবীদের নাজেহাল করে সে অমূল্য সময় নষ্ট করছে; নরেন ভটাচার্যদের সে-ই গ্রেপ্তার করায়। সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষে লাটসাহেবের আসার কথা। সুরেশ মোতায়েন আছে নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে। হঠাৎ ফেরারী আসামী চিত্তপ্রিয়কে দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে সুরেশ তাঁকে ধরতে ছুটল। চিত্তপ্রিয়ের অবস্থা ন যযৌ ন তস্থৌ; সুরেশকে টিপ করে পিস্তল তুলেও ঘোড়াটা নড়ছে না; সুরেশ তাঁকে ঝাপটে ধরা মাত্র গর্জে উঠল ঘোষচৌধুরীর অব্যর্থ অগ্নিনালিকা। সুরেশের মৃতদেহ সামলাতে গিয়ে আর-একটি দারোগারও জীবন গেল।[৪৯]

নীরদ হালদার মারা যাবার আগে হাসপাতালে বলে যায় যে যতীন্দ্রনাথই তাকে হত্যা করেছেন। পত্র-পত্রিকায় সেই বিবৃতি ছাপিয়ে যতীন্দ্রনাথের নামে হুলিয়া প্রকাশ করে দিল সরকার, তাঁর ফটো ছাপিয়ে চারিদিকে লটকে দিল এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারলে মোটা পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি সর্বত্র চাউর করা হল।[৫০] বিপ্লব আন্দোলনের 'প্রাণ ভোমরা' তখন যতীন্দ্রনাথ, বহুভাবেই তা স্বীকৃতি পেল। তাঁর নাগাল যাতে পুলিশে না পায়, সেজন্য তাঁর সহকর্মীদের সতর্কতার অবধি রইল না। নলিনীকান্ত কর কথা তুললেন—বালেশ্বরের কাছে কপ্তিপদার জঙ্গলে ১৯০৮ সালে পলাতক বিপ্লবীদের যে আশ্রয়স্থল বানিয়েছিলেন দেবীপ্রসাদ রায় (খুড়ো), ১৯১০ সালে সেখানে কিছুদিন আত্মগোপন করে ছিলেন নলিনীকান্ত। কেউ একজন তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখে আসুক—স্থানটি মহানায়কের প্রয়োজনে লাগবে কি না। সবারই কাছে জুতসই ঠেকল এ-প্রস্তাব। কারণ জার্মান জাহাজ এলে বালেশ্বরের উপকূলই হবে অস্ত্রশস্ত্র খালাসের প্রশস্ততম ঘাঁটি। এই নলিনী, তাঁর জ্ঞাতিভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, নরেন ভটাচার্য আর মাদারিপুরের রত্নপ্রভ ছেলে ক'টি 'দাদা আর গদা' ছাড়া কিছু জানেন না। নলিনীকে নিয়ে তখুনি নরেন গেলেন জায়গাটা

পরিদর্শনে।

যতীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রশ্ন তুললেন : "একা আমার নিরাপত্তার কথা ভাবলেই হবে ? যতদিন না বিপিন, চিত্তপ্রিয় ও আর সবার জন্য ঠিকমতো আশ্রয় পাচ্ছ, ততদিন আমি কলকাতা ছাড়ছিনে !" এমন সময়ে, ১৯১৫ সালের মার্চের গোড়ায় শ্রীরামপুর গুপ্ত সমিতির জিতেন লাহিড়ি দেশে ফিরলেন। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি, তারকনাথ দাসের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করছিলেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু দর্শন বিষয়ে ১৯১২ সালে বক্তৃতা করতে গিয়ে হরদয়াল একদিন ঝোঁকের মাথায় তীব্র অশালীন ভাষায় বিবেকানন্দকে সমাজের শত্রু, পলায়নবাদী মোক্ষলুব্ধ দার্শনিক ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করতেই উপস্থিত জিতেন লাহিড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সংযত অথচ শাণিত ভাষায় হরদয়ালকে স্মরণ করালেন দেশের জন্য, সমাজের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের অবদান ; সংগ্রামের সমস্ত দাবিকে অস্বীকার করে সত্যিই যিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ও ভ্রান্তির ঘানিতে চক্কোর মারছেন—তিনি, স্বয়ং হরদয়াল। "আপনি জানেন কি, মিঃ হরদয়াল," জিতেন বললেন, "এই দেশেই আপনার আশেপাশে শত সহস্র দেশভক্ত ভারতীয় আজ মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে উদ্যত : এমন মহামূল্য মানব-জীবন, আপনি যদি চাইতেন, তাদের দেদীপ্যমান করে তুলতে পারতেন সামান্য চেষ্টায় !" এই ভৎ'সনায় হতচেতন হরদয়াল সংবিত ফিরে পান এবং যুক্তিপ্রিয় তারকনাথ দাস ছ' বছরের পরিশ্রমে যেসব সঙ্ঘ-সমিতি দাঁড় করিয়েছিলেন—পাগল হরদয়াল তাদের মধ্যে এনে দিলেন অপূর্ব এক উন্মাদনা। কলকাতার 'যুগান্তর'কে স্মরণে রেখে সানফ্রান্সিস্কোয় স্থাপিত হল 'যুগান্তর আশ্রম' ও প্রকাশিত হল 'গদর' পত্রিকা (নভেম্বর ১৯১৩); জিতেন এখানেও তারকনাথের সাকরেদ হিসাবে সক্রিয় থাকলেন।[৫১] ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 'গদর' প্রতিনিধি জিতেন লাহিড়ি দু' মাসের জন্য বার্লিনে গিয়ে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের বিশদ তত্ত্ব সংগ্রহ করে দেশে ফিরলেন। দেখা করলেন যতীন মুখুজ্যে, অতুল ঘোষ, হরিকুমার প্রভৃতির সঙ্গে—উত্তরপাড়ায় অমরেন্দ্র চাটুজ্যের বাড়িতে। নরেন ভট্টাচার্য তখনো বালেশ্বর থেকে ফেরেননি। যতীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন—দলের তরফ থেকে নরেনকে তিনি নির্বাচিত করেছেন ব্যাঙ্কক, বাটাভিয়া ও শাংহাই গিয়ে সেখানকার জার্মান রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমদানির ব্যবস্থা পাকা

করতে। আহূত হয়েও এই বৈঠকে মতিলাল রায় যোগ দেননি।[৫২]

বিদেশের সঙ্গে চিঠিপত্র, টেলিগ্রামের আদান-প্রদানের জন্য একটা নির্ভরযোগ্য ঠিকানার প্রয়োজন হল। হরিকুমার রাজি হলেন না 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স'কে এই সূত্রে জড়িয়ে ফেলতে। বিপ্লবের কর্মসূচী থেকে ক্রমেই তিনি সরে দাঁড়াচ্ছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর বেজায় অর্থাভাবের দরুন নগদ পাঁচ শো টাকা দিয়ে তাঁকে হাত করা গেল। এই সময়ে নরেন ঘোষচৌধুরীর বরিশাল দল ও বিপিন গাঙ্গুলীর আত্মোন্নতি দলও অর্থের জন্য যতীন্দ্রনাথের মুখাপেক্ষী; এইসব হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাখবার দরুন গোপেন রায়কে যথেষ্টই দুর্ভোগ ভুগতে হয়—পরে যখন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।[৫২ক]

নরেন ও নলিনী ফিরে এসে সন্তোষজনক রায় দিলেন। নলিনী ফিরে গেলেন কপ্তিপদায় নতুন একটা আটচালা তোলাতে। কপ্তিপদা যাবার পথে নরেন ও বিপিনকে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ প্রথমে গেলেন বাগনানে; দলের কর্মী ওখানকার হেডমাস্টার অতুল সেনের আশ্রয়ে ক'টা দিন কাটাবেন বলে। তিনি কলকাতা ছাড়বার মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দের অনুগত রামচন্দ্র মজুমদার সতর্ক করে দিলেন এই প্রয়াসের উদ্যোক্তা মাখন সেনকে: "বাংলার প্রাণ আজ আপনার হাতে দেওয়া হল। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। নিজের দায়িত্ব বুঝে নেবেন।"[৫৩]

বাগনান থেকে বিপিন কলকাতায় ফিরলেন। নরেনের সঙ্গে মহিষাদলের কাছে কুমার-আড়ার হেডপণ্ডিত হেমচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে ক'দিন কাটিয়ে, যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরগামী ট্রেন ধরলেন। পথে পাঁশকুড়ায় ফণী চক্রবর্তী ও ভূপতি মজুমদার তাঁদের সঙ্গ নিলেন। কলকাতা থেকে তিনটে সাইকেল আর পাথেয় এনেছেন তাঁরা। এই অবকাশে যতীন্দ্রনাথের কাছে ফণী ভাঙলেন গোপেন রায়ের দুর্ভাবনার কথা: দলের ১৮,৮০০৲ টাকা দিয়ে এতদিন খরচপাতি চলছিল; কিন্তু নরেনের বিদেশ যাবার অর্থ গোপেনের হাতে না থাকায় যতীন্দ্রনাথ যে পনেরো হাজার টাকা বিপিনের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন, গোপেন সেটা চাইতে যান। আলটু-বালটু গপ্‌পো ফেঁদে বিপিন বুঝিয়ে দিয়েছেন যে পুরো টাকাটা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ফণীর দুশ্চিন্তা দূর করে যতীন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন: যেভাবে হোক টাকাটা উদ্ধার করতে হবেই; অবিশ্বাস্য কাহিনীতে কান দেবার দরকার নেই।[৫৪]

এই প্রসঙ্গে বিপিনের সঙ্গে নরেন আর ফণীর আবার নতুন করে বৈরি-

ভাব শুরু হল। কে কার প্রাণ হরণ করেন, সেই শঙ্কায় তটস্থ রইলেন বিপ্লবীরা। অর্থের প্রয়োজনে ফণীর নেতৃত্বে প্রাগপুরে ডাকাতি করতে গেলেন বিপ্লবীরা, ১৯১৫ সালের ২৯শে এপ্রিল: অপঘাতে প্রাণ দিলেন সুশীল সেন।

নরেন কলকাতা থেকে কপ্তিপদায় তাঁর মালপত্র নামিয়ে যতীন্দ্রনাথের পদধূলি নিয়ে ১৫ই এপ্রিল মাদ্রাজ হয়ে বাটাভিয়া যান। ১৩ই জুন কপ্তিপদায় ফিরে নাটকীয়ভাবে গুরুর চরণে একরাশ মোহর ও ১৮,০০০৲ টাকার একটা ড্রাফট রেখে প্রণাম করলেন। সব ব্যবস্থা পাকা হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ জার্মান দূতাবাসে তৈরি একটি মানচিত্রে চিহ্নিত বালেশ্বরের অস্তিত্ব দেখালেন তিনি। কলকাতা গিয়ে টাকা ভাঙিয়ে নিলেন অতুলের দিদি মেঘমালা দেবী ও জামাইবাবু কে পি বসুর সাহায্যে। অতুল ও যাদুগোপালকে জানালেন যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ। ১৫ই আগস্ট দ্বিতীয়বার তিনি ফণী চক্রবর্তীকে নিয়ে বাটাভিয়া যাবার প্রাক্কালে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলোচনার উল্লেখ করেছেন উত্তরকালে—মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আত্মজীবনীতে:

"একটি ভাবপ্রবণতা (পুরনো সহকর্মীদের প্রতি আনুগত্য) আর নূতন এক আদর্শকে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বরণ করা—এই দুটির মানসিক টানাপোড়েনে আমি তখন জর্জরিত। একমাত্র যে ব্যক্তিকে প্রায় অন্ধের মতো আমি বারবার অনুসরণ করে এসেছি, ভুলতে পারছিলাম না তাঁর বিধান। দ্বিতীয়বার[৫৫] ভারতবর্ষ ছাড়ার আগে আমি নিজে পাহারা দিয়ে যতীনদাকে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর অজ্ঞাতবাসে—পরে যেখানে যুদ্ধ করে তিনি প্রাণ দেন। রোমান্টিক তরুণের স্বল্পবুদ্ধি আর্জি—'অস্ত্র না নিয়ে আর ফিরব না আমি'—শুনে অগ্রজ সস্নেহে জবাব দিয়েছিলেন: 'ফিরে আয় চটপট, অস্ত্র পাস আর না পাস!' সে-রায় আমার কাছে ছিল আদেশ। তিনি আমাদের দাদা যেমন, তেমনিই ছিলেন আমাদের সর্বাধিনায়ক।"[৫৬]

এই প্রসঙ্গে ফণী চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তির আংশিক উদ্ধৃতি প্রয়োজন:

"...বাটাভিয়া যাবার আগে নরেন ও আমি কপ্তিপদা যাই দাদার সঙ্গে দেখা করতে। সে-সময়ে আমরা লক্ষ করি দাদা তাঁর উদার চরিত্রের জন্ত ওই অঞ্চলে রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। আশপাশ থেকে বহু লোক আসছে তাঁর পরামর্শ ও তাঁর অর্থসাহায্য নিতে; তিনি দুটিতেই ছিলেন

দরাজ।…যাদুর সঙ্গে কথা বলে গোয়ায় তাঁর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হল। বাংলা থেকে দূরে বলেও বটে এবং পর্তুগীজ অধিকৃত এলাকা বলে পুলিশ খুব বেশি নজর রাখবে না তাঁর উপরে। তখুনি আমাদের এক কর্মীকে গোয়ায় একটি দোকান খুলতে পাঠানো হল এবং স্থির হল, ওই দোকানের মালিক রূপে অবিলম্বে দাদা ওখানে যাবেন।…পরিকল্পনাটি আমাদের সবার মনঃপূত হয়, কারণ গোকর্ণীতে অস্ত্রবাহী জাহাজ এলে স্বয়ং দাদাই মরাঠাদের পরিচালনা করতে পারবেন ; নেতা না থাকলে মরাঠারা অকেজো হয়ে পড়ে। সব চেয়ে বড় কথা, যদি কোনও বিপদ আসে, গোয়া থেকে দাদা যত সহজে বিদেশ চলে যেতে পারবেন, আর কোথাও ততটা সম্ভব নয়।…"[৫৭]

এর পরবর্তী কাহিনী—বালেশ্বর যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের অসমসাহসিক আত্মদান—সুবিদিত। 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' গ্রন্থের সূচনায় ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখেছেন : "…সমস্ত ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রটা ধরা পড়ে গেল। বালেশ্বরের হলদিঘাটে যতীনদা নিহত হলেন। ও-পর্ব প্রায় শেষ হয়েই গেল। আশা ছাড়লে আর যারই চালুক, বিপ্লবীর চলে না। 'দাদা'র মৃত্যুর পর সবাই প্রায় ভেঙে পড়েছেন—এই সেদিন যেমন গান্ধীজীর মৃত্যুর পর সারা দেশ ভেঙে পড়েছিল। যাদুগোপাল মুখার্জী তখনও চেষ্টা করছেন।…"[৫৮]

বিদেশে বসে নরেন ভট্টাচার্যও দীর্ঘকাল চেষ্টা চালিয়ে গেলেন।

॥ ছয় ॥

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক নরেনের কাছে—অর্থাৎ বিবেকানন্দের কাছে—যে-বিত্ত পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারের মতো, তাঁর ছত্রিশ বছরের জীবনটার ঠিক মধ্যভাগে পৌঁছে কার হাতে তাকে দিয়ে যাবেন তিনি? আপন প্রাণ বাঁচানো ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মোহ তাঁর ছিল না। দেশের ও জাতির মঙ্গল-চিন্তাই তাঁর চেতনায় জাগ্রত ছিল অহর্নিশ। পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্রাশয়তা, ঈর্ষা, কপটতার ঘাত-প্রতিঘাত সবই অন্তরের আনন্দ ও আলো দিয়ে প্লাবিত করে একটা যুগব্যাপী যে-বিপ্লবের বোধনে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, তার অন্তিম সাফল্যের জন্য—তাঁর মন বলল—তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। সজ্ঞানেই তিনি জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমিকদের শেষ বারের

মতো উচ্চকিত করে মাতৃভূমির বেদীতলে অঞ্জলি দিয়ে গেলেন দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকু। যাবার আগে, হয়তো-বা অন্য নরেনের অগোচরেই তাকে উজাড় করে দিয়ে গেলেন তাঁর সাধনালব্ধ ধন। তাকে চিহ্নিত করে গেলেন উত্তরসাধকের যোগ্যতার দাবীতে। পুরাকালের সত্য-সন্ধানীরা আপন আপন উপলব্ধিকে বিকীর্ণ বিচ্ছুরিত করে যেতেন জীবনের প্রতিটি পলে-অনুপলে; মননশীল শিষ্য-পরম্পরায় সেই উপলব্ধি পরিগ্রহ করত দর্শনের রূপ। যে-উপলব্ধি যতীন্দ্রনাথে মূর্ত হতে দেখেছিলেন নরেন ভট্টাচার্য, তাকে তাত্ত্বিক পরিণতি দিলেন তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকায়—'নব মানবতাবাদ' রূপ দর্শন প্রণয়নে।

উচ্চাভিলাষী, অত্যন্ত আন্তরিকতা-বশত অসহিষ্ণু, গভীর অভিনিবেশ-সক্ষম, দুঃসাহসী এই শিষ্যটিকে কূপমণ্ডূকদের গণ্ডী থেকে দ্বিতীয় বার ছিটকে পড়বার সুযোগও সজ্ঞানেই দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। বিদেশে যাবার খদ্দেরের তখন অভাব নেই। কিন্তু দেশে বসে একদিকে রাজরোষ, অন্যদিকে সহকর্মীদের প্রতিহিংসা-স্পৃহা অকালে যাতে নরেনের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ জীবনে ছেদ না টানতে পারে, সেই বাসনাতেই তাকে তিনি গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া করে গিয়েছিলেন। তবু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন: "ফিরে আসিস্!"

পরবর্তী যুগে বিশ্ববিশ্রুত মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "যতীনদার বীর-জনোচিত মৃত্যু আমায় রেহাই দিয়েছিল তাঁর (এই) আদেশ পালনের নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে। ইতিপূর্বে, ১৯১৫ সালের হেমন্তকালে ম্যানিলায় পৌঁছে, পেয়েছিলাম আমি মর্মান্তিক ওই সংবাদ। তখন আমার প্রতিক্রিয়া ছিল নিছক আবেগপ্রসূত। যতীনদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই হবে। তারপরে একটি বছর কেটে গিয়েছে। ইত্যবসরে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে যতীনদা আমায় মুগ্ধ করেছেন কারণ—সম্ভবত তাঁর অজ্ঞাতসারেই—তিনি মূর্ত করেছেন মানবতার চরম উৎকর্ষ। সেই উপ-লব্ধির অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে—যতীনদার মৃত্যুর উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হবে, যদি আমি গড়ে তুলতে পারি তেমনি-এক সমাজ-ব্যবস্থা, যার মধ্যে মানবতার চরম উৎকর্ষ পাবে অভিব্যক্তি।"[৫] অর্থাৎ পুরনো যে উদ্দেশ্য-সাধনার্থে আমি পাড়ি দিয়েছিলাম, তৎসংক্রান্ত বিশ্বাসভঙ্গজনিত কোনও গ্লানিবোধ না রেখেই আমার পক্ষে সেসব পিছনে ফেলে যাওয়া সম্ভব হল,

কারণ আমি আবেগস্তরে এবং যুক্তি দিয়েও প্রবলতরভাবে আকৃষ্ট হলাম নূতন এক লক্ষ্যের দিকে। তা নইলে পুরনো সাধনা ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যর্থতা ও বিতৃষ্ণা আমায় ঠেলে দিত কটকাবাজ (adventurous) এই জীবনের পরিসমাপ্তি অভিমুখে।"[৬০]

মানবেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করে গিয়েছেন—তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান 'নব মানবতাবাদ' দর্শনের মাধ্যমে তিনি চেয়েছেন মানবতার উৎকর্ষকে বিকশিত করতে: গুরু যতীন্দ্রনাথে যে-উৎকর্ষ ও যে-বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল, সেই দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই তিনি অন্বেষণ করেছেন নতুন এক সমাজের। "মানুষের অগ্রগতির মূল প্রেরণা হল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেই প্রেরণাতেই মানুষ ইতিহাস রচনা করে চলেছে", লিখেছেন তিনি। সর্বাঙ্গীণ যে মুক্তির কামনা নিয়ে প্রথম কৈশোরে এঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশ-জননীর শৃঙ্খল মোচন করতে, দেশবাসীর দুঃখ দূর করতে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পীড়ন অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রের পত্তন করতে; মার্কসবাদের বিন্দু-বিসর্গ না জেনেও "সাধারণ মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য ও গ্লানিতে অভিভূত হয়ে মানবিক প্রেরণাতেই বিদ্রোহী" হয়েছিলেন এঁরা; "আবাল্যের সেই মুক্তিলাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই" জীবনের শেষ অবধি যে-প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন মানবেন্দ্রনাথ; অধ্যাত্মবাদী যতীন্দ্রনাথের বস্তুবাদী শিষ্য মানবেন্দ্র-নাথ তাঁর সাধনা ও সমীক্ষার শীর্ষে বসে সেই আধ্যাত্মিকতার বিজয় ঘোষণা করেছেন 'নব মানবতাবাদ' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্তত, যুক্তিবাদী তিনি, রেখে গিয়েছেন এই অনুমানের সপক্ষে প্রভূত যুক্তি।[৬১]

মানবেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী এলেন্ রায় ১৯৬০ সালে যতীন্দ্রনাথের পৌত্রের প্রথম পত্র পাওয়ামাত্র জবাব দিয়েছিলেন: "তোমার পিতামহের স্মৃতি তোমার কাছে কত মনোরম, আমি কল্পনা করতে পারি। আমার স্বামীর মুখে তাঁর সম্বন্ধে যা যা শুনেছি, তা থেকে আমিও শিখেছি তাঁকে গভীরতর সমীহ করতে। কিন্তু সেসবই ছিল—তথ্যনির্ভর স্মৃতিকথার পরিবর্তে—মানসলোকের ব্যঞ্জনা!..."